

182. Q. 899. II.

১৪৩ ১/৩ উদ্বোধন।

উদ্বোধন আশ্রিত প্রাপ্য কল্যাণাদি

182. Q. 899. II.



রামকৃষ্ণ মিশনের বাঙ্গালা-পাঠিক-পত্র।

ধর্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, পিতৃ

সাহিত্য ইতিহাস, ভ্রমণ আকৃতি নানাবিধ বিষয়ক।

তৃতীয় বর্ষ।

১৩০৭ অব্দ হইতে ১৩০৮ পৌষ।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি লেখক।

স্বামী সিদ্ধগীতীত-সম্পাদক।

অগ্নি দ্বারা প্রস্তুত।

প্রকাশক স্বামী বিবেকানন্দ মিশন কলিকাতা

১৩০৭ অব্দ হইতে ১৩০৮ পৌষ।

স্বামী বিবেকানন্দ মিশন কলিকাতা

১৩০৭ অব্দ হইতে ১৩০৮ পৌষ।

1/5/09



সূচীপত্র ।

উদ্বোধন—তৃতীয় বর্ষ ।

১। বিষয়ের আদ্যবর্ণনাক্রমিক সূচী ।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অপেরোক্তাঙ্গুষ্ঠি... স্বামী বিবেকানন্দ (অনুবাদক—স্বামী শুভানন্দ)		৫০০, ৫২৩, ৫৫২, ৫২৩
অসংসার ... ঐ	ঐ	৩৫১, ৩৬৩
অর্থ ...	বাবু হরিদাস দত্ত	২৩৭
আজ্ঞাপালন ...	সম্পাদক	৩৮৫, ৪১৭
আচার্য মুক্তচন্দ্র... স্বামী বিবেকানন্দ (অনুবাদক—স্বামী শুভানন্দ)		৫২৪, ৬২৪
আর—না ...	সম্পাদক	১৭৩
আশ্রম সংস্কার ...	বাবু শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী বি, এ	১৫৪
উপনিষদের বিষয় ...	স্বামী সচ্চিদানন্দ	৪১, ৭৫
একত্ব ও বহুত্ব ...	বাবু শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী বি, এ	২২৫
কর্ষলীলেন বেদান্ত... স্বামী বিবেকানন্দ (অনুবাদক—স্বামী শুভানন্দ)		৩৫৭, ৬৮৩
কি আর কহিব ...	সম্পাদক	৩২৭
কৃষিব্যবস্থা ...	বাবু এফোথেন্স (F. B. H. S. London)	৪৫৩, ৪৫৬, ৬৮৮
পদার্থ... স্বামী শুভানন্দ		৮
গীতা শঙ্করভাষ্যসুধা ...	পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ	৪৭, ৮২, ১৫৩, ২৪২, ৩১৩, ৩৪৫, ৩৭৭, ৪০২, ৪৭৩, ৪৩৭, ৬৩৩
জগৎ ...	স্বামী বিবেকানন্দ (অনুবাদক—স্বামী শুভানন্দ)	২৪৫, ২৭৩, ৩৩২, ৩৩৭
ভীষনকুম্ব ...	বাবু হরিদাস দত্ত	৪২৫
ভাষা ...	বাবু শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, বি, এ	৪৮৭

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ছইটী বন্ধু ...	বাবু শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, বি, এ	৩৫৮
দেবদাহন ...	ঐ	১৯৯
মহাভাগতে গুরু ...	স্বামী সচ্চিদানন্দ	২৫৭
ধর্মের আবশ্যকতা ...	স্বামী বিবেকানন্দ (অনুবাদক—ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষ, এম, বি) ৬২০, ৬১৪, ৬৮৩	
নবানুগাম ...	সম্পাদক	২
নূতন বংসর ...	বাবু হরিদ স দত্ত	২৭০
পরমহংসদেবের উপদেশ ...	স্বামী ব্রহ্মানন্দ	১, ৬৫
পরিব্রাজক ...	স্বামী বিবেকানন্দ	১১, ৬৭
পাঁচ কথা ...	সম্পাদক	১৬, ৮০, ১৪৪
প্রকৃত ...	বাবু শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, বি, এ	৪৮১
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ...	স্বামী বিবেকানন্দ ৩৩, ৯৭, ১২৯, ১৪৩	
প্রীত উপহার ...	বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ	৬৬
বহুত্ব একত্ব ...	স্বামী বিবেকানন্দ (অনুবাদক—স্বামী শুদ্ধানন্দ) ৪০১, ৪৩৩	
বৈজ্ঞানিক কথা ...	বাবু অনুকূলচন্দ্র ঘোষ	৪৮৪
ব্রহ্ম ও জগৎ ...	স্বামী বিবেকানন্দ (অনুবাদক—স্বামী শুদ্ধানন্দ) ১৮১, ২০৯, ২৪১	
ভগবৎকৃপা ও সাধন ...	স্বামী প্রকাশানন্দ	২৯২
মস্তিষ্ক ও শিক্ষা ...	স্বামী শুদ্ধানন্দ	২০৪
মহাত্মাবাদ ...	পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সান্নাধ্যায়ী ২৫, ১২১, ১৮৫, ২১২, ২৮১ ৪৪১, ৫০৫, ৫৬৯, ৬০১, ৬৬৫, ৬৯৭	
মানবজীবন—উদ্দেশ্য ও উন্নতি ...	বাবু অটল চন্দ্র নাথ	৩৬০
মানুষের মতাবলম্বন ...	স্বামী বিবেকানন্দ (অনুবাদক—স্বামী শুদ্ধানন্দ) ১৭, ৪৯, ৮১	
মায়া ও ঈশ্বরধারণার ক্রমবিকাশ	ঐ ঐ	৮৩, ১১৭
মায়া ও মুক্তি ...	ঐ ঐ	১৪৫, ১৭১
মুক্তি ...	বাবু শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, বি, এ	১৩
মুর্খিলা ও অনাথাশ্রম ...	স্বামী অথানন্দ	৪৬
মৃত্যু ...	বাবু শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, বি, এ	১৭
স্বামিকৃষ্ণসহোৎসবে নিগমণ ...	সম্পাদক	১
স্বামিকৃষ্ণ মিশন ...	সম্পাদক	৩

বিষয়	প্ৰেক্ষ	পৃষ্ঠা
সংস্কৃত	ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষ, এম. বি	১০১
শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদামুত	শ্রী ম— ১৭৬, ০৭, ১৮৮, ২৮৯, ৩২২ ০৫০, ০৯০, ৪৪৮, ৫৮৮, ৬১০, ৬৪০, ৬৭১, ৭১০, ৭১১, ৭৭১	
শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেবদাস	প্রেরিত পত্র	৩২, ৬২, ৬২৬
শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেব	সংবাদক	৬২৬
শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেব	প্রেরিত পত্র	১৪৭
শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেব	শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেব ৩০০, ৩০২, ৪২৬, ৪৫০ ৫২২, ৫৮৪, ৬৪১	
সংবাদক	সংবাদক	৬৪১
সংবাদক	শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেব	৬৪১
সংবাদক	শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেব (অনুবাদক—শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেব) ৪০০ ৪৬৫, ৫০১	
শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেব	প্রেরিত পত্র	১২২

২। লেখকগণের নামের আদ্যবর্ণানুক্রমিক সূচী।

লেখক

বিষয়

অখণ্ডানন্দ স্বামী ।—মুর্শিদাবাদ অনাধাত্ম ।

অটল চন্দ্র নাথ ।—মানবজীবন—উদ্দেশ্য ও উন্নতি ।

অনুকূলচন্দ্র ঘোষ ।—নৈজ্ঞানিক কথা ।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ।—প্রীতি উপহার ।

ত্রিগুণাতীত স্বামী (সম্পাদক) ।—আজ্ঞাপালিন, আর—না, কি আর
কহিব, নবাত্মরাগ, পাঁচ কথা, রামকৃষ্ণ-
মিশন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব, সমালোচনা ।

প্রকাশানন্দ স্বামী ।—ভগবৎকৃপা ও সাধন ।

প্রবোধচন্দ্র দে F. R. H. S. (London.)—কৃষিকার বা পল্লীভাণ্ডার ।

প্রমথনাথ তর্কভূষণ (পণ্ডিত) ।—গীতাশঙ্করভাবাহুবাদ ।

ব্রহ্মানন্দ স্বামী ।—পরমহংসদেবের উপদেশ ।

বিবেকানন্দ স্বামী ।—পরিব্রাজক, গ্রাণ্ড ও পাশ্চাত্য ।

বিবেকানন্দ স্বামী ।—(অনুবাদক—ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষ এম, বি)—
ধর্মের আবশ্যিকতা ।

বিবেকানন্দ স্বামী ।—(অনুবাদক—গুহানন্দ স্বামী)—অপরোক্ষাহুত্ব, অমৃতত্ব, আত্মার মুক্তস্বভাব, কর্মজীবনে বেদান্ত, জগৎ, বহুত্বে একত্ব, ব্রহ্ম ও জগৎ, মানুষের যথার্থ স্বরূপ, মারা ও ঈশ্বরধারণার ক্রমবিকাশ, মারা ও মুক্তি, সর্ববস্তুরে ব্রহ্মদর্শন ।

“ম—লিখিত” ।—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ।

মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী (পণ্ডিত) ।—মহাভাষ্যাহুবাদ ।

রামকৃষ্ণানন্দ স্বামী ।—শ্রীশ্রীরামাহুচরিত ।

শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, বি, এ ।—আশ্চর্য্য সময়র, একত্ব ও বহুত্ব, ভাগ্য, দুইটা বন্ধ, দোহাইন, প্রকৃতি, মুক্তি, মৃত্যু ।

শশিভূষণ ঘোষ এম, বি (ডাক্তার) ।—ভক্তদেবচরিত ।

শুক্লানন্দ স্বামী ।—গলাবন্ধে, মস্তিষ্ক ও শিক।

সক্তিদানন্দ স্বামী ।—উপনিষদের বিবরণ, ধর্মজগতে গুরু; সদাশিব ।

হরিন্দাস দত্ত ।—অর্থ, জীবনকুহল, নৃতন সংসার ।

১৯৮৭

৩১শে বঙ্গাব্দ ১৩৮৭ খ্রিঃ ১৯৮৭ খ্রিঃ ১৩/৮/৮৭

৩৫-৭৬০ উপদেশ



(স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রদত্ত)

যেমন ভিত্তি দেশ এই মাটির দ্বারা গঠিত তেমনি আমাদের জীবনও
একটি মাটির উপর নির্ভর করে। কত কতজনই এই ভিত্তি থেকে
উঠে, এই মাটিতে পড়ে, তারা জীবনটা দেশভাষায়ই
যেতে। হুঁসি কথা শুনে মাটি, তাদের ভাষায় শুনতে পারে। কিন্তু
আমি কখনো ভাবতে পারি না, তারা ভিত্তি দেশভাষায়ই
যেতে। হুঁসি কথা শুনে মাটি, তাদের ভাষায় শুনতে পারে।

১. ভিত্তি দেশ ভাষায় না কেন জানি? যেমন মহাজনের
ভাষায় চালা-মালা, তখন মাটির মাঝেই কিছু থেকে মাথা ঘামা করে মাল। এখানে
দেশ, তখন উপস্থান থেকেই তার গিয়ে দেন, একতরফের তার ফেরে।
না কিন্তু মহাজন জানিও ভাষায় চালা-মালা করে দেন।

২. প্রাণের ভিত্তি ভাষায় কেন কেউ না ভাষায় ভাষায় ভাষায়
জান কেউ, কেউ ভাষায় ভাষায় ভাষায় ভাষায় ভাষায় ভাষায়
ভাষায় ভাষায় ভাষায় ভাষায় ভাষায় ভাষায় ভাষায় ভাষায়
ভাষায় ভাষায় ভাষায় ভাষায় ভাষায় ভাষায় ভাষায় ভাষায়

৩. ভাষায় ভাষায় ভাষায় ভাষায় ভাষায় ভাষায় ভাষায়
ভাষায় ভাষায় ভাষায় ভাষায় ভাষায় ভাষায় ভাষায় ভাষায়
ভাষায় ভাষায় ভাষায় ভাষায় ভাষায় ভাষায় ভাষায় ভাষায়
ভাষায় ভাষায় ভাষায় ভাষায় ভাষায় ভাষায় ভাষায় ভাষায়

৪. ভাষায় ভাষায় ভাষায় ভাষায় ভাষায় ভাষায় ভাষায়
ভাষায় ভাষায় ভাষায় ভাষায় ভাষায় ভাষায় ভাষায় ভাষায়
ভাষায় ভাষায় ভাষায় ভাষায় ভাষায় ভাষায় ভাষায় ভাষায়
ভাষায় ভাষায় ভাষায় ভাষায় ভাষায় ভাষায় ভাষায় ভাষায়

নবানুরাগ ।

আজ আমাদের শুভ দিন—উদ্বোধনের নববর্ষারম্ভ । আজ অশীর্বাদ করুন, নূতন উত্তমের সহিত যেন ইহাকে চালাইতে পারি ; উদ্বোধন যেন নববর্ষে নবানুরাগের ভরে অধিকতর বেগে উর্দ্ধগাগে ছুটিতে থাকে । আজ একটু মঙ্গল কামনা করুন, যেন সকলে নব উৎসাহে, নব উজ্জবে স্ব স্ব কার্যে রত হইতে থাকেন ; নব প্রেমে, নব অনুরাগে যেন সকলে নিখুঁত আনন্দ-ময় মুক্তি হইয়া বিচরণ করিতে থাকেন । আজ একটু শুভেচ্ছা করুন, যেন ঘরে ঘরে দীপমালা জলিয়া উঠে ; অন্তরে অন্তরে, প্রতি অন্তরে, প্রতি ক্রমে, যেন আজ তড়িত-তত্ত্ব উদ্দীপিত হইয়া উঠে—নবানুরাগে সকলে যেন মত্ত হইতে থাকেন ; ইন্দ্র বায়ু বরুণ প্রভৃতি দেবগণ, মুনি ঋষি রাজা প্রজা প্রভৃতি মনুষ্যগণ, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণিগণ, যিনি যেখানে আছেন, সকলে যেন আজ একতানে নবানুরাগে গাইতে থাকেন—“জয় বঙ্গের জয়, জয় ভারতের জয়, জয় সকলের জয় ।”

‘নবানুরাগ’ শব্দটী অনেকেরই পক্ষে অতি প্রীতি-সুখকর ; শ্রবণমাত্রই অনেকের আনন্দ ও আশা-সমুদ্র উদ্বলিত হইয়া উঠে । ভগবদ্ভক্ত, বিশেষতঃ, তদাত্ত বৈষ্ণবগণ, এই অর্থ ও তাৎপৰ্য শব্দের বর্ণে বর্ণে অমৃতাস্বাদন করেন । কেবলই যে পরমার্থপথে, তাহা নহে ; সকল পথের সকল বিষয়েই নবানুরাগের অদ্বুত ক্রিয়া ও সামর্থ্য প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় । যে আধারে ইনি ক্রীড়া করিতে থাকেন,—যে ভাগ্যবান এই স্বর্গীয় পদার্থের কণামাত্রও লাভ করিতে পারিয়াছেন,—যে স্মৃতি-ব্যক্তির অন্তরে এই অমৃতোপম নবানুরাগ কিঙ্কিমাত্রও উদ্ভিক্ত হইয়াছে,—তিনি সাধুই হউন বা তদন্তই হউন, তিনি পরমার্থ-পিপাসুই হউন বা মানবীয় প্রেমরাজ্যের পথিকই হউন, অথবা অন্ত কোনও বিষয়ের প্রতি অনুধাবনেচ্ছুক হউন,—জানিবেন, নিশ্চয়ই অনন্ত উন্নতি-পথের দ্বার আজ তাঁহার সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইল ; জানিবেন, তিনি অচিরে নানাপ্রকার সত্যের আলোক প্রতিপদ-বিক্ষেপেই দেখিতে পাইবেন । আর তাঁহাকে অন্ধকার রাজ্যে বন্দী করিয়া রাখে কাহার সাধ্য ? কাহার সাধ্য আম কেহ তাঁহার সে জ্যোতির্ময় পথে, কণ্টক স্বরূপ আচরণ করিতে পারে ?

‘নবানুরাগ’—“নব-রাগে রঞ্জিত,” “কেটী শশিবিম্বিত,”—স্বর্ণ হইতে

স্রোতস্থিনীতে ঝলপ শ্রদান করিলেন । তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য । কিছুপরে, দেখি যে এক স্থানে ভাসিয়া উঠিয়া ভীষণ হাবু ডুবু খাইতেছেন ; এমন সময়ে, বোধ হইল, যেন এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ ভাসিয়া যাইতেছিল, তাহার একটা স্থূল শাখার উপর শ্রাম আশ্রয় লইলেন । শাখাগুলির অগ্রভাগ একটু একটু দেখিতে পাইলাম বটে, কিন্তু সে বৃহৎ বৃক্ষের মূল যে কোথা—তাহা দেখিতে পাইলাম না । অত বড় যে প্রকাণ্ড বৃক্ষ, স্রোত তাহাকেও বেগে লইয়া যাইতে লাগিল । শ্রাম তাহার এক শাখায় অতি ধীরঃ ধীরঃরূপে প্রশান্ত ও আনন্দময় মূর্তিতে, বসিয়া স্রোতের সহিত কোথায় চলিয়া গেলেন বুঝিতে পারিলাম না ।

নবানুরাগের এমনি স্রোত—এমনি টান যে, তাহাতে একবার পড়িলে আর ফিরিবাব সম্ভব থাকে না । নবানুরাগ এমনি ছোঁয়াচে—এমনি সংক্রামক, এবং এমনি তার আকর্ষণ শক্তি যে, নবানুরাগীর সহিত যিনি একটু মিশিয়াছেন, হার গায়ে একটু নবানুরাগের হাওয়া লাগিয়াছে, আর তাঁহাকে খুজিয়া পাইবার যো নাই—অর্মানি তাঁহাকে একেবারে ডুবিতে হইয়াছে । কেবল যে, ছোঁয়াচে, তাহা নহে ; নবানুরাগ মধ্যে মধ্যে দীর্ঘবাপী হইয়া পড়ে । তখন ত, দেশকে দেশই, ডুবিয়া যায় । শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্যদেব প্রভৃতি, এক একবার আদিশেই, দেশ ঐরূপ যেন বস্তা-প্রাদিত হইয়া যায় । নাহুস ত দূরের কথা ; গুনিয়াছি, চৈতন্যদেবের সময়, হিংস্রক পশু পক্ষপক্ষও নাকি, নবানুরাগে মত্ত হইয়াছিল ।

নবানুরাগে মত্ত হইলে ঐহিক ব্যাপার বা ঐহিক জ্ঞান ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া যায় । শ্রীপতি-জ্ঞানে তনাবকে অবলাগণ আলিঙ্গন করেন ; বৃহৎ কাঠজ্ঞানে গলিত মৃত দেহের উপর আরোহণ করিয়া ব্রাহ্মণ, নদী পার হইয়া যান । এমন কি, হিংস্রক পশুও হিংসা পশ্যন্ত ত্যাগ করে ।

ঐহিক ব্যাপার নষ্ট হইয়া যায় যাক ; ঐহিক জ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায় যাক । দুই দিনের অকিঞ্চিৎকর মর্যাদিকার ভ্রমণ করিবার আবশ্যক কি ? লুক্কায়িত-বিপদ স্বর্ণের মায়া-মৃগকে ধরিবার জন্ত ভ্রান্ত জ্ঞানলোকের জ্ঞান অনর্থক অত ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন কি ? লোকে কিন্তু বলে বলুক—ব্যাম বা বায়ু-গ্রস্ত বলে বলুক ; লোকে কি না বলে ? আমার সঙ্গে না মেশেন, কিছু ক্ষতি নাই, বরং শতগুণে ভাল—অপবিত্র হাওয়াটা কিছু কম লাগিবে ; জাতে ঠেলেন—মোতি আউর আচ্ছা, নির্কিপাকে অগ্রসর হইতে পারিব ; গালাগালি দিয়া ভূত ভাগান—ত কথাই নাই, পাপরাজ্য হইতে আরও গীত দৌড়িয়া পলাইতে পারিব । (একটা গান মনে পড়িতেছে ।)

কে বলে ?—শ্রামা আমার কালো ?

(যদি কালো) তবে, কেন হৃদয় করে আলো ?

আমার মা, যদি কালো হ'ত

তবে কি ডাকিতাম এত ?

যার কালো, তার কালো শ্রামা,

আমার সে যে ভাল।

গগণ কালো, সিঁধু কালো,

কালো সে অনন্ত কালো ;

তবু কালো নয়, সে কালো মাগিক,

অঁধার করে যে আলো।

তাহাদেরই বা দোষ কি ? বাঁহারা সে জিনিষ আশ্বাদন করেন নাই, তাহার সম্বন্ধে ত যা তাই তাঁহারা বলিবেনই—তাহার আর আশ্চর্য্য কি ? যিনি যাহা লইয়া পড়িয়া গাছেন, তিনি তাহা সম্বন্ধে কবিবার জন্য ত স্বর্গ-মর্ত্য সংগ্রাম করিবেন—এ ত ধরা কথা আছেই। তবে, মাঝখান থেকে আমি কেন নির্যো-ধের মত নিজেকে স্বর্গস্থ হ'তে বঞ্চিত করি ? আমার অদৃষ্টে যদি এখন “ওপ্‌নু সিসেম” (চিচিড্‌ফাঁক) হইয়া যায়, আমি রত্ন কেন লুণ্ঠন না করি ? অপরের জন্য চটী করিগেও তাহা কি অপরের ভাগ্যে কখন ঘটাইতে পারিব ? যিনি নবানু-রাগ আশ্বাদন করেন নাই, তাঁহাকে হাজার বুঝাইলেও তিনি বুঝিতে পারিবেন না। বাঁহার অদৃষ্টে সে সুখ রাজ্য নাই, কাহার সাধ্য, তাঁহাকে সে রাজ্য ভোগ করাইতে পারে ?

তবে কি নবানুরাগ অদৃষ্ট-গত ? সকলকার অদৃষ্টে কি নবানুরাগ ঘটে না ? তবে, নবানুরাগের জন্য এত সাধনা করিবার প্রয়োজন ? নবানুরাগ তাহা হইলে ছোঁয়াচে বা সংক্রামক হইল কি কপে ?—

যদি পুনর্জন্মবাদ বা কৰ্ম্মবাদ মানেন ত আর কথাই নাই, উত্তর হইয়াই রহিয়াছে। পূর্ব্বজন্মবশতঃ নবানুরাগ বাঁহার ভাগ্যে অদৃষ্টভাবে সঞ্চিত থাকে, তাঁহারই ইহ জন্মে সেইটা প্রকট হইয়া উঠে। বাঁহার ভাগ্যে নবানুরাগের অগ্নি বেশী পরিমাণে সঞ্চিত থাকে, তাঁহার ভাগ্যে উহা এক ফুঁয়েই জ্বলিয়া উঠে। আর বাঁহার ভাগ্যে খুব কম পরিমাণে থাকে, তাঁহার ভাগ্যে ফুঁ পাড়িতে পাড়িতে জ্বলি অস্ত হইয়া যায়। তবে কি জানেন, কাহী যদি হাজার ভিজ্জেও থাকে, ত, আগুনের কাছে থাকিলেই ক্রমশঃ কাহী

শুকাইয়া শুকাইয়া শেষে চাই কি দপ করে একেবারে জলিয়াও উঠিতে পারে। তাই বলি, নবানুরাগ ছোঁয়াচে ব্যামো। নবানুরাগীর নিকট থাকিতে থাকিতে নবানুরাগের উদ্রেক হইতে পারে। অবশ্য, তাই বলিয়া যে, যার তার হবে, তা নয়। বিস্থিতিকা সংক্রামক ; কিন্তু যারা বিস্থিতিকার নিকট থাকেন, তাঁদের সকলকারই কি বিস্থিতিকা নীঘ্র হয় ? বাহাদের শরীর মোটা, মন মোটা, মস্তিষ্ক মোটা, বুদ্ধি মোটা, হৃদয় মোটা, তাঁহাদের ব্যুহ ভেদ করিতে, নবানুরাগের একটু বিলম্ব লাগে। সাধনার দ্বারা সেইগুলি মার্জিত করিয়া ক্রমশঃ সূক্ষ্ম ও সান্ত্বিক করিতে হয়, তবে তাহাতে নবানুরাগের উদয় হয়। বাহাদিগের ভিতর নবানুরাগের উদয় হয়, তাঁহারা ধন্ত হন।

তাহা হইলে ত দেখিতেছি আমাদের আর গতি নাই। নবানুরাগী না হইতে পারিলে ত ধন্ত হইতে পারিব না ? নবানুরাগী হইতে হইলে ঈশ্বরকে মানিতে হবে, ধার্মিক হইতে হইবে, তপ্ত হইতে হইবে,—তবে ত ? বাবাঃ—তাহা হইলেই ত গেছি !—

নবানুরাগ স্বর্গীয় পদার্থ—অতি পবিত্র ; ঠাকুর বদেই থাকুক, আর আঁচ-তাকুড়েই থাকুক, ইহা নিজেও কখন অপবিত্র হয় না অপর কাহাকেও অপবিত্র করিতেও জানে না। ইহা সদা পাবক-রত্ন স্বরূপ ; ইহা অগ্নি স্বরূপ। ঈশ্বরেই হউক, বা মনুষ্যেই হউক, অথবা কোন জড় পদার্থ সম্বন্ধেই হউক, ‘নবানুরাগ’ কথাটা সর্বত্র প্রযুক্ত হইতে পারে। কাহারও, ঈশ্বরে নবানুরাগ হয়, কাহারও বা কোন মনুষ্যে নবানুরাগ হয়, কাহারও বা কোনও কার্য্য করিতেই অত্যন্ত নবানুরাগ হইতে দেখা যায়। নবানুরাগ সর্বত্রই প্রশংসনীয়। নবানুরাগ—এই গুণ থাকিলেই যথেষ্ট উপকার হইল।

কোনও কার্য্য অত্যন্ত আগ্রহের সহিত করার নাম—অনুরাগের সহিত কার্য্য করা। অত্যন্ত আগ্রহের নাম অনুরাগ। ঈশ্বর বা মনুষ্যের প্রতি অনুরাগের মানে—ঈশ্বর বা মনুষ্যের প্রতি অত্যন্ত ভালবাসা। সেই অনুরাগ কোন কোন স্থলে প্রথম অবস্থায় অতি তীব্র থাকে ; সেই অবস্থার নাম ‘নবানুরাগ’। যেমন, কোন কোন গোঁদা ফুলের বোঁটা—খুব মোটা, কিন্তু ফুল—একটু খানি ; আবার কোন কোন গোঁদা ফুলের বোঁটা—খুব সরু, কিন্তু ফুল—এত বড়। তেমনি, আধার অনুরাগে কোথাও নবানুরাগের বেশী বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় ; কোথাও বা কম দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও বিষয়ে নবানুরাগ হইলে মন আপনা হইতেই ক্রমশঃ একাগ্র হইয়া

আসিতে থাকে, অস্তর হইয়া আসিতে থাকে, হৃদয় প্রশস্ত হইয়া আসিতে থাকে। এইরূপ-হৃদয়ে, ঈশ্বর বা পরমার্থ-চিন্তার উদয় হইতে বিলম্ব হয় না। যাহার চক্ষু আছে, তিনি সবই দেখিতে পান; যার হৃদয়ে ভালবাসা আছে, তিনি ইচ্ছা করিলে বা আবশ্যক পড়িলে, সকলকেই ভাল-বাসিতে পারেন। তেমনি যার হৃদয়ে অনুরাগ আছে, তিনি সকল বিষয়েই সেই অনুরাগের চালনা করিতে পারেন।

ঈশ্বরকে না মানিলে যে, অনুরাগী হইতে পারিব না, তাহার কিছু মানে নাই। ঈশ্বরকে মানিবার কিছু আবশ্যক নাই। অনুরাগ থাকিলেই ঈশ্বর নিজেকে নিজে মানাইয়া লইবেন, কিছু চিন্তা নাই। কেবল, নৌকার পাল খাটাইয়া রাখুন; হাওয়া আপনা হইতেই তাহাতে লাগিবে এবং আরোহী সমেত নৌকাকে বহন করিয়া লইয়া যাইবে; হাওয়াকে ডাকিয়া আনিতে হইবে না—ওগো হাওয়া আইস, ওগো হাওয়া আইস। আর যদি হাওয়া থাকে, এবং পাল না খাটান, বোঝাই নৌকা কি চলিবে? ঈশ্বর স্বতঃই সদা সর্বত্র বিদ্যমান; অনুরাগ না থাকিলে কি-চক্ষুতে আপনি তাঁকে দেখিবেন? তাই বলি, নবানুরাগ অত্যাস করুন, যে কোনও গতিকে হউক। নবানুরাগী হউন—যে বিষয়েই হউক। নবানুরাগের পথ অতি আশাশ্রম। এ পথের পথিকগণ নানা ধনে ধনী হন। নবানুরাগ বলতরু বিশেষ; ইহার মূলে থাকিলে, না চাহিতেই নানাপ্রকার সত্যের আলোক দেখিতে পাওয়া যায়; অবশেষে, এমন কি, নিরপেক্ষ পরম সত্য পর্য্যন্তও লাভ করা যায়।

তবে নাকি, শুনিয়াছি, যাহারা নবানুরাগী, তাহাদিগকে নানাপ্রকার আপদ বিপদ সহ করিতে হয়?—

নদীর তীরে দাঁড়াইয়া থাকিলে বেশী শীত করিবে, এমন কি ঠকঠক করিয়া কাঁপিতে হইবে; অনেককে, হয় ত, ঠাণ্ডা দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিতেও হয়, স্নান করা আর হয় না। কিন্তু, নদীতে নাহুন, ভরসা করিয়া এক ডুব দিন, দেখিবেন আর তত শীত নাই; আর তত ভয় নাই; শরীর মন, অপেক্ষাকৃত সুস্থ ও পবিত্র হইয়াছে। বাহির থেকে দেখিতে, না জানি, নবানুরাগে কতই বিপদ; কিন্তু সে পথের পথিক যিনি, তিনি তত বিপদ অহুভব করেন না, অহুভব করিতে অবসরও পান না—এত তাঁর অনুরাগ। সে পথের গ্রহরী—সর্ববিঘ্নবিনাশক যে ঈশ্বর তিনিই।

তিনি স্বয়ং পথিকের হস্ত ধারণ করিয়া, কেমন সুন্দর, নানা প্রকার আলোক দেখাইতে দেখাইতে, নানা প্রকার সত্য দেখাইতে দেখাইতে, অতি যত্ন সহিত, অতি স্নেহের সহিত। লইয়া যান! হায়, আমাদের সে দিন কবে হবে? আজ শুভদিনে আশীর্ব্বাদে করুন, আমরা যেন সেই নবানুরাগে রঞ্জিত হইতে পারি; সেই রঙে যেন সকলকে রঙাইতে পারি; সকলের শরীর মন প্রাণ, যেন লাল লাল হইয়া যায়। আজ আমাদের নববর্ষের শুভদিনে আশীর্ব্বাদ করুন, নবানুরাগের পিচ্কারি লইয়া, মন খুলিয়া সকলে যেন পরস্পর পরস্পরের সহিত সে অমিয়-খেলা খেলিতে পারি, সুপ্রোখিত হইয়া দেখিতে পাই—দেশ যেন নবানুরাগের গোরি-ময় হইয়া গিয়াছে।

গঙ্গা-বক্ষে।

(স্বামী শুদ্ধানন্দ ।)

বৈশাখের বিকালে জাহ্নবীর কোলে,

বহে মৃদু মন্দ বায়,

লহরী নাচিয়া ধায়,

রঙ্গে ভঙ্গে কি মধুব সুন্দর দোলে!

সুনীল আকাশ—সব নীরব নীথর,

প্রকৃতির সৌম্য মূর্তি প্রশান্ত-দর্শনা,

যেন স্নেহময়ী মাতা,

আনন্দেতে প্রফুল্লিতা,

সস্তানের স্নেহে গেন বাকুল-অন্তর,

সস্তানের শুভ যেন নিয়ত কামনা।

এখনো তপন নিজ কার্য্য-অবসানে,

যান নাই অন্তঃপুরে বিশ্রাম আগারে,

এখনো ভেঙ্গেতে তাঁর সবে শোভা পায়,

এখনো পতন তাঁর,

হয় নাই রে আবার,

এখনো প্রচণ্ডভাবে উদ্দিত গগনে।

কিন্তু নিয়গতি তাঁর—ক্রমে অন্তাচলে,

চলিছেন নিজ রশ্মি করি সংবরণ,

দেখাছেন যেন এই জগতীমণ্ডলে,

চিররাজ্য কারো কভু হয় না কখন।

জাহ্নবীর বক্ষে সব কাতারে কাতারে,
বিবিধ বিচিত্রবর্ণা ভাসিছে তরণী,
দণ্ডবলে চলে কেহ, কেহ পালভরে,
চলিতেছে নয়নের আনন্দদায়িনী ।

যাইতেছে ওই দেখি প্রশস্ত তরণী,
ঝপাঝপ পড়ে দাঁড়, আনন্দেতে চলে,
মধ্যে তার হুই জন, পরস্পরে আলাপন,
‘আজন্ম প্রণয়বন্ধ আমরা যুগলে,’
পুরুষ পুরুষ—নহে পুরুষ রমণী ।

চলে যায়—বহিতেছে দক্ষিণ পবন,
ধীরে ধীরে মুছ মন্দ অতি মন্দ চলে,
আকাশে নাহিক মেঘ, নাহি কোন শ্রন,
যেন গো প্রকৃতি স্নমধুর ভাষ বলে ।

সহসা সকল শুক—নাহিক বাতাস—
শুমটে অবশ তণু—শ্বেদ অঙ্গে বরে,
বাহিরি বসিলা দৌড়ে আনন্দ অন্তরে—
দেখে সে সুনীলবর্ণ—নীল—নীলাকাশ ।

অনন্ত দেবিষা দৌহা দৌহে শিস্ররণ,
অনন্তের ভাবে দৌহে হইল বিভোরা,
ভুলিল দেহের প্রেম—ভুলে গেল মন,
অনন্তের ভাবে দৌহে হ’ল মাতোয়ারা ।

ভাবেতে বিহ্বল শুক—নাহি সংজ্ঞা জ্ঞান,
ধীরে ধীরে ধীরে বায়ু বহে নাসিকায়,
সমাধিস্থ যোগিমত, ভাবেতে হইয়া গত,
প্রকৃতির কোলে হুটী বালক ঘুমায় ।

কড়—কড়—কড়, ওকি—সহসা জাগিয়া,
দেখিলেন বজ্রধ্বজ অতি সমস্ত্রমে, "

পরিব্রাজক ।

(স্বামী বিবেকানন্দ ।)

আমাদের দেশে বলে, পায়ে চকর থাকলে, সে শোক ভবঘুরে হয় । আমার পায়ে বোধ হয় সমস্তই চকর । বোধ হয় বলি কেন ? পা নিরীক্ষণ করে, চকর আবিষ্কার করবার অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু সে চেষ্টা একেবারে বিফল—সে শীতের চোটে পা কেটে খালি চৌ-চাকুলা, তায় চকর ফকর বড় দেখা গেল না । যা হক্—যখন কিছুদূর হয়েছি, তখন যেনে নিলুম যে, আমার পা চকরময় । ফল কিন্তু সাক্ষাৎ—এত মনে করলুম যে, পারিসে বসে, কিছুদিন ফরাসী ভাষা, সভ্যতা, আলোচনা করা যাবে । পুরাণ বন্ধ বাক্য ত্যাগ করে, এক গরীব ফরাসী নবীন বন্ধুর বাসায় গিয়ে বাস করলুম ; তিনি না জানেন ইংরাজি, আমার ফরাসী সে এক অদ্বুত ব্যাপার ; বাসনা যে, বোবা হয়ে বসে থাকার না-পারকতায়, কাজে কাজেই ফরাসী বলবার উদ্যোগও ত হবে— আর গড় গড়িয়ে ফরাসী ভাষা এসে পড়বে ;—কোথায় চল্লুম, ভিয়েনা, তুরকী, গ্রীস, ইজিপ্ত, জিক্রসালম, পর্যটন কঠে ! ভবিষ্যৎ কে ঘোচায় বল । তোমার পত্র লিখছি, মুসলমান প্রভুত্বের অবশিষ্ট রাজধানী কন্সটান্টিনোপল হ'তে !!

সঙ্গের সঙ্গী তিন জন—দু জন ফরাসী, একজন আমেরিক । আমেরিক তোমাদের পরিচিতা মিস্ ম্যাকলউড্ ; ফরাসী পুরুষ বন্ধু মস্ত্রিয় জুল্ বোণ্ডায়— একজন ফ্রান্সের সুপ্রতিষ্ঠিত দার্শনিক ও সাহিত্যলেখক ; আর এক ফরাসিনী বন্ধু জগদ্বিখ্যাত গায়িকা মাদমোয়াজেলে কালভে । ফরাসী ভাষায় “মিষ্টর” হচ্ছেন “মস্ত্রিয়,” আর “মিস্” হচ্ছেন “মাদমোয়াজেলে”—“জ”টা পূর্ব-বাক্সলার জ । মাদমোয়াজেলে কালভে আধুনিক কালের সর্বশ্রেষ্ঠা গায়িকা—অপেরা-গায়িকা । এঁর গীতের এত সমাদর যে, এঁর তিন লক্ষ, চার লক্ষ টাকা বাৎসরিক আয়, খালি গান গেয়ে । এঁর সহিত আমার পরিচয় পূর্ব হতে । পশ্চাত্য দেশের সর্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী মাদাম্ সারা বার্নহার্ড, আর সর্বশ্রেষ্ঠা গায়িকা কালভে, দুজনেই ফরাসী, দুজনেই ইংরাজী ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা, কিন্তু ইংলণ্ড ও আমেরিকায় মধ্যে মধ্যে বান্, ও, অভিনয় আর গীত গেয়ে লক্ষ লক্ষ ডলার (Dollar) সংগ্রহ করেন । ফরাসী ভাষা সভ্যতার ভাষা, পশ্চাত্য জগতের ভদ্রলোকের চিহ্ন, সকলেই জানে,—কাজেই এঁদের ইংরাজী শেখবার অবকাশ এবং প্রবৃত্তিও নাই । মাদাম্ বার্নহার্ড বয়ীসদী ; কিন্তু সেজে মঞ্চে

যখন ওঠেন,—তখন যে ব্যস, যে লিঙ্গ, অভিনয় করেন, তারই হুবহু নকল । বালিকা, বালক, যা বল তাই,—হুবহু ;—আর সে আশ্চর্য্য আওয়াজ্ ! এরা বলে, তাঁর কণ্ঠে রূপার তার বাজে । বার্নহার্ডের অনুরাগ—বিশেষ ভারতবর্ষের উপর ; আমায় বারবার বলেন, “তোমাদের দেশ “ত্রেজাঁসিএন্”, “ত্রে সিভিলিজে””, অতি প্রাচীন, অতি স্পষ্ট । এক বৎসর ভারতবর্ষসংক্রান্ত এক নাটক অভিনয় করেন ; তার মঞ্চের উপর বেলকুল এক ভারতবর্ষের রাস্তা খাড়া করে দিয়েছিলেন—মেয়ে, ছেলে, পুরুষ, সাধু, নাগা, বেলবুল ভারতবর্ষ !! আমার অভিনয়ান্তে বলেন যে, “আমি মাসাবধি প্রত্যেক মিউজিয়ম বেড়িয়ে, ভারতের পুরুষ, মেয়ে, পোষাক, রাস্তা, ঘাট, পরিচয় করেছি ।” বার্নহার্ডের ভারত দেখবার ইচ্ছা বড়ই প্রবল—“সে ম’র্যাভ্” (ce mon rave “সে ম’র্যাভ্”—সে আমার জীবন-স্বপ্ন ! আবার প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্ তাকে বাঘ হাতী শিকার করাবেন, প্রতিশ্রুত আছেন । তবে বার্নহার্ড বলেন—সে দেশে যেতে গেলে, দেড় লাখ ছায়া টাকার খরজ না করলে কি হয় ? টাকার অভাব তাঁর নাই,—“লা দিভীন্ সারা !!” (La divino Sara), “দৈবী সারা” ;—তাঁর আবার টাকার অভাব কি ? যার স্পেন্সাল ট্রেন ভিন্ন গত্যাত নাই,—সে ধুম বিলাস ইয়ুরোপের অনেক রাজা রাজড়া পারে না,—যাঁর থিয়েটারে মাসাবধি আগে থেকে দুনো দামে টিকিট কিনে রাখলে তবে স্থান হয়, তাঁর টাকার বড় অভাব নাই । তবে, সারা বার্নহার্ড বেজায় থরজে । তাঁর ভারত-ভ্রমণ কাজেই এখন রইল ।

মাদামোয়াজেল্ কাল্ভে এ শীতে গাইবেন না, বিশ্রাম করবেন,—ট্রাজিষ্ট প্রভৃতি নাতিশীত দেশে চলেছেন । আমি যাচ্ছি—এঁর অতিথি হয়ে । বাল্ভে যে সুপু সঙ্গীতের চর্চা করেন তা নয় ; বিদ্যা যথেষ্ট, দর্শনশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্রের বিশেষ সমাদর করেন । অতি দরিদ্র অবস্থায় জন্ম হয় ; ক্রমে নিজের প্রতিভা বলে, বহু পরিশ্রমে, বহু কষ্ট সনে, এখন প্রভূত ধন,—রাজা, বাদসার সম্মানের ঈশ্বরী ।

মাদাম্ মেল্লা, মাদাম্ এমা এমস্, প্রভৃতি বিখ্যাত গায়িকা সকল আছেন ; জঁ মেরজ্জ্ কি, প্রাঁস্, প্রভৃতি অতি বিখ্যাত গায়ক সবল আছেন ; এঁরা সকলেই দুই তিন লক্ষ টাকা বার্ষিক রোজগার করেন ;—কিছু কাল্ভির বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে এক অভিনব প্রতিভা । অসাধারণ রূপ, যৌবন, প্রতিভা, আর দৈবী কণ্ঠ—এ সব একত্র সংযোগে কাল্ভেকে গায়িকামণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় করেছে ।

কিন্তু হুঃখ, দারিদ্র্য অপেক্ষা শিক্ষক আর নেই। সে শৈশবের অতি বঠিন দারিদ্র্য, হুঃখ, কষ্ট—যার সঙ্গে দিন রাত যুদ্ধ করে কালভের এই বিজয় লাভ, সে সংগ্রাম তাঁর জীবনে এক অপূর্ণ সহানুভূতি, এক গভীর ভাব এনে দিয়েছে। আবার এদেশে উদ্যোগ যেমন, উপায়ও তেমন। আমাদের দেশে উদ্যোগ থাকলেও, উপায়ের একান্ত অভাব। বাঙ্গালীর মেয়ের বিদ্যা শিখবার সমধিক ইচ্ছা থাকলেও, উপায়াভাবে বিফল,—বাঙ্গলা ভাষার আছে কি শিখবার? বড় জোর পচা নভেল নাটক!! আবার বিদেশী ভাষায়, বা সংস্কৃত ভাষায় আবদ্ধ বিভ্রা, ছ'চার জনের জন্ত মাত্র। এ সব দেশে নিজের ভাষায় অসংখ্য পুস্তক; তার উপর যখন যে ভাষায় একটা নূতন কিছু বেরুচ্ছে, তৎক্ষণাৎ তার অনুবাদ করে সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করছে।

মসিয় জুল্ বোওয়া প্রসিদ্ধ লেখক; ধর্ম্য সকলের, কুসংস্কার সকলের ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কারে বিশেষ নিপুণ। মধ্যযুগে ইউরোপে যে সকল সরতান-পূজা, জাত, মারণ, উচাটন, ছিটে কোঁটা, মস্ত তন্ত্র ছিল এবং এখনও যা কিছু আছে, সে সকল ইতিহাসবদ্ধ করে এঁর এক প্রসিদ্ধ পুস্তক। ইনি সুকবি এবং ভিক্তর হুগো, লা মাটিন্ প্রভৃতি ফরাসী মহাকবি এবং গেটে, সিলার প্রভৃতি জার্মান মহাকবিদের ভেতর যে ভারতের বেদান্তি-ভাব প্রবেশ করেছে, সেই ভাবের পোষক। বেদান্তের প্রভাব ইউরোপে কাব্য এবং দর্শনশাস্ত্রে সমধিক। ভাল কবি মাত্রই দেখছি বেদান্তী; দার্শনিক তত্ত্ব লিখতে গেলেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বেদান্ত। তবে কেউ কেউ স্বীকার করতে চায় না, নিজের সম্পূর্ণ নূতন বাহ্য রূপে চায়,—যেমন হারবার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি। কিন্তু অধিকাংশরাই স্পষ্ট স্বীকার করে। এবং না করে যায় কোথা—এ তার, রেলওয়ের, খবর-কাগজের দিনে? ইনি অতি নিরভিমাত্র, শান্তপ্রকৃতি, এবং সাধারণ অবস্থার লোক হলেও, অতি যত্ন করে আমার নিজের বাসায় পারিসে রেখেছিলেন। এখন একসঙ্গে ভ্রমণে চলেছেন।

কম্প্টনটিনোপল পর্য্যন্ত পথের সঙ্গী আর এক দম্পতী—পেরর হিয়াসাস্ এবং তাঁর সহধর্ম্মিণী। পেরর, অর্থাৎ পিতা হিয়াসাস্ ছিলেন—ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের, এক কঠোর তপস্বী-শাখাজুক সন্ন্যাসী। পাণ্ডিত্য অসাধারণ ব্যাখ্যাত্ত-গুণে, এবং তপস্যার প্রভাবে, ফরাসী দেশে এবং সমগ্র ক্যাথলিক সম্প্রদায়ে, ইঁহার অতিশয় প্রতিষ্ঠা ছিল। মহাকবি ভিক্তর হুগো দুজন লোকের ফরাসী ভাষায় প্রশংসা কর্তেন। তার মধ্যে পেরর হিয়াসাস্

একজন। চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পেরর হিয়াসাস্ এক আমেরিক নারীর প্রণয়বদ্ধ হয়ে, তাকে করে ফেলেন বে—মহা হুলস্থূল পড়ে গেল,—অবশ্য ক্যাথলিক সমাজ তৎক্ষণাৎ তাঁকে ত্যাগ করলো। শুধু পা, আশেপাশে-পরা-তপস্বী-বেশ ফেলে, পেরর হিয়াসাস্ গৃহস্থের হাট্ কোর্ট্ ব্লট্ পরে হলেন—মস্ত্রিয় লইসন্। আমি কিন্তু তাঁকে তাঁর পূর্বের নামেই ডাকি। সে অনেক দিনের কথা—ইউরোপ-প্রসিদ্ধ হ'লাম, প্রোটেষ্ট্যান্টরা তাঁকে সমাদরে গ্রহণ করলে, ক্যাথলিকরা ঘৃণা করতে লাগলো, পোপ লোকটার গুণাতি শয্যে তাঁকে ত্যাগ করতে না চেয়ে, বলেন যে, “তুমি গ্রীক্ ক্যাথলিক্ পাদ্রী হয়ে থাক, (সে শাখার পাদ্রী একবার মাত্র বে করতে পায়, কিন্তু বড় পদ পায় না), কিন্তু রোমান চার্চ ত্যাগ করো না”; কিন্তু লয়জন্-গেহিনী তাঁকে টেনে হিঁচড়ে পোপের ঘর থেকে বার করলে। ক্রমে পুত্র পৌত্র হলো; এখন অতি স্ববির লয়জন্ জিরুসালমে চলেছেন,—কিশ্চান্ আর মুসলমানের মধ্যে যাতে সদ্ভাব হয়, সেই চেষ্টায়। তাঁর গেহিনী বোধ হয় অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন, যে লয়জন্ বা দ্বিতীয় মার্টিন্ লুথার হয়, পোপের সিংহাসন উঠে বা ফেলে দেয়,—ভূমধ্যসাগরে। সে সব ■ কিছুই হলো না; হলো—ফরাসীরা বলে, “ইতোনষ্টন্তোন্নষ্টঃ”। কিন্তু মাদাম্ লয়জনের সে নানা দিবা স্বপ্ন চলেছে!! বৃদ্ধ লয়জন্ অতি মিষ্টভাষী, নম্র, ভক্ত প্রকৃতির লোক। আমার সঙ্গে দেখা হলেই কত কথা, নানা ধর্ম্মের, নানা মতের; কেবল ভক্ত মনুষ্য—অদ্বৈতবাদে একটু ভয় খাওয়া আছে। গিন্নির ভাবটা বোধ হয় আমার উপর কিছু বিকপ। বৃদ্ধের সঙ্গে যখন আমার ত্যাগ, বৈরাগ্য, সন্ন্যাসেব চর্চা হয়, হবিবের প্রাণে সে চিরদিনের ভাব জেগে ওঠে, আর গিন্নির বোধ ■■ গা কন্ কন্ করে। তাব উপর মেয়ে মন্দ সমস্ত ফরাশীরা যত দোষ গিন্নির উপর ফেলে; বলে, “ও মাগী, আমাদের এক মহাত্মাস্বী সখুকে নষ্ট করে দিয়েছে!!” গিন্নির কিছু বিপদ বটে কি,—আবার বাস হচ্ছে পারিসে, ক্যাথলিকের দেশে। বে করা পাদ্রীকে ওরা দেখলে ঘৃণা করে; মাগ ছেলে নিয়ে ধর্ম্ম প্রচার, এ ক্যাথলিক্ আদর্শে সহ্য করবে না। গিন্নির আবার একটু ঝাজ্ আছে কি না। একবার গিন্নি এক অভিনেত্রীর উপর ঘৃণা প্রকাশ করে বলেন, “তুমি বিবাহ না করে অমৃতের সঙ্গে বাস করছো, তুমি বড় ধারাপ”। সে অভিনেত্রী ঝট্ জবাব দিলে যে, “আমি তোমার চেয়ে লাল গুণে ভাল। আমি একজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে বাস করি,

আইন মত বে না হয় নাই করছি ; আর তুমি মহাপাপী—এত বড় একটা সাধুর ধর্ম নষ্ট করলে !! যদি তোমার প্রেমের চেউ এতই উঠেছিলো কি, না হয় সাধুর সেবা-দাসী হয়ে থাকতে ; তাকে বে করে, গৃহস্থ করে, তাকে উৎসর্গ কেন দিলে ?” “পচাকুম্‌ডো শরীরের” কথা যে দেশে শুনে হাঁসতুম, তার আর এক দিক্ দিয়ে মানে হয় দেখছো ?

যাক্, আমি সমস্ত শুনি, চুপ করে থাকি। মোদ্দা বৃদ্ধ পেয়ার হিয়াসাহ্ বড়ই প্রেমিক, আর শান্ত ; সে খুসি আছে, তার মাগ ছেলে নিয়ে, দেশশুল লোকের ভাতে কি ? তবে গিন্নিটা একটু শান্ত হলেই, নোথ হয় সব মিটে যায়। তবে কি জান ভায়া, আমি দেখছি যে পুরুষ আর মেয়ের মধ্যে সব দেশেই বোঝবার, বিচার করবার, রাস্তা আলাদা। পুরুষ এক দিক্ দিয়ে বুঝবে, মেয়ে মানুষ আর এক দিক্ দিয়ে বুঝবে ; পুরুষের যুক্তি এক রকম, মেয়ে-মানুষের আর এক রকম। পুরুষে মেয়েকে মার্ক করে, আর পুরুষের ঘাড়ে দোষ দেয় ; মেয়েতে পুরুষকে মার্ক করে, আর সব দোষ মেয়ের ঘাড়ে দেয়।

এমন সঙ্গে আমার বিশেষ লাভ যে, ঐ এক আমেরিক ছাড়া এরা কেউ ইংরাজী জানে না, এবং ইংরাজী ভাষা এক দম বন্ধ, কাজেই কোনও রকম করে, আমায় কইতে হচ্ছে ফরাসী এবং শুন্তে হচ্ছে ফরাসী।

পারিসনগরী হতে বন্ধুর ম্যাক্সিম্ নানা স্থানে চিঠি পত্র যোগাড় করে দিয়েছেন, যাতে দেশগুলো যথার্থ রকমে দেখা হয়। ম্যাক্সিম্—বিখ্যাত “ম্যাক্সিম্-গনে”র নির্মাতা, যে তোপে ক্রমাগত গোলা চলতে থাকে, আপনি ঠাসে, আপনি ছোঁড়ে, বিরাম নাই। ম্যাক্সিম্ আদিতে আমেরিকান্ ; এখন ইংলণ্ডে বাস, তোপের কারখানা ইত্যাদি। ম্যাক্সিম্ তোপের কথা বেশী কইলে বিরক্ত হয়, বলে, “আরে বাপু, আমি কি আর কিছুই করিনি,—খালি ঐ মানুষ মারা কল্টা ছাড়া ?” ম্যাক্সিম্ চীনভক্ত, ভারত-ভক্ত, ধর্ম ■ দর্শনাদি সম্বন্ধে সুলেখক। আমার বই পত্র পড়ে অনেকদিন হতে আমার উপর বিশেষ অনুরাগ, বেজায় অনুরাগ। আর ম্যাক্সিম্ সব রাজা রাজত্বকে তোপ বেচে, সব দেশে জানা শুনা ; কিন্তু তাঁর বিশেষ বদ্ধ লি-হং-চাঙ্গ, বিশেষ শ্রদ্ধা চানের উপর, ধর্ম অনুরাগ বং ফুছে মতে। চীনে নাম নিয়ে মধ্যে মধ্যে কাগজে কুশচান পাঞ্জীদের বিপক্ষে লেখা হয় ; তারা চীনে কি করতে যায়, কেন বা যায়,—এ ম্যাক্সিম্ আদিতে সহ করতে পারে না। ম্যাক্সিম্

যের গিল্লিটীও ঠিক অম্বরূপ, চীন-ভক্তি, কৃষ্ণানী-সুগা ; ছেলে পিলে নেই, বুড়ো মাছুষ,—অগাধ ধন ।

যাত্রার ঠিক হলো পারিস্ থেকে রেলযোগে ভিয়েনা, তার পর বনটান্-টিনোপল, তার পর জাহাজে এথেন্স, গ্রীস, তার পর ভূমধ্যসাগর-পার ইজিপ্ত, তার পর আসি-মিনর, জিরুসালম, ইত্যাদি । “ওরিন্জী-তাল এক্সপ্রেস্ ট্রেন” পারিস্ হতে স্তাম্বুল পর্য্যন্ত ছোট, প্রতিদিন । তার আমেরিকার নকলে শোবার, বসবার, খাবার স্থান । ঠিক আমেরিকার গাড়ীর মত সুসম্পন্ন না হলেও, কতক বটে । সে গাড়ীতে চড়ে ২৪শে অক্টোবর পারিস্ ছাড়তে হচে । (ক্রমশঃ)

পাচ কথা ।

খোঁরা ফেলবো না ত কি ? রাস্তাটা ত মোটা হ’ক । রাস্তার না জল দাঁড়ালেই হ’ল ; লোকের উঠোন নীচু হবে, লোকের ঘরে জল সঁধুবে, শোবার ঘরের তক্তাপোষ ভেসে উঠবে, তা আমি ক’রব কি ? যাও যাও—রাস্তায় না জল দাঁড়ালেই হ’ল । ফেলরে ফেল, রাস্তার ওপরেই ফেল—গাড়ি গাড়ি ফেল ! আর, পারিশ ত এই নেড়া বোয়ুগটার..... ।

মোরে যায় যাক্, আবরু ত রক্ষে হবে । বলি, অত ঘেরাটোপের দরকারটা কি ? একে পাকিতে যাচ্ছে, তার ওপর ছপাশে দুই-লাঠি-হাতে দরোয়ান ; তার ওপর, আবার ঘেরাটোপের দরকার কি ? একটু দরজাটা ফাঁক ক’রে রাখলে, পাল্কির খড় খড়টা একটু খুলে রাখলে,—হাওয়া খেলতে পার ; তা নইলে যখন হাঁপিষে পেট ফুলে অসুখ ক’রবে, ডাক্তার এসে এগজামিন করবে, তখন আবরুটা কোথায় থাকবে ? পোয়াতীর হাঁপিষে ওঠার দরুন, যখন পেটের ছেলেটার হাঁপানির ব্যারাম হবে, তখন কুলে বাতী জালবে কে ?

প্রাপ্তি-স্বীকার ।—“The Bench and Bar Diary, 1901,” by M. N. Banerjee, Esqr., B. L., Govt. Pleader, Darjeeling. উপহার স্বরূপ পাইয়াছি । বিজ্ঞলোকের প্রণীত । উকীল-বাবুদিগের বিশেষ উপকারে আসিবে । গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য । মূল্য সাত টাকা ।

বাবু বটকৃষ্ণ পাগ এণ্ড কোং, (৭, বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা) ও বাবু বনার্জী এণ্ড মল্লিক কোম্পানির (৩৫০, আপার চিংপুর রোড) শিট্ ক্যালেন্ডার এবং প্রাত্যাহিক দিন-পরিবর্তনের ক্যালেন্ডার । ক্যালেন্ডারগুলি দেখিতে অতি সুন্দর ও প্রশংসনীয় হইয়াছে ।

তদ্রূপকরণ না করিয়া, ‘ঋতক’ এইরূপ করিয়া উচ্চারণ করা)। ভাষ্য ‘ঋতক’ শব্দেরই, সংজ্ঞাদিতে করণা করা, সাধু (সম্মত) বলিয়া মনে করিতে হইবে। সুতরাং ইহা ‘ঋতক’ই যথার্থ শব্দ, ‘ঋতক’ কদাচ নহে।

ভাষ্যমূল।—অপর আহ। ভাষ্য ঋতক শব্দঃ শাস্ত্রাদিতোহন্তি স করণিতব্যঃ সাধু সংজ্ঞাদিষু ঋতক এবাসৌ ন ঋতকঃ।

বঙ্গানুবাদ।—অন্ত কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ভাষ্য ‘ঋতক’ শব্দই হইয়াছে যথার্থ শাস্ত্রসিদ্ধ, (যদিও কালক্রমে অনভিজ্ঞ লোকদ্বারা উহা অপভ্রংশ হইয়া থাকে, তথাপি শাস্ত্রজ্ঞ অশুকবণ-কাবী ব্যক্তির), সুতরাং সেই পরিশুদ্ধ ‘ঋতক’ শব্দই, বিশুদ্ধ সংজ্ঞাদিতে, প্রয়োগ করা কর্তব্য; ‘ঋতক’ কদাচ নহে।

ভাষ্যমূল।—অয়ং তর্হি বদুচ্ছাশব্দঃ অপরিহার্যঃ। ঋফিডঃ ঋফিডডশ্চেতি। এষোপি ঋফিডঃ ঋফিডডশ্চ। কথম্। অর্তি প্রবৃত্তিশ্চৈব হি নোকে লক্ষ্যতে। ফিড ফিডেড বোলাদিনৌ প্রত্যয়ৌ।

বঙ্গানুবাদ।—(অশক্তিজাত্যুৎকরণ স্থলে, এই ঋকারের অনানুষ্ঠকতা প্রমাণিত হইলেও,) এই বদুচ্ছা শব্দ কিন্তু পরিচায়কের (পরিভাষকের) অযোগ্য। যথা;—ঋফিড এবং ঋফিডড, ইত্যাদি। প্রয়োগ ত হইয়া থাকে)।

(না, ইহাও মূল শব্দ নহে, অপভ্রংশ শব্দমাত্র)। ইহাও (মূল শব্দ) ঋফিডঃ এবং ঋফিডড ই। (যদি ঋফিড, ঋফিডড শব্দ শাস্ত্রসিদ্ধ হয়, তাহা কোন্ ধাতু হইতে উৎপন্ন?) কিকপে সিদ্ধ?

(‘ঋ’ গতো, এই জুহোত্যাদিগণীয় ধাতুর উত্তর, [এই ধাতু শ্রুতিনিহিত হইলেও,] ডিপ্ প্রত্যয় করিয়া, অর্তি পদ লোক মধ্যে ব্যবহার আছে।) অর্তি অর্থাৎ ‘ঋ’ ধাতুর প্রবৃত্তি (বেদবৎ), লৌকিক ব্যবহারেও দৃষ্ট হয়। অতএব সেই ‘ঋ’ ধাতুর উত্তর, উগাদিতে বিহিত ফিড বা ফিডড প্রত্যয় করিলে, অবশ্য ঋফিড বা ঋফিডড পদ সিদ্ধ হইবে। (উগাদয়ৌ বহুলম্। তাতা৷ এই সূত্রানুসারে উগাদি প্রকরণে বহুবিধ প্রত্যয় ই বিধান হইতে পারে, সুতরাং ফিড, ফিডড প্রত্যয় অসম্ভব নহে। ঋফিডাদি পদসিদ্ধিও অসম্ভব নহে)।

ভাষ্যমূল।—ত্রয়ো ৫ শব্দানাং প্রবৃত্তিঃ। জাতিশব্দা গুণশব্দাঃ ক্রিয়াশব্দা ইতি। ন সন্তি বদুচ্ছাশব্দাঃ।

বঙ্গানুবাদ।—(ঋফিডাদি প্রয়োগ সিদ্ধ হইলেও, অসংখ্য অসংখ্য বদুচ্ছা শব্দের ব্যুৎপত্তি করা অসম্ভব। আর যদি একাকুই সম্ভব হয়, তবে অত্যন্ত ১লা মাঘ, ১৩০৭।] উদ্বোধন। [৪] ২৫

বৃহৎ এক প্রকাণ্ড গ্রন্থ প্রণয়ন প্রয়োজন। সুতরাং এইরূপ অসম্ভব বা গৌরব হেতু বলিতে হইবে যে) তিন প্রকার শব্দের প্রবৃত্তি (স্থিতি)। যথা;—জ্ঞাতি শব্দ, গুণ শব্দ এবং ক্রিয়াশব্দ। কিন্তু যদৃচ্ছা শব্দ বলিয়া কোন শব্দই নাই।

ভাষামূল।—অনুপা কৃড়া প্রয়োজনমুক্তমনুপা কৃড়া পরিহারঃ। সন্তি যদৃচ্ছা-শব্দা ইতি কৃড়া প্রয়োজনমুক্তং ন সন্তীতি পরিহারঃ। সমানে চার্থে শাস্ত্রাবিতোহ শাস্ত্রান্বিতস্ত নিবর্তকো ভবতি। তদ্বথা। দেবদত্তশব্দো দেবদত্ত শব্দং নিবর্তয়তি। ন গাবাদীন।

বঙ্গানুবাদ।—এ কিরূপ হইল? অনু প্রকাণ্ডে ('অ'কারের) প্রয়োজন স্বীকার কবিয়া, আব এক প্রকারে তাহার পরিচা (খণ্ড) করা হইল? যদৃচ্ছা শব্দ আছে, এই বলিয়া, 'অ'কারের প্রয়োজন স্বীকার করিয়া, যদৃচ্ছা-শব্দ নাই, এই বলিয়া তাহার খণ্ড করা হইল? (অর্থাৎ বাহারা যদৃচ্ছা শব্দ লইয়া, চারিপ্রকার শব্দের প্রবৃত্তি মানে, তাহাদের মতে প্রয়োজন দেখাইয়া, "আমি তাহা মানি না, আমি তিন প্রকাণ্ডই মানি," এই বলিয়া খণ্ড করা কি সম্ভব হয়? কোনও একদলের লোকগণ, স্বীকার করিলেই শাস্ত্রের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।

(আর তোমরা বাহা পূর্বে বলিয়াছিলে যে, "ঋতক" শব্দই অপভ্রংশ হইয়া 'অতক' শব্দ হইয়াছে," যদি 'ঋতক' এবং 'অতক', এই উভয় শব্দের সমান অর্থ হইত, তবে এইরূপ বলিয়া 'অতক' শব্দের বারণ করা সম্ভব হইত; কেন না,) সমান অথেতেই শাস্ত্রসম্ভব শব্দ, শাস্ত্রবচিভূত শব্দকে নিবারণ করে। যেমন, শাস্ত্রবিহিত 'দেবদত্ত' শব্দ অশাস্ত্রীয় 'দেবদত্ত' শব্দকে নিবারণ করে। (কেন না এই উভয় শব্দ সমান অর্থবাচক)। কিন্তু সেই দেবদত্ত শব্দ, ভিন্নার্থ বোধক গাব্য প্রভৃতি শব্দকে নিবারণ করে না। (বরং গো শব্দ গাব্য প্রভৃতি অপভ্রংশ শব্দকে নিবারণ করে। এই স্থলেও সেইরূপ 'ঋতক' শব্দের ছাড়া বা আভাস মাত্র 'অতক' শব্দ না থাকাতে, ['ঋতক' শব্দ ধাতু প্রত্যয় নিম্ন অর্থবান, গমনকারী লোক, আর 'অতক' শব্দ ধাতুপ্রত্যয়বর্জিত সংস্কার মাত্র] 'ঋতক' শব্দ, 'অতক' শব্দের নিবর্তক হইতে পাবে না, অতএব 'অ'কার উপদেশ কর্তব্য।)

ভাষামূল।—নৈষ দোষঃ। পক্ষান্তরৈরপি পরিহার্য ভবন্তি। অনুকরণং শিষ্টাশিষ্টাশ্চিৎকিঞ্চিৎ যথা লৌকিক বৈদিকেষু।* অনুকরণং হি শিষ্টস্ত সাধু

উবোধন।

[৩য়—১ম সংখ্যা ;

ভাতি। অশিষ্টা প্রতিদিক্ত বা নৈব তদোষায় ভবতি নান্দায়ায়। যথা
লৌকিক বৈদিকে।*। যথা নৌকিকে বৈদিকে চ কৃতান্তে।

লোকে ভাবদ্। য এবমসৌ দদতি, য এবমসৌ যজতে, য এবমসাবধীত
ইতি তত্ত্বানুকূর্সন্ দদ্যচ্চ যজতে চাধীযীত । সোহগাভ্যাদয়েন যুজ্যতে ।

বেদেহপি য এবং বিশ্বস্রজঃ সত্রাণ্যধ্যাসত ইতি তেষামনুকূর্সন্ তদং
সত্রাণ্যধ্যাসীত সোপ্যভ্যাদয়েন যুজ্যতে। অশিষ্টাপ্রতিদিক্তঃ যথা। য এবমসৌ
হিক্তি, য এবমসৌ হসতি, য এবমসৌ কণ্ডুয়তীতি, তত্ত্বানুকূর্সন্ হিক্তেচ
হসেচ কণ্ডুয়েচ নৈব তদোষায় স্ত্রাণ্যভ্যাদয়ায়।

বঙ্গমুবাদ।—পুনঃ উত্তর এই যে. ইহা দোষ নহে। প্রকারান্তরেও ‘৯কাব’
পরিহার হইতেছে। শিষ্ট, অশিষ্ট, এবং অনিষিক্ত শব্দ সমূহেরই অনুকরণ করা
কর্তব্য; যেমন লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারে হইয়া থাকে। ■

অনুকরণও, শিষ্ট (শাস্ত্রসঙ্গত) শব্দেই করা সঙ্গত। আর শাস্ত্রে বাহা
বিধান নাই, অথচ নিষেধও নাই, তাহা প্রয়োগ করাতে, কোন দোষও
হয় না, অথবা অভ্যাদয়ও (উন্নতি বা মঙ্গলও) হয় না। বেক্রপ লৌকিক
বৈদিকেতে।* যেমন লৌকিক সিদ্ধান্ত এবং বৈদিক সিদ্ধান্ত সমূহে
অনুকরণ হইয়া থাকে।

লোকে, (স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস, শিষ্ট মনুষ্য প্রভৃতির ব্যবহারে)
যথা;—কোনও ব্যক্তি, “যে এই রূপে ইহা দান করে, যে এইরূপে এই যজ্ঞ
করে, যে এইরূপে ইহা অগ্নয়ন করে,” এই কথা বলিয়া তাহাদের অনুকরণ
দেখাইতে গিয়া, সত্য মতাই কিছু দান করে, কোনও যজ্ঞ (১) করে
এবং কোন কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, সেও (অনুকারী দাতার) অভ্যা-
দয় (অর্গাদি) লাভ করে।

বেদেতেও সেইরূপ, যে ব্যক্তি “ব্রহ্মা (বিশ্বস্রষ্টিকর্তা) এই প্রকারে
সত্র (২) সমূহ নির্বাহ করিয়াছিলেন,” এই বলিয়া তাহার অনুকরণ
করিতে করিতে, নিজেও সেই ব্রহ্মার ত্রায়, সত্র (বৃহৎ যজ্ঞ) সমূহের অনুষ্ঠান
করে, সেও অভ্যাদয় (অর্গাদি) লাভ করে। শাস্ত্রে অবিহিত অনিষিক্ত কর্ম,
যথা;—ইনি এইরূপে চোহর (হিক্তা) তোলেন, ইনি এইরূপে হাসেন, ইনি
এইরূপে গা চুব্বান (কণ্ডুয়ন করেন); এই বলিয়া যিনি, তদ্রূপ অনুকরণ

(১) স্মৃতি শাস্ত্র বিহিত যজ্ঞ। (২) দিনদিনের অধিক কালব্যাপী যজ্ঞকে সত্র কহে।

করিতে করিতে, নিজেও ঢেকুর তোলেন, হাসেন, চুড়ান, এই কর্ম সকল (শাস্ত্রে বিধি বা নিষেধ না থাকাতে) তাহার দোষের জ্ঞাতও হয় না, অথবা উন্নতির জ্ঞাতও হয় না।

ভাষ্যমূল।—যন্ত ধৰ্ম্মব্রহ্মসৌ ব্রাহ্মণং হস্তি, এবমসৌ সুরাং পিবতীতি তত্ৰাহুকুর্সন্ ব্রাহ্মণং হস্তাং, সুরাং বা পিবেৎ, সোপি মত্তে পতিতঃ স্তাং ।

বঙ্গানুবাদ।—“এই ব্যক্তি এইরূপে ব্রহ্মহত্যা করে, এই ব্যক্তি এইরূপে সুরাপান করে,” এই বলিয়া যে ব্যক্তি তাহার অনুকরণ করিতে করিতে, নিজেও সত্য সত্যই ব্রাহ্মণকে বধ করে, অথবা সুরাপান করে, সেও পতিত হয় বলিয়াই মানিতে হয়। (সুতরাং অন্তর্ভুক্ত অনুকরণও অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে।)

ভাষ্যমূল।—যিষম উপস্তাসঃ । যশ্চৈবং হস্তি, যশ্চাহুহস্তি উভৌ তৌ হতঃ । যশ্চাপি পিবতি, যশ্চাহুপিপতি উভৌ তৌ পিবতঃ । যন্ত ধৰ্ম্মব্রহ্মসৌ ব্রাহ্মণং হস্তি, এবমসৌ সুরাং বা পিবতীতি তত্ৰাহুকুর্সন্ সাতাহুলিপ্তৌ মাণ্যগুণকণ্ঠঃ কদলীসুতন্তং ছিন্দ্যাং পয়ো বা পিবেৎ ন সমত্তে পতিতঃ স্তাং । এবামিহাপি য এবমসানপশবৎ প্রযুক্তে ইতি তত্ৰাহুকুর্সন্ পশবৎ প্রযুক্তীত মোহপাপশব্দ-ভাক্ স্তাং ।

বঙ্গানুবাদ।—অসমর্থন দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইল, (কারণ এই স্থলে ত অনুকরণ হয় নাই;) কেন না, যে ব্যক্তি (ব্রাহ্মণ) হত্যা করিল, এবং যে ব্যক্তি পশু (তাহার অনুকরণ করিতে গিয়া ব্রাহ্মণ) হত্যা করিল, ব্রাহ্মণহত্যা ত তাহারাই হই জনেই করিল। যে সুরাপান করে, (তাহার অনুকরণ করিয়া) পশু (যে ব্যক্তি সুরাপান করে, সুরাপান কার্য্যটি ত তাহারাই হই জনেই করিল। কিন্তু যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণহত্যা বা সুরাপানের অনুকরণ করণ করিতে গিয়া, প্রকৃতপক্ষে সুরাপান না করিয়া, “এই ব্যক্তি এইরূপে ব্রাহ্মণ বধ করে, অথবা এই ব্যক্তি এইরূপে সুরাপান করে,” এই বলিয়া, তাহার (প্রকৃত হত্যাকাণ্ডের) অনুকরণ করিতে করিতে, ঠিক সেই ব্রহ্মহত্যাকাণ্ডের স্থায়ী, স্মরণ করিয়া, চন্দনাদি সুগন্ধি দ্রব্য বা রক্তচন্দন গায়ে কপালে লেপিয়া, সুতার গাঁথা মালা গলায় ঝুলাইতে ঝুলাইতে, কলাগাছের স্তম্ভ (খামের স্থায় কলাগাছের মধ্যভাগ), ছেদন করে, (মস্তপানের চং করিয়া) ওদ্র বা জল পান করে, সে পতিত বলিয়া গণ্য হয় না। সেইরূপ এই স্থলেও যে ব্যক্তি, “তিনি এইরূপে অপশব্দ প্রয়োগ করেন,” এই বলিয়া তাহার অনুকরণ করিতে করিতে, নিজেও অপশব্দ প্রয়োগ করে,

দেও (প্রয়োগকারীর জ্ঞান অনুকরণকারীও) অপশব্দ প্রয়োগ ভাগী হয় (অপ-
শব্দপ্রয়োগজনিত দোষভাগী হয়) ।

ভাষ্যমূল।—অয়ং ত্রয়োহপশব্দপদার্থকঃ শব্দো যদর্থ উপদেশঃ কর্তব্যঃ । ন
চাপশব্দ পদার্থকঃ শব্দোহপশব্দ ভবতীতি । অপশব্দ ইত্যেব তত্ৰাপশব্দঃ
জ্ঞান । ন চৈষোপশব্দঃ ।

বঙ্গানুবাদ ।—এই স্থলে কিন্তু অত্র প্রকার (অর্থঃ ‘কুমার্ষভতক’ এইরূপ বলিতে,
অনুকরণকারী বক্তা যে, সর্বত্রই ‘ঋতক’ বলিতে অসমর্থ। কুমারী [বালিকার]
জ্ঞান, ‘ঋতক’ শব্দ বলিবে তাহা নহে ; তবে ‘বালিকাগণ ‘ঋতক’ স্থানে অস-
মর্থতাহেতু ‘ঋতক’ বলিয়া থাকে,” ইহা অত্ৰকে বুঝাইবার জন্য ‘কুমার্ষভতক’
শব্দ প্রয়োগ করিয়াছে ;) অপশব্দ প্রয়োগের প্রয়োজন বুঝাইবার জন্য, এই
স্থলে অপশব্দ প্রয়োগ করিয়াছে ; (স্মরণ্যং ইহা অপশব্দ হইতে পারে না ;)
এই হেতুই ‘ঋকার’ উপদেশ করা কর্তব্য । অপশব্দ প্রয়োগের প্রয়োজন
বুঝাইবার জন্য যে শব্দ, তাহা অপশব্দ হইতে পারে না ; ইহা এইরূপ জানিতে,
অবশ্যই বাধ্য হইবে । নতুবা, যে ব্যক্তি ইহা মনে করে যে, অপশব্দ (অন্তঃশব্দ
বা অপভ্রংশ শব্দ) পদের প্রয়োজন বুঝাইবার জন্য, যে শব্দ প্রয়োগ করা হয়,
তাহাও অপশব্দই হয় ; তবে সে যে ‘অপশব্দ,’ এই শব্দটী (আমাদের শব্দকে
অপশব্দ বলিবার জন্য) প্রয়োগ করিল, তাহাও ত তাহার অপশব্দ হইয়াছে ।
কিন্তু ইহা অপশব্দ নহে ।

ভাষ্যমূল।—অয়ং খবপি ভূয়োহনুকরণশব্দোহপরিহার্যঃ । যদর্থ উপদেশঃ
কর্তব্যঃ । সাধ্ব্৯কারমধীতে, মধ্ব্৯কারমধীত ইতি । কহন্ত পুনরৈতদনু-
করণম্ ।

কপিস্থস্ত । যদিকপিস্থস্ত । কপেশ্চল’ত্বমসিদ্ধম্ । তত্ৰাসিদ্ধতাদৃকার
এবাচ্ কার্য্যাপি ভবিষ্যন্তি ।

বঙ্গানুবাদ ।—এইস্থলে এইরূপ হইলেনও, এই যে রাশি রাশি অনুকরণ শব্দ
তাহা পরিত্যাগের উপায় নাই । যাহার জন্য ‘ঋ’কার উপদেশ, অবশ্যই করিতে
হইবে । যেমন, এই বালক, সাধু (পরিতৃক) ‘ঋ’কারটী পাঠ করিতেছে । স্তমধুর
‘ঋ’কারটী পাঠ করিতেছে । (এইরূপ অনুকরণ করিতে গিয়াও ত ‘ঋ’কার
পাঠ করা হয় ।) (পূর্বে ‘ঋ’কার উপদেশের প্রয়োজন নাই দেখান হইয়াছে)
পুনরায় এই অনুকরণ (কৃত ‘ঋ’কার) কোথা হইতে আসিল ।

‘কপি’ ধাতু হইতে আসিয়াছে ।

যদি ‘ক্‌অপি’ ধাতু হইতেই আসিয়া থাকে ; তবে ক্‌অপি ধাতুর ‘ল’ত্ব (‘ঋ’ স্থানে, ‘ঐ’ বিধান সন্ধির পরে বলিয়া, পর শব্দের নিকট পূৰ্ণশাস্ত্র অসিদ্ধত্ব-হেতু) অসিদ্ধ, তাহার অসিদ্ধতা প্রযুক্ত, ‘ঋ’কারেতেই অচ্‌ত্ব ধর্ম্‌ মানিয়া (ইচ্‌ এর স্থানে, যণ্‌ হয়, অচ্‌ পরে থাকিলে) সন্ধি প্রভৃতি (ই স্থানে ‘য’, উ স্থানে ‘ব’ ইত্যাদি) কার্য্য হইবে । (কেন না, “কৃপোরোলাঃ ।” এই সূত্রের দৃষ্টিতে, “ইকো যণ চি” সূত্র অসিদ্ধ ।)

ভাষ্যমূল ।—ভবেন্তদধেন নার্থঃ স্তাং । অয়ং ভূতঃ ক্‌অপিস্বপদার্থকঃ শব্দঃ
ষদর্থ উপদেশঃ কর্তব্যঃ ।

বঙ্গানুবাদ ।—এইরূপ হউক যে, সেই প্রয়োজনের জন্তে (ক্‌অপি ধাতুর ‘ঐ’ কারেতে অচ্‌ত্ব ধর্ম্‌ মানিয়া, সন্ধি করিয়া ‘য’কাবাদি কার্য্য হইবার জন্ত), ইহার (‘ঐ’কার উপদেশের) প্রয়োজন নাই । এখানে ‘ঐ’কার উচ্চারণের অস্ত্র উদ্দেশ্য, ক্‌অপি এই ধাতুটির পদার্থ নির্ণয়ের জন্ত (অর্থাৎ এই ধাতুটী কোথা হইতে আসিল, বিরূপে উৎপন্ন হইল ইত্যাদির জন্ত) যে, ক্‌অপি উচ্চারণের প্রয়োজন ; বাহার (যে ক্‌অপি উচ্চারণের) জন্ত ‘ঐ’ কারের উপদেশ করা কর্তব্য ।

ভাষ্যমূল ।—ন কর্তব্যঃ । ইদং অবগ্‌তং কর্তব্যং প্রকৃতিবদনুকরণং ভবতীতি ।
কিং প্রয়োজনম্ । দ্বিঃ পচত্বীত্যাহ । তিঙ্‌ তিঙ্‌ ইতি নিষাতো যথাস্থাং ।

অগ্নী ইত্যাহ । ঐদৃদেদ্বিবচনং প্রগৃহ্য সংজ্ঞং ভবতীতি প্রগৃহ্যসত্ত্বা
যথাস্থাং ।

বঙ্গানুবাদ ।—ঐ কার উপদেশ কর্তব্য নহে ; কেননা ইহা অগ্নীই স্বীকার করা কর্তব্য যে, প্রকৃতির (মূল শব্দের) ভাষ্য, অনুকরণ শব্দও হইয়া থাকে । কি হেতু প্রকৃতির ভাষ্য অনুকরণ শব্দও হইয়া থাকে ? দ্বিঃ পচত্ব (তাইবার পাক হউক), এই স্থলে উক্ত হইয়াছে যে, যেমন প্রথমবার “দ্বিঃ পচত্ব,” এই স্থলে “তিঙ্‌ তিঙ্‌” (অতিঙ্‌ত্বশব্দের পরে তিঙ্‌ত্ব নিম্ন পদ থাকিলে, তাহার অর্থাৎ সেই অতিঙ্‌-অন্তের, অনুদাত্ত স্বর হয়) সূত্র দ্বারা যেমন “দ্বিঃ” অনুদাত্ত স্বর-বিশিষ্ট হয়, তদ্রূপ সেই “দ্বিঃ” শব্দের অনুকরণার্থ পুনঃ পাঠেও নিষাত (অনুদাত্ত) স্বর হইবে ।

এহরূপ, অগ্নী ইত্যাহ (অগ্নি এই শব্দ বলিয়াছিল), এই স্থলে, এই পূৰ্ণ উচ্চারিত শব্দের যেমন, “ঐদৃদে দ্বিবচনম্ প্রগৃহ্যম্” । ১ । ১ । ১১ । (দ্বিবচন নিম্নপদ ঐকারান্ত, উকারান্ত এবং একারান্ত শব্দের প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হয়), (প্লুত এবং প্রগৃহ্যসংজ্ঞক শব্দের পরেতে স্বরবর্ণ থাকিলে, প্রকৃতি ভাব হয় অর্থাৎ যেমন

অবস্থা ছিল, তেমনই থাকে, সন্ধি হয় না), এই সূত্রানুসারে প্রযুক্ত সংজ্ঞা হওয়াতে, প্রকৃতি-ভাব হইয়াছিল ; পরবর্তী অঙ্করণ “অগ্নীত্যাহ” শব্দেও তাহাই হইয়াছে, সন্ধি হয় নাই । সূত্রের অঙ্করণ শব্দও প্রকৃতিগত শব্দের আশ্রয় হয়, এইরূপ বলা যাইতে পারে ।

ভাষামূল।—যদি প্রকৃতিবদম্বলকরণং ভবতীতুচ্যতে । অপশব্দ এবাসৌ ভবতি কুমার্ষ্যন্তক ইত্যাহ । ব্রাহ্মণ্যন্তক ইত্যাহ । অপশব্দো হ্যশ্চ প্রকৃতিঃ ।

ন চাপশব্দঃ প্রকৃতিঃ । নহপশব্দা উপদিষ্টান্তে । ন চানুপদিষ্টা প্রকৃতিরস্তি ।

বঙ্গানুবাদ।—যদি অঙ্করণ শব্দও প্রকৃতির আশ্রয়ই হয়, এইরূপ বলা যায়, তাহা হইলে এই যে “কুমার্ষ্যন্তক ইত্যাহ” (কুমারী ‘ন্তক’ এই কথা বলিয়াছিল), “ব্রাহ্মণ্যন্তক ইত্যাহ” (ব্রাহ্মণী ‘ন্তক’ এই কথা বলিয়াছিল), এইরূপ অঙ্করণীকৃত শব্দ সমূহও কুমারী-উক্ত প্রকৃতি-গত শব্দের আশ্রয়, অপশব্দই হইবে । কেন না অপশব্দই ইহার প্রকৃতি ।

অপশব্দ কাহারও প্রকৃতি হইতে পারে না । যে হেতু পণিনি কোনও অপশব্দ উপদেশ করেন নাই ; আর বাহা পণিনি উপাদষ্ট নহে, তাহা কখনও প্রকৃতি হইতে পারে না । অতএব ংতক শব্দ যদি প্রকৃতি না হইল, তবে ংকার উপদেশ সঙ্গতই হইল ।

ভাষামূল।—একদেশবিকৃতমনস্ত্বং প্রুত্যা দয়ঃ *। একদেশবিকৃতমনস্ত্বং তীতি প্রুত্যা দয়োপি ভবিষ্যতি ।

যন্তে একদেশবিকৃতমনস্ত্বং তীতুচ্যতে । রাজ্ঞঃ ক চ । রাজকীয়ম্ । অম্লোপন ইতি লোপঃ প্রাপ্নোতি ।

একদেশবিকৃতমনস্ত্বং যন্তী নিদিষ্টম্ ।

বঙ্গানুবাদ।—এক অংশ বিকৃত হইলেও, সেই শব্দ অনন্ত হয় বলিয়া, প্রুতি প্রভৃতি কাব্য হইবে । *। কোনও শব্দের একটা অংশ বিকৃত হইলেও, সেই শব্দ অন্ত শব্দ বলিয়া পরিগণিত হয় না ; সূত্রের প্রুত্যা দি কার্য্য (অর্থ্যাৎ কং, রকারের স্থানে ল কার হইয়া ং হইলেও, ংকার নিমিত্ত, যে স্থানে প্রুত, প্রকৃতি ভাব প্রভৃতি কার্য্য হইত, ংকার নিমিত্তও তাহাই হইবে) বিকৃতাবস্থায়ও হইবে ।

“যদি এক অংশ বিকৃত হইলেও রূপান্তর না হয়,” এইরূপ বলা যায়, তবে রাজ্ঞঃ ক চ। ৪। ২। ১৪। (বুদ্ধির পরে ছ-প্রত্যয় সিদ্ধি হইলে, তাহার ১লা মাধ্য, ১৩০৭।] উঃ.ধন ।

সহিত মিলিত হইয়া, রাজন্ শব্দের উত্তর ‘ক’কার আদেশ হইয়া থাকে), এই সূত্রানুসারে রাজকীয় শব্দ সিদ্ধ হইয়া, “অয়োপোহনঃ,” এই সূত্রানুসারে অকারের লোপ প্রাপ্তি হইবে। (অর্থাৎ “রাজকীয়” এই অণ্ডক প্রয়োগ হইবে।)

তাহা হইবে না ; যে হেতু, যষ্টি বিভক্তি নির্দিষ্ট শব্দেরই, একদেশ বিকৃত হইলেও, রূপান্তর হয় না, এইরূপ জানিতে হইবে। (রূপধাতুর ঋকার যখন, “কৃপোরোলঃ” এই সূত্রে যষ্টি বিভক্তি দ্বারা নির্দিষ্ট হয় নাই, তখন এই স্থলে, ঋকারের রূপান্তর প্রাপ্তি হইবে। আর “রাজঃ কচ,” এই সূত্রটির সমস্ত রাজন্ শব্দেই যষ্টি বিভক্তি হইয়াছে। কিন্তু কেবল মাত্র রাজন্ শব্দের অন্ ভাগেতে যষ্টি বিভক্তি হয় নাই ; সুতরাং “অয়োপোহনঃ” এই সূত্রানুসারে অকারের লোপ হইবে না ।)

ভাষামূল ।—যদি যষ্টি নির্দিষ্টস্থে চাচাতে ক্রতপুশিথ ইতি প্লুতো ন প্রাপ্নোতি নহত ঋকারঃ যষ্টিনির্দিষ্টঃ । কস্তর্হি । রেফঃ । ঋকারোপাত্ত যষ্টিনির্দিষ্টঃ । কথম্ । অবিভক্তিকোনির্দেশঃ । রূপ উঃ রঃ লঃ কৃপোরোল ইতি ।

বঙ্গানুবাদ ।—যদি যষ্টি বিভক্তির দ্বারা নির্দিষ্ট বর্ণেরই একদেশ বিকৃত হইলে, রূপান্তর হয় না, এইরূপ বলা যায় ; তবে ক্রতপুশিথ এই স্থলেও, ঋকার প্লুত হইবে না, যে হেতু এই স্থানে ঋকার যষ্টি বিভক্তির দ্বারা নির্দিষ্ট হয় নাই (অর্থাৎ রূপধাতুর ঋকার স্থানে যে ঋকার আদেশ হইয়াছে, সেই ঋকারের স্ব মাত্র অংশেরই, ল্ আদেশ হইয়া ঋকার হইয়াছে ; সমস্ত ঋকার (১) অবয়বের স্থানে, সমস্ত ঋকার (২) আদেশ হয় নাই, যখন সুতরাং ঋকার যষ্টি নির্দিষ্ট হয় নাই, তখন তাহার একদেশ বিকৃত হইয়া যে, রূপান্তরিত হইবে না, তাহাও নহে ; অতএব “ক্রতপু শিথ” (৩) এই স্থলে ঋকার প্লুতও হইবে না ।) তবে যষ্টি নির্দিষ্ট কোন বর্ণ ? রেফ অর্থাৎ রেফার মাত্র বর্ণ । না, এই স্থলে কেবল মাত্র রেফই যষ্টি বিভক্তি নির্দিষ্ট হয় নাই । পরন্তু ঋকারও এই স্থানে যষ্টি বিভক্তির দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়াছে । কিরূপে যষ্টি বিভক্তি দ্বারা নির্দিষ্ট

(১) ঋকারের এক অংশ (র্) বাঞ্জন, এবং এক অংশ স্বর (‘ই’বৎ কোনও বর্ণ) জানিবে ।

(২) ঋবর্ণের একভাগ বাঞ্জন (ল্) এবং একভাগ স্বর (‘ই’বৎ কোনও বর্ণ) জানিবে ।

(৩) যে সকল স্থানে স্বরবর্ণের পরে, ‘ত’ থাকিবে, তাহাকে প্লুত স্বর বিশিষ্ট জানিবে । যেমন ক্রতপুশিথ ।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।

স্বামী বিবেকানন্দ।]

[৫৮৩ পৃষ্ঠার পর।

থাওয়া দাঁওয়া সম্বন্ধে ত এই মোট কথা শুনলে। এখন পাশ্চাত্যরা কি খায় এবং তাদের আহারের ক্রমশঃ কেমন পরিবর্তন হয়েছে, তাও কিছু বলি।

গরীব অবস্থায় সকল দেশের থাওয়াই ধাত্ত বিশেষ; এবং শাক তরকারি, মাছ মাংস বিলাসের মধ্যে এবং চাটনির মত ব্যবহৃত হয়। যে দেশে যে শত প্রধান ফসল, গরীবদের প্রধান খাওয়া তাই; অত্যাশ্রয় জিনিস আত্ম-সঙ্গিক। যেমন বাঙ্গালা, ও উড়িষ্যা, ও মাল্লাজ উপকূলে ও মালাবার উপকূলে ভাত প্রধান খাদ্য; তার সঙ্গে ডাল তরকারি, কখন কখন মাছ মাংস চাটনিবৎ।

ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশে অবস্থাপন্ন লোকের জন্য গমের রুটি ও ভাত; সাধারণ লোকের নানা প্রকার বজ্রা, মড়ুয়া, জনার, খিজুরা প্রভৃতি ধাত্তের রুটি প্রধান খাদ্য।

শাক, তরকারি, দাল, মাছ, মাংস, সমস্তই সমগ্র ভারতবর্ষে, ঐ রুটি বা ভাতকে স্বেচ্ছা করবার জন্য ব্যবহার—তাই ওদের নাম বাজান। এমন কি, পঞ্জাব, রাজপুতানা ■ দাক্ষিণাত্য দেশে, অবস্থাপন্ন অমিষাশী লোকেরা, ও এমন কি রাজারাও, যদিও নিত্য নানা প্রকার মাংস ভোজন করে, তথাপি রুটি বা ভাতই প্রধান খাদ্য। যে ব্যক্তি আত্মসের মাংস নিত্য খায়, সে এক সের রুটি তার সঙ্গে নিশ্চিৎ খায়।

পাশ্চাত্য দেশে এখন যে সকল গরীব দেশ আছে এবং ধনী দেশের গরীবদের মধ্যে, ঐ প্রকার রুটি এবং আনুই প্রধান খাদ্য। মাংসের চাটনি মাত্র—তাও কালে ভজে। স্পেন, পোর্টুগাল, ইতালি প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত উষ্ণ দেশে যথেষ্ট ড্রাক্সা জন্মায় এবং ড্রাক্সা-ওয়াইন অতি সস্তা। সে সকল ওয়াইনে মাদকতা নাই (অর্থাৎ পিপেথানেক না খেলে ত আর নেদা হবে না এবং তা কেউ খেতেও পারে না) এবং যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য। ■ দেশের দরিদ্র লোকে এজন্য মাছ মাংসের জায়গায় ঐ ড্রাক্সা-রস দ্বারা পুষ্টি সংগ্রহ করে। কিন্তু উত্তরাঞ্চল, যেমন রুসিয়া, সুইডেন, নরওয়ে প্রভৃতি দেশে দরিদ্র লোকের আহার প্রধানতঃ রাই-নামক ধানের রুটি ও এক আধ টুকরা ওট্‌কি মাছ ও আনু।

ইউরোপের অবস্থার বোকের এবং আমেরিকার আবালবৃদ্ধবনিতার খাওয়া আর এক রকম, অর্থাৎ রুটি, ভাত প্রভৃতি চাট্‌নি এবং মাছ মাংসই হচ্ছে খাওয়া। আমেরিকায় রুটি খাওয়া নাই বল্লেই হয়। মাছ মাছই এলো, মাংস মাংসই এলো, তাকে অমনি খেতে হবে, ভাত রুটির সংযোগে নয়। এবং একন্য প্রত্যেক বারেই খালা বদলান হয়। যদি দশটা খাবার জিনিস থাকে, ত দশবার খালা বদলাতে হয়। যেমন মনে কর, আমাদের দেশে প্রথমে শুধু শুক্ক এলো, তার পর খালা বদলে শুধু ডাল এলো, আবার খালা বদলে শুধু কোল এলো, আবার খালা বদলে দুটি ভাত, নয় ত দুখান লুচি ইত্যাদি। এর লাভের মধ্যে এই যে, নানা জিনিস অল্প অল্প খাওয়া হয়, পেট বোকাই করা হয় না। ফরাসী চাঁল সকালবেলা “কাকি” এবং এক আদ্ টুকরা রুটি-মাখুম; দুপুর বেলা মাছ মাংস ইত্যাদি মধ্যবিৎ; রাতে লম্বা খাওয়া। ইতালি, স্পেন প্রভৃতি জাতিদের ঐ এক রকম। জর্মান্বারা ক্রমাগত থাকে,--পাঁচ বার, ছ বার, প্রত্যেক বারেই অল্প বিস্তর মাংস। ইংরাজরা তিনবার; সকালে অল্প, কিন্তু মধ্যে মধ্যে কফি-যোগ, চা-যোগ আছে। আমেরিকানদের তিনবার—উত্তম ভোজন, মাংস প্রচুর। তবে এ সকল দেশেই “ডিনার”টা প্রধান খাদ্য—ধনী হলে, তার ফরাসী রাঁধুনি এবং ফরাসী চাঁল। প্রথমে একটু আদটু নোনা মাছ বা মাছের ডিম, বা কোনও চাট্‌নি বা সস্‌জি। এটা হচ্ছে স্ন্যাক্‌বুজ্‌। তার পর স্প; তার পর আজকাল ফ্যানসান—একটা ফল; তার পর মাছ; তার পর মাংসের একটা স্ন্যাক্‌কারি; তার পর থান্ মাংস শূন্য, সঙ্গে কাঁচা সস্‌জি; তার পর আরণ্য মাংস মৃগপক্ষ্যাদি; তার পর মিষ্টান্ন; শেষ কুজী—মধুরেণ সমাপয়েৎ। ধনী হলে প্রায় প্রত্যেক বার খাল বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে মদ বদলাচ্ছে,—সেরি, ক্রারেট, স্মার্পাঁ ইত্যাদি এবং মধ্যে মধ্যে মদের কুজী একটু আদটু। খাল বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে কাঁচা চামচ সব বদলাচ্ছে। আহা-রাতে “কাকি”—বিনা হৃদ, আসব মদ্য খুদে খুদে গ্লাসে এবং ধুমপান। খাওয়ার রকমারির সঙ্গে মদের রকমারি দেখাতে পারলে, তবে বড়মান্‌সি চাঁল বল্‌বে। একটা খাওয়ার আমাদের দেশের একটা মধ্যবিৎ লোক সর্বস্বাঙ হতে পারে, এমন খাওয়ার ধ্ম এরা করে।

আখ্যার একটা পীঠে ব’সত, একটা পীঠ চৈসান দিত এবং একটা জলচৌকীর উপর খালা রেখে, এক খালাতেই সকল খাওয়া খেত। ঐ চাঁল এখনও পঞ্জাব,

রাজপুতানা, মহারাষ্ট্র ও গুজ্জর দেশে বিদ্যমান। বান্ধালী, উড়ে, তেলিঙ্গি, মালাবারি প্রভৃতি মাটিতেই “সাপ্‌ডান”। মহীশূরের মহারাজও মাটিতে আঙ্গট্‌পাতে ভাত ডাল খান। মুসলমানেরা চাদর পেতে খায়। বর্ষি, জাপানী প্রভৃতি উপু হয়ে বসে মাটিতে খাল রেখে খায়। চীনেরা টেবিলে খায়; চেয়ারে বসে, কাটি ও চামচ যোগে খায়। রোমান ও গ্রীকরা কোচে শুয়ে, টেবিলের উপর থেকে হাত দিয়ে খেত। ইউরোপীয়া টেবিলের উপর হতে, কেদারায় বসে, হাত দিয়ে পূর্বে খেত; এখন নানা প্রকার কাঁটা চামচ।

চীনের খাওয়াটা কসরৎ বটে—যেমন আমাদের পানওয়ারীরা হুখান সম্পূর্ণ আলাদা লোহার পাতকে হাতের কায়দায় কাঁচির কাজ করায়, চীনেরা তেমনি ছোটো কাটিকে ডাঁন হাতের ছোটো আঙ্গুল আর মুঠোর কায়দায় চিমটির মত ক’রে শাকাদি মুখে তোলে। আবার ছোটোকে একত্র করে, এক বাটি ভাত মুখের কাছে এনে, ঐ কাটিদ্বয়নির্মিত খোজা-যোগে ঠেলে ঠেলে মুখে পোরে।

সকল জাতিরই আদিম পুষ্ক নাকি প্রথম অবস্থায় বা পেত তাই খেত। একটা জানোয়ার মারলে, সেটাকে এক মাস ধরে খেত; পচে উঠলেও তাকে ছাড়ত না। ক্রমে সভ্য হয়ে উঠলো চাম বাস্‌ শিখলে; আরণ্য পশুগুলের মত একদিন বেদম্‌ খাওয়া, আর হু পাঁচ দিন অনশন ঘুটলো; আহার নিত্য যুটতে লাগল; কিন্তু পচা জিনিস খাবার চা’ল একটা দাঁড়িয়ে গেল। পচা দুর্গন্ধ একটা বা হয় কিছু আবশ্যক ভোজ্য হতে নৈমিত্তিক, আদরের চাটুনি হয়ে দাঁড়াল।

একুইমো জাতি বরফের মধ্যে বাস করে। শস্ত সে দেশে একদম জন্মায় না; নিত্য ভোজন—মাছ মাংস; ১০।৫ দিনে অরুচি বোধ হলে, এক টুকরা পচা মাংস খায়—অরুচি সারে।

ইউরোপীয়া এখনও বস্ত্র পশু পক্ষীর মাংস না পচলে খায় না। তাক্স পেলো, তাকে টাঙ্গিয়ে রাখে—যতক্ষণ না প’চে দুর্গন্ধ হয়। কল্‌কেতার পচা হরিণের মাংস পড়তে পায় না; রসা ভেট্‌কির উপাদেয়তা প্রসিদ্ধ। ইংরেজদের পানীর স্বত পচবে, স্বত পোকা বিল্বিল করবে, ততই উপাদেয়। পণায়মান পানীর-কাটকেও তাড়া করে ধরে মুখে পুরবে—তা নাকি বড়ই অস্বাদ! নিরামিষাণী হয়েও পঁয়াজ লহনের জন্ত ছোঁক ছোঁক করবে। দক্ষিণী বামুনের পঁয়াজ লহন নইলে খাওয়াই হবে না। শাস্ত্রকারেরা সে পথও বন্ধ করে দিলেন। পঁয়াজ, লহন, গেঁও শোব, গেরো মুরগি খাওয়া এক-

জাতের পাপ, সাজা—জাতিনাশ । যারা শুনলে এ কথা, তারা ভয়ে পঁাজ লম্বু ছাড়লে, কিন্তু তার চেয়ে বিষমদুর্গন্ধ হিঙ্গ খেতে আরম্ভ করলে!! পাহাড়ি গোড়া হিঁহু লম্বুনে-খাস পঁাজ লম্বুনের আয়গায় ধরলে । ও ছোটের নিষেধ ত আর পুঁথিতে নেই!!

সকল ধর্ম্মেই খাওয়া দাওয়ার একটা বিধি নিষেধ আছে; নাই কেবল ক্রিস্চানি ধর্ম্মে । জৈন, বৌদ্ধয় মাছ মাংস খাবেই না । জৈন আবার বা মাটির নীচে জন্মায়, আলু মূলা প্রভৃতি, তাও খাবে না । খুঁড়তে গেলে পোকা মরবে, রাত্রে খাবে না—অন্ধকারে পাছে পোকা খায় ।

রাহদীরা যে মাছে আঁশ নেই তা খাবে না, শোর খাবে না, যে জানোয়ার বিশক নয় এবং জাগব কাটে না, তাকেও খাবে না । আবার বিষম কথা, দুধ বা দুগ্ধোৎপন্ন কোনও জিনিস যদি হেঁসেলে ঢোকে, যখন মাছ মাংস রান্না হচ্ছে, ত সে সব রান্না ফেলে দিতে হবে । এ বিধায় গোড়া রাহদী অল্প কোনও জাতির রান্না খায় না । আবার হিঁহুর মত রাহদীরা বৃথা-মাংস খায় না । যেমন বাঙ্গালা দেশ ও পঞ্জাবে মাংসের নাম “মহাপ্রসাদ” । রাহদীরা সেই প্রকার মহাপ্রসাদ অর্থাৎ যথা নিয়মে বলিদান না হলে, মাংস খায় না । কাজেই হিঁহুর মত, রাহদীদেরও যে সে দোকান হতে মাংস কেনবার অধিকার নাই । মুসলমানেরা রাহদীদের অনেক নিয়ম মানে, তবে অত বাড়াবাড়ি করে না ; দুধ মাছ মাংস একসঙ্গে খায় না এই মাত্র, ছোঁয়া ছুঁয়ি হলেই যে সর্কনাশ, অত মানে না । রাহদীদের আর হিঁহুদের অনেক সৌসাদৃশ্য—খাওয়া গন্ধকে ; তবে রাহদীরা বুনা শোরও খায় না, হিঁহুরা খায় । পঞ্জাবে মুসলমান হিঁহুর বিষম সংঘাত থাকায়, বুনা শোর আবার হিঁহুদের একটা অত্যাবশ্যক খাবা হয়ে দাঁড়িয়েছে । রাজপুতদের মধ্যে বুনা শোর শিকার করে খাওয়া একটা ধর্ম্মবিশেষ । দক্ষিণ দেশে ব্রাহ্মণ ছাড়া অত্যাঁচ জাতের মধ্যে গৌড় শৌরও যথেষ্ট চলে । হিঁহু বুনা মুরগী খায় ; গৌড় খায় না । বাঙ্গলা দেশ থেকে নেপাল ও আকাশ্মীর হিমালয় এক রকম চলে চলে । মনুজ খাওয়ার প্রথা এই অঞ্চলেই সমধিক বিদ্যমান আজও ।

কিন্তু কুমায়ুন হতে আরম্ভ করে কাশ্মীর পর্য্যন্ত, বাঙ্গালী, বেহারী, প্রয়াগী ও নেপালীর চেয়েও মনুর আইন বিশেষ প্রচার । যেমন বাঙ্গালী, মুরগী বা মুরগীর ডিম খায় না, কিন্তু হাঁসের ডিম খায়, নেপালীও তাই, কিন্তু কুমায়ুন হতে তাও চলে না । কাশ্মীরীরা বুনা হাঁসের ডিম পেলে সুখে খায়, গ্রাম্য নয় ।

আলাহাবাদের পর হতে, হিমালয় ছাড়া, ভারতবর্ষের অত্র সমস্ত দেশে যে ছাগল খায়, সে মুরগীও খায়।

এই সকল বিধি নিষেধের মধ্যে অধিকাংশই যে স্বাস্থ্যের জন্য, তার সন্দেহ নাই। তবে সকল জায়গায় সমান পারে না। শোর মুরগী যা তা খায়, অতি অপরিষ্কার জানোয়ার, কাজেই নিষেধ; বুনো জানোয়ার কি খায় কে দেখতে যায় বল। তা ছাড়া বোগ, বুনো জানোয়ারে কম। দুধ, পেটে অস্বাদিক্য হ'লে একেবারেই ছপাচ্য, এমন কি একদমে এক গ্লাস দুধ খেয়ে কখন কখন মৃত্যু ঘটতেছে।

দুধ যেমন শিশুতে মাতৃতত্ত্ব পান করে, তেমনি চোকে চোকে খেলে তবে শীঘ্র হজম হয়, নতুনা অনেক দেৱী লাগে। দুধ একটা গুরুপাক জিনিস, মাংসের সঙ্গে হজমে আরও গুরুপাক, কাজেই এ নিষেধ গ্রাহীদের মধ্যে। মূর্থ মাতা কচিছেলেকে জোর করে ঢক ঢক কবে দুধ খাওয়ায়, আর ছ ছ মাসের মধ্যে মাথায় হাত দিয়ে কাঁদে!! এখনকার ডাক্তারেরা পূর্ববয়স্কের জন্যও একপোয়া দুধ আন্তে আন্তে আধ ঘণ্টায় খাওয়ার বিধি দেন; কচিছেলের জন্য “কিডনি বটল” ছাড়া উপায়ান্তর নাই। মা ব্যস্ত কাজে—দানী একটা কিছুকে করে, ছেলেটাকে চেপে ধরে সাঁ সাঁ দুধ খাওয়াচ্ছে!! লাভের মধ্যে এই, যে রোগা-পটকা গুলো আর বড়, বড় হচ্ছে না, তারা ঐ খানেক জন্মের মত দুধ খাচ্ছে; আর যে গুলো এ বিষয় খাওয়ার মধ্য দিয়ে ঠেলে ঠেলে উঠছে, সে গুলো প্রায় স্নেহকায় এবং বলিষ্ঠ।

সে কালে আঁতুড় ঘর, দুধ খাওয়ান প্রভৃতির হাত থেকে যে ছেলেপিলে গুলো বেঁচে উঠতো, সে গুলো একরকম স্নেহ স বল আশ্রয়ন থাকত। মা যত্নের সাক্ষাৎ বরপুত্র না হলে কি আর সে কালে একটা ছেলে বাঁচতো!! সে তাপসেঁক, দাগা, ফোঁড়া প্রভৃতির মধ্য দিয়ে বেঁচে ওঠা, প্রসূতি ও প্রসূত উভয়েরই পক্ষে দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। হরিদ্রুঠের, তুলসীতলার খোকা ও মা দুই প্রায় বেঁচে যেত, সাক্ষাৎ যমরাজের দূত চিকিৎসকের হাত এড়াতে বলে।

(কাপড়ে সভ্যতা।)

সকল দেশেই কাপড় চোপড়ে কিছু না কিছু ভদ্রতা লেগে থাকে। “বেতন না জানলে বোদ্ধ অবদ্ব বুঝবো ক্যামনে?” শুধু ব্যাতনে নয়, “কাপড় না দেখলে, ভদ্র অভদ্র বুঝবো ক্যামনে” সর্বদেশে কিছু না কিছু চলন। আমাদের দেশে শুধু গায়ে ভদ্রলোক রাস্তায় বেরতে পারে না; ভারতের

অত্যাশ্চর্য প্রদেশে আবার পাগড়ী না মাথায় দিয়ে কেউই রাস্তায় বেরোয় না । পাশ্চাত্য দেশে ফরাসীরা বরাবর সকল বিষয়ে অগ্রণী,—তাদের খাওয়া, তাদের পোষাক সকলে নকল করে । এখনও ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিশেষ বিশেষ পোষাক বিস্তারিত, কিন্তু ভঙ্গ হলেই, ছপসপা হলেই, অমনি সে পোষাক অন্তর্দান হন, আর ফরাসী পোষাকের আবির্ভাব । কাবুলি-পাজামা-পর্যায় ওলন্দাজি চাষা, ঘাঘরা-পর্যায় গ্রীক, তিব্বতি-পোষাক-পর্যায় রুষ, যেমন “বোড্র” হওয়া, অমনি ফরাসী কোট প্যান্টালুনে আবৃত হয় । মেয়েদের ত কথাই নাই, তাদের পয়সা হয়েছে কি পারি রাজধানীর পোষাক পরতে হবেই হবে । আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স — জার্মানী এখন ধনী জাত ; ও সব দেশে সকলেরই একরকম পোষাক—সেই ফরাসী নকল । তবে আজকাল পারি অপেক্ষা লণ্ডনে পুরুষদের পোষাক ভব্যতর, তাই পুরুষের পোষাক “লণ্ডন মেড”, আর মেয়েদের পারিসিবেন নকল । যাদের বেশী পয়সা, তারা ঐ দুই স্থান হতে তৈয়ারী পোষাক বারমাস ব্যবহার করে । আমেরিকা বিদেশী আমদানী পোষাকের উপর ভয়ানক মাত্রা বসায়, সে মাণ্ডল দিয়েও পারি লণ্ডনের পোষাক পর্তে হবে । এ কাজ একা আমেরিকানরা পারে—আমেরিকা এখন কুবেয়ের প্রধান আড্ডা ।

প্রাচীন অর্থাজাতিরা ধুতি চাদর পরত ; কত্রিয়দের ইজার ও লম্বা জামা, লড়ায়ের সময় । অল্প সময় সকলেরই ধুতি চাদর । কিন্তু পাগড়ীটা ছিল । অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে মেয়ে মদে পাগড়ী পরত । এখন যেমন বাঙ্গালা ছাড়া অত্যাশ্চর্য প্রদেশে কপনি মাত্র থাকলেই শরীর ঢাকার কাজ হলো, কিন্তু পাগড়ীটা চাই ; প্রাচীনকালেও তাই ছিল, মেয়ে মদে । বৌদ্ধদের সময়ের যে সকল ভাস্কর্য্য-মূর্তি পাওয়া যায়, তার মেয়ে মদে কোপীন-পর্যায় । বুদ্ধদেবের বাপ কপনি পরে বসেছেন সিংহাসনে ; তবু মাও বসেছেন—বাড়ার ভাগ, এক-পা মগ ও একহাত বাল্য ; কিন্তু পাগড়ী আছে ! সন্ন্যাসী ধর্ম্মা-শোক ধুতি পরে, চাদর গলায় ফেলে, আহুড় গায়ে, একটা ডমরু-আকার আগনে বসে নাচ দেখছেন । নর্ত্তকীরা দিব্যি উলঙ্গ ; কোমর থেকে কতক শুভো ভাস্কর্য্য ফালি ঝুলছে । মোক্ষা পাগড়ী আছে । নেবু টেবু সব ঐ পাগড়ীতে । তবে রাজ-সামন্তরা ইজার ও লম্বা জামা পরা—চুস্ত ইজার এ চোপা । সারথি নগরাজ এমন রথ চালানেন যে, রাজা ঋতুপর্ণের চাদর কোথায় পড়ে রইল ; রাজা ঋতুপর্ণ আহুড় গায়ে বে কস্মতে চললেন । ধুতি

চাদর আঁধারের চিরস্তন পোষাক, এই অজ্ঞাই ক্রিয়া কর্ত্তের বেলায় ধুতি চাদর পরতেই হয়।

প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের পোষাক ছিল ধুতি চাদর; একখান বৃহৎ কাপড় ও চাদর—নাম ছিল “তোগা”, তারি অপভ্রংশ এই “চোগা”। তবে কখন কখনও একটা পিরতানও পরা হত। যুদ্ধকালে ইজার জামা। মেয়েদের একটা খুব লম্বা চোড়া চারকোণা জামা, যেমন ছথানা বিছানার চাদর লম্বা লম্বি সেলাই করা, চওড়ার হৃদিক খোলা। তার মধ্যে ঢুকে, কোমরটা বঁদলে ছায়া, —একবার বুকের নীচে, একবার পেটের নীচে। তার পর, উপরের খোলা ছপাট ছ হাতের উপর ছ জায়গায় তুলে মোটা ছুঁচ দিয়ে আটকে দিলে, যেমন উত্তরাধ্বের পাহাড়িরা কঞ্চল পরে। সে পোষাক অতি স্নন্দর ও গহজ। ওপরে একখান চাদর।

কাটা কাপড় এক ইরানীরা প্রাচীনকাল হতে পরত। বোধ হয় চীনেদের কাছে গেল। চীনেরা হচ্ছে সভ্যতার অর্থাৎ ভোগ বিলাসের, সুখসুচ্ছন্দতার আদ্যুত। অনাদি কাল হতে চীনে টেবিলে খায়, চেয়ারে বসে, বস্ত্র ভিন্ন কত খাওয়ারে জ্ঞাত, এবং কাটা পোষাক নানা রকম, ইজার, জামা, টুপি, টোপা পরে।

সিকন্দর সা ইরান জয় করে, ধুতি চাদর ফেলে ইজার পরতে লাগলেন। তাতে তাঁর স্বদেশী সৈন্তরা এমন চটে গেল যে বিদ্রোহ হবার মত হয়েছিল। মোদা সিকন্দর নাছাড় পুরুষ, ইজার জামা চালিয়ে দিলেন।

পরমদেশে কাপড়ের দরকার বড় হয় না। কোপীনমাত্রেই লজ্জানিবারণ, বাকি কেবল অলঙ্কার। ঠাণ্ডাদেশে শীতের চোটে অস্থির, অসভ্য অবস্থায় জামোয়ারের ছাল টেনে পরে, ক্রমে কঞ্চল পরে, ক্রমে জামা পাজামা ইত্যাদি নানান্ খানা হয়। তারপর আছড় গায়ে গয়না পরতে গেলেই ত ঠাণ্ডায় মৃত্যু, কাজেই অলঙ্কার-প্রিয়তাটা ঐ কাপড়ের উপর গিয়ে পড়ে। —যেমন আমাদের দেশে গয়নার ফ্যাশান্ বদলায়, এদের তেমন ঘড়ি ঘড়ি বদলাচ্ছে কাপড়ের ফ্যাশান্।

ঠাণ্ডাদেশমাত্রেই এজ্ঞ সর্বদা সর্বদা না ঢেকে কারু সাম্ন্নে বেরুবার ধোঁ নাই। বিলেতে ঠিক ঠিক পোষাকটি না পরে ঘরের বাইরে যাবার ধোঁ নাই। পাশ্চাত্যদেশের মেয়েদের পা দেখান বড়ই লজ্জা; কিন্তু গলা ও বুকের খানিকটা দেখান যেতে পারে। আমাদের দেশে মুখ : দেখান বড়ই লজ্জা; কিন্তু সে ঘোমটা টানার চোটে সাড়ি কোমরে ওঠেন উঠুন, তার ঘোষ নাই। রাজপুতানার ও হিমাচলের অষ্টাঙ্গ ঢেকে তলপেট দেখান!

পাশ্চাত্য দেশের নর্তকী ও বেশারা লোক ভূলাবার জন্ত অনাচ্ছাদিত । এদের নাচের মানে, তালে তালে শবীর অনাবৃত করে দেখান । আমাদের দেশের আছড় গা ভজলোকের মেয়ের ; নর্তকী বেশী সর্কাস ঢাকা । পাশ্চাত্য দেশে মেয়েছেলে সর্কদাই গা-ঢাকা, গা আছড় করলে আকর্ষণ বেশী হয় ; আমাদের দেশে দিন রাত আছড় গা, পোষাক পরে ঢেকে ঢুকে থাকলেই আকর্ষণ অধিক । মালাবাব দেশে মেয়ে মদ কোপীনের উপর বহির্বা সমার, আর বজ্র-মাত্রই নাই । বাঙ্গালিরও তাই, তবে কোপীন নাই এবং পুরুষদের মাফাতে মেয়েরা গাটা মুড়ি মুড়ি দিয়ে ঢাকে ।

পাশ্চাত্য দেশে পুরুষে পুরুষে সর্কাস অক্লেশে উলঙ্গ হয়—আমাদের মেয়েদের মত । বাপে ছেলের সর্কাস উলঙ্গ করে স্নানাদি করে, দোষ নাই । কিন্তু মেয়েদের সামনে, বা রাস্তা ঘাটে, বা নিজের ঘর ছাড়া, সর্কাস ঢাকা চাই ।

এক চীনে ছাড়া সর্কদেহেই এ লজ্জা সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত বিষয় দেখছি—কোনও বিষয়ে বেজায় লজ্জা, আবার তদপেক্ষা অধিক লজ্জাকর বিষয়ে আদতে লজ্জা নাই । চীনে মেয়ে মদে সর্কদা আপাদমস্তক ঢাকা । চীনে কনু-ফুছের চোলা, বুদ্ধের চেলা, বড় নাতি চরস্ত । খারাপ কথা, চাল, চলন—তৎ-জ্ঞান সাজ । কুশান পাদ্রী গিয়ে চীনে ভাষায় বাইবেল ছাপিয়ে ফেললে । এখন বাইবেল পুরাণ হচ্ছেন হিঁহুর পুরাণের চোদ্দ পুরুষ—সে দেবতা-মানুষের অদ্ভুত কলেক্টর পড়ে চীনে ত চটে অস্থির, বল্লে, “এ বই কিছুতেই এদেশে চালান হবে না, এ—ত—অতি অশ্লীল কেতাব” ; তার উপর পাদ্রিনী বুকুখোলা সাক্ষ্য পোষাক পরে, পর্দার বার হয়ে, চীনেদের নিমন্ত্রণে আহ্বান করলেন । চীনে মোটা-বুদ্ধি, বল্লে—“সর্কনাশ ! এই খারাপ বই পড়িয়ে, আর এই মাগীদের আছড় গা দেখিয়ে, আমাদের ছোঁড়া বইয়ে দিতে, এ ধর্ম এসেছে ।” এই হচ্ছে চীনের কুশানের উপর মহাক্রোধ । নতুবা চীনে কোনও ধর্মের উপর আঘাত করে না । শুনছি যে, পাদ্রীরা এখন অশ্লীল অংশ ত্যাগ করে বাইবেল ছাপিয়েছে ; কিন্তু চীনে তাতে আরও সন্দেহান ।

আবার এ পাশ্চাত্য দেশে, দেশ বিশেষে লজ্জা-বেজায় তারতম্য আছে । ইংরেজ, আমেরিকানের লজ্জা সরস একরকম ; ফরাসীর আর একরকম ; জার্মানের আর এক রকম । ক্রম ‘আর’ তিস্তি বড় কাছাকাছি ; তুরুকের আর এক ভৌল ; ইত্যাদি ।

(ক্রমশঃ)

উপনিষদের বিষয় ।

(স্বামী সচ্চিদানন্দ ।)

উপনিষদ্যতে ব্রহ্মলিঙ্গা অনয়া ইতি উপনিষদ্ ;—যাহার দ্বারা ব্রহ্মস্বকীয় ভবজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম উপনিষদ্ । সাধারণতঃ মানুষ যে সমুদয় বিষয় লইয়া নাড়া চাড়া করে, সে সমুদয় বিষয় দুই ভাগে বিভক্ত,—জড়-জগৎ ও চিত্ত-জগৎ । যে সমস্ত বিষয় অল্পভূত করিতে হইলে, চক্ষুঃ, শ্রোত্র ইত্যাদি পঞ্চ স্কেন্দ্রিয়ের, এবং যে সমস্ত বিষয়ের সহিত মানুষের কোনও ব্যবহারিক সম্পর্ক স্থাপিত করিতে হইলে, বাক্, পাণি ইত্যাদি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের, একটীর অথবা ততোধিকের, কার্যকারিতার আবশ্যক, তৎসমুদয়ের সমষ্টি—জড়-জগৎ । পুরাতন হিন্দু পদার্থবিদ্য দার্শনিকগণের ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুত, ব্যোম এই পঞ্চ স্থূল ভূত, ও আধুনিক পাশ্চাত্য পদার্থবিদ্য-গণের লৌহ, অঙ্গার, অক্সিজেন ইত্যাদি বহুতর ভূত সমূহের পরস্পর সংমিশ্রণে, যে জগৎ গঠিত, তাহাই জড়-জগৎ । আর যে জগতের কার্যকলাপ জ্ঞান বা কর্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে সঞ্চালিত সাধারণ ব্যক্তিরকে, কেবলমাত্র অল্পতম অন্তরিক্ষিয় মনের দ্বারা সম্পন্ন, তাহার নাম চিত্ত জগৎ । অবশ্য বলিতে হইবে, দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি এবং কখন, গ্রহণ ইত্যাদি কোন কার্যই তত্ত্বদিক্ষিয়ে মনঃ-সংযোগ ভিন্ন নিস্পন্ন হয় না । আবার মনও কখনও জ্ঞান বা কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা পূর্দগৃহীত বিষয় ছাড়া অভিনব বিষয়ের ধারণা করিতে পারে কি না, সন্দেহ । একাগ্রচিত্ত হইয়া পুস্তকপাঠে অবহিত থাক, পাশে ঘড়ি বাজিয়া যাইল, তুমি শুনিতে পাওলে না ; শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিদ্য-মত্তা সত্ত্বেও, সে ইন্দ্রিয়ে তোমার মনের অসংযোগই ঘড়ির শব্দ শুনিতে না পাইবার কারণ । অনেকে চক্ষুঃ মুদ্রিত না করিয়াই, নিদ্রা যান ; অথচ, সূক্ষ্ম-চেতু অবসন্ন মনের চক্ষুদিক্ষিয়ের সহিত যোগ না থাকায়, বহির্জগতের কোনও বিষয়ই সে নিদ্রাবস্থায় তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হয় না । অপর দিকে, চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া ধ্যান করিবার চেষ্টা কর, নিরবচ্ছিন্ন চিন্তাশ্রোতে ভাসিতে বাও, দেখিবে—কেবল অন্ধকার ; আর দেখিতে পাও যদি কিছু, দেখিবে—যা বাহিরে পূর্বে অস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দেখিয়াছিলে, তাহাই এখন অন্তরিক্ষিয় মনের বিষয়ীভূত হইয়াছে । এই জড়, জড় ও চিত্ত জগতের ঠিক ঠিক পার্থক্যবোধক সংজ্ঞা করা অসম্ভব । এই জড়ই, সাংখ্যকার বলেন, জড়-জগৎ চিত্ত-জগতের পরিণাম মাত্র ; একটী স্থূল, অপরটী সূক্ষ্ম । একটী কার্য্য, অপরটী কারণ ; বরঞ্চ যেকোন জলের পরিণাম, তেমনি স্থূল ভূতাকাশ সূক্ষ্ম চিত্তাকাশের পরিণাম ;

স্বরূপতঃ ঐ উভয়ই এক । এ দুই জগৎ ছাড়া আর কোন জগৎ আছে কি না ? ও যদি থাকে, মানুষের সহিত সে জগতের কি সম্পর্ক,—সে জগৎ মানবীয় মনোব গ্রাহ্য বিষয় কি না ? কিরূপেই বা সে জগৎ মানবমনেব আয়ত্তাধীন হইতে পারে ? আয়ত্তাধীন হইলেই বা আমাদের ফল কি ?—এই সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্বের মীমাংসা উপনিষদের বিষয় ।

অধিকাংশ লোকই জড়-জগৎ লইয়া ব্যাপৃত । ক্ষুৎপিপাসা নিবারণের জন্য বিবিধ আহাৰ্য্য ও পানীয় সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভূতসমষ্টিকে ভাঙিতেছে, গড়িতেছে । পরিদেয় ভূষণাদির বিলাসেচ্ছা পবিত্রপু করিবার জন্য, কামক্ৰোধাদি রিপুকুলের তীব্র তৃষ্ণা শাস্ত করিতে গিয়া, জড় জগৎকে কত ছাটে চাপিয়া নিজের ব্যবহারোপযোগী করিয়া ফেলিতেছে । অথচ, কেহ কেহ মানবমূলভ সত্যাত্ম-সন্ধিৎসা চরিতার্থ করিতে যাউয়া, জড়জগৎের বিভিন্ন অংশের গুণ ও অগোচ্য সাপেক্ষতা, ঐতিহ্য ও গতিব কাল, পদস্পর্শের দ্বারা আকর্ষণ ও বিক্ষেপণ শক্তির খেলা আবিষ্কার করিতেছেন, ইহারাই পদার্থ-বিদ, জ্যোতির্বিদ, রসায়ন-তত্ত্ববিদ, ভূ-তত্ত্ববিদ, প্রভৃতি । যে কোশলে পৃথিবী আম'নের সহজ ও স্নগ উপভোগ্য হইতে পাবে, যে আলোচনার পথ অতঃসবণ করিলে, অগ্নিবাজডের গুণ ও ক্রিয়া-নিবহ স্পষ্টে বুঝিতে পারি, তৎসমুদায় স্তম্ভজলভাবে সমাবেশিত করিয়া গুরু-একটীর পর আর একটী, প্রদান পর পদা তুলনা, জান'পাস্ শিষ্যের সমুপে উপস্থিত করান ; শিষ্য স্বীয় অমুপাবনশক্তির ক্রমোৎকর্ষ বলে একটীর পর অপরটী বুঝিয়া লইয়া, আপনার জিনিষ করিয়া লন,—এই আদান-প্রদানের নাম বিদ্যাচর্চা । বিদ্যাচর্চা কবিত হইলে শিষ্যের দুইটী সহায়ের আবশ্যক,—নিজের স্বতন্ত্র বিচার, ■ যে ক্ষেত্রে তিনি সত্য লাভ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, সেই ক্ষেত্রে তাঁহার পূর্ণ পূর্ণ আচার্য্যগণ কি কি সত্য আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, তৎসকলের বৃত্তান্ত । এই বৃত্তান্তই শিষ্যের গন্তব্য স্থানের পথপ্রদর্শক । সেই সমস্ত বৃত্তান্ত তিনি প্রথমে, 'সত্য বলিয়া মানিয়া লয়েন,' পবে স্বায় স্বাধীন বিচার দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখেন, তৎসমুদয় 'প্রকৃত সত্য কিনা' । যতদিন তিনি নিজের জীবনে ঐ সমস্ত সত্য প্রত্যক্ষ না করিতেছেন, ততদিন সে সমুদয়কে অকবিশ্বাস্যপন্ন হইয়া মানিয়া লইলে, তাঁহাকে কপট বলিতে হইবে । অল্পজ্ঞান ও উদজ্ঞান, এই দুই বাস্প সম্যক্ মিশ্রিত হইলে, জল উৎপন্ন হয়,—এই সত্যটী কোন পূর্বজন রসায়নবিদ প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন । তুমি যদি রসায়ন-বিদ্যা শিখিতে চাও, তা হ'লে তোমাকে প্রথম ঐটী সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে

হইবে; পরে অল্পজ্ঞান ■ উদ্ভূতবাস্প আনিয়া, যেরূপ ভাবে তিনি মিশ্রিত করিতে বলিয়াছেন, সেইরূপ ভাবে উহাদিগকে মিশ্রিত করিয়া দেখিতে হইবে; মিশ্রিত করিবার পর যদি দেখ, জল উৎপন্ন হইল, তখন তুমি বলিতে পার, “তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য”। সত্য বটে, পূজ্যপাদ আচার্য্যাদিগের কথায় অবিশ্বাস স্থাপন করা ধুষ্টতার পরিচায়ক; কিন্তু, নিজের জীবনে সত্য প্রত্যক্ষ করিতে নিশ্চেষ্ট থাকিয়া, কেবল পরের কথায় সায় দিয়ে যাওয়াও অলস ও মূর্খের কার্য্য। পুস্তকেও ত দে সব বৃত্তান্ত লিখিত থাকে; তাহাদিগকে কণ্ঠস্থ করিলেই যদি জ্ঞানার্জন হয়, তবে জড় পুস্তক আর চৈতন্য মাত্রেই প্রভেদ কি? জড়-জগৎ মাতৃদের পংক্তিবোধ্য, জড় জগতের বাপারে মাতৃ মন্দা অভ্যস্ত; তাই এই প্রত্যক্ষাত্মত্বের প্রশ্ন অবলম্বনে জড় জগতের সত্যের দিকে অগ্রসর হইতে শিষ্যের বেশী কষ্ট হয় না। আচাৰ্য্য কাঠ খড় জোগাড় করিয়া, হাতে কলমে শিষ্যের সম্মুখে যা করিবার, দেখাইবাব, তা করেন ও দেখান; শিষ্যও যে সমস্ত বিষয় রাত্রিদিন দেখিতেছে, শুনিতেছে, সেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সমূহেরই বাপার বলিয়া, সে সকল বিনাক্রমে বৃত্তিতে পারে। মানসিক জগতেও ঐ এক নিয়ম,—প্রথমে বিশ্বাস, পরে স্বাধীন বিচার। মনস্তত্ত্ববিদ উদ্দালক আকণি শিষ্য ঋতকেতুকে বলিলেন, “অন্নময়ং হি সৌম্য মনঃ,—অশিত অন্নের অগ্নিঃ অংশের দ্বারা মন গঠিত। ঋতকেতু প্রথমে বিশ্বাস করিলেন, পরে বলিলেন, “ভূর এব মাতৃগবাদিজ্ঞাপয়তু,—আমাকে এ বিষয় বিশদরূপে বুঝাইবা দিন। উদ্দালক ঋতকেতুকে পঞ্চদশাহ উপবাসী থাকিতে বলিলেন। উপবাসের পর প্রত্যগত ঋতকেতু পূর্ণপাঠিত বেদাদি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া দেখিলেন, তৎ সমুদায় কিছুই তাহার মনে প্রতিভাও হইতেছে না। তাঁর পর, আচাৰ্য্য কতক অনুষ্ঠান হইয়া অন্ন-অশনের পর দেখিলেন, সমস্ত প্রশ্নের বিষয় একে একে স্মৃতিপথে ফিরিয়া আসিতেছে; তখন বুঝিলেন, মন ভুক্ত অন্নেরই পরিণাম-বিশেষ। এই প্রত্যক্ষ-জ্ঞানই সমস্ত সত্যের মূল ভিত্তি। জড়-জগৎ ও চিত্ত-জগৎ ছাড়া অন্য জগৎ যদি থাকে, যদি আত্মা, ভগবান বলিয়া কোনও অতীন্দ্রিয় সত্য থাকে, তাহাকে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। উপনিষদ্ বিদ্বৎগণের স্বরে বলিতেছেন, “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ,—আত্মাকে দেখিতে হইবে।

বিদ্বৎসম্মত ঋষি-ঋদয়ে কতকগুলি ইন্দ্রিয়াতীত সত্য প্রাকলভিত হইয়াছিল। ঋষিগণ দেখিয়াছিলেন, জড় ও চিত্ত জগতের পশ্চাতে আর এক অতীন্দ্রিয় জগৎ আছে, যেখানে পবিত্র মনবুদ্ধির গতিবিধি হইতে পারে। এই জগতের

নাম চিং-জগৎ ; ভগবান্, আত্মা, ব্রহ্ম, মুক্তি, ঐ জগৎস্থ সত্যের জ্ঞাপক ভাষা । উপনিষদ্ সেই ঋষিগণের প্রত্যক্ষীকৃত সত্যনিচয়ের বৃত্তান্ত । ধর্ম্ম মানে—সেই সমস্ত ঋষিদৃষ্ট চিং-জগতের সত্যসমূহের প্রত্যক্ষ অনুভূতি । ধর্ম্মরাজ্যে বিচরণেচ্ছ নবীন সাধক যখন সন্দেহের গুরুভাবে পীড়িত হইয়া, ধর্ম্ম কি সত্য, না গুরুতমস্তিক্বে মিত্যা কল্পনামাত্র, ঠিক করিতে না পারিয়া হতাশ হইয়া পড়েন, নাস্তিক যখন স্পর্শ করিয়া ভগবানের অসত্তা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করে, তখন উপনিষদ্ আশ্বাস দিয়া বলেন, “বেদাহমন্তং পুরুষং মহাশ্বমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পবস্তাং,”—আমি সেই অজ্ঞকাষের পার, আদিত্যবর্ণ মহান্ পুরুষকে দেখিয়াছি ; আমাকে বিশ্বাস কর ; আমার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া অগসর হও, তুমিও তাঁহাকে দেখিতে পাইবে । তাই উপনিষদের নাম—আপ্তবাক্য ।

কিন্তু, ধর্ম্মরাজ্যে উপনিষদের কাজ ঐ থানেই শেষ । উপনিষদ্ কেবল বলিয়া দিলেন, “ধর্ম্ম বলিয়া, যথার্থ একটা জিনিষ আছে, ঋষিগণ তাহা দেখিয়াছেন, এই লও তাঁহাদের প্রমাণ-বাক্য ।” দেখিয়াছি, জড় ও চিত্ত জগৎ সম্পর্কীয় বিস্তার চর্চা করিতে হইলে, শিষ্য প্রথমে সে বিস্তারবিধে তাহার পূর্বতন আচার্য্যগণ যে যে সত্য জানিয়া গিয়াছেন, সে সকল মানিয়া লইয়া তৎ-সহায়ে অগ্রসর হইতে থাকেন ; চিং-জগতের সত্য ধর্ম্মের চর্চা সম্বন্ধেও সেই এক নিয়ম । ধর্ম্মজিজ্ঞাসমান শিষ্যকে যাহা প্রথমে মানিয়া লইতে হয়, তাহাই উপনিষদ্ ।

কেবল মানিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না । নিজের জীবনে ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ করিতে হইবে । হাজার উপনিষদ্ হাজার-বার পড়, “নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যোঃ—ন বহুনা শ্রুতেন,”—মহা পণ্ডিত হও, উপনিষদের প্রত্যেক শ্লোক জিহ্বাগ্রে ধাক্ক, যদি তোমার কিছু না কিছু অতীন্দ্রিয় সত্যের সাক্ষাৎ উপলব্ধি না হইয়া থাকে, তুমি ধর্ম্মরাজ্যের অনেক দূরে । নাস্তিকের ক্ষমা আছে । আস্তিক ! তুমি “ভগবান্, ভগবান্,” করিয়া চীৎকার করিতেছ—যদি সেই “প্রেরঃ পুত্রাং, প্রেরোবিতাং, প্রেরোহতশ্রাং সকশ্রাং,” নিখিল বিশ্ব অপেক্ষা প্রিয়তম পুরুষকে জানিবার স্রষ্টা প্রাণ অবধি পণ না কর, তুমি নাস্তিকেরও অধম !

তবে মাক্ আছে ।

“কুম্ভস্ত ধার্য্য নিশিতা হুরত্যম্ভা হুর্গম্পথস্তং,”—সে জগতে কাইবার পথ

শানিত স্মরণের স্মরণ, প্রতিপদে পতনের সম্ভাবনা, প্রতিপদে ক্ষতবিক্ষত হইতে হইবে। যদি যাইতে পারেন, লক্ষ, কোটি যত্নকারী লোকের মধ্যে এক জনও,—তিনি ধর্ম! মাহু-বর অপরাধ কি?

এই ভগবদভূতি, ভাসা ভাসা, অস্পষ্ট, স্বপ্নের ছায়া-দৃশ্যের স্মরণ নহে। মন যখন জড় ও চিত্ত-জগৎ পশ্চাৎ ফেলিয়া, ইন্দ্রিয়গত চিত্ত-জগতে ক্রীড়া করিতে থাকে ও তথাকার সত্য অনুভব করে, সে অনুভব, এই যে স্থল ভূত-জগতের ইন্দ্রিয়গত অনুভব, তদপেক্ষা সহস্র সহস্র গুণ পরিষ্কার ও বন। “বপা আদিশ্চ,”—আর্শিতে যে রূপ নিজের চেহারা অস্পষ্ট দেখা যায়, এ দর্শনও তদ্রূপ নির্মল।

উপনিষদের ভাষা মহাকবিদের পরিচায়ক। যে ঋষি-স্বদেশের সর্বসংশয়, সর্বগ্রন্থি, পরাবরের সাক্ষাৎ দর্শনে ছিন্ন ভিন্ন, ভূমানন্দের মধুর হিলোলে যে হৃদয়-পুণ্ডরীক নিয়ত নিত্যপর, যোগদৃষ্টি সহারে বাহারা সমভূত আত্মার, “সর্বভূতেষু চাত্মনম্” জাজ্ঞ্যমান প্রত্যক্ষ করিতেছেন, সে হৃদয়োখিত অশেষকলাপকারী বাণী ওজঃস্বরূপের ঐশ্বরিক বলে বলীয়ান। বক্তার ভাষার দিকে লক্ষ্য নাই—অথচ উপনিষদের প্রত্যেক অক্ষর প্রাণস্পন্দনে অধার। “রসো বৈ সঃ,”—সে মহাকবির অনন্তরসের প্রস্রবণে উপনিষদ্ স্নাত। অষ্টোদশী উপনিষদের স্নেহময় ক্রোড়ে শয়ান;—মাত্ররূপা উপনিষদ্ ধর্মশিল্পকে কত কথা বলিতেছেন, কত খেলা দেখাইতেছেন, জড়ভূমি হইতে চিত্তভূমিতে, চিত্তভূমি হইতে চিত্ত-ভূমিতে উঠাইলেন,—শিশু অমৃতপীযুষপানে মাতোয়ারা, জননী শান্ত, স্থির, স্তম্ভদানে হান্তমুখী;—সহসা সব ভাসিয়া—? নাম-রূপ পরাৎ-পর ব্রহ্ম-সমুদ্রের অতল গর্ভে চিরকালের জন্ত ডুবিয়া গেল, “ন তত্র সূর্যো ভাতি, ন চন্দ্র তারকং,”—চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা, ত্রিজগৎ ঘূর্ণায়মান, ত্রিজগৎ শত খণ্ডে বিভক্ত, শূন্যে বিলীন;—শিশু ভীত, স্তম্ভিত, মাঘের সে শান্তমূর্তি কোথায়? কোথায় শিশু? কোথায় জননী? সব “নেতি, নেতি”র—কঠোর আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ,—“যত্র নান্তং পশ্চতি, যত্র নান্তং শূণ্যোতি, নান্তং বিজ্ঞানান্তি, স ভূমা, যো বৈ ভূমা তদমৃতম্,” দেখানে একমাত্র আত্মা,—কে কাহাকে দেখিবে? কে কাহাকে শুনিবে? কে কাহাকে জানিবে?—তাহাই অমৃত। এ কবিত্ব আর কোথাও নাই। মানবমনের তব্ব সম্যক জানিয়া, তাহাকে নারান, উঠান, আশে পাশে খেলান, একবার ছেড়ে দেওয়া, আবাস ধরা,—ইহাই কবিত্ব। জগি, বার ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণ সম্মুখে

প্রাহৃত্ত ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ হইয়া, “কিমিদং যক্ষমিতি,”—এ অপূৰ্ণদৃষ্ট ব্যাপার কি! ভাবিয়া আকুল হইতেছেন,—৩২ক্ষণাৎ দৃশ্যের পরিবর্তন—আকাশে বহুশোভনান্য হৈমবতী স্ত্রীকল্পী উমা—বলিলেন, “আমিই সেই ব্রহ্ম”। বালক নচিকেতা পিতৃদেবতাপাণনে মৃত্যুমুখে পতিত,—কি কঠোর অভিনয়! ফিরিয়া দেখি, সে বালক নচিকেতা মৃত্যুমুখাৎ প্রত্যাগত, ব্রহ্ম নন্দর অচুগ্নস্থখে পিতার সম্মুখে দণ্ডারমান !!

মুসলমানদিগের ধর্মগ্রন্থ কোরান, খৃষ্টানদের বাইবেল; তেমনি হিন্দু ধর্মের মূল গ্রন্থ উপনিষদ্। এই উপনিষদ্ অবলম্বন করিয়া বাস হইতে শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব, প্রভৃতি হিন্দুধর্ম প্রচারকগণ স্বায় স্বায় মত স্থাপিত করিয়াছেন। সাংখ্য, পাণ্ডুল, নীতি, তত্ত্ব, পুরাণ প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়ের বীজ উপনিষদের উৎসরা ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত। মূল পাথর-পূজা হইতে ধর্মরাজ্যের চরম আবিষ্কার “অহম্ ব্রহ্মস্মি”—কর্মা, যোগী, ভক্ত, জ্ঞানী, সকল সম্প্রদায়ের প্রমাণস্থানীয় একমাত্র উপনিষদ্। আচার্য্যগণ উপনিষদকে এত সম্মানের চক্ষে দেখিতেন যে, ভগবানে বিশ্বাস থাকুক, না থাকুক, তাহাতে আসে যায না, কিন্তু বাহ্যের উপনিষদে বিশ্বাস নাই, সে নাস্তিক। নিরীশ্বরবাদী সাংখ্যকারের ভাবানুসারে বিশ্বাস না থাকিলেও, তিনি উপনিষদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতেন বলিয়া, নাস্তিক বলিয়া গণ্য হন নাহি।

এখন উপনিষদের রচয়িতা কে? কেহই নহে,—কোন বিশেষ উপনিষদ্ যে কোন বিশেষ ঋষিকর্তৃক রচিত, একপ কোন নিদর্শনই পাওয়া যায় না। উপনিষদ্ স্বয়ং বলিতেছেন,—“ইতি শুক্রম ধারাবাৎ যে নশ্বরিচচক্ষিরে,” আমরা পূর্ব পূর্ব আচার্য্যগণের নিকট হইতে এই জ্ঞান এই রূপ শুনিয়াছি।

আব, অত্র ধর্মগ্রন্থের দ্বারা উপনিষদের ঐতিহাসিক ভিত্তি না থাকাহ হিন্দুধর্মের গোঁড়ের বিষয়। বাইবেল খৃষ্টের কথা; আজ যদি প্রমাণ হয়, খৃষ্ট বলিয়া কোনও ব্যক্তি বিশেষ কখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই, ছিলেন না, তাহা হইলে তাঁহার উক্তি বাইবেল, খৃষ্টধর্মের মূল অবলম্বন, সঙ্গে সঙ্গে ভূমিসাৎ হইবে। যদি ভবিষ্যৎ কালের গতিতে মহাম্মদের মানবগোষ্ঠীর অস্তিত্ব সম্বন্ধের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়, মুসলমান-ধর্ম-স্বত্ত্ববও, সঙ্গে সঙ্গে ভাঙ্গিবার কথা। কিন্তু হিন্দুধর্মের সে ভয় নাই। হিন্দুধর্ম কোনও ব্যক্তি বিশেষের উপর নির্ভর করে না। ঋষিরা হিন্দুধর্ম-প্রবর্তক নহেন; উপনিষদ্রুত সনাতন জ্ঞানের উপরই হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠিত; তবে ঋষিরা সেই জ্ঞান

প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, এই মাত্র । শত বাজবল্য, জনক, সনৎকুমার, নারদ, গার্গী ছিলেন, বা না ছিলেন, তাতে হিন্দুধর্মের ক্ষতি বৃদ্ধি নাই । ইংরাজরা উপনিষদেব ব্রহ্মজ্ঞান দর্শন করিয়াছিলেন, সে জন্য হিন্দু তাঁহাদিগকে পূজা করিতে প্রস্তুত ; হিন্দু বিশেষ বিশেষ আচার্য্যকে অবতার বলিয়া পূজা করেন, কারণ তাঁহাদের আশ্রয় অত্র কেহ উপনিষদের বিশদ ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হন নাই । কিন্তু যে কোন মহাচার্য্য হউন না, যদি তিনি উপনিষদের যথোচিত সম্মান করিতে দ্বিধাক্রি কবেন, তিনি হিন্দুর পূজ্যস্থানীয় নহেন । (ক্রমশঃ)

সমালোচনা ।

“প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী” ।

সকল দেশেই প্রাচীন দ্রব্যের আদর চিরকালই হইয়া থাকে । উপস্থিত-কতি বিক্রয় হইলেও, প্রাচীন দ্রব্য সর্বদাই প্রশংসনীয় ; ভগ্নাংশনাশও অতি যত্ন ও ভক্তি সহকারে সকলে রক্ষা করিয়া থাকেন । ভাবার সহক্রেও এইরূপ ; সকলদেশে সকলকালে সর্বত্র লোকেই প্রাচীন ভাবের সমাদর করিয়া থাকেন । কিন্তু, আমাদের দেশে অদৃষ্টক্রমে সবই বিপরীত । ভাষা অর্থ-করী এবং রাজভাষা বিজাতীয় হওয়ার দরুনই আমাদের দেশে প্রাচীন ভাষার উপর সকলকার আর আদর নাই । ইংরাজী শিখিতে পারিলেই পয়সা আসিবে—অন্নপ্রাশন হইতে ইংরাজীই শিখিতেছি । ইংরাজ কর্তৃপক্ষের মনে যদি কখন দয়া হইল (অথবা যদি কখন তাঁহাদিগের সুবিধা হইল) ত, সভ্যতার পোষাক পরিয়া, কেহ তাঁহাদিগের কর্তৃক প্রেরিত হইয়া, দু দশ দিন একবার প্রাচীন দ্রব্যাদির জন্ত দু-এক দিক্ ঘুরিয়া আসিলেন মাত্র । গাঁহাদের জাতীয় জিনিষ, গাঁহাদের নিজের দেশের জিনিষ—নিজের পৈত্রিক জিনিষ, তাঁহাদের যে, সে বিষয়ে চাড়া খোঁজ-খবর লওয়া একটা আবশ্যিকতা মনে করা—তা কিছুই নাই বলিলেই হয় ; যাঁহী দু-চারজন বুড়ো-বুড়ী বৈকাল বেলা পবিত্র-ধর্ম্মভাবে পাঠ গান কণ্ঠকতা বা কীর্ত্তন প্রভৃতি আকারে যৎকিঞ্চিৎ শুনিতেই মাত্র । ইংরাজি সভ্যতার অমদ্যবহারে, তাও আজকাল লোপ পাইয়া আসিতেছে । একেবারেই সমস্ত লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছিল, ভাগ্যিশ ! আজ সাহিত্য-পরিষদের সৃষ্টি হইয়াছিল—তাই রক্ষা । বোধ হয়, বঙ্গের যাবতীয় শিক্ষিত নর নারী শুনিয়া থাকিবেন, এবং শুনিয়া পরমানন্দিত হইয়া থাকিবেন যে, কলিকাতার “সাহিত্য-পরিষৎ” নামক সভা, বঙ্গীয় সাহিত্যের “অজ্ঞ গণিতঃ

পলিতমুণ্ড দণ্ডবিহীনঃ জাভং তুণ্ডং” এমন যে বুদ্ধপিতামহা, তাঁহাদিগের
সে। কতদূর কৃতসঙ্কল হইয়াছেন, বঙ্গীয় প্রাচীন সাহিত্য উদ্ধারের জন্য
কতদূর তাঁহারা যত্ন করিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহারা “বাক্সালা প্রাচীন গ্রন্থাবলী”
নামে বঙ্গের অমূল্য ভাষা-কার্ত্তি সকল আবিষ্কার কবিয়া বঙ্গের সকলবেই
কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিতেছেন। ইহার এক খণ্ড বাহির হইয়াছে। তাহার
সূচী,—(১) বিদ্যাপতির পদাবলী; সম্ভবতঃ বিদ্যাপতির সময়কার; ইহা
নেপাল-রাজ হইতে বহয় হইয়া আসিত। (২) ছুটি খাঁর মহাভারত :—মুসলমান-
রাজগণ যে কেন্দ্র পীড়ন করিতেন তাহা নহে; তাঁহাদিগের মধ্যে কোন কোন
মহাশয়ের কতদূর হিন্দু প্রতি শ্রদ্ধা ছিল, তাহা ইহার ভূমিকা পাঠে কিঞ্চিৎ
অবগত হইতে পারিবেন; বঙ্গের স্বাধীন আলা-উদ্দীন-হুসেন-সাহের সময়ে এই
মহাভারত রচিত—অ.জ. ৭০০ বঙ্গাব্দের কথা; (৩) বনমালিন্দাসের জয়দেবচরিত
—৩৫০ বঙ্গাব্দের পুরাতন পুঁথি। (৪) বাসুদেব ঘোষের পদাবলী—৪০০
বঙ্গাব্দের। এ চাবধানি গ্রন্থ ইতিপূর্বে আর কখনও মুদ্রিত হয় নাই।

“প্রাচীন বাক্সালা গ্রন্থাবলী” বাৎসবিক দুইটাকা মাত্র সাহায্য; দুই মাস
অন্তর একখানি করিয়া বাহির হয়। আশা করি, বঙ্গের প্রত্যেক
সাহিত্যমুগ্ধ সাধুগণ ইহাদিগকে সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। এ
মহৎকর্মো সকলেই যথাসাধ্য আন্তরিক সাহায্য করা একান্ত কর্তব্য।

সহস্রমুদ্রণের নিকট আর অধিক কি লিখিব। “প্রাচীন গ্রন্থাবলী” (বিশেষ
অবশ্যের) সর্বতোভাবে প্রশংসনীয়, সুন্দর ও শ্রেয়ঃ; ইহা সদস্যসমালোচনার
পারের দ্রব্য; পুস্তক-পৃষ্ঠে “ফর রিভিউ” (For Review) লেখা থাকিলেও,
সেইজন্য ইহার বিশেষ সমালোচনা হইতে বিরত রহিলাম।

ইহাদিগের উপস্থিত ঠিকানা—১৩৭।১ কর্ণওয়ালিসস্ট্রীট, কলিকাতা।

নিমন্ত্রণ-পত্র ।

উদ্বোধন-গ্রাহক মহাশয়েষু—

সবিনয় নিবেদন,—১২ইফাল্গুন, রবিবার, গঙ্গাভীরব বেলুড়-মঠ ঠাকুরগাটিতে
ভগবান শ্রীমৎ রামকৃষ্ণদেবের অষ্টষষ্টিতম জন্মোৎসব হইবে। গ্রাহক মহাশয়গণ,
আপনারা সবাকবে যোগদান করিয়া আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন। ইতি—মঠাধ্যক্ষ।

কলিকাতা আহিরীটোলার ঘাট হইতে, গোরমিলার কোম্পানীর বড় বড় জাহাজ, সমস্ত
দিন এক ঘণ্টা অন্তর এক ঘণ্টা বাক্সালাপকে লইয়া যাত্রায়াত করিবে।

বুদ্ধিরও পশ্চাতে আসিয়া । প্রথম যেন আমরা পাইলাম, আসিয়া শরীর হইতে পৃথক্, মন হইতেও পৃথক্ । এই স্থান হইতেই ধর্ম্মজগতের মতভেদ দেখা যায় । দ্বৈতবাদী বলেন, আসিয়া সংগ অর্থাৎ ভোগ, সুখ, দুঃখ সবই স্বার্থার্থঃ আসিয়ার ধর্ম্ম ; অদ্বৈতবাদী বলেন, উহা নিগূণ ।

আমরা প্রথমে দ্বৈতবাদীদের মত,---আসিয়া ■ উহার গতি সম্বন্ধে তাঁহাদের মত বর্ণন করিয়া, তার পর যে মত উহা সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন কবে, তাহা বর্ণন করিব । অবশেষে অদ্বৈতবাদীদের দ্বারা উভয় মতের সামঞ্জস্য সাধন করিতে চেষ্টা করিব । এই মানবাসিয়া শরীর-মন হইতে পৃথক্ বলিয়া এবং আকাশপ্রাণে গঠিত নয় বলিয়া অমর । কেন ? মরত্মের বা বিনশ্বরত্মের অর্থ কি ? বাহা বিলিষ্ট হইয়া যায়, তাহাই বিনশ্বর । আর যে দ্রব্য কতকগুলি পদার্থের সংযোগ-লব্ধ, তাহাই বিলিষ্ট হইবে । কেবল যে পদার্থ অপর পদার্থের সংযোগোৎপন্ন নয়, তাহা কখন বিলিষ্ট হয় না, সূত্রাৎ তাহার বিনাশ কখন হইতে পারে না । তাহা অশিনাশী । তাহা অনন্ত কাল ধরিয়া রহিয়াছে, তাহার কখন সৃষ্টি হয় নাই । সৃষ্টি কেবল সংযোগমাত্র ; শূন্য হইতে সৃষ্টি কেহ কখন দেখে নাই । সৃষ্টি সম্বন্ধে আমরা কেবল এই মাত্র জানি যে, উহা পূর্ক হইতে অবস্থিত কতক গুলি বস্তুর নূতন নূতন রূপে একত্র মিলন মাত্র । তাহা যদি হইল, তবে এই মানবাসিয়া ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর সংযোগোৎপন্ন নয় বলিয়া অবশ্য অনন্ত কাল ধরিয়া ছিল এবং অনন্ত কাল ধরিয়া থাকিবে । এই শরীর পাত হইলেও আসিয়া থাকিবে । বেদান্তবাদীদের মতে যখন এই শরীর পতন হয়, তখন তাঁহার ইঞ্জিরগণ মনে লয় হয়, মন প্রাণে লয় হয়, প্রাণ আত্মায় প্রবেশ করে, আর তখন সেই মানবাসিয়া যেন সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গ শরীররূপে বন পরিধান করিয়া যান । এই সূক্ষ্ম শরীরেই মানুষের সমুদয় সংস্কার বাস করে । সংস্কার কি ? মন যেন ব্রহ্মের তুল্য, আর আমাদের প্রত্যেক চিন্তা যেন সেই ব্রহ্মে তরঙ্গতুল্য । যেমন ব্রহ্মে তরঙ্গ উঠে, আবার পড়ে, পাড়িয়া অন্তর্হিত হইয়া যায়, সেইরূপ মনে এই চিন্তাতরঙ্গগুলি ক্রমাগত উঠিতেছে, আবার অন্তর্হিত হইতেছে । কিন্তু উহার একবারে অন্তর্হিত হয় না । উহার ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর হইয়া যায়, কিন্তু বর্তমান থাকে, আবশ্যক হইলে আবার উপর হয় । যে চিন্তাগুলি সূক্ষ্মতর রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহারই কতকগুলিকে আবার তরঙ্গাকারে আনয়ন করাকেই সৃষ্টি বলে । এইরূপে আমরা বাহা কিছু চিন্তা করিয়াছি, যে কোন কাৰ্য্য আমরা করিয়াছি, সবই মনের মধ্যে

অবস্থিত আছে। সবগুলিই স্বল্পভাবে অবস্থিতি করে এবং মানুষ মরিলেও এই সংস্কারগুলি তাহার মনে বর্তমান থাকে—উহারা আবার স্বল্প শরীরের উপর কার্য্য করিয়া থাকে। আত্মা, এই সকল সংস্কার এবং স্বল্প শরীর রূপ বসন পরিধান করিয়া চলিয়া যান, ও এই বিভিন্নসংস্কাররূপ বিভিন্ন শক্তির সমবেত ফলই আত্মার গতি নিয়মিত করে। তাঁহাদের মতে আত্মার ত্রিবিধ গতি হইয়া থাকে।

যাহারা অত্যন্ত ধার্মিক, তাঁহাদের মৃত্যু হইলে তাঁহারা সূর্য্যারশ্মির অনুসরণ করেন; সূর্য্যারশ্মি অনুসরণ করিয়া তাঁহারা সূর্যালোকে উপনীত হন; তথা হইতে চন্দ্রলোক এবং চন্দ্রলোক হইতে বিদ্যালোকে উপস্থিত হন; তথায় তাঁহাদের সহিত আর একজন মৃত্যুয়ার থাকে হয়; তিনি ঐ জীবাত্মাগণকে সর্ব্বলোক ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। এইস্থানে তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বশক্তিমত্তা লাভ করেন; তাঁহাদের শক্তি ও জ্ঞান প্রায় ঈশ্বরের তুল্য হয়; আর দ্বৈতবাদীদের মতে তাঁহারা তথায় অনন্তকাল বাস করেন, অথবা, অবৈতবাদীদের মতে কল্পাবসানে ব্রহ্মের সহিত একত্ব লাভ করেন। যাহারা সক্রিয়ভাবে সংকার্য্য করে, তাহারা মৃত্যুর পর চন্দ্রলোকে গমন করে। এখানে নানাবিধ স্বর্গ আছে। তাহারা এখানে স্বল্প শরীর—দেবশরীর লাভ করে। তাহারা দেবতা হইয়া তথায় বাস করে ও দীর্ঘকাল ধর্ম্মীয় স্বর্গভূমি উপভোগ করে। এই ভোগের অবসানে আবার তাহাদের প্রাচীন কর্ম্ম বলবান হয়, সুতরাং পুনরায় তাহাদের মন্ত্রলোকে পতন হয়। তাহারা বায়ুলোক, মেঘলোক, প্রভৃতি লোকের ভিতর দিয়া আসিয়া অবশেষে বৃষ্টি-ধারার সহিত পৃথিবীতে পতিত হয়। বৃষ্টির সহিত পতিত হইয়া তাহারা কোন শস্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। তৎপরে সেই শস্য কোন ব্যক্তি ভোজন করিলে, তাহার ঔরসে সেই জীবাত্মা পুনরায় কলধর পরিগ্রহ করে। যাহারা অতিশয় দুর্কৃত, তাহাদের মৃত্যু হইলে তাহারা ভূত বা দানব হয় এবং চন্দ্রলোক ও পৃথিবীর মাঝামাঝি কোন স্থানে বাস করে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মনুষ্যাগণের উপর নানাবিধ অত্যাচার করিয়া থাকে, কেহ কেহ আবার মানুষের প্রতি নিরুভাবাপন্ন। তাহারা কিছুকাল ঐ স্থানে থাকিয়া পুনরায় পৃথিবীতে আসিয়া পশুজন্ম গ্রহণ করে। কিছুদিন পশুদেহে নিবাস করিয়া তাহারা আবার মানুষ হয়, আর একবার মুক্তিলাভ করিবার উপযোগী অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তাহা হইলে আমরা দেখিলাম,

যাহারা মুক্তির নিকটতম সোপানে পৌঁছিয়াছেন, যাহাদের ভিতরে খুব অল্পপরিমাণে অপবিত্রতা অবশিষ্ট আছে, তাহারাষ্ট স্বর্গাক্রমণ ধরিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন। যাহারা মাঝারি রকমের লোক, যাহারা স্বর্গে যাইবার কামনা রাখিয়া কিছু সংস্কার করেন, চন্দ্রলোকে গমন করিয়া সেই সকল ব্যক্তি সেই স্থানস্থ স্বর্গে বাস করেন, ওখায় তাহারা দেবদেহ প্রাপ্ত হন, কিন্তু তাহাদিগকে মুক্তিতে পরিবার জন্ত আবার মনুষ্যদেহ ধারণ করিতে হইবে। আর যাহারা অত্যন্ত অসৎ, তাহারা ভূত দানব প্রভৃতি রূপে পরিণত হয়, তার পর তাহারা পশু হয়; তৎপরে মুক্তিতে পরিবার জন্ত তাহাদিগকে আবার মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিতে হয়। এই পৃথিবীকে কর্মভূমি বলে। ভাল মন্দ কর্ম সবই এখানে করিতে হয়। মানুষ স্বর্গকাম হইয়া সংস্কার্য করিলে তিনি স্বর্গে গিয়া দেবতা হন; এই অবস্থায় আর তিনি কোন নূতন কর্ম করেন না, কেবল পৃথিবীতে তাঁহাকর্তৃক কৃত সংস্কারের ফলভোগ করেন। আর এই সংস্কার যাই শেষ হইয়া যায়, অমনি তিনি জীবনে যে সকল অসৎ কর্ম করিয়াছিলেন, তাহার সমবেত ফল তাহার উপর বেগে আইসে, তাহাতে তাঁহাকে পুনর্বার এই পৃথিবীতে টানিয়া আনে। এইরূপে, যাহারা ভূত হয়, তাহারা সেই অবস্থায় কোনরূপ নূতন কর্ম না করিয়াই কেবল ভূতকর্মের ফলভোগ করে, তার পর পশুজন্মগ্রহণ করিয়া তথায়ও কোন নূতন কর্ম কবে না, তার পর তাহারা আবার মানুষ হয়।

মনে কর, কোন ব্যক্তি সারা জীবন অনেক মন্দ কায করিল, কিন্তু একটা খুব ভাল কায করিল, তাহা হইলে সেই সংস্কারের ফল তৎক্ষণাৎ প্রকাশ পাইবে, আর ঐ কার্যের ফল শেষ হইয়া যাইবামাত্রই, অসংস্কার্য গুলিও তাহাদের ফল প্রদান করিবে। যে সব লোক কতকগুলি ভাল ভাল বড় বড় কায করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের সারা জীবনের গতিটা ভাল নহে, তাহারা দেবতা হইবে। দেবদেহসম্পন্ন হইয়া দেবতাদের শক্তি কিছু কাল সন্তোষ করিয়া আবার তাহাদিগকে মানুষ হইতে হইবে। যখন সংস্কারের শক্তি ক্ষয় হইয়া যাইবে, তখন আবার সেই পুরাতন অসংস্কার্য গুলির ফল হইতে থাকিবে। যাহারা অতিশয় অসংস্কার্য কবে, তাহাদিগকে ভূতযোনি দানবযোনি গ্রহণ করিতে হইবে, আর যখন ঐ অসংস্কার্যগুলির ফল শেষ হইয়া যায়, তখন যে সংস্কারটুকু অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে তাহাদিগকে আবার মানুষ করিবে। যে পথে ব্রহ্মলোকে যাওয়া যায়, যথা হইতে ১লা মাঘ, ১৩০৭।]

পতন বা প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা নাই, তাহাকে দেবদান বলে, আর চন্দ্রগোবিন্দ পথকে পিতৃদান বলে ।

অতএব বেদান্তদর্শনের মতে মানুষই জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী, আর এই পৃথিবীই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান, কারণ, এইখানেই মুক্ত হইবার একমাত্র সম্ভাবনা। দেবতা প্রভৃতিকেও মুক্ত হইতে হইলে মানবজন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। এই মানবজন্মেই মুক্তির সৰ্বাপেক্ষা অধিক সুবিধা।

এক্ষণে এই মতের বিরোধী মতের আলোচনা করা যাউক। বৌদ্ধগণ এই আত্মার অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করে। বৌদ্ধগণ বলেন, এই শরীর-মনের পশ্চাতে আত্মা বলিয়া একটি পদার্থ আছে মানিবার আবশ্যকতা কি? ইহা মানিবার আবশ্যকতা কি? এই শরীর ও মনোরূপ যন্ত্র কি স্বতঃসিদ্ধ বলিলেই যথেষ্ট ব্যাখ্যা হইল না? আবার আর একটি তৃতীয় পদার্থ কল্পনার প্রয়োজন কি? এই যুক্তিগুলি খুব প্রবল। যতদূর পর্যন্ত অনুসন্ধান চলে, ততদূর বোধ হয়, এই শরীর ও মনোরূপ স্বতঃসিদ্ধ; অন্ততঃ আমরা অনেকে এই ভক্তৃষ্টি এই ভাবেই দেখিয়া থাকি। তবে শরীরও মনোতিরিক্ত, অথচ শরীরমনের আশ্রয়ভূমিরূপ আত্মা-নামক একটি পদার্থের অস্তিত্ব কল্পনার আবশ্যক কি? শুধু শরীর, মন, বলিলেই ত যথেষ্ট হয়। নিয়তপরিণামশীল জড়স্রোতের নাম শরীর, আর নিয়তপরিণামশীল চিন্তা-স্রোতের নাম মন। তবে এই যে একত্বের প্রতীতি হইতেছে, তাহা কিসে হয়? বৌদ্ধ বলেন, এই একত্ব বাস্তবিক নাই। একটি অলস্ত মশাল লইয়া ঘুরাইতে থাক। ঘুরাইলে একটি অগ্নির বৃত্তস্বরূপ হইবে। বাস্তবিক কোন বৃত্ত হয় নাই, কিন্তু মশালের নিয়ত ঘূর্ণনে উহা ঐ বৃত্তের আকার ধারণ করিয়াছে। এইরূপ আমাদের জীবনেও একত্ব নাই। জড়ের রাশি ক্রমাগত চলিয়াছে, সমুদ্র জড়রাশিকে এক বলিতে ইচ্ছা কর বল, কিন্তু তদতিরিক্ত বাস্তবিক কোন একত্ব নাই। মনের সম্বন্ধেও তদ্রূপ; প্রত্যেক চিন্তা অপরা চিন্তা হইতে পৃথক্। এই প্রবল চিন্তাস্রোতেই এই ভ্রাম্যমাণ একত্বের ভাব রাখিয়া বাইতেছে; সুতরাং তৃতীয় পদার্থের আর আবশ্যকতা কি? এই বাহা কিছু দেখা বাইতেছে, এই জড়স্রোত ও এই চিন্তাস্রোত—কেবল ইহাদেরই অস্তিত্ব আছে; ইহাদের পশ্চাতে আর কিছু ভাবিবার আবশ্যকতা কি? আধুনিক অনেক সম্প্রদায় বৌদ্ধদের এই মত গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা সকলেই এই মতকে তাঁহাদের নিজ আবিষ্কার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে

ইচ্ছা করেন। অধিকাংশ বৌদ্ধদর্শনেরই মোট কথাটা এই যে, এই পরিদৃশ্যমান জগৎই পর্যাপ্ত; ইহার পশ্চাতে আর কিছু আছে কিনা, তাহা অনুসন্ধান করিবার কিছুমাত্র আবশ্যিকতা নাই। এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতই সর্বত্র; কোন বস্তুকে এই জগতের আশ্রয়রূপে কল্পনা করিবার আবশ্যিক কি? সমুদয়ই গুণসমষ্টি। এমন অমুমানিক পদার্থ কল্পনা করিবার কি আবশ্যিকতা আছে, যাহাতে সেগুলি লাগিয়া থাকিবে? পদার্থের জ্ঞান আইসে, কেবল গুণরাশির বেগে স্থানপরিবর্তনবশতঃ, কোন অপরিণামী পদার্থ বাস্তবিক উহাদের পশ্চাতে আছে বলিয়া নয়। আমরা দেখিলাম, এই যুক্তিগুলি অতি প্রবল, আর উহা সাধারণ মানবের অনুভূতির সপক্ষে খুব সাক্ষ্য দিয়া থাকে; বাস্তবিকও লক্ষ্য একজনও এই দৃশ্য জগতের অতীত কিছুই ধারণা করিতে পারে কি না সন্দেহ। অধিকাংশ লোকের পক্ষে প্রকৃতি নিত্যপরিণাম-শীল মাত্র। আমাদের মধ্যে খুব অল্প লোকই আমাদের পশ্চাদেশস্থ সেই ঐ সমুদ্রের অত্যন্ত আভাসও পাইয়াছেন। আমাদের পক্ষে এই জগৎ কেবল তরঙ্গপূর্ণমাত্র। তাহা হইলে আমরা দুইটি মত পাইলাম। একটা এই,— এই শরীর মনের পশ্চাতে এক অপরিণামী সত্তা রহিয়াছে; আর একটা মত এটি,— এই জগতে নিশ্চলত্ব বলিয়া কিছুই নাই, সবই চঞ্চল, সবই কেবল পরিণাম, অবৈতবাদেই এই দুই মতের সামঞ্জস্য পাওয়া যায়।

অবৈতবাদী বলেন, জগতের একটা অপরিণামী আশ্রয় আছে, দৈত-বাদীর এই বাক্য সত্য; অপরিণামী কোন পদার্থ কল্পনা না করিলে আমরা পরিণামই কল্পনা করিতে পারি না। কোন অপেক্ষাকৃত অল্প-পরিণামী পদার্থের তুলনার কোন পদার্থকে পরিণামিক্রমে চিন্তা করা যাইতে পারে, আবার তাহা অপেক্ষাও অল্পপরিণামী পদার্থের সহিত তুলনার উহাকেও আবার পরিণামিক্রমে নির্দেশ করা যাইতে পারে, যৎক্ষণ না একটা সম্পূর্ণ অপরিণামী পদার্থ বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হয়। এই জগৎপ্রপঞ্চ অসংশয় এমন এক অবস্থার ছিল, যখন উহা স্থিৎশান্ত ছিল, যখন উহা শক্তিব্যয়ের সামঞ্জস্যস্বরূপ ছিল, অর্থাৎ কোন শক্তিরই অস্তিত্ব ছিল না, কারণ বৈষম্য না হইলে শক্তির বিকাশ হয় না। এই ব্রহ্মাণ্ড আবার সেই সাম্যাবস্থা প্রাপ্তির জন্ত চলিয়াছে। যদি আমাদের কোন বিষয় সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান থাকে, তাহা এই। দ্বৈতবাদীরা যখন বলেন, কোন অপরিণামী পদার্থ আছে, তখন তাঁহারা ঠিকই বলেন, কিন্তু উহা যে শরীরমনের সম্পূর্ণ অতীত, শরীরমন ওলা মাঘ, ১৩০৭।]

হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, এ কথা ভুল। বৌদ্ধেরা যে বলেন, সমুদ্র জগৎ কেবল পরিণামপ্রবাহমাত্র, এ কথাও সত্য, কারণ যতদিন আমি জগৎ হইতে পৃথক্, যতদিন আমি আমার অতিরিক্ত আর কিছুকে দেখি, মোট কথা, যতদিন দৈত্য ভাব থাকে, ততদিন এই জগৎ পরিণামশীল বলিয়াই প্রতীত হইবে। কিন্তু প্রকৃত কথা এই, জগৎ পরিণামীও বটে, অপরিণামীও বটে। আত্মা, মন ও শরীর, তিনটি পৃথক্ বস্তু নহে, উহার একই। একই বস্তু কখন দেহ, কখন মন, কখন বা দেহমনের অতীত আত্মা বলিয়া প্রতীত হয়। যিনি শরীরের দিকে দেখেন, তিনি মন পশ্যন্ত দেখিতে পান না; যিনি মন দেখেন, তিনি আত্মা দেখিতে পান না; আর যিনি আত্মা দেখেন, তাঁহার পক্ষে শরীর মন উভয়ই কোথা চলিয়া যায়! যিনি কেবল গতি দেখেন, তিনি সম্পূর্ণ স্থিরভাব দেখিতে পান না, আর যিনি সেই সম্পূর্ণ স্থিরভাব দেখেন, তাঁহার পক্ষে গতি কোথায় চলিয়া যায়! সর্পে রজ্জুভ্রম হইল। যে ব্যক্তি রজ্জুকে সর্প দেখিতেছে, তাহার পক্ষে রজ্জু কোথায় চলিয়া যায়, আর যখন দ্রাষ্টা দূর হইয়া সে ব্যক্তি রজ্জুই দেখিতে থাকে, তাহার পক্ষে সর্পও কোথা চলিয়া যায়!

তাহা হইলে দেখা গেল, একটীমাত্র বস্তুই আছে, তাহাই নানাক্রম বলিয়াই প্রতীত হইতেছে। ইহাকে আত্মাই বল, আর বস্তুই বল, বা আর কিছুই বল, জগতে কেবল একমাত্র উহারই অস্তিত্ব আছে। অবিভবদের ভাবায় বলিতে গেলে এই আত্মাই ব্রহ্ম, কেবল নামরূপ-উপাধিবিশতঃ বহু প্রতীত হইতেছে। সমুদ্রের তরঙ্গগুলির দিকে দৃষ্টিপাত কর; একটী তরঙ্গও সমুদ্র হইতে পৃথক্ নহে। তবে তরঙ্গকে পৃথক্ দেখাইতেছে কেন? নামরূপ—তরঙ্গের আকৃতি,—আর আমরা উহাকে ‘তরঙ্গ’ এই যে নাম প্রদান করিয়াছি, তাহাতেই উহাকে সমুদ্র হইতে পৃথক্ করিয়াছে। নামরূপ চলিয়া গেলেই, উহা যে সমুদ্র ছিল, সেই সমুদ্রই রহিয়া যায়। তরঙ্গ ও সমুদ্র মন্যে কে প্রভেদ করিতে পারে? অতএব এই সমুদ্র জগৎ একস্বরূপ হইল। নামরূপই যত পার্থক্য রচনা করিয়াছে। যেমন সূর্য্য লক্ষ লক্ষ জলকণার উপরে প্রতিবিম্বিত হইয়া প্রত্যেক জলকণার উপরেই সূর্য্যের একটী পূর্ণ প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করে, তরঙ্গ সেই এক আত্মা, সেই এক সত্তা ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে প্রতিবিম্বিত হইয়া নানাক্রমে উপলব্ধ হইতেছেন। কিন্তু ব্যাপ্তবিক উহা এক। ব্যাপ্তবিক ‘আমি’ বা ‘তুমি’ বলিয়া কিছুই নাই—সবই এক। হয় বল সবই আমি, না হয় বল সবই তুমি। এই দ্বৈতজ্ঞান সম্পূর্ণ মিথ্যা, আর সমুদ্র জগৎ এই দ্বৈতজ্ঞানের ২২ উদ্বোধন। [৩য়—ম সংখ্যা ;

ফল । যখন বিবেকের উদয়ে মানুষ দেখিতে পার, দুইটা বস্তু নাই, একটা বস্তু আছে, তখন তাঁহার উপলব্ধি হয়, তিনিই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-স্বরূপ হইয়াছেন । আনিই এই পরিবর্তনশীল জগৎ, আমিই আবার অপরিণামী, নিশ্চল, নিত্যপূর্ণ, নিত্যানন্দময় ।

অতএব নিত্যশুদ্ধ, নিত্যপূর্ণ, অপরিণামী, অপরিবর্তনীয় এক আত্মা আছেন; তাঁহার কখন পরিণাম হয় নাই, আর এই সকল বিভিন্ন পরিণাম সেই একমাত্র আত্মাতেই প্রতীত হইতেছে মাত্র । উহার উপরে নামরূপ এই সকল বিভিন্ন স্বপ্নচিত্র অঙ্কিত করিয়াছে । আকৃতিই তরঙ্গকে সমুদ্র হইতে পৃথক্ করিয়াছে । মনে কর, তরঙ্গটা মিলাইয়া গেল, তখন কি ঐ আকৃতি থাকিবে? না, উহা একেবারে চলিয়া যাইবে । তরঙ্গের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে সাগরের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে, কিন্তু সাগরের অস্তিত্ব তরঙ্গের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে না । যতক্ষণ তরঙ্গ থাকে, ততক্ষণ রূপ থাকে, কিন্তু তরঙ্গ নিবৃত্ত হইলে ঐ রূপ আর থাকিতে পারে না । এই নামরূপকেই মায়া বলে । এই মায়াই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি স্বজন করিয়া এক জনকে আর একজন হইতে পৃথক্ বোধ করাইতেছে । কিন্তু ইহার অস্তিত্ব নাই । মায়ার অস্তিত্ব আছে, বলা যাইতে পারে না । রূপের অস্তিত্ব আছে, বলা যাইতে পারে না, কারণ উহা অপরের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে । আবার উহা নাই, তাহাও বলা যাইতে পারে না, কারণ উহাই এই সকল ভেদ করিয়াছে । অদ্বৈতবাদীর মতে এই মায়া বা অজ্ঞান বা নামরূপ, অথবা ইয়ুরোপীয়গণের মতে দেশকালনিমিত্ত, এই এক অনন্ত সত্তা হইতে এই বিভিন্নরূপ জগৎসত্তা দেখাইতেছে ; পরমার্থতঃ এই জগৎ এক অখণ্ডস্বরূপ । যতদিন পর্যন্ত কেহ দুইটা বস্তুর কল্পনা করেন, তিনি ভ্রান্ত । য ন তিনি জানিতে পারেন, একমাত্র সত্তা আছে, তখনই তিনি যথার্থ জানিয়াছেন । যতই দিন যাইতেছে, ততই আমাদের নিকট এই সত্তা প্রমাণিত হইতেছে । কি জড়জগতে, কি মনোজগতে, কি অধ্যাত্ম জগতে, সর্বদাই এই সত্তা প্রমাণিত হইতেছে । এখন প্রমাণিত হইয়াছে যে, তুমি, আমি, স্বর্ঘা, চন্দ্র, তারা, এ সবই এক জড়সমুদ্রের বিভিন্ন অংশের নামমাত্র । এই জড়রাশি ক্রমাগত পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে । যে শক্তিকণা বরষেক মাস পূর্বে সূর্যো ছিল, তাহা আজ মনুষ্যের ভিতর হয়ত আসিয়াছে; কাল হয়ত উহা পত্তর ভিতরে, আবার পরে হয়ত কোন উদ্ভিদে প্রবেশ করিবে । সর্বদাই আসিতেছে যাইতেছে । উহা একমাত্র অখণ্ডজড়রাশি—কেবল নামরূপে

পৃথক। উহার এক বিন্দু নাম সূর্য্য, এক বিন্দু নাম চন্দ্র, এক বিন্দু তারা, এক বিন্দু মানুষ, এক বিন্দু পত, এক বিন্দু উদ্ভিদ, এইরূপ। আর এই যে বিভিন্ন নাম, ইহা ভ্রমাত্মক, কারণ, এই জড়রাশির ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটতেছে। এই জগৎকেই আর এক ভাবে দেখিলে চিন্তাসমুদ্ররূপে প্রতীয়মান হইবে, উহার এক একটা বিন্দু এক একটা মন; তুমি একটা মন, আমি একটা মন, প্রত্যেকেই এক একটা মনমাত্র। আবার এই জগৎ জ্ঞানের দৃষ্টি হইতে দেখিলে, অর্থাৎ যখন চক্ষু হইতে মেহাবরণ অপসারিত হইয়া যায়, যখন মন শুদ্ধ হইয়া যায়, তখন উহাকেই নিত্যজ্ঞ, অপরিণামী, অবিনাশী, অখণ্ড, পূর্ণস্বরূপ পুরুষ বলিয়া প্রতীত হইবে। তবে বৈতবাদীর পরলোকবাদ—মানুষ মরিগে স্বর্গে যায়, অথবা অমুক অমুক লোকে যায়, অসংলোকে ভূত হয়, পরে পণ্ড হয়, এসব কথার কি হহল? অবৈতবাদী বলেন, কেহ আসেও না, কেহ যায়ও না। তোমার পক্ষে যাওয়া আসা কিসে সম্ভব? তুমি অনন্তস্বরূপ, তোমার পক্ষে বাইবার স্থান আর কোথায়?

কোন বিভাগে কতকগুলি ছোট বালক বালিকার পরীক্ষা হইতেছিল। পরীক্ষক ঐ ছোট ছেলেগুলিকে নানারূপ কঠিন প্রশ্ন করিতেছিলেন। অত্যাশ্চর্য্য প্রশ্নের মধ্যে তাঁহার এই প্রশ্নও ছিল, পৃথিবী পড়িয়া যায় না কেন? অনেকেই প্রশ্নটাই বুঝিতে পারে নাই, সুতরাং বাহার বাহা মনে আসিতে লাগিল, সে সেইরূপ উত্তর দিতে লাগিল। একটা বুদ্ধিমতী বালিকা আর একটা প্রশ্ন করিয়া ঐ প্রশ্নটির উত্তর করিল,—“কোথায় উহা পড়িবে?” ঐ প্রশ্নটাই ঐ ভুল। জগতে উঁচু নীচু বলিয়া ত কিছুই নাই। উঁচু নীচু বলা কেবল আপেক্ষিক মাত্র। আদ্যাদ্যক্ষেপে তদ্রূপ; জগৎমূঢ়া সৰ্ব্বক্ষেপে প্রশ্নই ভুল। কে যায়, কে আসে? তুমি কোথায় নাই? এমন স্বর্গ কোথায় আছে, যেখানে তুমি পূর্ণ হইতেই অবস্থিত নহ? মানুষের আত্মা সৰ্ব্বব্যাপী। তুমি কোথায় বাইবে? কোথায় বাইবে না? আত্মা ত সৰ্ব্বত্র। সুতরাং সম্পূর্ণ জীবন্তুক্ত ব্যক্তির পক্ষে এই বালকমূলভ প্রশ্ন, এই জগৎমূঢ়রূপ বালকমূলভ ভ্রম, স্বর্গ নরক প্রভৃতি প্রশ্ন—সবই একেবারে অন্তর্হিত হইয়া যায়; বাহাদের ভিতরে কিঞ্চিৎ অজ্ঞান অবশিষ্ট আছে, তাহাদের পক্ষে উহা ব্রহ্মলোকান্ত নানাবিধ দৃষ্ট দেখাইয়া অন্তর্হিত হয়; অন্তর্যাতীর পক্ষে উহা থাকিয়া যায়।

সমুদয় জগৎ, স্বর্গে বাইবে, মরিবে, জন্মিবে, একথা বিশ্বাস করে কেন? আমি একখানি গ্রন্থ পাঠ করিতেছি, উহার পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পঠিত হইতেছে

এবং ওটান হইতেছে। আর এক পৃষ্ঠা আসিল—উহাও ওটান হইল। পরি-
ণাম প্রাপ্ত হইতেছে কে? কে যায় আসে? আমি নই,—ঐ পুস্তকেরই পাতা
ওটান হইতেছে। সুন্দর প্রকৃতিই আশ্চর্য সমুদ্রের একখানি পুস্তক স্বরূপ।
উহার অধ্যায়ের পর অধ্যায় পড়া হইয়া যাইতেছে ও ওটান হইতেছে, নতুন
দৃশ্য সমুখে আসিতেছে। উহাও পড়া হইয়া গেল ও ওটান হইল। আবার
নতুন অধ্যায় আসিল, চিত্র আশ্রয় যেমন তেমনিই, অনন্তস্বরূপ। প্রকৃতিই
পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছেন, আশ্রয় নহেন। উহার কখন পরিণাম হয় না।
জন্মমৃত্যু প্রকৃতিতে, ভোমতে নহে। তথাপি অজ্ঞেরা ভ্রান্ত হইয়া মনে করে,
আমরা জন্মাইতেছি, মরিতেছি, প্রকৃতি নহেন, যেমন আমরা ভ্রান্তিবশতঃ মনে
করি, সূর্য্যই চলিতেছেন, পৃথিবী নহে। এ সকল, সূত্রাং, ভ্রান্তিভ্রান্ত, যেমন
আমরা ভ্রমবশতঃ রেলগাড়ীর পরিবর্তে মাঠকে মচল বলিয়া মনে করি।
জন্মমৃত্যুভ্রান্তি ঠিক এইরূপ। যখন মানুষ কোন বিশেষরূপ ভাবে থাকে, তখন
সে ইহাকেই পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র, তারা প্রভৃতি বলিয়া দেখে, আর বাহ্যারী রূপ
মনোভাবসম্পন্ন, তাহারও ঠিক তাহাই দেখে। হোমার আবার মধ্যে লক্ষ
লক্ষ লোক থাকিতে পারে, বাহ্যারী বিভিন্ন প্রকৃতিসম্পন্ন। তাহাবাও আমা-
দিগকে কখন দেখিবে না, আমরাও তাহাদিগকে কখন দেখিতে পাইব না।
আমরা এককপচিত্তবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণীবৎ দেখিতে পাই। সেই যন্ত্রগুলিই
পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে গায়, যে গুলি এক প্রকার কম্পনবিশিষ্ট। মনে
কর, আমরা এক্ষণে বেদ্য প্রাণকম্পনসম্পন্ন। উহাকে আমরা মানব-কম্পন
নাম প্রদান করিতে পারি;—যদি উহা পবিত্রিত হইয়া যায়, তবে আর মনুষ্য
দেখা যাইবে না, উহাও পরিবর্তে অপরূপ দৃশ্য আমাদের সমক্ষে আসিবে,—হয়ত
দেবতা ও দেবজগৎ, কিম্বা অসং লোকের পক্ষে দানব ও দানবজগৎ; কিন্তু ঐ
সকলগুলিই এই এক জগতেরই বিভিন্ন ভাব মাত্র। এই জগৎ মানবদৃষ্টিতে
পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র, তারা প্রভৃতিরূপে, আবার দানবের দৃষ্টিতে দেখিলে ইহাই
নরক বা শাস্তিস্থানরূপে প্রতীত হইবে, আবার বাহ্যারী স্বর্গে যাইতে চাহে,
তাহাবা এই স্থানকেই স্বর্গ বলিয়া দেখিবে। বাহ্যারী সারা জীবন ভাবিতেছে,
আমরা স্বর্গসিংহাসনারূঢ় ঈশ্বরের নিকট গিয়া সারা জীবন তাহার
উপাসনা করিব, তাহাদের মৃত্যু হইলে তাহারা তাহাদের চিত্তই ঐ বিষয়ই
দেখিবে। এই জগতই একটী বৃহৎ স্বর্গে পরিণত হইয়া যাইবে; তাহারা দেখিবে,
নানাপ্রকার অশ্বর কিম্বা চতুর্দিকে উড়িয়া বেড়াইতেছে, আর দেবতারা
১৫ই মাঘ, ১৩০৭।] উদ্যোতন। [৩]

সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন । স্বর্গাদি সমুদয়ই মানুষেরই কৃত । অতএব
অদৈতবাদী বলেন, দৈতবাদের কথা সত্য, কিন্তু ঐ সকল তাহার নিজেরই
রচিত । এই সব লোক, এই সব দেব দৈতা, পুনর্জন্ম প্রভৃতি সবই রূপক,
মানবজীবনও তাহাই । ঐগুলি কেবল রূপক, আর মানবজীবন সত্য,
তাহা হইতে পারে না । মানুষ সর্বদাই এই ভুল করিতেছে । অত্যাশ্রয় জিনিস,
যদি স্বর্গ নরক প্রভৃতিকে রূপক বলিলে, তাহারা বেশ বুঝিতে পারে, কিন্তু তাহারা
নিজদের অস্তিত্বকে রূপক বলিয়া কোন মতে স্বীকার করিতে চায় না । এই
আপাতপ্রতীয়মান সমুদয়ই রূপকমাত্র, আর সম্বাপেক্ষা মিথ্যা এই যে, আমরা
শরীর, যাঁহা আমরা কখনই নই এবং কখন হইতেও পারি না । আমরা কেবল
মানুষ, ইহাই ভয়ানক মিথ্যা কথা । আমরাই জগতের ঈশ্বর । ঈশ্বরের উপাসনা
করিতে গিয়া আমরা নিজদের অব্যক্ত আত্মারই উপাসনা করিয়া আসিতেছি ।
তুমি জন্ম হইতে পাপী বা অসৎ পুরুষ, এইটী ভাবাই সর্বাপেক্ষা মিথ্যা
কথা । যিনি নিজ পাপী, তিনিই কেবল অপরকে পাপী দেখিয়া থাকেন ।
মনে কর, এখানে একটা শিশু রহিয়াছে, আর তুমি টেবিলের উপর এক
মোহরের খলি রাখিলে । মনে কর, একজন দলু আসিয়া ঐ মোহর
লইয়া গেল । শিশুর পক্ষে ঐ মোহরের খলির অবস্থান ও অন্তর্দ্বন্দ্ব, উভয়ই
সমান ; তাহার ভিতরে চোর নাই, সুতরাং সে বাহিরেও চোর দেখে না ।
পাপী ও অসৎ লোকই বাহিরে পাপ দেখিতে পায়, কিন্তু সাধু লোকের
পক্ষে তাহা বোধ হয় না । অতাস্ত অসাধু পুরুষের এই জগৎকে নরকরূপ
দেখে, বাহারা মাঝামাঝি লোক, তাহারা ইহাকে স্বর্গরূপ দেখে, আর
বাহারা পূর্ণ শুদ্ধ পুরুষ, তাহারা উহাকে মাঝাং ভগবান-রূপে দর্শন
করেন । তখনই কেবল তাঁহার চক্ষু হইতে আবরণ পড়িয়া যায়, আর তখন
সেই ব্যক্তি পবিত্র ও শুদ্ধ হইয়া দেখিতে পান, তাঁহার দৃষ্টি একেবারে সম্পূর্ণ
পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে । যে সকল গ্রন্থে তাঁহাকে লক্ষ লক্ষ বৎসর
ধরিয়া উৎপীড়ন করিতেছিল, তাহা একেবারে চলিয়া যায়, আর যিনি
আপনাকে একদিন মানুষ, দেবতা দানব প্রভৃতি বলিয়া মনে করিতেছিলেন,
যিনি আপনাকে কখন উর্দ্ধে, কখন অধোতে, কখন পৃথিবীতে, কখন
স্বর্গে, কখন বা অন্য স্থানে অবস্থিত বলিয়া ভাবিতেছিলেন, তিনি দেখিতে
পান, তিনি বাস্তবিক সর্ববাপী, তিনি কালের অধীন নন, কাল তাঁহার অধীন,
সমুদয় স্বর্গ তাঁহার ভিতরে, তিনি কোনরূপ স্বর্গে অবস্থিত নহেন, আর

মানুষ কোন না কোন কালে যে কোন দেবতা উপাসনা করিয়াছে, সবই তাঁহার ভিতরে, তিনি কোন দেবতার অবস্থিত নহেন। তিনিই দেবাম্বর, মানুষ, পশু, উদ্ভিদ প্রভৃতি প্রভৃতির সৃষ্টিকর্তা, আর তখন মানুষের প্রকৃত স্বরূপ তাঁহার নিকট এই জগৎ হইতে শ্রেষ্ঠতর, স্বর্গ হইতে শ্রেষ্ঠতর এবং সর্বব্যাপী অকাশ হইতে অধিক সর্বব্যাপীরূপে প্রকাশ পায়। তখনই মানুষ নির্ভর হইয়া যায়, তখনই মানুষ মুক্ত হইয়া যায়। তখন সব ভ্রান্তি চলিয়া যায়, সব দুঃখ দূর হইয়া যায়, সব ভয় একেবারে চিরকালের জন্ত শেষ হইয়া যায়। তখন জন্ম কোথায় চলিয়া যায়, তার সঙ্গে মৃত্যুও চলিয়া যায়; দুঃখ চলিয়া যায়, তার সঙ্গে সুখও চলিয়া যায়। পৃথিবী উড়িয়া যায়, তাহার সঙ্গে স্বর্গও উড়িয়া যায়; শরীর চলিয়া যায়, তাহার সঙ্গে মনও চলিয়া যায়। সেই ব্যক্তির পক্ষে সমুদয় জগৎই যেন অবাক্ত ভাব ধারণ করে। এই যে শক্তিরূপের নিদত্ত সংগ্রাম, নিয়ত সংঘর্ষ, ইহা একেবারে স্থগিত হইয়া যায়, আর বাহ্য শক্তি ও ভূতরূপে, প্রকৃতির বিভিন্ন চেষ্টারূপে প্রকাশ পাইতেছিল, বাহ্য স্বয়ং প্রকৃতিরূপে প্রকাশ পাইতেছিল, বাহ্য স্বর্গ, পৃথিবী, উদ্ভিদ, পশু, মানুষ, দেবতা প্রভৃতিরূপে প্রকাশ পাইতেছিল, সেই সমুদয়ই এক অনন্ত অচ্ছেদ্য, অপরিণামী সত্তারূপে পরিণত হইয়া যায়, আর জ্ঞানী পুরুষ দেখিতে পান, তিনি সেই সত্তার সহিত অভেদ। “যেমন আকাশে নানাবর্ণের মেঘ আসিয়া ধানিক ক্ষণ খেলা করিয়া পরে অন্তর্হিত হইয়া যায়,” সেইরূপ এই আয়ার সমুখে পৃথিবী, স্বর্গ, চন্দ্রলোক, দেবতা, স্বপ্ন দুঃখ প্রভৃতি আনিতেছে; কিন্তু উহার। সেই এক অনন্ত অপরিণামী নীলবর্ণ আকাশকে আমাদের সমুখে রাখিয়া অন্তর্হিত হয়। আকাশ কখন পরিণাম প্রাপ্ত হয় না, মেঘই কেবল পরিণাম প্রাপ্ত হয়। ভ্রমশব্দঃ আমরা মনে করি, আমরা অপবিত্র, আমরা সান্ত, আমরা জগৎ হইতে পৃথক্। প্রকৃত মানুষ এই এক অখণ্ড সত্যস্বরূপ।

একণে দুইটি প্রশ্ন আসিতেছে। প্রথমটি এই, “এই অপ্রতজ্ঞান উপলব্ধি করা কি সম্ভব? এতক্ষণ পর্যন্তত মতের কথা হইল, ইহার অপরোক্ষানুভূতি কি সম্ভব?” হাঁ, সম্ভবই সম্ভব। এমন অনেক লোক সংসারে এখনও ভাবিত, যাঁহাদের পক্ষে অজ্ঞান চিরকালের জন্ত চলিয়া গিয়াছে। ইহার। কি এই সত্য উপলব্ধি করিবার পরকণেই মরিয়া যান? আমরা বত শীঘ্র মনে করি, তত শীঘ্র নয়। এককাষ্ঠবণ্ডসংযোজিত দুইটি চক্রে একত্রে চলিতেছে। যদি আমি একখানি চক্রে ধরিয়া সংযোজক কাষ্ঠখণ্ডটিকে কাটিয়া ফেলি, তবে আমি যে ১৫ই মার্চ, ১৯০৭।] উদ্বোধন। ৫৯

চক্রখানি ধরিয়াছি, তাহা খামিয়া যাইবে, কিন্তু অপর চক্রের উপর পূর্ণ-
প্রদত্ত বেগ রহিয়াছে, সুতরাং উহা কিছুক্ষণ গিয়া তবে পড়িয়া যায়। পূর্ণ ও
শুদ্ধরূপ আত্মা যেন একখানি চক্র, আর এই শরীরমনরূপ ভ্রান্তি আর একটা
চক্র, কক্ষরূপ কাঠদণ্ড দ্বারা যোজিত। জ্ঞানই সেই কুঠার, যাহা ঐ দুইটির
সংযোগদণ্ড ছেদন করিয়া দেয়। তখন আত্মারূপ চক্র স্থগিত হইয়া যাইবে, তখন
আত্মা, আসিতেছেন যাইতেছেন অথবা তাঁহার জন্মগত হইতেছে, এ সকল
অজ্ঞানের ভাব পরিত্যাগ করিবেন, আর প্রকৃতির সহিত তাঁহার মিলিতভাবে,
এবং অভাব বোধনা সব চাওয়া যাইবে, তখন আত্মা দোষতে পাইবেন,
তিনি পূর্ণ, বাসনারহীন। কিন্তু শরীরমনরূপ অপর চক্রে প্রাক্তন কক্ষের
বেগ থাকিবে। সুতরাং যতদিন না এই প্রাক্তন কক্ষের বেগ একেবারে
নিবৃত্তি হয়, ততদিন উহারা থাকিবে। ঐ বেগ নিবৃত্তি হইলে শরীরমনের
পতন হইবে, তখন আত্মা মুক্ত হইবেন। তখন আর স্বর্গে যাওয়া বা স্বর্গ
হটতে জগতে ফিরিয়া আসা, এমন কি, ব্রহ্মলোকে গমন পর্যন্ত স্থগিত হইয়া
যাইবে, কারণ তিনি কোথা হইতে আসিবেন, কোথায়ই বা যাইবেন?
যে ব্যক্তি এই ভীতনেই এই অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে, অন্ততঃ
এক মিনিটের জন্তও এই সংসারদৃশ্য পবিত্রিত হওয়া দিয়া সত্য প্রতিভাত
হইয়াছে, তিনি জীবমুক্ত বনিয়া কথিত হন। এই জীবমুক্ত অবস্থা লাভ
করাই বেদান্তের লক্ষ্য।

এক সময়ে আমি ভারত মহাসাগরের উৎকূলে ভারতের পাশ্চাত্যভাগস্থ
মরুখণ্ড ভ্রমণ করিতেছিলাম। আমি অনেক দিন ধরিয়া পদবজ্রে মরুতে ভ্রমণ
করিলাম, কিন্তু প্রতিদিন এই দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতাম যে, চতুর্দিকে সুন্দর
সুন্দর হৃদ রহিয়াছে, তাহাদের সকলগুলির চতুর্দিকে বৃক্ষবাজ বিরাজিত,
আর ঐ জলে বৃক্ষসমূহের ছায়া নিপাত ভাবে পড়িয়া নড়িতেছে। কি অদ্ভুত
দৃশ্য! ইহাকে আমার হোকে মরুভূমি বলে? আমি একমাস ভ্রমণ করিলাম,
ভ্রমণ করিতে করিতে এই অদ্ভুত হৃদ সকল ও বৃক্ষবাজি দেখিতে লাগিলাম।
একদিন অতিশয় তৃষ্ণাত হওয়ার আমার একটু জল খাটবার ইচ্ছা হইল,
সুতরাং আমি ঐ সকল সুন্দর নিখিল হৃদ সকলের মধ্যে এগটির দিকে অগ্রসর
হইলাম। অগ্রসর হইলামাত্র হঠাৎ উপা অদৃশ্য হইল, আর আমার মস্তিষ্কে
হঠাৎ এই জ্ঞান আসিল, ‘যে মরীচিকা সম্বন্ধে সারা জীবন পুস্তকে পড়িয়া
আসিতেছি, এ সেই মরীচিকা।’ আর তাহার সহিত এই জ্ঞানও আসিল,
৫২ উদ্বোধন। [৩য়—২য় সংখ্যা ;

মানুষের যথার্থ স্বরূপ ।

এই সারা মাসের মধ্যে প্রত্যহই আমি মরীচিকাই দেখি। আসিতেছি, কিন্তু জানি না যে, ইহা মরীচিকা । তার পর দিন আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম । পূর্বের মতই হৃদ দেখা যাউতে লাগিল, কিন্তু ঐ সঙ্গে সঙ্গে এই জ্ঞানও আসিতে লাগিল যে, উহা মরীচিকা, সত্য হৃদ নহে । এই জগৎসম্বন্ধেও তরুণ । আমরা প্রতিদিন, প্রতি মাস, প্রতি বৎসর, এই জগৎসম্বন্ধে ভ্রমণ করিতেছি, কিন্তু মরীচিকাকে মরীচিকা বলিয়া বুঝিতে পারিতেছি না । একদিন এই মরীচিকা অদৃশ্য হইবে, কিন্তু উহা আবার আসিবে । শরীর প্রাক্তন কণ্ঠের অধীন থাকিবে, স্ততরাং ঐ মরীচিকা ফিরিয়া আসিবে । যতদিন আমরা কণ্ঠ দ্বারা বন্ধ, ততদিন জগৎ আমাদের সম্মুখে আসিবে । নরনারী পশু উদ্ভিদ আসক্তি, কর্তব্য, সব আসিবে, কিন্তু উহার পূর্বের স্মৃতি আমাদের উপর শক্তিবিস্তারে সমর্থ হইবে না । এই নব জ্ঞানের প্রভাবে কণ্ঠের শক্তি নাশ হইবে, উহার বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া যাইবে । জগৎ আমাদের পক্ষে একেবারে পরিবর্তিত হইয়া যাউবে, কারণ যেমন জগৎ দেখা যাউবে, তেমনি উহার সহিত সত্য ও মরীচিকার প্রভেদের জ্ঞানও আসিবে ।

তখন এই জগৎ আর সেই পূর্বের জগৎ থাকিবে না । তবে একটা বিপদ আছে । আমরা দেখিতে পাঠ, প্রতি দেশেই লোকে এই বেদান্তদর্শনের মত গ্রহণ করিয়া বলে, “আমি ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত, আমি বিধিনিষেধের অতীত, স্ততরাং আমি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারি।” এই দেশেই দেখিবে, অনেক অজ্ঞান বলিয়া থাকে, ‘আমি বন্ধ নহি, আমি স্বয়ং জৈবস্বরূপ ; আমি যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিব ।’ ইহা ঠিক নহে, যদিও ইহা সত্য যে, আত্মা ভৌতিক মানসিক বা নৈতিক সর্ব্ব প্রকার নিয়মের অতীত । নিয়মের মধ্যে বন্ধন, নিয়মের বাহিরে মুক্তি । ইহাও সত্য যে, মুক্তি আত্মার জন্মগত স্বভাব, উহা তাঁহার জন্মপ্রাপ্ত সত্ত্ব, আর আত্মার যথার্থ মুক্তস্বভাব ভৌতিক আবরণের মধ্য দিয়া মাতৃবের আপাতপ্রতীক্ষমান মুক্তস্বভাবকপে প্রতীত হইতেছে । তোমার জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তই হুমি আপনাকে মুক্ত বলিয়া অনুভব করিতেছি । আমরা আপনাকে মুক্ত না অনুভব করিয়া এক মুহূর্ত্তও জীবিত থাকিতে পারি না, কথা কহিতে পারি না, ক্রিয়া স্বাসপ্রশ্বাসও ফেলিতে পারি না । কিন্তু আবার, অন্য চিন্তায় ইহাও প্রমাণিত হয় যে, আমরা যন্ততুল্য—মুক্ত নহি । তবে কোন্টী সত্য ? এই যে ‘আমি মুক্ত’ এই ধারণাটাই কি ভ্রমাত্মক ? একদল বলেন, ‘আমি মুক্ত-স্বভাব’ এই ধারণা ভ্রমাত্মক, আবার অন্য দল বলেন, ১৫ই মাঘ, ১৩০৭ ।]

‘আমি বদ্ধভাবাপন্ন’ এই ধারণাই ভ্রমাত্মক। তবে এই দ্বিবিধ অমুভূতি কোথা হইতে আনিয়া থাকে? মানুষ প্রকৃত পক্ষে মুক্ত, মানুষ পরমার্থতঃ বাহ্য, তাহা মুক্ত বাতীত আর কিছু হইতে পারে না, কিন্তু যখনই তিনি মানুষের জগতে আসেন, যখনই তিনি নামরূপের মধ্যে পড়েন, তখনই তিনি বদ্ধ হইয়া পড়েন। ‘স্বাধীন, ইচ্ছা’ ইহা বলাই ভুল। ইচ্ছা কখন স্বাধীন হইতেই পারে না। কি করিয়া হইবে? যখন প্রকৃত মানুষ যিনি, তিনি বদ্ধ হইয়া যান, তখনই তাঁহার ইচ্ছার উদ্ভব হয়, তাহার পূর্বে নহে। মানুষের ইচ্ছা বদ্ধভাবাপন্ন, কিন্তু তাহার মূল বাহ্য, তাহা নিত্যকালের জ্ঞান মুক্ত। সুতরাং বন্ধনের অবস্থাতেও—এই মনুষ্যজীবনেই হউক, দেব-জীবনেই হউক, স্বর্গে অবস্থান কালেই হউক, আরম্ভে অবস্থান কালেই হউক, আমাদের বিবিধত অধিকারস্বরূপ এই, মুক্তির স্থিতি থাকিয়া যায়। আর জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমরা সকলেই ঐ মুক্তির দিকেই চলিয়াছি। যখন মানুষ মুক্তিলাভ করে, তখন সে নিয়মের দ্বারা কিরূপে বদ্ধ হইতে পারে? জগতের কোন নিয়মই তাহাকে বদ্ধ করিতে পারে না, কারণ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার।

তিনিই তখন সমুদয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ। হয় বল, তিনিই সমুদয় জগৎ, না হয় বল, তাঁহার পক্ষে জগতের অস্তিত্বই নাই। তবে তাঁহার লিঙ্গ, দেশ, ইত্যাদির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব কিরূপে থাকিবে? তিনি কিরূপে বলিবেন, আমি পুরুষ, আমি স্ত্রী, অথবা আমি বালক? এগুলি কি মিথ্যা কথা নহে? তিনি জানিয়াছেন, সেগুলি মিথ্যা। তখন তিনি এই গুলি পুরুষের অধিকার, এই গুলি স্ত্রীর অধিকার, কিরূপে বলিবেন? কাহারও কিছুই অধিকার নাই, কাহারই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। পুরুষ নাই, স্ত্রীও নাই; আত্মা লিঙ্গহীন, নিত্যশুদ্ধ। আমি পুরুষ বা স্ত্রী বলা, অথবা আমি অমুক দেশবাসী বলা, মিথ্যাবাদ মাত্র। সমুদয় জগতই আমার দেশ, সমুদয় জগতই আমার, কারণ, সমুদয় জগতের দ্বারা যেন আমি আপনাকে আবৃত করিয়াছি। সমুদয় জগৎ যেন আমার শরীর হইয়াছে। কিন্তু আমরা দেখতেছি, অনেক লোকে পিটারের সময় এই সব কথা বলিয়া কার্যের সময় অপবিত্র কার্য সকল করিয়া থাকে। আর যদি আমরা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, কেন তাহারা এইরূপ করিতেছে, তাহারা উত্তর দিবে, ‘এ তোমাদের বুদ্ধিবার ভ্রম। আমাদের দ্বারা কোন অত্যাচার কার্য

হওয়া অসম্ভব।' এই সকল লোককে পরীক্ষা করিবার উপায় কি ? উপায় এই, --

যদিও সদস্য উভয়ই আত্মার ঋণ প্রকাশমাত্র, তথাপি অসম্ভাবই আত্মার বাহ্য আবরণ, আর 'সং' ভাব—মানুষের প্রকৃত স্বরূপ যে আত্মা, তাঁহার অপেক্ষাকৃত নিকটতম আবরণ। যতদিন না মানুষ 'অসং'এর স্তর ভেদ করিতে পারিতেছেন, ততদিন তিনি সতের স্তরে পঁহুঁছিতেই পারিবেন না, আর যতদিন না তিনি সদস্য উভয় স্তর ভেদ কবিত্তে পারিতেছেন, ততদিন তিনি আত্মার নিকট পঁহুঁছিতে পারিবেন না। আত্মার নিকট পঁহুঁছিলে তাঁহার কি অবশিষ্ট থাকে ? অতি সামান্য কর্ম ভূত জীবনের কার্যের অতি সামান্য বেগই অবশিষ্ট থাকে, কিন্তু এ বেগ—শুভকর্ম্মেই বেগ। যত দিন না অসংকে একেবারে রহিত হইয়া যাইতেছে, যতদিন না পূর্ণ অপ-বিত্রতা একেবারে দৃষ্ট হইয়া যাইতেছে, ততদিন কোন ব্যক্তির পক্ষে সত্যকে প্রত্যক্ষ এবং উপলব্ধি করা অসম্ভব। সুতরাং, যিনি আত্মার নিকট পৌঁছিয়াছেন, যিনি সত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহার কেবল ভূত-জীবনের শুভ সংস্কার, শুভ বেগগুলি অবশিষ্ট থাকে। শরীরে বাস করিলেও এবং অনবরত কর্ম্ম করিলেও তিনি কেবল সংকর্ম্ম করেন ; তাঁহার মুখ সকলের প্রতি কেবল আশীর্ষচন বর্ষণ করে, তাঁহার হস্ত কেবল সংকাষাই করিয়া থাকে, তাঁহার মন কেবল সং চিন্তা করিতেই সমর্থ ; তাঁহার উপস্থিতিই, তিনি যেখানেই যান না কেন, সর্বত্রই মানবজাতির মহাকল্যাণকর। একরূপ ব্যক্তি দ্বারা কোন অসং কর্ম্ম কি সম্ভব ? তোমাদের স্মরণ রাখা উচিত, 'প্রত্যক্ষানুভূতি' এবং 'শুধু মুখে বলা' ভিতর বিস্তর তফাত। অজ্ঞান ব্যক্তিও নানা জ্ঞানের কথা কহিয়া থাকে। তোতা ও কীও এইরূপ বকিয়া থাকে। মুখে বলা এক, আর উপলব্ধি আর এক। দর্শন, মতামত, বিচার, শাস্ত্র, মন্দির, সম্প্রদায় প্রভৃতি কিছু মন নয়, কিন্তু এই প্রত্যক্ষানুভূতি হইলে ও-সব আর থাকে না। মানচিত্র অবশ্য উপকারী, কিন্তু মানচিত্রে অঙ্কিত দেশ স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়া, তার পর আবার সেই মানচিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত কর, তখন তুমি কত প্রভেদ দেখিতে পাও। সুতরাং যাহারা সত্য উপলব্ধি করিয়াছে, তাহাদিগকে আর উহা বুঝিবার শ্রায়শক্তি তরুণিতরু প্রভৃতির আশ্রয় লইতে হয় না। তাহাদের পক্ষে উহা তাহাদের অন্তরাত্মার মর্মে মর্মে প্রবিষ্ট হইয়াছে। প্রত্যক্ষেরও ১৫ই মাঘ, ১৩০৭।]

প্রত্যক্ষ হইয়াছে। পৈদাহাবাদীদের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, উহা যেন তাহার করামলকবৎ হইয়াছে। প্রত্যক্ষ উপলক্ষিকারীরা অসঙ্খচিত্তিতে বলিতে পারেন, ‘এই যে, আয়া রহিয়াছেন।’ তুমি তাঁহাদের সহিত যতই তর্ক কর না কেন, তাঁহারা তোমার কথায় হাসিবেন মাত্র, তাঁহারা উহা আবেল তাবোল বাক্য বলিয়া মনে করিবেন। শিঙা যা তা বলুক না কেন, তাঁহারা তাহাতে কোন কথা কহেন না। তাঁহারা সভ্য উপলক্ষি করিয়া “ভরপুর” হইয়া আছেন। মনে কর, তুমি একটা দেশ দেখিয়া আসিয়াছ, আর একজন ব্যক্তি তোমার নিকট আসিয়া এই তর্ক করিতে লাগিল যে, ঐ দেশের কখন অস্তিত্বই ছিল না; এইরূপ সে ক্রমাগত তর্ক করিয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহার প্রতি তোমার মনের ভাব এইরূপ হইবে যে, সে ব্যক্তি বাতুলারয়ের উপযুক্ত। এইরূপ যিনি ধর্মের প্রত্যক্ষ উপলক্ষি করিয়াছেন, তিনি বলেন, “জগতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মের কথা কেবল বাগকের কথা মাত্র। প্রত্যক্ষাত্মভূতি ধর্মের সার-কথা।” ধর্ম উপলক্ষি করা যাইতে পারে। প্রশ্ন এই, তুমি কি প্রস্তুত আছ? তোমার কি ধর্মের আবশ্যক আছে? যদি তুমি যথার্থ চেষ্টা কর, তবে তোমার প্রত্যক্ষ উপলক্ষি হইবে, তখনই তুমি প্রকৃত পক্ষে ধার্মিক হইবে। যতদিন না তোমার এই উপলক্ষি হইতেছে, ততদিন তোমাতে এত নাস্তিকে কোন প্রভেদ নাই। নাস্তিকেরা তবু অকপট, কিন্তু যে বলে ‘আমি ধর্মবিশ্বাস করি’, অথচ কখন উহা প্রত্যক্ষ উপলক্ষি করিতে চেষ্টা করে না, সে অকপট নহে।

তার পরের প্রশ্ন এই—এই উপলক্ষির পরে কি হয়? মনে কর, আমরা জগতের এই অখণ্ড ভাব (আমরাই যে, সেই একমাত্র অনন্ত পুরুষ, তাহা) উপলক্ষি করিলাম; মনে কর, আমরা জানিতে পারিলাম, আত্মাই একমাত্র আছেন, আর তিনিই বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পাইতেছেন; এইরূপ জানিতে পারিলে তার পর আমাদের কি হয়? তাহা হইলে আমরা কি নিশ্চেষ্ট হইয়া এক কোণে বসিয়া মরিয়া যাইব? জগতে ইহা দ্বারা কি উপকার হইবে? সেই প্রাচীন প্রশ্ন আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া! প্রথমতঃ, উহা দ্বারা জগতের উপকার হইবে কেন? ইহার কি কোন যুক্তি আছে? লোকের এই প্রশ্ন করিবার কি অধিকার আছে, ‘ইহাতে জগতের কি উপকার হইবে?’ ইহার অর্থ কি? ছোট ছেলে মিষ্ট দ্রব্য ভাল বাসে।

উদ্বোধন।

[৩য়—২য় সংখ্যা;]

মধ্যে যাহা শ্রেয়ঃ, তাহা আনাকে বল, এই প্রকার অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলে
 পর ভগবান এইপ্রকার নির্ণয় করিয়াছেন যে, জ্ঞানী সংন্যাসীগণের মোক্ষপ্রাপ্তি
 কেবল জ্ঞানযোগের দ্বারাই হয়, কাম্যযোগীগণের মোক্ষপ্রাপ্তির প্রতি প্রথম
 কারণ কাম্যযোগ (কাম্যযোগদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে তাহারা জ্ঞানলাভে সমর্থ হইয়া
 মোক্ষলাভ করিতে পারে), “নচ সংন্যাসনাদো সিদ্ধিং সমদিশচ্ছত্তি” (কেবল
 সংন্যাসেব দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না) এই প্রকার বাক্যের দ্বারাও
 ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, জ্ঞানের সহিত সন্ন্যাসই সিদ্ধির কারণ (এবং
 জ্ঞানের উদয় না হওয়া পর্যন্ত কাম্যযোগই কর্তব্য)। ইহার প্রকৃত বিবেক অবদারণ
 করিতে অসমর্থ হইয়া। অর্জুন জ্ঞানরহিত সংন্যাস শ্রেয়ঃ কিংবা কাম্যযোগ শ্রেয়ঃ,
 ইহাই জানিবার ইচ্ছায় বলিতেছেন যে, সংন্যাসমিত্যাদি। “সংন্যাস” অর্থাৎ
 শাস্ত্রীয় কতকগুলি বিশেষ কৰ্ম্মের অন্তর্গত পরিত্যাগ, তাহাই। করিবার উপদেশ
 দিতেছ, অথচ আবার সেই সকল কৰ্ম্মের অন্তর্গত ন বৈ অপ্রকৃত্য, তাহাও
 বলিতেছ, সুতরাং এই দুইটির মধ্যে কোনটী শ্রেয়ঃ (অর্থাৎ কাম্য শ্রেয়ঃ কিংবা
 কাম্য পরিত্যাগ করা শ্রেয়ঃ (এইরূপ সংশয় হইতেছে ; দুইটি উপায়ের মধ্যে
 যাহা উৎকৃষ্ট, তাহারই অন্তর্গত কৰ্ম্ম, অতএব কাম্যসংগ্রাম ও কাম্যযোগ এই
 দুইটির মধ্যে যাহা উৎকৃষ্টের অর্থ্যাৎ যাহার অন্তর্গত কারণে আনার শ্রেয়লাভ
 হয়, তাহাই তুমি নিশ্চয় করিবা, তোমার যাহা অভিলষিত, তাহা বল, কাবণ
 এই দুইটি উপায় এককালে একটি পুরুষের অর্জনের হইতে পারে না ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ । - সংন্যাসঃ কাম্যযোগেচ্চ নিঃশ্রেয়সকরোবুভৌ ।

তয়োস্ত কাম্যসংন্যাসাং কাম্যযোগোবিশিষ্যতে ॥২॥

অর্থঃ।—সংন্যাসঃ কাম্যযোগঃ চ ইতি উভৌ যেত্বপি নিঃশ্রেয়সকরৌ হু
 (তথাপি) তয়োঃ মধ্যে সংন্যাসাং কাম্যযোগো বিশিষ্যতে ॥২॥

মূলানুবাদ ।—সংন্যাস এবং কাম্যযোগ এই দুইটাই মোক্ষদায়ক, কিন্তু এই
 দুইটির মধ্যে কাম্যযোগই সংগ্রাম হইতে উৎকৃষ্ট ॥ ২ ॥

ভাষ্য ।—স্বাভিপ্রায়মাত্রফলোনির্ণয়ঃ (শ্রীভগবানুবাচ) সংন্যাসঃ কাম্যয়াং
 পরিত্যাগঃ কাম্যযোগেচ্চ তেষামনুষ্ঠানং তাবুতাবপি নিঃশ্রেয়সকরৌ নিঃশ্রেয়সং
 মোক্ষং কুর্ক্মতে জ্ঞানোৎপত্তিহেতুতেন উভৌ যদ্যপি নিঃশ্রেয়সকরৌ তথাপি
 তয়োস্ত নিঃশ্রেয়সহেতুঃ কাম্যসংগ্রামাং কেবলাং কাম্যযোগোবিশিষ্যত ইতি কাম্য
 যোগঃ গৌতি ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—অর্জুনের নিশ্চয় উৎপন্ন কণ্ঠবাত জন্ম নিজের অতিপ্রায় প্রকাশ করিয়া ভগবান্ বলিতেছেন যে, সংজ্ঞাস (অর্থঃ ২) কতকগুলি বিহিত কল্পেব পরিচ্যোগ এবং কল্পযোগে অর্থাৎ সেই কতকগুলি কর্মের অনুষ্ঠান, এই দুইটা উপায়ই নিঃশ্রেয়সকর, (অর্থঃ) জ্ঞানের উৎপত্তির প্রতি কারণ, এই জ্ঞান মোক্ষের পরস্পরায় সাধন স্বরূপ হইয়া থাকে, তথাপি মোক্ষের কারণ এই দুইটির মধ্যে জ্ঞানটান কল্পসংন্যাস হইতে কল্পযোগটি বিশিষ্ট অর্থাৎ উৎকৃষ্ট এই বাক্যের দ্বারা কল্পযোগের স্থিতিবরা হইতেছে ২ ৥

জ্ঞেয়ঃ সনিত্যসংন্যাসী যোন দ্বেষ্টিন বাজ্জতি ।

নির্দ্বন্দ্বহি মহাবাহো স্মৃৎ বদ্ধাং প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ৥

অর্থঃ ।—স (কর্মযোগী) নিত্যসংন্যাসী (ইতি) জ্ঞেয়ঃ, যঃ ন দ্বেষ্টিন কাজ্জতি, হি (যস্যঃ) নির্দ্বন্দ্বঃ তে মহাবাহো, স্মৃৎ (অন্যায়মেন) বদ্ধাং প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ৥

মূলানুবাদ ।—যাহার দেহ বা আকাঙ্ক্ষা নাই, সে ব্যক্তি কর্মযোগী হইলেও তাহাকে নিত্যসংন্যাসী বলিয়াই জানিবে, কারণ হে মহাবাহো, যে ব্যক্তি অভিলাষ ও ঘৃণাভক্তি দ্বন্দ্ব হইতে বিমুক্ত, সে অন্যায় সেই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকে ॥ ৩ ৥

ভাষা ।—বন্দাদিত্যাহ জ্ঞেয়ইতি জ্ঞেয়ো জ্ঞাতব্যঃ স কর্মযোগী নিত্যসংন্যাসীতি যোন দ্বেষ্টি কিকিন্ন বাজ্জতি স্মৃৎপ্রাধে তৎসাধনে চ এবধিধো যঃ কর্মনি বর্জনানোহপি স নিত্যসংন্যাসীতি জ্ঞাতব্য ইত্যর্থঃ । নির্দ্বন্দ্বঃ দ্বন্দ্ববর্জিতোহি যস্যঃ মহাবাহো স্মৃৎ বদ্ধাদনায়ামেন প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ৥

ভাষ্যানুবাদ ।—কেন এই প্রকার বলা হইল, তাহার কারণ বলা যাউতেছে যে, জ্ঞেয় ইত্যাদি, জ্ঞেয় (এই শব্দটির অর্থ) জ্ঞাতব্যঃ অর্থাৎ (সেই কর্মযোগীকেও নিত্যসংন্যাসী বলিয়া জানিবে (কাহাকে তাহাই বলা যাইতেছে) যে ব্যক্তি জ্ঞেয় ও তাহার সাধনের উপায়ে ঘৃণা করে না এবং স্মৃৎ ও তাহার সাধনে যাহার আকাঙ্ক্ষা নাই, এই প্রকার ব্যক্তি কর্মানুষ্ঠান করিলেও সে নিত্যসংন্যাসী ইহা জানিবে । হে মহাবাহো, যে ব্যক্তি নির্দ্বন্দ্ব অর্থাৎ দ্বন্দ্ববর্জিত, সেই স্মৃৎ (অর্থঃ) অন্যায়সে সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় ৩ ৥

সাংখ্যযোগো পৃথগ্ভাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ ।

একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োবিন্দতে ফলম্ ॥ ১১ ॥

অর্থঃ ।—বালাঃ (এব) সাংখ্যযোগো পৃথগ্ বদন্তি ন পণ্ডিতাঃ । একমপি উভয়োরাস্থিতঃ সম্যক্ ফলং বিন্দতে ॥

মূলান্তবাদ ।—যাহারা অনভিজ্ঞ, তাহারাষ্ট সাংখ্য ও যোগকে পৃথক্ বলিয়া থাকে, কিন্তু পণ্ডিতগণ বলেন না; এই সাংখ্য ও যোগের মধ্যে যে কোন একটীরও অচুঠান করিলে সম্যক্ ফল লাভ করিতে পারা যায় । ॥

ভাষ্য ।—সংন্যাসকর্মযোগয়োঃ ভিন্নপুরুষাত্বেরয়োঃ ফলেতপি বিরোধো যুক্তোক্তভয়োনিঃশ্রেয়সকবৎসবোতিপ্রাপ্ততদমুচ্যতে । সাংখ্যযোগানিতি সাংখ্যযোগো পৃথগ্ বিকল্পফলো বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ । পণ্ডিতাস্ত জ্ঞানিন একং ফলমবিকল্পমিচ্ছন্তি । কথং একমপি সাংখ্যযোগয়োঃ সম্যগাস্থিতঃ সম্যগুপ্তিতবান্ ইত্যর্থঃ । উভয়োবিন্দতে ফলমুভয়োস্তদেব হি নিঃশ্রেয়সং ফলমতোন ফলে বিরোধোহস্মি । নন্তু সংন্যাসকর্মযোগাদেদনং প্রস্তুতং সাংখ্যযোগশব্দয়োঃ ফলৈকত্বং কথমিহাপ্রকৃতং ভবতি ? নৈষদোষঃ যদাপ্যজ্ঞেন সংন্যাসং কর্মযোগঞ্চ কেবলমভিপ্রেতাঃ প্রপ্লবঃ কৃতে ভগবৎস্তু তদপরিভোগেন স্বাভিপ্রেতং চ বিশেষং সংযোজ্য শব্দান্তবচাত্ময়া প্রাতিবচনং দদৌ সাংখ্যযোগানিতি । তাবেব সংন্যাসকর্মযোগৌ জ্ঞানতদুপাসমবুদ্ধির্বাদিসংবুদ্ধৌ সাংখ্যযোগশব্দবাতৌ ইতি ভগবতোমমিতি নাপ্রকৃতমক্ৰিয়ং । ৪ ।

ভাষ্যানুবাদ ।—সংন্যাস ও কর্মযোগ এই দুইটী এককালে একই পুরুষের অজুষ্ঠেয় হইতে পারে না, এই কারণে এই দুইটী যে ন পরস্পর বিরুদ্ধ, এইরূপ এই দুইটী উপায়ের ফলও পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়া উচিত, এই দুইটী উপায়েব ফল যে একই নোক্ষ হইবে, ইহা কখনও সম্ভবপর নহে, এই প্রকার শঙ্কা উপস্থিত হইলে, তাহািব নিশাকরণ করিবার জন্ত এই বলা যাইতেছে যে, সাংখ্যযোগানিতি । অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণই বলিয়া থাকে যে, সাংখ্য ও যোগ পৃথক্, (অর্থাৎ) ইহাদের ফল পরস্পর বিরুদ্ধ, কিন্তু পণ্ডিতগণ এ প্রকার বলেন না, তাহারা এই উভয় উপায় দ্বারা একই ফলকে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন । কেন (এমন হয় তাহাই বলা যাউতেছে যে) সাংখ্য ও যোগ এই উভয়ের মধ্যে সম্যক্ প্রকারে একটীও অচুঠান করিলে, উভয়ের যাহা ফল তাহাই লাভ করিতে পারা যায় । সাংখ্য ও যোগ এই উভয়েরই ফল নোক্ষ একরূপ । সুতরাং এই উপায়দ্বয়ের ফলে কোন প্রকার বিরোধ নাই । এইরূপে এই ১৫ই মাষ, ১৩৫শ ।]

একার আশঙ্কা হইতে পারে যে, সংন্যাস ও কর্মযোগ শব্দের দ্বারা সাংখ্য ও যোগের ঐক্য করিয়া এই দুইটির ফলের একতা এক্ষণে কেন অপ্রকৃত-ভাবে প্রতিপাদন করিতেছেন ? ইহার উত্তর এই হইতেছে যে, এই প্রকার দোষ হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ যদিপি অর্জুন কেবল সংন্যাস ও কর্মযোগের অভ্যাস করিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ভগবান্ কিন্তু তাহা পরিত্যাগ না করিয়া তাহাতে নিজের অভিপ্রেত পদার্থ বিশেষের সংযোজন পূরক শব্দান্তরের দ্বারা প্রতিপাদন করিয়া সাংখ্যযোগবিভাবাদি বচনের দ্বারা প্রতিপাদন দিয়াছেন । সেই সংন্যাস ও কর্মযোগ, জ্ঞান এবং জ্ঞানের উপায় সমবুদ্ধিাদির সহিত যুক্ত হইলে সাংখ্য ও যোগ শব্দের বাচ্য হইয়া থাকে ইহাই ভগবানের মত, সুতরাং এই হলে কোন প্রকার অপ্রাসঙ্গিক বলা হয় নাই ॥ ৪ ॥

যং সাংখ্যোঃ প্রাপ্যতে স্থানং তত্যাগৈবপি গম্যতে ।

একং সাংখ্যং চ যোগঞ্চ যঃ পশুতি স পশুতি ॥ ৫ ॥

অহা !—সাংখ্যোঃ প্রাপ্যতে, তং ত্যাগৈবপি গম্যতে, সাংখ্যং যোগঞ্চ একং যঃ পশুতি স পশুতি ॥ ৫ ॥

মূলানুবাদ !—জ্ঞাননিষ্ঠসংতাসীগণও যে স্থান প্রাপ্ত হন, ফলাভিসন্ধান-বর্জিত কর্মযোগীগণও সেই স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । সাংখ্য ও যোগ এই দুইটা উপায়কে যে ব্যক্তি এক বলিয়া জানে, সেই বথার্থ বস্তু দর্শন করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥

ভাষ্য ।—একত্রাপি সম্যগনুষ্ঠানং কপমুভয়োঃ ফলং বিদিত ইত্যাচাতে বদিতি । যং সাংখ্যোজ্ঞাননিষ্ঠঃ সংতাসিভিঃ প্রাপ্যতে স্থানং মোক্ষাখ্যং, তত্যাগৈবপি জ্ঞানপ্রাপ্ত্যপাবহেন ঈশ্বরে সমর্প্য ধর্ম্মাণি আত্মনঃ ফলম-নভিসন্ধায় অন্তর্ভুক্তি মে তে যোগিনঃ, তৈরপি পরমাত্মজ্ঞানসংতাসপ্রাপ্তি-দ্বারেন গম্যতে ইত্যভিপ্রায়ঃ, অত্র একং সাংখ্যং যোগঞ্চ যঃ পশুতি কটৈ-কত্বং স সমাক্ পশুতি ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ !—একটরই সমাক্ প্রকারে অনুষ্ঠান করিলে, উভয়েরই ফল লাভ করে, তাহা বলা বাইতেছে, যে যদিচ্যাদি । সাংখ্য (অর্থাৎ) জ্ঞাননিষ্ঠ সংতাসীগণ, যে মোক্ষ নামক স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা যোগের দ্বারাও লভ্য হয় । জ্ঞানপ্রাপ্তির উপায়, এই কারণ ঈশ্বরে কর্মের অর্পণ করিয়া এবং নিজের ফলাভিসন্ধান না করিয়া, যাহারা কর্মানুষ্ঠান

করে, তাহারাই যোগী, সেই যে গীগণ এই যোগের দ্বারা পরমার্থজ্ঞান ও সংশ্রাস লাভ করিয়া ক্রমে মোক্ষফল লাভ করিবার থাকে । ইহাই অভিপ্রায় । এই কারণেই (বলা হইয়াছে যে,) সাংখ্য ও যোগ এই দুইটিকে যে একই বলিয়া জানে অর্থাৎ এটি দুইটির একই ফল, এই প্রকার জানে, সেই সম্যক জ্ঞানবান হয় । ইহাই অর্থ ॥ ৫ ॥

সংশ্রাসস্ত মহাপ্রাণো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ ।

যোগযুক্তো মুনিব্রহ্মান চিরেণাদিগচ্ছতি ॥ ৬ ॥

অর্থঃ ।—হে মহাবাহো, সংশ্রাসঃ অযোগতঃ (যোগং বিনা) তু (কেবলং) দুঃখমাপ্তুং (ভবতি), যোগযুক্তো মুনিঃ ন চিরেণ (পরং) ব্রহ্ম অদিগচ্ছতি ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদ ।—হে মহাবাহো, যোগব্যতিরেকে সংশ্রাসাশ্রম বেদন দুঃখ-লাভের হেতু হইয়া থাকে । যোগযুক্তমুনি শীঘ্রই পরব্রহ্মের স্বরূপ নিশ্চয় করিতে সমর্থ হয় ॥ ৬ ॥

ভাষ্য ।—এবং তর্হি যোগাৎ সংশ্রাস এব বিশিষ্যতে, কথং তর্হি ইদমুক্তং তয়োস্ত কৰ্ম্মসংশ্রাসাং কৰ্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ইতি । শৃণু তত্র কারণং; তন্মা পৃষ্টং কেবলং কৰ্ম্মসংশ্রাসং কৰ্ম্মযোগকাভিপ্রেত্য তয়োব্রহ্মতরঃ কঃ শ্রোতান্ ? তদনুরূপং প্রতিবচনং ময়োক্তং কৰ্ম্মসংশ্রাসাং কৰ্ম্মযোগো বিশিষ্যত ইতি জ্ঞানমনপেক্ষ্য । জ্ঞানাপেক্ষস্ত সংশ্রাসঃ সাংখ্যমিতি ময়া অভিপ্রেতঃ । পর-মার্থ যোগশ্চ স এব । যন্ত কৰ্ম্মযোগো বৈদিকঃ স তাদর্থাৎ যোগঃ সংশ্রাস ইতি চোপচর্য্যতে কথং তাদর্থাৎ ত্রুচ্যতে ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—এই প্রকারই যদি হয় তাহা হইলে যোগ হইতে সংশ্রাসই ত উৎকৃষ্ট হইয়া উঠিল । কেন তবে বলা হইয়াছে যে, “সেই উভয়ের মধ্যে কৰ্ম্মসংশ্রাস হইতে কৰ্ম্মযোগই উৎকৃষ্ট ?” কেন এই প্রকার বলা হইয়াছে, তাহার কারণ শুন । তুমি কেবল (অর্থাৎ) জ্ঞানরহিত কৰ্ম্মসংশ্রাস এবং কৰ্ম্মযোগ এই দুইটিকে মনে করিয়া, তাহাদের মধ্যে কোনটী উৎকৃষ্ট তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহারই অনুরূপ প্রতিবচনও আমি বলিয়াছি যে, কৰ্ম্মসংশ্রাস হইতে কৰ্ম্মযোগ উৎকৃষ্ট । জ্ঞানকে অপেক্ষা না করিয়াই, আমি সংশ্রাস হইতে কৰ্ম্মযোগের উৎকৃষ্টত্ব বর্ণন করিয়াছি । জ্ঞানের উদয় হইলে যে সংশ্রাস হয়, তাহাই সাংখ্য, ইহাই আমার অভিপ্রেত । সেই সংশ্রাস-কেই পরমার্থ-যোগ কহা যায় । যে কৰ্ম্মযোগ বেদবিহিত, তাহাও সেই ১৫ই মাঘ, ১৩০৭ ।]

পরমার্থ-কর্মযোগ-প্রাপ্তির উপায়, এই জন্তই তাহাকেও কর্মযোগ ও সংহাস-
শব্দের দ্বারা লক্ষণাবৃতির সাহায্যে প্রতিপদন করা গিয়াছে । কেন কর্মযোগ
সংহাসপ্রাপ্তির কারণ, তাহা বলা যাইতেছে ॥ ৬ ॥

ভাষ্য ।—সংহাসস্ত পারমার্থিকো দুঃখপ্রাপ্ত্যযোগো যোগেন বিনা,
যোগযুক্তো বৈদিকেন কর্মযোগেন জৈগৃহমর্পিতরূপেণ ফলনিরপেক্ষেণ
যুক্তো মুনির্মিনাদীশ্বরস্বরূপস্ত মুনিব্রহ্মপংমর্থজ্ঞানলগণহাৎ প্রকৃতঃ সংহাসো
ব্রহ্মোচ্যতে, “হাস ইতি ব্রহ্মা”, “ব্রহ্মহিপর” ইতি শ্রুতেঃ ব্রহ্মপরমার্থ-
সংহাসং পরমাত্মজ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণং নচিরেণ ক্ষিপ্রেমোদগচ্ছতি প্রাপ্নোতি,
অতো ন্যয়োক্তং কর্মযোগো বিশিষ্যত ইতি ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—যোগ না হইলে পারমার্থিক সংহাস কেবল দুঃখপ্রাপ্তিরই
কারণ হইয়া থাকে । যোগযুক্তঃ (অর্থাৎ) ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত, জৈগৃহ-
মর্পিত, বেদবিক্তি কাম্যাহুষ্ঠান রূপ যোগ যাচর আছে, সেই যোগযুক্ত এবং
মুনি অর্থাৎ জৈগৃহের মননকর্তা যে ব্যক্তি, সে আত্মশিবই পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত
হইয়া থাকে । আত্মজ্ঞানেরই স্বরূপ সংহাস, এই কারণে এই স্থানে পরব্রহ্ম-
শব্দের দ্বারা সংহাসই প্রতিপাদিত হইতেছে । শ্রুতহেতু উক্ত হইয়াছে যে,
হাস (অর্থাৎ) সংহাসই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মই পর (শব্দের প্রতিপাদ্য), এই
কারণেই বলিয়াছি যে কর্মযোগই (জ্ঞানরহিত সংহাস হইতে) উৎকৃষ্ট ॥ ৬ ॥

যোগযুক্তো বিজ্ঞান্য বিজিতান্য জিতেন্দ্রিয়ঃ ।

সর্গভূতান্ন ভূতান্য কুর্সন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭ ॥

অর্থ ।—(যঃ) যোগযুক্তঃ বিজ্ঞান্য বিজিতান্য জিতেন্দ্রিয়ঃ সর্গভূতা-
ন্মভূতান্য (সঃ) কুর্সন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭ ॥

মুগ্ধানুবাদ ।—যে ব্যক্তি যোগযুক্ত, বিজ্ঞান্য, বিজিতান্য, জিতেন্দ্রিয় ও
সর্গভূতান্নভূতান্য, সে কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াও লিপ্ত হয় না ॥ ৭ ॥

ভাষ্য ।—যদা পুনঃ সমাগদর্শনপ্রাপ্ত্যাপ্যস্বেন যোগেন যুক্তো যোগ-
যুক্তো বিজ্ঞান্য বিজ্ঞান্যো বিজিতান্য বিজিতেন্দ্রিয়ঃ সর্গভূতান্ন-
ভূতান্য সর্গেবাং ব্রহ্মাদীনাম্ স্বত্বপর্গাস্তানাম্ ভূতান্যাম্মভূত তান্য সমাগদর্শ-
ন ইত্যর্থঃ । স তত্রৈব বর্তমানো লোকসংগ্রহস্য কর্ম কুর্সন্নপি ন লিপ্যতে ন
কর্মভিক্ষ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—যেকালে এই (সাধক) সমাগদর্শন প্রাপ্তির উপায়
৬২ উদ্বোধন । [৩য়—২য় সংখ্যা ;

পূৰ্ণোক্ত যোগের অনুষ্ঠান (ইচ্ছা যোগসূক্ত শব্দের অর্থ), (যে ব্যক্তি)
 বিশুদ্ধাত্মা (অর্থাৎ) বিশুদ্ধসত্ত্ব (যে ব্যক্তি) নিজাত্মা (অর্থাৎ) বশী-
 কৃতদেহ এবং জিতেজিয়, (যে ব্যক্তি) সৰ্বভূতায়ত্ত্বাত্মা (অর্থাৎ) ব্রহ্ম
 হইতে সম্বন্ধ পর্যান্ত সকল ভূতের আত্মাই যাহার আত্মা হইয়াছে, অর্থাৎ যে
 ব্যক্তি সমাগ্ জ্ঞানবান, সেই ব্যক্তি এককণ হইয়াও কেবল লোকসংগ্রহের
 জগৎ কর্ম করিলেও লিপ্ত হয় না, অর্থাৎ বশ্য দ্বারা বদ্ধ হয় না ॥ ৭ ॥

নৈব কিঞ্চিৎ কৰোমীতি যুক্তো মন্ত্ৰেত তত্ত্ববিৎ ।

পশুন্ শৃণ্বন্ স্পৃশ্বন্ জিঘ্রক্সন্ গচ্ছন্ স্বপন্ খসন্ ॥ ৮ ॥

প্রলপন্ দিসৃজন্ গৃহ্নন্ উন্মিসন্ নিমিষন্পি ।

ইন্দ্রিগণীন্দ্রিয়ার্থেযু বর্জন্ত ইতি ধারণন ॥ ৯ ॥

অর্থঃ—তত্ত্ববিৎ যুক্তঃ পশুন্ শৃণ্বন্ জিঘ্রক্সন্ স্বপন্ খসন্ প্রলপন্
 উন্মিসন্ নিমিষন্ অপি ইন্দ্রিগণি ইন্দ্রিয়ার্থেযু বর্জন্ত ইতি ধারণন নৈব কিঞ্চিৎ
 কৰোমি ইতি মন্ত্ৰেত ॥ ৮।৯ ॥

মূলানুবাদ ।—দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, স্রাণ, ভোজন, গমন, স্বপ্ন, খাস, প্রলপন,
 বিনর্গ, গ্রহণ, উন্মেষ ও নিমেষ প্রভৃতি কাব্য করিয়াও তত্ত্বজ্ঞানী যুক্তব্যক্তি
 বিবেচনা করিয়া থাকে যে, ইন্দ্রিয় সকল (স্বভাবের বশে) ইন্দ্রিয়ার্থে প্রবৃত্ত
 হইতেছে, (আমার ইহাতে কোন দিকার নাই), সুতরাং ইহাই ভাবিবে
 যে, আমি কিছুই করিতেছি না ॥ ৮।৯ ॥

ভাষ্য ।—ন চার্মো পরমার্থতঃ কৰোতি, অতঃ নৈব কিঞ্চিৎ কৰোমীতি
 যুক্তঃ সমাহিতঃ সন মন্ত্ৰেত চিত্তয়েৎ । তত্ত্ববিদ্ আত্মনো যথাযথা তত্ত্বং বেত্তি
 ইতি তত্ত্ববিৎ পরমার্থদর্শী ইত্যর্থঃ । কদা কথং বা তত্ত্বমবধারণন্ মন্ত্ৰেত
 ইচ্ছাচাতে, মন্ত্ৰেতেতি পূৰ্বেণ সম্বন্ধঃ । যত্বেবং তত্ত্ববিদঃ সৰ্ব্বকার্য্যকরণ-
 চেষ্টাসু কর্মসু অকর্মেব পশুতঃ সমাগ্ দর্শিনস্তস্য সৰ্ব্বকৰ্মসংগ্রাস এবাধিকারঃ
 কৰ্ম্মণোহভাবদর্শনাৎ । নহি মৃগতৃষ্ণায়াং উদকবুদ্ধ্যাপানায় প্রবৃত্ত উদকা-
 ভাণ্ডজ্ঞানেহপি হঠেব পানপ্রয়োজনায় প্রবর্ত্ততে ॥ ৮।৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—এই তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি পরমার্থতঃ কোন কার্য্যই করে না,
 এই ■■■ তত্ত্ববিৎ (অর্থাৎ) পরমার্থদর্শী সমাহিতচেতা হইয়া চিন্তা করিবে
 যে, আমি কিছুই করি না, আত্মার যথাযথা যে ব্যক্তি জানে, তাহাকেই তত্ত্ব-
 বিৎ বলা যায় । কখন, কোন সময়ে, আত্মার তত্ত্ব অবধারণ পূর্বক এইভাবে
 ১৫ই মাঘ, ১৩০৭ ।]

উদ্বোধন ।

৬৩

বিচার করিলে, তাহাই বলা যাইতেছে যে ; এই প্রোবেও ক্ষেত্রে এই ক্রিয়ার সঞ্চিত সম্বন্ধ আছে । যে ব্যক্তি এই প্রকার তত্ত্ববিদ (অর্থাৎ) সকল প্রকার কার্য ও করণের চেষ্টাতে য ব্যক্তি অকর্ম্ম ব্রহ্মের স্বরূপ দর্শন করিয়া থাকে, সেই সমাগ্দর্শীর সম্বন্ধসম্মানসেই অধিকার আছে, কারণ তাহার কর্ম্মের অভাব দর্শন হইয়াছে । যে ব্যক্তি যুগতুষ্ণায় জ্ঞানপ্রাপ্তিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহার পবে তাহাতে জ্ঞানের অভাব জ্ঞান হইলে, তাহাতেই আবার তাহার পানাদি প্রয়োজনের জন্য প্রবৃত্তি কখনও সম্ভবপর নহে ॥ ৮৯ ॥

ব্রহ্মাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যজ্য করেতি যঃ ।

নিপাতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাস্তসা ॥ ১০ ॥

অর্থ্য ।—যঃ ব্রহ্মাধায় সঙ্গং ত্যজ্য কর্ম্মাণি করেতি, যঃ অন্তসা পদ্মপত্র-
মিব পাপেন ন নিপাতে ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদ ।—যে ব্যক্তি ঈশ্বরে নিক্ষেপ করিয়া সঙ্গত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্মের
অন্তর্ধান করে, সে পাপে লিপ্ত হয় না, যেমন পদ্মপত্র জলে লিপ্ত
হয় না ॥ ১০ ॥

ভাষ্য ।—যন্ত পুনরতত্ত্ববিৎ প্রবৃত্তস্ত কর্ম্মযোগে ব্রহ্মাধায় ঈশ্বরে আধায়
নিক্ষিপ্য, তদর্থং কেরোমীতি ভূতাইব স্বাম্যর্থং সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি মোক্ষোহপি ফলে
সঙ্গং ত্যজ্য করেতি যঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি, নিপাতে ন স পাপেন সম্বন্ধেতে পদ্মপত্রমিব
অন্তসা উদগেহন ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে নাই, অর্থাৎ কর্ম্ম-
যোগে প্রবৃত্ত, সে ব্যক্তি ব্রহ্মে (অর্থাৎ) ঈশ্বরে নিক্ষেপ করিয়া, মোক্ষরূপ
ফলেতেও সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সকল কর্ম্মের অন্তর্ধান করে, (ও) সে পাপের
দ্বারা লিপ্ত হয় না, যেমন পদ্মপত্র জলের দ্বারা লিপ্ত হয় না ॥ ১০ ॥

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিদ্রিয়ৈরপি ।

যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্কন্তি সঙ্গং ত্যক্তান্নশুদ্ধয়ে ॥ ১১ ॥

অর্থ্য ।—যোগিনঃ সঙ্গং ত্যক্তা আশুদ্ধয়ে কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈ-
রিদ্রিয়ৈরপি কর্ম্ম কুর্কন্তি ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ ।—যোগিগণ আশক্তি পরিহার করিয়া চিত্তশুদ্ধির জন্ত, দেহ, মন,
বুদ্ধি ও কেবল ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা কর্ম্মের অন্তর্ধান করিয়া থাকে ॥ ১১ ॥

পরমহংসদেবের

উপদেশ

(স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রদত্ত)



১। আমি ছেলেদের এত ভালবাসি কেন জানি? ছেলেবেলা তাদের মন খোল আনা নিজের কাছে থাকে, ক্রমে ভাগ হয়ে পড়ে। বে হলে আট আনা জ্বীর উপর যায়, ছেলে হলে আবার চার আনা তাদের প্রতি যায়, বাকী চার আনা মা, বাপ, মান সম্মম, বেশভূষা ইত্যাদিতে চলে যায়; এই জন্ত ছেলেবেলায় বারী ঈশ্বর লাভের চেষ্টা করে, তারা সহজে তাঁকে লাভ করতে পারবে। বুড়োদের হওয়া বড় কঠিন।

২। যেমন টীয়া পাখীর গলায় কাঁটা উঠলে আর পড়ে না, ছানা বেলায় শেখালে শীঘ্র পড়ে, তেমনি বুড়ো হলে সহজে ঈশ্বরে মন যায় না, ছেলে বেলায় তাদের মন অন্তরেই স্থির হয়।

৩। যেমন কচি বাঁশ অতি সহজে নোয়ান যায়, পাকা বাঁশ নোয়াতে গেলে ভেঙ্গে যায়, তেমনি ছেলেদের মন সহজে ঈশ্বরে নিয়ে যাওয়া যায়; কিন্তু বুড়োদের মন ঈশ্বরের দিকে টানতে গেলে ছেড়ে পালায়।

৪। এক সের ছুধে এক ছটাক জল থাকলে, সহজে অঙ্গ জ্বাল দিয়ে ক্ষীর করা যায়, কিন্তু একসের ছুধে তিন পোয়া জল থাকলে সহজে ক্ষীর হয় না, অনেক কচি খড় পুড়িয়ে জ্বাল দিতে হয়, তবে হয়; সেই রকম বালকের মনে বিষয় বাসনা খুব কম, এইজন্ত একটুতে ঈশ্বরের দিকে যায়, কিন্তু বুড়োদের মনে বিষয় বাসনা গজ গজ করে, তাইতে তাদের মন সহজে তাঁর দিকে যায় না।

৫। মাহুষের মন যেন সরসের পুটলী। সরসের পুটলী একবার ছড়িয়ে গেলে যেমন কুড়ান ভার হয়ে ওঠে, তেমনি মাহুষের মন একবার সংসারে ছড়িয়ে গেলে, তখন স্থির করা বড় কঠিন হয়ে পড়ে। বালকের মন ছড়ায় নি, অন্তরেই স্থির হয়, কিন্তু বুড়োদের খোল আনা মন সংসারে ছড়িয়ে রয়েছে, সংসার থেকে মন তুলে ঈশ্বরে স্থির হওয়া বড় শক্ত।

শ্রীতি উপহার ।

(শ্রীযুক্ত গিরীশ চন্দ্র বোম্ব ।)

লোম্পদে বিপদে মতি অটল যাহার,—
 ধনমদে নহে মত্ত, সত্য তার মনুষ্যত্ব,
 তুষ্ট-রুষ্ট ভাষে মনে, না জন্মে বিকার,—
 কার্ণা হেতু কার্যে রত, যেই জন মহাব্রত,
 কার্যের বাসনা মাত্র কার্যে অধিকার—
 ভূদন-ভিলক,—জন্ম সার্থক তাহার !

ভাসমান এ সংসার বোদন-ধারায়,
 যেই জন স্বার্থভাগী, পর দুঃখে হয়ে ভাগী,
 অনাথ বিধবা অশ্রু যতনে মুছায়,—
 দুর্জনে শাসনে বল, সুজনের শান্তি স্থল,
 বৃদ্ধু, তাপিত, ভীত—আশ্রিত যথায় ?
 পর-ভার-বাহী তার তুলনা কোথায় ?

বালা প্রেম, বালাবন্ধ, বালা-সংস্কার—
 যেই জন উচ্চাসনে, বালাদিন রাখি মনে,
 বালা-বন্ধ মনে করে বালক ব্যাভার,
 সেইরূপ একান্তর, নাহি কভু ভাবান্তর,
 নিরন্তর সরল নির্মল প্রেম ধার,—
 প্রেম পুষ্পে সুবাসিত হৃদয়-আগার ।

স্বধীর-সুজন-ব্রজ-নিয়ত-বেষ্টিত,
 বহি ঞ্জ রাজ্যভার, সদসদ্ সুশিচার,
 প্রজার মঙ্গল রত সতত যে চিত্ত,—
 প্রিয় পুত্র জননীর, স্বদেশ-বৎসল ধীর,
 জয় জয় রাজ্যেশ্বর মহিমা-মণ্ডিত ।
 শ্রীতি-পুলকিত নট করে স্ততি-গীত ॥

পরিব্রাজক ।

স্বামী বিবেকানন্দ ।]

[১৬ পৃষ্ঠার পর ।

আজ ২৩শে অক্টোবর ; কাল সন্ধ্যার সময় পারিস হতে বিদায় । এ বৎসর এ পারিস সভ্য জগতের এক কেন্দ্র, এ বৎসর মহাপ্রদর্শনী । নানা দিক্ দেশ সমাগত সজ্জন সম্মত । দেশ দেশান্তরের মনীষিগণ নিজ নিজ প্রতিভা প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করছেন, আজ এ পারিসে । এ মহা কেন্দ্রের ভেরী-ধ্বনি আজ ধীর নাম উচ্চারণ করবে, সে নাদ তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে সর্বজন সমক্ষে গৌরবারিত করবে । আর আমার জন্মভূমি—এ জার্মান, ফরাণী, ইংরাজ, ইতালী প্রভৃতি যুগমণ্ডলী-মণ্ডিত মহারাজ-খানীতে তুমি কোথায়, বঙ্গভূমি ? কে তোমার নাম নেয় ? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা কবে ? সে বহু গৌরবর্ণ প্রাতিত মণ্ডলীর মধ্য হতে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির, আমাদের মাতৃভূমির, নাম ঘোষণা করলেন,—সে বীর জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে, সি, বোস । একা যুগা বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক, আজ বিদ্যাব্যবেগে পাশ্চাত্য মণ্ডলীকে নিজের প্রতিভা মহীমান্ন মুগ্ধ করলেন, সে বিদ্যাসংস্কার মাতৃভূমির যুতপ্রায় শরীরে নবজীবন তরঙ্গ সঞ্চার করলে । সমগ্র বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ জগদীশ বসু—ভারতবাসী, বঙ্গবাসী ! ধাত্ত বীর ! বসুজ্ঞ এ তাঁহার সতী, সাধবী, সর্বগুণ-সম্পন্না গেহিনী যে দেশে যান, সেখানেই ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেন—বাঙ্গালীর গৌরব বর্দ্ধন করেন । ধাত্ত দম্পতী !

আর মিঃ লেগেট প্রভূত অর্থব্যয়ে তাঁর পারিসস্থ প্রাসাদে ভোজনাদি-ব্যপদেশে নিত্য নানা যশস্বী যশস্বিনী নর নারীর সমাগম সিদ্ধ করেছেন—তারও আজ শেষ ।

কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, নৈতিক, সামাজিক, গায়ক, গায়িকা, শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী, চিত্রকর, শিল্পী, ভাস্কর, বাদক—প্রভৃতি নানা জাতের গুণীগুণ-সমাবেশ, মিষ্টর লেগেটের আতিথ্য সমাদর আকর্ষণে, তাঁর গৃহে । সে পর্ব্বত-নির্ব্বরবৎ কথাচ্ছটা, অগ্নিস্কুলিগ্নবৎ চতুর্দিক্‌সমুখিত ভাববিকাশ, মোহিনী-সঙ্গীত, মনীষ-মনঃসংঘর্ষ-সমুখিত-চিন্তামন্ত্রপ্রবাহ, সকলকে দেশ কাল ভুলিয়ে মুগ্ধ করে রাখত,—তারও শেষ ।

সকল জিনিসেরই অন্ত আছে । আর আজ আর একবার, পূজীকৃত-ভাবরূপ হির মোদামিনো, এই অপূর্ণ ভূষণ-সমাবেশ পারিস্ এক্স্‌হিবিশন, দেখে এলুম ।

আজ ছ তিন দিন ধরে পারিসে ক্রমাগত বৃষ্টি হচ্ছে । ফ্রান্সের প্রতি সদা সদয় সূর্য্যদেব আজ কদিন বিরূপ । নানাদিক্‌দেশাগত শিল্প শিল্পী, বিদ্যা ও বিদ্বানের পশ্চাতে গুচ ভাবে প্রবাহিত হাঁস্রয় বিলাসের শ্রোত দেখে, স্বপ্নায় সূর্য্যের মুখ মেঘকলুষিত হয়েছে, অথবা কাষ্ঠ, বস্ত্র ও নানা রাগ রঞ্জিত এ মায়া অমরাবতীর, আশু বিনাশ ভেবে, তিনি ছুখে মেঘাবলুষ্ঠনে মুখ ঢাকলেন ।

আমরাও পানিরে বাঁচি, একজিগিসন ভাস্মা এক বৃহৎ ব্যাপার । এই ভূষণ, নন্দনোপম পারিসের রাস্তা, এক হাটু কাদা চুণ বালিতে পূর্ণ হবেন । ছ একটা প্রধান ছাড়া, এম্মিবিজনের সমস্ত বাড়ি ঘর দোরই, পাঠ, কুঠরো, হেঁড়া ত্রাতা, আর চুণকাদের খেলা বহিত নয়—যেমন সমস্ত সংসার । তা যখন ভাস্মতে থাকে, সে চুণের গুঁড়ো উড়ে দম আটকে দেয়,—ছাতা চোতার, বালি প্রভৃতিতে পথ ঘাট কদর্যা করে তোলে, তার উপর বৃষ্টি হলেই সে পিরাট বাণ ।

২৪শে অক্টোবর সন্ধ্যার সময় ট্রেন পারিস ছাড়লে, অন্ধকার রাত্রি ; দেখ-বার কিছুই নাই ; আনি আর মন্দির বোয়া এক কানরায় । শীঘ্র শীঘ্র শয়ন করলুম । নিদ্রা হতে উঠে দেখি,—আমরা ফরাসী সীমানা ছাড়িয়ে, জার্মান সাম্রাজ্যে উপস্থিত । জার্মানি পূর্বে বিশেষ করে দেখা আছে, তবে ফ্রান্সের পর জার্মানি—বড়ই প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব । বাতোকতোহস্তশিপরং পতিরোষধীনাং—একদিকে ভুবনস্পর্শী ফ্রান্স প্রতিহিংসানলে পুড়ে পুড়ে আস্তে আস্তে থাক্ হয়ে যাচ্ছে । আর একদিকে বেক্সীকৃত নৃতন, মহাবল জার্মানি মহাবেগে উন্নয়-শিখরাভিমুখে চলেছে । কৃষ্ণবেশ, অপেক্ষাকৃত ধর্ম্মকায়, শিল্পপ্রাণ, বিলাস-প্রিয়, অতি সুসভা ফরাসীর শিল্প বিজ্ঞান, আর একদিকে হিরণ্যাকেশ, দীর্ঘা-কার, দিগ্‌নাগ জার্মানির স্থূল-হস্তাবলম্ব । পারিসের পর পাশ্চাত্য জগতে আর নগরী নাই ; সব সেই পারিসের নকল, অন্ততঃ চেষ্টা । কিন্তু ফরাসীতে সে শিল্প স্বভাবের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য ; জার্মানে, উৎসাহে, আমেরিকে, সে অলঙ্করণ স্থূল । ফরাসীর বল বিজ্ঞানও যেন রূপপূর্ণ ; জার্মানীর রূপবিকাশ-চেষ্টাও বিতীর্ণ । ফরাসী প্রতিভার, মুখগুণল ক্রোধাক্ত হলেও সুন্দর ; জার্মান প্রতিভার মধুর

হাস্ত-বিমণ্ডিত আননও যেন ভয়ঙ্কর। ফরাসীর সত্যতা স্নায়ুঘর, কপূরের মত, কস্তুরীর মত, এক মুহূর্তে উড়ে ঘর দোর ভরিয়ে দেয়; জর্মান সত্যতা পেশীময়, সোনার মত, পারার মত ভারি, যেখানে পড়ে আছে, ত পড়েই আছে। জর্মানের মাংসপেশী ক্রমাগত, অশ্রান্তভাবে ঠুক ঠাক হাতুড়ি আজন্ম মারতে পারে। ফরাসীর নরম শরীর, মেয়ে মানুষের মত; কিন্তু যখন কেশ্মীভূত হয়ে আঘাত করে, সে কামারের এক ঘা; তার বেগ সহ্য করা বড়ই কঠিন।

জর্মান ফরাসীর নকলে বড় বড় বাড়ি অট্টালিকা বনাচ্ছেন,—বৃহৎ বৃহৎ মূর্তি, অগারোহী, রণী, সে প্রাঙ্গণের শিখরে স্থাপন করছেন। কিন্তু, জর্মানের দোতলা বাড়ি দেখলেও, জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়,—এ বাড়ি কি মানুষের বাসের জন্ত, না হাতি উটের “তবেলা”? আর ফরাসীর পাঁচতলা, হাতি দোঁড়া রাখবার বাড়ি দেখে ভ্রম হয় যে, এ বাড়িতে বৃদ্ধি পরীতে বাস করবে।

আমেরিকা জর্মান প্রবাহে অনুপ্রাণিত, লক্ষ লক্ষ জর্মান প্রত্যেক সহরে। ভাষা ইংরাজি হলে কি হয়,—আমেরিকা আস্তে আস্তে জর্মানিত হয়ে যাচ্ছে। জর্মানির প্রবল বংশবিস্তার, জর্মান বড়ই কষ্টসহিষ্ণু। আজ জর্মানি ইউরোপের আদেশ-দাতা; আর সকলের উপর, অগ্রাগ্র জাতির অনেক আগে, জর্মানি, প্রত্যেক নর নারীকে, রাজনগের ভয় দেখিয়ে, বিদ্যা শিখিয়েছে। আজ সে বৃক্ষের ফল ভোজন হচ্ছে। জর্মানির সৈন্ত, প্রতিষ্ঠায় সর্বশ্রেষ্ঠ; জর্মানি প্রাণপণ করেছে, যুদ্ধ পোতেও সর্বশ্রেষ্ঠ হতে; জর্মানির পণ্য-নির্যাস ইংরাজকেও পরাজিত করেছে। ইংরাজের উপনিবেশেও জর্মান-পণ্য, জর্মান-মহুযা, ধীরে ধীরে একাধিপত্য লাভ করেছে; জর্মানির স্রষ্টার আদেশে, সর্ব-জাতি, চীনক্ষেত্রে, অবনক যন্তকে, জর্মান সেনাপতির অধীনতা স্বীকার করছেন।

সারাদিন ট্রেণ জর্মানির মধ্য দিয়ে চল্লে; বিকাল বেলা জর্মান আধিপত্যের প্রাচীন কেন্দ্র, এখন পর-রাজ্য, অষ্ট্রিয়ার সীমানায় উপস্থিত। এ যুরোপে বেড়াবার কতকগুলি হাঙ্গামা আছে। প্রত্যেক দেশেতেই, কতকগুলি জিনিসের উপর, বেজায় গুরু; অথবা কোনও কোনও পণ্য সরকারের এক চেটে, যেমন তামাক। আবার রুশ ও তুর্কিতে, তোমার রাজার ছাড়পত্র না থাকলে, একেবারে প্রবেশ নিষেধ; ছাড়পত্র অর্থাৎ পাস্‌পোর্ট একান্ত আবশ্যিক। তা ছাড়া, রুশ এবং তুর্কিতে, তোমার বই পত্র কাগজ সব কেড়ে নেবে; তারপর, তারা পড়ে শুনে, যদি বোঝে যে তোমার কাছে তুর্কি বা রুশের

রাজত্বের বা ধর্মের বিপক্ষে কোনও বই কাগজ নাই, তা'হলে তা তখন ফিরিয়ে দেবে। নতুবা সে সব বই পত্র জপ্ত করে নেবে। অত্র অত্র দেশে এ পোড়া তামাকের হাঙ্গামা বড়ই হাঙ্গামা। সিঙ্কুক, প্যাটরা, গাঁটরি, সব খুলে দেখাতে হবে, তামাক প্রভৃতি আছে কি না। আর কন্স্টান্টিনোপল আস্তে গেলে, দুটো বড় জর্ম্মাণি আর অষ্ট্রিয়া, এবং অনেকগুলো ক্ষুদে দেশ মধ্য দিয়ে আস্তে হয় ;—ক্ষুদেগুলো পূর্বের তুরকের পবগণা ছিল, এখন স্বাধীন কন্সটান রাজারা একত্র হয়ে, মুসলমানের হাত থেকে, যতগুলো পেরেছে, কন্সটান-পূর্ণ পরগণা ছিনিয়ে নিয়েছে। এ ক্ষুদে পিপড়ের কামড়, ও ডেওদের চেয়ে অনেক অধিক।

২৫এ অক্টোবর সন্ধ্যার পর ট্রেণ অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা নগরীতে পৌঁছান। অষ্ট্রিয়া ও রুমিয়ায় রাজবংশীয় নর নারীকে আর্কডুক ও আর্কডচেস্ বলে। এ ট্রেণে ছজন আর্কডুক ভিয়েনার নাববেন ; তাঁরা না নাবলে অশান্ত যাত্রীর আর নাববার অধিকার নাই। আমরা অপেক্ষা করে বইলুম। নানা প্রকার জরিবুটার উদ্দিপরা জনকতক মৈনিক পুরুষ এবং পর-লাগান টুপি মাথায় জনকতক মৈত্র আর্কডুকদের জন্ত অপেক্ষা করছিল। তাঁদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আর্কডুকছয় মনে গেলেন। আমরাও বাচলুম—ভাড়াভাড়ি নেমে, সিঙ্কুকপত্র পাশ্ করাবার উদ্যোগ করতে লাগলুম। যাত্রী অতি অল্প ; সিঙ্কুক পত্র দেখিয়ে ছাড় করাতে বড় দেরি লাগলো না। পূর্বের হতে এক হোটেল ঠিকানা করা ছিল ; সে হোটেলের লোক গাড়ী নিয়ে অপেক্ষা করছিল। আমরাও, যথাসম্ভব সময়ে, হোটেল উপস্থিত হলুম। সে রাতে আর দেখা শুনা কি হতে ; পরদিন প্রাতঃকালে সূর্য দেখতে বেরলুম। সমস্ত হোটেলেরই এবং ইউরোপের ইংলণ্ড ও জর্ম্মাণি ছাড়া প্রায় সকল দেশেই করাসী চাল। হিটদের মত ঢাবার বাওয়া। প্রাতঃকালে ছপছরের মধ্যে ; সাংকালে ৮টার মধ্যে। প্রত্যয়ে অর্থাৎ ৮৯টার সময় একটু কাফি পান করা। চায়ের চাল, ইংলণ্ড ও রুমিয়া ছাড়া, অত্র বড়ই কম। দিনের ভোজনের করাসী নাম—“দেজুনে”, অর্থাৎ উপবাসভঙ্গ, ঠংরাজী ত্রেক্কাষ্ট। সাংক ভোজনের নাম—“দিনে”, ঠং “ডিনার”। চা-পানের ধুম রুমিয়াতে অত্যন্ত—বেজায় ঠাণ্ডা, আর চীন সরিকট। চীনের যা খুব উত্তম চা, তার অধিকাংশ ব্যর্থ, কষে। কষের চা-পানও চীনের অহরূপ, অর্থাৎ দুধ মিশান নেই। দুধ মিশালে চা বা কাফি বিষের ভ্রায় অপকারক। আসল চা-পায়ী জাতি চীনে, জাপানি, রুষ, মধ্য-আসিয়া-বাসী, বিনা দুধে চা পান করে ; শুধু

আবার তুর্ক প্রভৃতি আদিম কাফি-পায়ী জাতি বিনা দ্রুপ্তে কাফি পান করে। তবে রুশিয়ার তার মধ্যে এক টুকু পাতি নেবু এবং এক ডেলা চিনি চায়ের মধ্যে ফেলে দেয়। গরীবেরা এক ডেলা চিনি মুখের মধ্যে রেখে, তার উপর দিয়ে চা পান করে এবং এক জের পান শেষ হলে, আর একজনকে সে চিনির ডেলা বার করে দেয়। সে ব্যক্তিও সে ডেলা মুখের মধ্যে রেখে পূর্ববৎ চা পান করে।

ভিয়েনা সহর পারিসের নকল ছোট সহর। তবে অষ্ট্রিয়ানরা হচ্ছে জাতিতে জর্মান। অষ্ট্রিয়ার বাদশা এককাল প্রায় সমস্ত জর্মানীক বাদশা ছিলেন। বর্তমান সময়ে, প্রফরাজ ভিলহেল্মের দূরদর্শিতায়, মন্ত্রীবার বিম্বার্কের অপূর্ববুদ্ধিকৌশলে, আর সেনাপতি ফন্মন্টকির যুদ্ধপ্রতিভায়, প্রফরাজ অষ্ট্রিয়া ছাড়া সমস্ত জর্মানীর একাধিপতি বাদশা। হতশ্রী হতবীৰ্য অষ্ট্রিয়া কোনও মতে পূর্বকালের নাম গৌরব বক্ষা করছেন। অষ্ট্রীয় রাজবংশ—হাপ্সবুর্গ বংশ, ইয়ুরোপের সর্বাধিপতি। প্রাচীন ও অভিজাত রাজবংশ। সে জর্মান রাজত্ব-কুল ইয়ুরোপের প্রায় সর্বদেশেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, যে জর্মানীর ছোট ছোট করদ রাজা, ইংলণ্ড ও রুশিয়াতেও, মহাবল সাম্রাজ্যশীর্ষে সিংহাসন স্থাপন করেছে, সেই জর্মানীর বাদশা এককাল ছিল এই অষ্ট্রীয় রাজবংশ। সে মান, সে গৌরবের ইচ্ছা, সম্পূর্ণ অষ্ট্রিয়ার রয়েছে,—নাই শক্তি। তুর্ককে ইয়ুরোপের আতুর বৃদ্ধ পুরুষ বলে; অষ্ট্রিয়াকে, আতুর বৃদ্ধা স্ত্রী বলা উচিত। অষ্ট্রিয়া ক্যাথলিক সম্প্রদায় ভুক্ত; সেদিন পর্যন্ত অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের নাম ছিল—“পবিত্র রোম সাম্রাজ্য”। বর্তমান জর্মানী প্রটেস্ট্যান্ট-প্রবল। অষ্ট্রীয় সম্রাট চিরকাল পোপের দক্ষিণ হস্ত, অনুগত শিষ্য, বোম্বক সম্প্রদায়ের নেতা। এখন ইউরোপে ক্যাথলিক বাদশা কেবল এক অষ্ট্রীয় সম্রাট; ক্যাথলিক সম্রাটের বড় মেয়ে ফ্রান্স এখন প্রজাতন্ত্র; স্পেন, পোর্চুগাল অধঃপাতিত; ইটালি পোপের সিংহাসন মাত্র স্থাপনের স্থান দিয়েছে; পোপের ঐশ্বর্য, রাজা সমস্ত কেড়ে নিয়েছে; ইতালীর রাজা, আর বোমের পোপে, মুখ দেখা দেখি নাই, বিশেষ শক্ততা। রোম, পোপের রাজধানী, এখন ইতালীর রাজধানী; পোপের প্রাচীন প্রাসাদ দখল করে, রাজা বাস করছেন; পোপের প্রাচীন ইতালী রাজ্য এখন পোপের ভ্যাটিকান (Vatican) প্রাসাদের চতুঃসীমানায় আবদ্ধ। কিন্তু পোপের ধর্মসম্বন্ধে প্রাধান্য এখনও অনেক—সে ক্ষমতার বিশেষ সহায় অষ্ট্রিয়া। অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে, বহুকালব্যাপী, ও পোল-সহায়

অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের বিকল্পে নব্য ইতালীর অভ্যুত্থান । অষ্ট্রিয়া কাজেই বিপক্ষ, ইতালী খুইয়ে বিপক্ষ । মাঝখানে থেকে ইংলণ্ডের কুপরামর্শে নবীন ইতালী, মহাশয়গণ, রণপোত-বল সংগ্রহে বদ্ধকর হলো । সে টাকা কোথায় ? ঋণজালে জড়িত হয়ে, ইতালী উৎসন্ন খাবার দশায় পড়েছে ; আবার কোথা হতে উৎপাত—আফ্রিকার রাজ্য বিস্তার করতে গেলো । হাবসি বাদসার কাছে হেরে, হতভী হতমান হয়ে, বসে পড়েছে । এ দিকে প্রুসিয়া মহা-যুদ্ধে হারিয়ে অষ্ট্রিয়াকে বহুদূর হঠিয়ে দিলে । অষ্ট্রিয়া ধীরে ধীরে মরে যাচ্ছে, আর ইতালী নব জীবনের অপব্যবহারে তদন্ত জালবদ্ধ হয়েছে ।

অষ্ট্রিয়ার রাজবংশের এখনও ইউরোপের সকল রাজবংশের অপেক্ষা গুণমর । তাঁরা অতি প্রাচীন, অতি বড় বংশ । এ বংশের বেথা বড় দেখে শুনে হয় । ক্যাথলিক না হয়ে, সে বংশের সঙ্গে বেথা হয়ই না । এই বড় বংশের ভাঁওতায় পড়ে, মহাবীর নেপলজঁর অধঃপতন !! কোথা হতে তাঁর মাথায় ঢুকলো, যে বড় রাজবংশের মেয়ে বে করে, পুত্র পোত্রাদিক্রমে এক মহাবংশ স্থাপন করবেন । যে বীর, “আপনি কোন বংশে অবতীর্ণ ?”, এ প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে, “আমি কারুর বংশের সন্তান নই—আমি মহাবংশের স্থাপক”, অর্থাৎ আমি হতে মহীমাখিত বংশ চলবে । আমি কোনও পূর্বপুরুষের নাম নিয়ে বড় হতে জন্মাইনি, সেই বীরের এ বংশ-মর্যাদারূপ অঙ্ককূপে পতন হলো ।

রাজ্ঞী জোসেফিনকে পরিত্যাগ, যুদ্ধে পরাজয় করে অষ্ট্রিয়ার বাদসার কণ্ঠা গ্রহণ, মহা সমারোহে অষ্ট্রীয় রাজকন্যা মারি লুইসের সহিত বোনাপার্টের বিবাহ, পুত্রজন্ম, সত্ত্বজাত শিশুকে রোমরাজ্যে অভিষিক্ত করণ, ন্যাপোলয়ঁর পতন, স্বপ্নের শত্রুতা, লাইপজিস্, ওয়াটারলু, সেণ্টহেলেনা, রাজ্ঞী মেরি লুইসের সপুত্র গিউগ্‌হে বাস, সামান্য সৈনিকের সহিত বোনাপার্ট-সাম্রাজ্ঞীর বিবাহ, একমাত্র পুত্র রোমরাজ্যের মাতামহ গৃহে মৃত্যু, এ সব ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কথা ।

ফ্রান্স এখন অপেক্ষাকৃত দুর্বল অবস্থায় পড়ে প্রাচীন গৌরব স্মরণ করছে,—আজকাল ফ্রান্সে সংক্রান্ত পুস্তক অনেক । সার্দু প্রভৃতি নাট্যকার গত নেপোলয়ঁ সম্বন্ধে অনেক নাটক লিখেছেন ; মাদাম্ বারনহার্ড, রেজঁ প্রভৃতি অভিনেত্রী, কফের্ণ প্রভৃতি অভিনেতাগণ, সে সব পুস্তক অভিনয় করে, প্রতি রাতে থিয়েটার ভরিয়ে ফেলেছে । সম্প্রতি “লেগল্”—“গরুড় শাবক”—নাগক

এক পুস্তক অভিনয় করে, মাদাম্ বাবনহার্ড পারিস নগরীতে মহা আকর্ষণ উপস্থিত করেছেন।

গরুড়-শাবক হচ্ছে বোনাপার্টের একমাত্র পুত্র, মাতামহ গৃহে ভিয়েনার প্রাসাদে এক রকম নজরবন্দী। অষ্ট্রীয় বাদশার মন্ত্রী, চাণক্য মেটাব্লিক, বালকের মনে পিতার গৌরবকাহিনী যাতে একেবারে না স্থান পায়, সে বিষয়ে সদা সচেতন। কিন্তু তখন পাঁচজন বোনাপার্টের পুরাতন সৈনিক নানা কৌশলে সামবোর্ণ প্রাসাদে অজ্ঞাতভাবে বালকের ভৃত্যে গৃহীত হলো; তাদের ইচ্ছা কোনও রকমে বালককে ফ্রান্সে হাজির করে এবং সমবেত-ইয়ুরোপীয়-রাজত্বগণ-পুনঃস্থাপিত বৃহৎ বংশকে তাড়িয়ে দিয়ে বোনাপার্ট বংশ স্থাপন করা। শিশু—মহাবীর পুত্র; পিতার রণ-গৌরব-কাহিনী শুনে, সে সুপ্ত তেজ অতি শীঘ্রই জেগে উঠলো। চক্রান্তকারীদের সঙ্গে বালক সামবোর্ণ প্রাসাদ হতে একদিন পলায়ন কবলে; কিন্তু মেটাব্লিকের তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি পূর্বে হতেই টের পেয়েছিল; সে যাত্রা বন্ধ করে দিলে। বোনাপার্ট-পুত্রকে সামবোর্ণ প্রাসাদে ফিরিয়ে আনলে;—বন্ধপক্ষ গরুড়-শিশু ভগ্নহৃদয়ে অতি অল্পদিনেই প্রাণ ত্যাগ করলে।

এ সামবোর্ণ প্রাসাদ সাধারণ প্রাসাদ; অবশ্য ঘর দোর খুব সাজান বটে, কোনও ঘর খালি চীনের কাজ, কোনও ঘর খালি হিন্দু হাতের কাজ, কোনও ঘর অস্ত্র দেশ, এই প্রকার, এবং প্রাসাদস্থ উদ্যান অতি মনোহর বটে; কিন্তু যত লোক এ প্রাসাদ দেখতে যাচ্ছে, এখন সব ঐ বোনাপার্ট-পুত্র যে ঘরে শুতেন, যে ঘরে পড়তেন, যে ঘরে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল, সেই সব দেখতে যাচ্ছে। অনেক আহাম্মক ফরাসী ফরাসিনী রক্ষী পুরুষকে জিজ্ঞাসা করছে, “এগল”র ঘর কোন্টা, কোন্ বিছানায় “এগল” শুতেন!! মর আহাম্মক, এরা জানে বোনাপার্টের ছেলে। এদের মেয়ে জুলুম করে কেড়ে নিয়েছিলেন সম্রাট; সে ঘণা এদের অজ্ঞও যায় না। নাতি, রাখতে হয়, নিরাশ্রয়, রেখেছিল। তার রোমরাজ প্রভৃতি কোনও উপাধিই দিত না; খালি অষ্ট্রিয়ার নাতি, কাজেই ডাক, বস্। তাকে এখন তোরা গরুড়-শিশু করে এক বই লিখেছিস, আর, তার উপর নানা করুণা জুটিয়ে, মাদাম্ বাবনহার্ডের প্রতিভায়, সে একটা খুব আকর্ষণ হয়েছে: কিন্তু এ অষ্ট্রীয় রক্ষী সে নাহি কি করে জানবে বল? তার উপর সে বইয়ে লেখা হয়েছে যে, স্ত্রাপেলজ-পুত্রকে

অষ্ট্রিয়ান বাদ্যশাস্ত্র মেটোরনিক্ মস্ত্রীর পরামর্শে একরকম মেয়েই ফেললেন। রক্ষী “এগল” “এগল” শুনেও, মুখ হাঁড়ি কবে, গোঁজ গোঁজ করতে করতে, ঘর দোর দেখাতে লাগলো ; কি করে, বন্ধিস্ ছাড়া বড়ই দুঃখিন। তার উপর, এসব অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশে সৈনিক বিভাগে বেতন নাই বললেই হলো, এক রকম পেট ভাতায় থাকতে হয় ; অশ্রু কয়েক বৎসর পরে ঘরে ফিরে যাও। রক্ষীর মুখ অন্ধকার হয়ে স্বদেশপ্রিয়তা প্রকাশ করলে, হাত কিছু আপনা হতেই বন্ধিসের দিকে চললো। ফরাসীর দল রক্ষীর হাতকে রোপ্য-সংযুক্ত করে, এগার দল আর মেটোরনিক্কে গাল দিতে দিতে ঘরে ফিরলো—রক্ষী লম্বা সেলাম করে দোর বন্ধ করলে। মদ্য মনে সমগ্র ফরাসী জাতির বাপস্ত পিত্ত অবশ্যই করেছিল।

ভিয়েনা সহরে দেখবার জিনিস মিউসিয়ম, বিশেষ বৈজ্ঞানিক মিউসিয়ম। বিদ্যার্থীর বিশেষ উপকারক স্থান। নানা প্রকার গাণিত্য লুপ্ত জীবের অস্থাদি সংগ্রহ অনেক। চিত্রশালিকায় ওলন্দাজ চিত্রকরদের চিত্রই অধিক। ওলন্দাজ সম্প্রদায়ে, রূপ বাবু করবার চেষ্টা বড়ই বম্ ; জীব প্রকৃতির অবিকল অনুকরণ এ সম্প্রদায়ের আধাত্য কখন শিল্পী বছর কতক ধরে এক বুড়ি মাচ্ এঁকেছে, না হয় ত এক থান্ মাংস, না হয় ত এক গ্লাস জল, সে মাচ্, মাংস, গ্লাসে জল, চমৎকাব-জনক। কিন্তু সে ওলন্দাজ-সম্প্রদায়েব মেয়ে চেহারা যেন সব কুস্তীগীর পালোয়ান !!

ভিয়েনা সহরে জার্মান পাণ্ডিত্য বুদ্ধিবল আছে, কিন্তু যে কারণে তুর্কী ধীরে ধীরে অবসন্ন হয়ে গেল, সেই কারণ এণায়ও বর্তমান, অর্থাৎ নানা বিভিন্ন জাতি ও ভাষার সমাবেশ। আসল অষ্ট্রিয়ার লোক জার্মান-ভাষী ক্যাথলিক, হুঙ্গারির লোক, তাতার বংশীয়, ভাষা আলাদা, আবার কতক গ্রীক-ভাষী, গ্রীক-মতের খ্রিস্টান। এ সকল ভিন্ন সম্প্রদায়কে একীভূত করণের শক্তি অষ্ট্রিয়ার নাই। কাজেই অষ্ট্রিয়ার অধঃপতন।

বর্তমানকাল ইয়ুরোপ খণ্ডে জাতীয়তার এক মহা তরঙ্গের প্রাচুর্ভাব। এক ভাষা, এক ধর্ম, এক জাতীয় সমস্ত লোকের একত্র সমাবেশ। যেথায় ঐ প্রকার একত্র সমাবেশ অসিদ্ধ হচ্ছে, সেথায়ই মহাবলের প্রাচুর্ভাব হচ্ছে ; যেথায় তা অসম্ভব, সেথায়ই নাশ। বর্তমান অষ্ট্রীয় সম্রাটের মৃত্যুর পর, অবশ্যই জার্মানি অষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যের জার্মানভাষী অংশটুকু উদরদায় করবার চেষ্টা করবে, কৃষ প্রভৃতি অবশ্যই বাধা দেবে ; মহা

আহবের সম্ভব; বর্তমান সম্রাট্ অতি বুদ্ধ—সে ত্রয়োগ আশু-সম্ভাবী । জর্মান্ সম্রাট্ তুর্কির স্থলতানের আজকাল সহায়; সে সময়ে যখন জর্মানি অষ্ট্রিয়া-গ্রাসে মুখ বাদান করবে, তখন রুষ-বৈরী তুর্ক রুষকে কতক মতক বাধা ত দেবে, কাজেই জর্মান্ সম্রাট্ তুর্কের সহিত বিশেষ মিত্রতা দেখাচ্ছেন ।

ভিয়েনায় তিন দিন দিক্ করে দিনে । পারিসের পর ইয়ুরোপ দেখা, চৰ্ক-চোষা খেয়ে তেঁতুলের চাটনি টাকা । সেই কাপড় চোপড়, খাওয়া দাওয়া, সেই সব এক ঢগ, জনিয়া শুদ্ধ সেই এক কিলুত্ কালো জামা, সেই এক বিকট টুপি । তার উপর ওপরে মেঘ, আর নীচে পিল্ পিল্ করছে এই কাল টুপি, কাল জামার দল, —দম্ যেন আটকে দেয় । ইয়ুরোপশুদ্ধ সেই এক পোষাক, সেই এক চাল চলন হয়ে আসছে —প্রকৃতির নিষম ঐ, সবই যুত্মর চিহ্ন । শত শত বংসর কস্মরত করে, আমাদের আর্থোরা আমাদের এমনি কাওয়াজ করিয়ে দেছেন, যে আমরা এক ঢঙ্গে দাঁত মাজি, মুখ ধুই, খাওয়া খাই, ইত্যাদি, ইত্যাদি,—ফল, আমরা ক্রমে ক্রমে যন্ত্রগুলি হয়ে গেছি, প্রাণ বেরিয়ে গেছে, খালি যন্ত্রগুলি ঘুরে বেড়াচ্ছি, যন্ত্রে ‘না’ বলে না, ‘হঁ’ বলে না, নিজের মাথা ঘামায় না, ঘেনাচ্ছ পিতরো যাভাঃ চলে যায়, তার পর পচে মরে যায় । এদেবও তাই হবে,—কান্ধা কুটিল গতিঃ, সব এক পোষাক, এক খাওয়া, এক দাঁজে কথা কওয়া, ইত্যাদি, ইত্যাদি, হতে হতে ক্রমে সব যন্ত্র, ক্রমে সব ঘেনাচ্ছ পিতরো যাভাঃ হবে, তার পর পচে মরা !!

উপনিষদের বিষয় ।

স্বামী সচ্চিদানন্দ ।]

[৪৭ পৃষ্ঠার পর ।

শাস্ত্র বলেন, ক্রতি অপৌকষেয় ও অনাদি । যদিও উপনিষদের রচয়িতা কোনও বিশেষ ঋষি-পুরুষের নাম পাওয়া যায় না, তাই বলিয়া যে মন্তরাজি গুরুর মুখ হইতে শিষ্যপরম্পরা প্রথমে কেবল গুনিয়া আসিতেছেন, পরে লিপি-বদ্ধমাত্র থাকিয়া এখন মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হইতেছে, সে গুলিকে অপৌকষেয় বা অনাদি বলা যুক্তিযুক্ত নয় । “ও ব্রহ্মা বিষ্ণু কৰ্ত্তা ব্রহ্মবিদ্যাঃ অর্থব্যাস জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ”,—বিষকৰ্ত্তা ব্রহ্মা নিজের জ্যেষ্ঠপুত্র অর্থকৰ্ত্তাকে ব্রহ্মবিদ্যা

প্রদান করিলেন, এই মন্ত্র অবলম্বনে, শ্রুতি স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার মুখনির্গতা, এরূপ অনুমান করা উচিত কি না, তাহাও বিবেচনার বিষয়। ফল কথা, “শ্রুতি অপৌরুষেয় ও অনাদি”, ইহার অর্থ—“শ্রুতিবিষয়ক জ্ঞান অনাদি”। মাধ্যাকর্ষণশক্তি অনাদি ভূতকালে বিদ্যমান ছিল, চিরকাল রহিয়াছে, ও অনন্ত ভবিষ্যৎ কালে থাকিবে ; নিউটন্ সেই শক্তির আবিষ্কর্তা। নিউটন্ সেই শক্তি আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়া, আজ সকলে জানিতে পারিতেছে, মাধ্যাকর্ষণ বলিয়া এক শক্তি। যদি অদ্যাপি ঐ শক্তির আবিষ্কার না হইত, তাহা হইলেও উহা বিদ্যমান থাকিত, ইহা নিশ্চিত। তেমনি, চিৎ-জগৎস্থ সত্য, জ্ঞান সমূহ অনাদি ভূত ও অনন্ত ভবিষ্যৎ কালে বর্তমান ; এই সনাতন জ্ঞানবাণির নাম বেদ ; সুতরাং বেদও অনাদি ও অনন্ত। ঋষিগণ সেই অনাদ্যানন্ত বেদসংজ্ঞ জ্ঞানসমূহের দৃষ্টা, আবিষ্কর্তা। উপনিষদ্ সেই ঋষিদিগের ভাষা। মন্ত্রাযুক্ত ঋষিপুত্রমুখনিঃসৃত ভাষা অবশ্য অপৌরুষেয় নহে। সে ভাষাশ্রিত যে জ্ঞান, তাহাই অপৌরুষেয়।

অতি প্রাচীনকালে আর্য ঋষিগণ দুক্তি, ভগবান্, আত্মা প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়া বলিতেন, “এ ঐশ্বর্যং”—এই সেই আত্মা ; যেন করতলস্থিত আমূলক-ফলবৎ শিষ্যকে দেখাইতেন, “এই সেই আত্মা”। ভারতের এ দুর্দিনে হিন্দু-সম্প্রদায়ের কি ঋষিহ লাভ সম্ভব ? সম্ভব,—উপনিষদের আশা বাক্য বলিতে-ছেন, “অত্থোহং পাবং”, নচিকেতা ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইয়া বিমুচ্তা হইয়াছিলেন, অথ যে কেহ এই অধ্যাত্মবিদ্যা জানিবেন, তিনিও নচিকেতার জ্ঞান অমৃতত্ব পাইবেন। দেশকালব্যক্তিনির্দেশে এই ব্রহ্মজ্ঞান সকলেরই পাইবার অধিকার। মানুষ্যের মধ্যে অনন্ত শক্তি নিহিত, এ বিশ্বাস যেন উপনিষদের মূলমন্ত্র। উপনিষদ্ মানুশকে, “অমৃতের পুত্র”, বলিয়া সম্বোধন করেন,—বলেন, “তুমিই সেই পরমাত্মা”, “এই নিখিল বিশ্ব তোমাতে জাত, তোমাতে প্রতিষ্ঠিত, কালে তোমাতেই লয়গত, তুমি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন”। হে পুরুষ ! তোমার ভিতর বীৰ্য্যস্বরূপের অনন্ত বীৰ্য্য তোমার অজ্ঞাতসারে বিদ্যমান ; আত্মায় বিশ্বাস কর, নিজের স্বরূপে বিশ্বাস কর, “আমি অনন্ত শক্তির আধার” —এই মন্ত্র দিনরাত জপ কর, বৃথা দুর্কলতার অভিমান ফেলিয়া দেও, দেখিবে—মহাশক্তির আধার তুমি অজ্ঞানবশতঃ এত দিন আপনাকে দুর্কল ভাবিয়া আসিতেছিলে, সিংহের কুমার তুমি নিজেকে শৃগাল শিশু ভাবিয়াছ। উপনিষদের ঐ বীজমন্ত্র জপিয়া যাওয়াতেই আমাদের এত অবনতি। আমরা

নিজেরে দুর্লভ কীটাপ্রকীটাদেশ ভাবি, হইও তাই। “ধলু ক্রতুময়ঃ পুরুষঃ”,— এই পুরুষ নিজেকে যা ভাবেন, হন তাই। ক্রমাগত বল, “আমি দুর্লভ, আমি অধম, আমি পাণী”, দেশের দুর্লভতা তোমাকে আশ্রয় করিবে; বল, “আমি বীৰ্যময়, আমি অমৃতরূপ, আমি শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ,” সব দুর্লভতা ছুটিয়া যাইবে, শতসর্পগর্জনে অন্তর্নিহিত ভগবৎ-শক্তি জাগিয়া উঠিবে। এটা সত্য, এবং সত্য। ইহাই ধর্ম। অতীতকালে যদি দশজন আমি ভারতভূমি পবিত্র করিয়া থাকেন, বর্তমানে সহস্র আমি আমাদের মধ্য হইতে উঠিবেন, নিশ্চয় উঠিবেন, এই দৃঢ় বিশ্বাস ধারণা কর, সত্য, ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া বীরদর্পে তপস্ব্যাক্ষেত্রে অগ্রসর হও, তুমিও ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইবে। নহিলে হাজার কাঁদ, হাজার আপনাকে দীনহীন ভাব, সারা জীবনটা মিছে কেঁদে কেটে যাবে। আজই ত সব দীনহীন,—তার উপর আমার “আমি দীনহীন”, ব’লে বাহ্যিক কি? “নাঃস্বাঃ” বলচেনেন লভ্যঃ,—চরিত্র কখনই আত্মাকে লাভ করিতে পারে না। ভীক, কাপুরুষ, দাসের মুক্তি কোথায়? অর্জুন বীর ছিলেন বলিয়াই, ভগবান্ ইহাকে গীতা উপদেশ করিলেন।

“তমেবৈকং জানথ আত্মানমহা বাচো বিনুগ্ধং”, একমাত্র আত্মাকে জান, অল্প কথা পরিচ্যাগ কর, “ন কৰ্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্ব-মানসঃ”, কৰ্ম্ম, বিত্ত, পুত্রপৌত্র কিছুতেই অমৃতত্ব পাওয়া যায় না, ত্যাগই একমাত্র অমৃতত্বের হেতু, “যেনাহং নাগৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্”, সমস্ত পৃথিবী বিত্তপূর্ণা আমার হইলেও, আমি অমৃত হইব না, “ন বিত্তেন তর্পণীয়ে মহমহাঃ” বিত্তের দ্বারা মানুষ কখনই তৃপ্তি লাভ করে না,—সংসারের অনিত্যতা অভিধান পূর্ণক অরণ্যশ্রমী ঋষিগণ দিব্য পরমপুরুষে মগ্ন হইতেন। উপনিষদের তীত্রবৈরাগ্যরূপ অগ্নিশিখার তীক্ষ্ণ জ্যোতিঃ সংসারী লোকের দৃষ্টি বন্সাইয়া দেয়; আশে পাশে দৃশ্যমান কতকগুলি ধূমবেখা সে তীক্ষ্ণতার কোমলত্ব সাধন করে। বর্তমান পুত্তিগন্ধময় ভারতজীবনেব স্বাস্থ্য পুনরানয়ন করিবার জন্ত ঐ ধূমবেখাগুলি একান্ত আবশ্যক। সংসার ছাড়িতে হইলে, সংসারী থাকিয়াই, সংসার সংগ্রামে কার্য্য করিয়াই, সংসার ছাড়িবার বল অর্জন করিতে হইবে। তাই, কি করিয়া সাংসারিক কৰ্ম্মে গৃহী কৃতকার্য্য হইতে পারেন, তাহার উপায় উপনিষদ্—আত্মার দিক্ দিয়া—বলিতেছেন,—“এতদ্যোবাক্ষরং জ্ঞানী যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ”, আত্মার অসীম শক্তির গূঢ় রহস্য অবগত হইয়া যিনি যা ইচ্ছা করেন, তিনি তাহাই পান। মুদুক্ষু তুমি, নিজের আত্মার অনন্ত শক্তিতে

বিশ্বাস কর, মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। গৃহী তুমি, অর্থ উপার্জন করিতে অভিলাষী, তোমার ভিতরে অনন্ত শক্তি বিদ্যমান, অর্থোপার্জনরূপ উদ্দেশ্যে তাহা নিয়োজিত কর, তুমি অতুল ধনরাশির অধিকারী হইবে। পণ্ডিত তুমি মহাবিদ্বান্ হইতে ইচ্ছুক, ক্ষত্রিয় তুমি শত্রুকে পরাজয় করিতে চাও, আত্মার অনন্ত শক্তিতে বিশ্বাস করিয়া যে দিকে সে শক্তি চালাইবে, সেই দিকেই তুমি কৃতার্থ হইবে। পাশ্চাত্যেরা আত্মার মহাশক্তি ভোগের দিকে প্রয়োগ করিয়া মহোৎসাহে পৃথিবী উপভোগ করিতেছে; হীনবিশ্বাসাশ্রয় আমাদের না ইহকাল, না পরকাল,—ইতোনষ্টন্ততোভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছি। যার আত্মায় বিশ্বাস নাই, তাব ভগবানে বিশ্বাস মিথ্যা কথা।

সকল দিদারই উন্নতিব এক সীমা আছে; সেই সীমায় উপনীত হইলে, নূতন আর কিছু আবিষ্কার করিবার থাকে না; তার পর, সে বিদ্যাবিশয়ে অগ্র আব বা কিছু আলোচনা হয়, তৎসমুদায়ই সেই সীমার মধ্যে হইতে থাকে। পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যা জড়জগতের ঘটনাবলী পর্যালোচনা ও তাহাদিগের বৈজ্ঞানিক বাণী বাহির করে। আজ পর্যন্ত, বৈজ্ঞানিক জগৎকে বিশ্লিষ্ট করিয়া ঠিক করিয়াছেন, সমস্ত জগৎ চতুঃসংস্থতিসংখ্যক বিভিন্ন ভূতের পরস্পর মিশ্রণে গঠিত এবং সমস্ত জগতের স্থিতিগতিকার্থাদি মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি, তাড়িত-শক্তি, আলোক-শক্তি প্রভৃতি কতিপয় বিভিন্নজাতীয় শক্তির দ্বারা চালিত। বিজ্ঞানবিদ এখনও পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যার চরম সীমায় উপস্থিত হন নাই। পদার্থবিদ যখন এমন একটা শক্তি আবিষ্কার করিবেন, মাধ্যাকর্ষণাদি বিভিন্ন শক্তি সমূহ যে শক্তির সহিত স্বরূপতঃ এক, কেবল বিকাশকালে সেই শক্তির বিকার মাত্র, অবস্থান্তর মাত্র, রসায়নতত্ত্ববিদ যখন এমন একটা ভূত বাহির করিবেন, অগ্রাশ্রয় সমুদয় ভূত যে ভূতের সহিত স্বরূপতঃ এক, কেবল অবস্থা ভেদে সেই ভূতের বিকারমাত্র, অবস্থান্তর মাত্র, তখন পদার্থবিদ্যার ও রসায়নবিদ্যার শেষ উন্নতি সাধিত হইবে। ইহার পর, আরও উন্নতি আমরা ধারণা করিতে পারি না। তার পূর্বে, পদার্থবিদ্যা সেই এক শক্তির ও রসায়নবিদ্যা সেই এক ভূতের বিভিন্ন পরিণাম, বিভিন্ন বিকার, নানাবিধ অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্তি, ইত্যাদি লইয়া বিচার বিতর্কে ব্যাপৃত থাকিবে। অধ্যাত্মবিদ্যা সম্বন্ধেও ঐ এক নিয়ম। উপনিষদ্ প্রথমে নিখিল জগৎ বিশ্লেষণ করিয়া বলিলেন, এক সর্বব্যাপী জড়া প্রকৃতি, অনন্তসংখ্যক জীবাত্মা ও এক সর্বনিঃসৃত্য পরমাত্মা, এই তিন পরস্পর বিভিন্ন পৃথক্ সত্তা

অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল বর্তমান। এটা বৈতবাদ—অধ্যাত্মবিদ্যার প্রথম অবস্থা। দ্বিতীয় অবস্থায়, উপনিষদ্ আবার বলিলেন, প্রকৃতি, জীবাশ্মা ও পরমাশ্মা, এ তিনটী বিভিন্ন সত্তা নয়। কেবল একমাত্র পরমাশ্মাই আছেন, প্রকৃতি তাঁহার স্থূলশরীর এবং জীবাশ্মা সমূহ তাঁহার সূক্ষ্মশরীর; তিনি প্রকৃতি ও জীবাশ্মারূপ অংশরীরের দ্বারা, দৃশ্যমান জগৎ ব্যাপিয়া, জগতের বাহিরেও অনন্ত পূর্ণরূপে বিদ্যমান—“বহিঃশ্চ”। “যথোপনিষাঃ সৃজতে গৃহতে চ”, “যথা সূদীপ্তাং পাবকাদিকুলিকাঃ”, বেক্রপ উপনিষাতি নিজের শরীর হইতে তত্ত্ব বাহির করে, আবার গ্রহণ করে, যেৰূপ বৃহৎ অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগ্নিকণা বাহির হয়, সেইরূপ পরমাশ্মা হইতে জড়া প্রকৃতি এবং অনন্তসংখ্যক জীবাশ্মা নির্গত। তাঁহাতে পুনর্গত হয়। ইহা বিশিষ্টাট্টৈতবাদ—অধ্যাত্মবিদ্যার দ্বিতীয় অবস্থা। অবশেষে বিশিষ্টাট্টৈতবাদ মার্জিত করিয়া অদ্বৈতবাদ। অনন্তের আবার শরীর কি? অনন্তের আবার অংশ কি? অনন্তের আবার ‘নির্গত’, ‘বহির্গত’ কি? একমাত্র রসদ্বন দেশকালাতীত, কার্যকারণশব্দের পার, অংশরহিত, সর্বব্যাপী, সর্বস্থানে পূর্ণভাবে বর্তমান, অসংশয় প্রতীক্ষিত আছেন। তিনি ছাড়া কিছুই নাই। প্রকৃতিজীবাশ্মা তাঁহারই নামরূপমাত্র। বিখ্যজগৎ সে অনন্ত অগাধ মহাবুনিধির তরঙ্গতঙ্গ—সে বিপুল সত্যরাজ্যের স্বপ্নময় অলীকতা। অধ্যাত্মবিদ্যার শেষ আবিষ্কৃত্য সনাত্ত,—এক বই দুই নাই, আর উন্নতি অসম্ভব। অতীতে বা হইয়াছে, ভবিষ্যতে বা হইবে, সকলই এই মহান্ অসীম ব্রহ্মের, উপনিষদেব, মধ্যে আবদ্ধ। তাই, উপনিষদ্ হিন্দুর পরম আদরের, তাহার মাথার অমূল্যমণি, হিন্দুর প্রাণদর্শন।

নামরূপাতীত, অবায়নসোগোচর, দেশকালপার একত্ব ছাড়া, নামরূপাত্মক জগতের মধ্যেও আর এক একত্ব আছে। “ষদেবেহ তদমূত্র যতমূত্র তদব্ধিহ। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্রোতি য ইহ নানৈব পশুতি ॥”,—যা এখানে তা সেখানে, যা সেখানে তা এখানে, মৃত্যু হইতে মৃত্যুমুখে পতিত হন, যিনি এই এ জগতে নানা দর্শন করেন। প্রত্যেক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সহিত একত্ব-স্বত্রে গাঁথা। একের কল্যাণে অপরের কল্যাণ, একের অশুভ অপরের। পরের ভাল করা, আর নিজের ভাল করা, একই কথা। পরের মন্দ কর, তোমার উপর সে অমঙ্গলের প্রতিঘাত, আজ না হয় কাল, নিশ্চয়ই আসিবে। তুমি, আমি, তিনি যে এক। অবোধ আমরা জগৎ থেকে নিজেকে পৃথক্ করিতে চেষ্টা করি, যা হবার নয় তা চাই; ফল, অশেষ যন্ত্রণা। দেবদেব হইতে নরকের কীট-পর্যন্ত তোমারই

রূপ । “যো অত্রাং দেবতামুপাস্তে অত্রোহসৌ অত্রোহমস্মাতি ন স বেদ”, যে অত্র দেবতাকে উপাসনা করে, “দেবতা আমা ইহৈতে ভিন্ন, আমি দেবতা ভিন্ন”, এইরূপ মনে করিয়া, সে অজ্ঞান । বহর পশ্চাৎ এক, ও একের মধ্যে অনন্ত,—এই দৃষ্টির নাম জ্ঞান । যোগী দিব্য ধ্যাননেত্রে এক ইষ্টদেবতার মধ্যে অনন্ত জগৎ ভাসমান দেখিয়া বিশ্বয়াবিস্তৃতিতে বলেন, “পশ্চামি দেবাংস্তব দেব দেহে, সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসজ্জান্”; জ্ঞানী “অশরীরং শরীরেষু, অন-বস্তেষু অবস্থিতম্”, পরিবর্তনের পশ্চাৎ অপরিবর্তন, অনিত্যের পশ্চাৎ নিত্য, মিথ্যার পশ্চাৎ সত্য অস্তি-ভাতি-প্রিয় সত্তা প্রাণে প্রাণে অমুভব করিয়া ভক্তি-প্রফুল্ল হৃদয়ে সকলকে আনিজন করেন ।

এক সময়ে উপনিষদের একত্ব-জ্ঞানিত ভালবাসার ভাবে ভারতবর্ষ টলমল করিত ; সে প্রীতি আর আমাদের নাই । সে উপনিষদ্-প্রচারিত বলবীৰ্য্যও ভারতবর্ষ হারাইয়া ফেলিয়াছে । তবে, চিরদিন কখন সমান যায় না, ছুঃখেরও অবসান আছে । আমরা ভবিষ্যতের গাঢ় অন্ধকারের দিকে একটীও জ্যোতি-রেখা দেখিতে উদ্যত রহিলাম ।

(সমাপ্ত) ।

পাঁচ কথা ।

দেখ, লিখবে, একটু তলিয়ে বুঝে স্মৃতি লিখো ; সমালোচনা ক’রবে—খুব স্মৃতি ক’রে । সমালোচনা অতি পবিত্র জিনিষ । পবিত্র কায পবিত্র মনে, পবিত্র দাত দিয়ে, ক’রবে । সমালোচনা, বিচার প্রভৃতি অতি পবিত্র হ’য়ে ক’রতে হয় ; ঈশ্বরকে স্মরণ ক’রে ক’রতে হয় । ঘেব হিংসা বশতঃ অমন ধারা কিছু কাটব্য বের ক’রতে নেই । ছি, ছি ! ভদ্রলোকের ছেলে, লেখাপড়া শিখেছো, একটা কাগজের ভার তুমি পেয়েছো—কোথার, ধীর হবে, নম্র হবে, নিজের মর্যাদা রেখে কায করবে, পরের মাজ রেখে কথা কইবে, পরের যাতে মজল হয় তাই ক’রবে ; তা না হয়ে, কার্ মজ্জে লাগ’বো, কার্ ওপর পুরোণো রাগ ঝাড়’বো, কার্ মন্দ ক’রবো, কোণায় ছ’পয়সা পাব—পেয়ে ছ’কলম লিখে কার্ সর্কনাশ ক’রবো, এরূপ ক’রে বেড়ালে কি বাপু নিজের মজল হয়, না—দেশের হিত হয় ? উচিত কথা ব’লবে—বলনা, খুব ব’লবে বইকি ; কিন্তু মিষ্টি ক’রে ব’লবে,—যাতে কায হয়, যাতে ফল হয়, হিতে বিপরীত যাতে না হয়, দলাদলি যাতে না হয় ।

মনে কর, তুমি তাড়িতের বিষয়ে কিছু গবেষণা করিতেছ। শিশু তোমাকে জিজ্ঞাসিতেছে, 'ইহাতে কি মিষ্টি কেনা যায়?' তুমি বলিলে, 'না'। 'তবে ইহাতে কি উপকার হইবে?' লোকেও এইরূপে দাঁড়াইয়া বলে, 'ইহাতে জগতের কি উপকার হইবে? ইহাতে কি আমাদের টাকা হইবে?' 'না'। 'তবে ইহাতে আর উপকার কি?' মানুষ জগতের হিত করা অর্থে এইকথাই বুঝিয়া থাকে। তথাপি ধর্ম্মের এই প্রত্যক্ষাভূতিই জগতের সম্পূর্ণ উপকার করিয়া থাকে। লোকের ভয় হয়, যখন সে এই অস্থি লাভ করিবে, যখন সে উপলব্ধি করিবে যে, সবই এক, তখন প্রেমের প্রসঙ্গ শুকাইয়া যাইবে। জীবনের মূল্যবান যাহা কিছু সব চাওয়া যাইবে, এই জীবনে ও পরজীবনে তাহার যাহা কিছু ভালবাসিত, সবই তাহাদের পক্ষে উড়িয়া যাইবে। লোকে এ বিষয় এসবার ভাবিয়া দেখে না যে, যে সকল ব্যক্তি তাহাদের নিজের সম্বন্ধে খুব অল্প চিন্তা করিয়াছেন, তাহাই জগতে সর্বাশ্রেষ্ঠ কর্ম্মী হইয়া গিয়াছেন। তখনই মানুষ যথার্থ ভাববাসে, যখন মানুষ দেখিতে পায়, তাহার ভালবাসার জিনিস কোন ক্ষুদ্র মৃত্ত জীব নহে। তখনই মানুষ যথার্থ ভালবাসিতে পারে, যখন সে দেখিতে পায়, তাহার ভালবাসার পাত্র—খানিকটা মৃত্তিকাগুণ নহে, স্বঃ ভগবান। স্ত্রী স্বামীকে আরও অধিক ভাল বাসিবেন, যদি তিনি ভাবেন, স্বামী সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ। স্বামীও স্ত্রীকে অধিক ভালবাসিবেন, যদি তিনি জানিতে পারেন, স্ত্রী স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ। সেই মাতাও সন্তানগণকে বেশী ভাল বাসিবেন, যিনি সন্তানগণকে ব্রহ্মস্বরূপ দেখেন। সেই ব্যক্তি তাহার মহা শত্রুকেও প্রীতি করিবেন, যিনি জানেন, ঐ শত্রু সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ। সেই ব্যক্তিই সাধু ব্যক্তিক ভাল বাসিবেন, যিনি জানেন সেই সাধু ব্যক্তি সাখ্যৎ ব্রহ্মস্বরূপ। সেই লোকই আবার অতিশয় অসাধু ব্যক্তিকেও ভাল বাসিবেন, যিনি জানেন সেই অসাধুতম পুরুষেরও পশ্চাতে সেই প্রভু রহিয়াছেন। যাহার পক্ষে এই ক্ষুদ্র অংগ একেবারে মৃত হইয়া গিয়াছে। এবং তৎস্থল দৈবের অধিকার করিয়া বসিয়াছেন, সেই ব্যক্তি জগৎকে ইঙ্গিতে পরিচালন করিতে পারেন। তাহার পক্ষে সূক্ষ্ম জগৎ সম্পূর্ণরূপে অস্ত্র আকার ধারণ করে। ছঃখের ক্রোধানর যাহা কিছু, সবই তাহার পক্ষে চলিয়া যায়; সকল প্রকার গোলামাল দ্বন্দ্ব মিটিয়া যায়। জগৎ তখন তাহার পক্ষে কারাগারস্বরূপ না হইয়া (যেখানে আমরা প্রতিদিন এক টুকরা রুটির জন্য ঝগড়া মারামারি করি) উহা আমাদের জোড়ামুদ্রারূপে পরিণত হইবে।

তখন জগৎ অতি সুন্দরভাবে পরিণত হইবে। এইরূপ ব্যক্তিরই কেবল বলি-
বার অধিকার আছে। যে, ‘এই জগৎ কি সুন্দর!’ তাহারই কেবল বলিবা
অধিকার আছে যে, সবই মঙ্গলস্বরূপ। এইরূপ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হই
জগতের এই মহান্ হিত হইবে যে, জগতের এই সকল বিবাদ গুণগোল
দূর হইয়া জগতে শান্তির রাজ্য হইবে—যদি জগতের সকল মানুষ আজ এই
মহান্ সত্যের এক বিন্দু উপলব্ধি করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে
এই সমুদয় জগতই আদ্য এত রূপ ধারণ করিবে, আর এই সব গুণগোলের পরি-
বর্ত্তে শান্তির রাজ্য আসবে। অসভ্যভাবে তাড়াতাড়ি করিয়া সকলকে
ছাড়াইয়া যাইবার প্রবৃত্তি জগৎ হইতে চলিয়া যাইবে। উহার সঙ্গে সঙ্গেই
সকল প্রকার অশান্তি, সকল প্রকার ঘৃণা, সকল প্রকার ঈর্ষ্যা এবং সকল
প্রকার অশুভ চিরকালের জন্য চলিয়া যায়। তখন দেবতারা এই জগতে বাস
করিবেন। তখন এই জগৎই স্বর্গ হইয়া যাইবে, আর যখন দেবতার দেবতায়
খোঁসা, যখন দেবতায় দেবতার কাম, যখন দেবতা দেবতাকে ভালবাসে, তখন
আর অশুভ কি থাকিতে পারে? ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির এই মহা সফল।
সমাজে তোমরা যাহা কিছু দেখিতেছ, সবই তখন পরিবর্তিত হইয়া অন্তরূপ
ধারণ করিবে। তখন তোমরা মানুষকে আর খারাপ বলিয়া দেখিবে না;
ইহাই প্রথম মহা লাভ। তখন তুমি আর কোন অস্তায় কার্যাবারী দরিত্র
নরনারীর দিকে ঘৃণাপূর্ণক দৃষ্টিপাত করিবে না। হে মহিলাগণ, তোমরা
আর, যে চুখিনী কামিনী রাত্রিতে পথে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, ঘৃণাপূর্ণক
তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না, কারণ তুমি সেখানেও সাফাৎ ঈশ্বরকে
দেখিবে। তখন তোমার আর ঈর্ষ্যা বা অপরকে শাস্তি দিবার ভাব উদয়
হইবে না। ঐ সবই চলিয়া যাইবে, তখন প্রেম এত প্রবল হইবে যে, মনোব-
ক্তাতিকে সংপথে পরিচালিত করিতে আর চাবুকের প্রয়োজন হইবে না।

যদি জগতের নরনাগিণের লক্ষ্যভাগের এক ভাগও শুদ্ধ রূপ করিয়া বসিয়া
খানিক ক্ষণের জন্য বলেন, “তোমরা সকলেই ঈশ্বর। হে মানবগণ, হে পশু-
গণ, হে সর্পপ্রকার জীবিত প্রাণী, তোমরা সকলেই এক জীবন্ত ঈশ্বরের
প্রকাশ,” তাহা হইলে অর্দ্ধবর্গের মধ্যেই সমুদয় জগৎ পরিবর্তিত হইয়া যাইবে।
তখন চতুর্দিকে ঘৃণার বীজ প্রক্ষেপ না করিয়া, ঈর্ষ্যা ■ অসং চিন্তার প্রবাহ
প্রক্ষেপ না করিয়া সকল দেশের লোকই চিন্তা করিবেন, সবই তিনি। যাহা
কিছু দেখিতেছ বা অনুভব করিতেছ, সবই তিনি। তোমার মধ্যে অন্ত না

থাকিলে, তুমি অশুভ দেখিবে কিরূপে ? তোমার মধ্যে চোর না থাকিলে, তুমি কেমন করিয়া চোর দেখিবে ? তুমি নিজে খুনী না হইলে, খুনী দেখিবে কিরূপে ? মাধু হও, তাহা হইলে অসাদু ভাব তোমার পক্ষে একেবারে চলিয়া যাইবে । এইরূপে সমুদয় জগৎ পরিভ্রিত হইয়া যাইবে । ইহাই সমাজের মহৎ লাভ । মানুষের পক্ষে ইহা মহৎ লাভ । এই সকল ভাব ভারতে প্রাচীন কালে অনেক মহাত্মা আবিষ্কার ও কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন । এই সকল আচার্য্যগণের সঙ্কীর্ণতা এবং দেশের পরাধীনতা প্রভৃতি নানাবিধ কারণে এই সকল চিন্তা চতুর্দিকে প্রচার হইতে পারি নাই । তাহা না হইলেও এগুলি খুব মহানত্যা ; যেখানেই এগুলি তাহাদের পোভাব বিস্তার করিতে পাইয়াছে, সেইখানেই মানুষ দেবভাবাপন্ন হইয়াছে । এইরূপ একজন দেব-প্রকৃতিক মানুষের দ্বারা আমার সমুদয় জীবনটা পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে ; ইহার সম্বন্ধে আগামী রবিবার তোমাদের নিকট বলিব । এক্ষণে এই সকল ভাব সমুদয় জগতে প্রচারিত হইবার সময় আসিতেছে । মঠে আবদ্ধ না থাকিয়া, কেবল পণ্ডিতদের পাঠের জন্ত দর্শনের পুস্তক সমূহে আবদ্ধ না থাকিয়া, কেবল কতকগুলি সম্প্রদায়ের এবং কতকগুলি পণ্ডিত ব্যক্তির একচেটিয়া অধিকার না থাকিয়া, উহা সমুদয় জগতে প্রচারিত হইবে, যাঁহাতে উহা সাধু পাপী, আবালবৃদ্ধবনিতা, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি হইতে পারে । তখন এই সকল ভাব জগতের বায়ুতে থেলা করিতে থাকিবে, আর আমরা যে বায়ু শ্বাসপ্রশ্বাস দ্বারা গ্রহণ করিতেছি, তাহার অত্যেক ভালে ভালে বলিবে, ‘তত্ত্বমসি ।’ এই অসংখ্যচক্ষুর্দ্ব্যাপূর্ণ সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড, বাক্য উচ্চারণকারী অত্যেক পদার্থেব ভিত্তর দিয়া বলিবে, ‘তত্ত্বমসি ।’

মায়া ও ঈশ্বরধারণার ক্রমবিকাশ ।

আমরা দেখিয়াছি, অষ্টমত বেদান্তের একতম মূলভিত্তিস্বরূপ মায়াবাদ অক্ষুটভাবে সংহিতাতেও দেখিতে পাওয়া যায়, আর প্রকৃতপক্ষে উদ্ভিষ্টে যে সকল তত্ত্ব খুব পরিষ্কৃত ভাব ধারণ করিয়াছে, সংহিতাতে তাহার সকলগুলিই অক্ষুটভাবে কোন না কোন আকারে বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায় । আপনারা অনেকেই এক্ষণে মায়াবাদের তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়াছেন এবং বুঝিতে পারিয়াছেন, অনেক সময় লোকে ভ্রান্তিবশতঃ মায়াকে ‘ভ্রম’ বলিয়া

ব্যাখ্যা করে, অতএব তাঁহারা যখন জগৎকে মায়া বোঝেন, তখন উণাকোও ‘ভ্রম’ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হয়। মায়ার ‘ভ্রম’ এই অর্থ বড় ঠিক নহে। মায়া কোন বিশেষ মত নহে, উহা কেবল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ বর্ণনা মাত্র। এইরূপ মায়াকে বুঝিতে হইলে আমাদের কাছে সেই সংহিতা পর্য্যন্ত দাঁড়াইতে হইবে, এবং প্রথমে মায়া সম্বন্ধে কি ধারণা ছিল, তাহা পর্য্যন্ত দেখিতে হইবে। আমরা দেখিয়াছি, লোকের দেবতার জ্ঞান কিরূপে আসিল। কিন্তু বুঝিতে হইবে, এই দেবতার প্রথমে কেবল শক্তিশালী পুরুষ মাত্র ছিলেন। আপনারা অনেকে গ্রীক, হিব্রু, পারসী বা অপরাপর জাতির প্রাচীন শাস্ত্রে দেবতার আমাদের দৃষ্টিতে যে সকল কার্য্য অতীব ঘৃণিত, সেই সকল কার্য্য করিতেছেন, এইরূপ বর্ণনা দেখিয়া ভীত হইয়া থাকেন; কিন্তু আমরা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যাই যে, আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর লোক, আর এই সব দেবতা অনেক সহস্র বর্ষ পূর্ব্বের জীব; আর আমরা ইহাও ভুলিয়া যাই যে, ঐ সকল দেবতার উদাসকেরা তাঁহাদের চরিত্রে কিছু অসঙ্গত দেখিতে পাইতেন না, বা তাঁহারা তাঁহাদের দেবতাদের যে রূপ বর্ণনা করিতেন, তাহাতে তাঁহারা কিছুমাত্র ভয় পাইতেন না, কারণ, সেই সকল দেবতার তাঁহাদেরই মত ছিলেন। আমাদের সারা জীবনে আমাদের এই শিক্ষা করিতে হইবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার নিজ নিজ আদর্শানুসারে বিচার করিতে হইবে, অপরের আদর্শানুসারে নয়। তাহা না করিয়া আমরা আমাদের নিজ আদর্শ দ্বারা অপরের বিচার করিয়া থাকি। এরূপ করা উচিত নয়। আমাদের চতুঃপার্শ্ববর্তী লোকসকলের সহিত ব্যাহার করিবার সময় আমরা সন্দেহ এই ভুল পড়ি, আর আমার ধারণা,—অপরের সহিত আমাদের যাহা কিছু বিবাদ বিসম্বাদ হয়, তাহা কেবল এই এক কারণ হইতে হয় যে, আমরা অপরের দেবতাকে আমাদের নিজ দেবতা দ্বারা, অপরাপর আদর্শ আমাদের আদর্শ দ্বারা এবং অপরের অভিসন্ধি আমাদের নিজ অভিসন্ধি দ্বারা বিচার করিতে চেষ্টা করিয়া থাকি। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় আমি হয়ত কোন বিশেষ কার্য্য করিতে পারি, আর যখন আমি দেখি, আর এক জন লোক সেইরূপ কার্য্য করিতেছে, আমি মনে করিয়া লই, তাহারও সেই অভিসন্ধি; আমার মনে একথা একবারও উদয় হয় না যে, যদিও ফল সমান হইতে পারে, তথাপি ভিন্ন ভিন্ন সহস্র সহস্র কারণ সেই একই ফল প্রসব করিতে পারে। আমি যে কারণে সেই কার্য্য করিতে প্রেরিত হইয়া থাকি, তিনি সেই কার্য্য অল্প অভিসন্ধিতে করিতে পারেন।

সুতরাং ঐ সকল প্রাচীন ধর্ম বিচার করিবার সময়, আমরা যে ভাবে অপরের সম্বন্ধে বিচার করিয়া থাকি, সেইরূপভাবে যেন বিচারে অগ্রসর না হই, কিন্তু আমরা যেন সেই প্রাচীন কালের চিন্তাপ্রণালীর ভাবে আপনাদিকে ভাবিত করিয়া বিচার করি ।

ওল্ড টেষ্টামেন্টের নিষ্ঠুর জিহোভার বর্ণনায় অনেকে ভীত হইয়া থাকেন, কিন্তু ভীত হইবার কাণ্ড কি ? লোকের ইচ্ছা করিয়া কবিবার কি অধিকার আছে যে, প্রাচীন যাহুদীদিগের জিহোভা আজকালকার ঈশ্বরের মত হইবেন ? আবার ইহাও আমাদের বিস্তৃত হওয়া উচিত নয় যে, আমাদের পদে যাহারা আসিবেন, তাঁহারা, আমরা যে ভাবে প্রাচীনদের ধর্ম বা ঈশ্বরের ধারণায় হস্ত করিয়া থাকি, আমাদের ধর্ম বা ঈশ্বরের ধারণায়ও সেই ভাবে হস্ত করিবেন । তাহা হইলেও এই সকল বিভিন্ন ঈশ্বর ধারণা সোণার স্তম্ভে গ্রথিত, আর বেদান্তের উদ্দেশ্য এই স্তম্ভ আবিষ্কার করা । শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, ভিন্ন ভিন্ন মণি যেমন এক স্তম্ভে গ্রথিত, সেইরূপ এই সকল বিভিন্ন ভাবের ভিতরেও এক স্তম্ভ প্রবাহিত । আর আধুনিক ধারণামুসারে সেগুলি যতই বীভৎস, ভয়ানক বা ঘৃণিত বলিয়া প্রতীয়মান হউক না কেন, বেদান্তের কর্তব্য ঐ সকল ধারণা এবং বর্তমান ধারণা সকলের ভিতর এই সংযোগসূত্র আবিষ্কার করা । ভূতকালের অংস্থা লইয়া বিচার করিলে সে গুলি বেশ সঙ্গত দেখায়, আর বোধ হয়, আমাদের বর্তমান ধারণা সকল হইতে অধিক বীভৎস ছিল না । যখন আমরা সেই প্রাচীনকালের সমাজের অবস্থা, প্রাচীনকালের লোকের নৈতিক ভাব, যাহার ভিতরে ঐ দেবতার ভাব বিকাশ পাইবার অবকাশ পাইয়াছিল, তাহা হইতে পৃথক্ করিয়া সেই ভাবগুলিকে দেখিতে যাই, তখনই তাহাদের বীভৎসতা প্রকাশ হইয়া পড়ে । প্রাচীনকালের সমাজের অবস্থা এখন ত আর নাই ! যেমন প্রাচীন যাহুদী বর্তমান তীক্ষ্ণবুদ্ধি যাহুদীতে পরিণত হইয়াছেন, যেমন প্রাচীন আর্যেরা আধুনিক বুদ্ধিমান হিন্দুতে পরিণত হইয়াছেন, সেইরূপ জিহোভার ক্রমোন্নতি হইয়াছে, দেবতারেরও হইয়াছে । আমরা ভুল করি এই যে, উপাসকের ক্রমোন্নতি স্বীকার করিয়া থাকি, ঈশ্বরের ক্রমোন্নতি স্বীকার করি না । তাঁহার উপাসকদিগকে আমরা উন্নতি করিতেছেন বলিয়া যেটুকু প্রশংসাবাদ প্রদান করি, ঈশ্বকে তাহাও দিতে নারাজ । কথাটা এই, তুমি আমি যেমন কোন বিশেষ ভাবের প্রকাশক বলিয়া ঐ ভাবের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তোমার আমার উন্নতি হইয়াছে, সেইরূপ দেবতারেরও বিশেষ বিশেষ ১লা ফাল্গুন, ১৩০৭ ।] উদ্বোধন ।

ভাবের দ্রোতক বলিয়া, ভাবের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেবতারও উন্নতি হইয়াছে। তোমাদের পক্ষে এইটী আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে যে, দেবতা বা ঈশ্বরের আদ্য উন্নতি হয় কি? একপভাবে ধরিলে ইহাও ত বলা যায় যে, মানুষেরও কখন উন্নতি হয় না। আমরা গুরে দেখিব, এই মানুষের ভিতর যে প্রবৃত্তি মানুষ রহিয়াছেন, তিনি অচল, অপরিণামী, শুদ্ধ ও নিত্যানুজ্ঞ যেমন এই মানুষ সেই প্রকৃত মানুষের ছায়া মাত্র, তদ্রূপ আমাদের ঈশ্বরধাণ কেবল আমাদের মনের স্ফটমাত্র—উহার সেই প্রকৃত ঈশ্বরের আংশিক প্রকাশ, অভাসমাত্র। ঐ সকল আংশিক প্রকাশের পশ্চাতে প্রকৃত ঈশ্বর রহিয়াছেন, তিনি নিত্যশুদ্ধ, অপরিণামী। কিন্তু ঐ সকল আংশিক প্রকাশ সর্বদাই পরিণামশীল—উহার সেই পশ্চাতস্থ সত্যকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ আরো প্রকাশ করিতেছে। যখন উহার সেই সত্য অধিক পরিমাণে প্রকাশ কবে, তখন উহাকে উন্নতি বল, আর যখন উহা ঐ সত্যের অধিকাংশ আবৃত করিয়া রাখে, তখন উহাকে অব-তি বলে। এইরূপে যেমন আমাদের উন্নতি হয়, তেমনি দেবতারও উন্নতি হয়। মোটামুটি ধরিয়া গেলে, যেমন আমাদের উন্নতি হয়, আমাদের স্বরূপ যেমন প্রকাশ হয়, তেমনি দেবগণও তাঁহাদের স্বরূপ প্রকাশ করিতে থাকেন।

এক্ষণে আমরা মার্যাবাদ বুঝিতে সমর্থ হইব। জগতের সকল ধর্ম্মই এই এক প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন, জগতে এই অসামঞ্জস্য কেন? জগতে এই অশুভ কেন? আমরা ধর্ম্মভাবের প্রথম আরাধনার সময় এই প্রশ্ন পাই না, তাহার কারণ আদিম মানুষের পক্ষে জগৎ অসামঞ্জস্যপূর্ণ বোধ হয় নাই। তাহার চতুর্দিকে কোন অসামঞ্জস্য ছিল না, কোন প্রকার মতাবিরোধ ছিল না, ভাবমন্দের কোন প্রতিবন্ধিতা ছিল না। কেবল তাঁহাদের হৃদয়ে দুইটী তিনিষের সংগ্রাম হইত। একটি বলিত, এই কর, আর একটি তাহা করিতে নিষেধ করিত। প্রাথমিক মানুষ ভাবেব দাস ছিলেন। তাঁহার মনে যাহা উদয় হইত, তাহাই তিনি করতেন। তিনি নিজের এই ভাব সম্বন্ধে বিচার করিবার বা উত্থাকে সংযম করিবার চেষ্টা মেটেই করিতেন না। এই সকল দেবতা সম্বন্ধেও তদ্রূপ; ইহারাও উপস্থিত প্রবৃত্তির অধীন ছিলেন। ইন্দ্র আসিলেন, আর দৈত্যগণ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন। জিহোভা কাহারও প্রতি সন্তুষ্ট, কাহারও প্রতি ব্যস্ত; কেন—তাহা কেহ জানে না, জিজ্ঞাসাও করে না। ইহার কারণ, তখন অহুস্কানের প্রবৃত্তিই লোকের জাগরক হয় নাই, সুতরাং তিনি

যাহা করেন, তাহাই ভাল। তখন ভাগবতের কোন ধারণা নাই। আমরা যাহাকে মন্দ বলি, দেবতারা এমন অনেক কাণ্ড করিতেছেন; বেদে দেখিতে পাই, হস্ত ■ অস্ত্র দেবতারা অনেক মন্দ কাণ্ড করিতেছেন, কিন্তু ইন্দ্রের উপাসকদিগের দৃষ্টিতে পাপ বা অসৎ কার্য্য কিছু ছিল না, সুতরাং তাঁহারা সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিতেন না।

নৈতিক ভাবের উন্নতির সহিত মানুষের মনে এক যুদ্ধ বাধিল। মানুষের ভিতরে যেন একটা নূতন ইন্দ্রিয়ের আবির্ভাব হইল। ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন ভিন্ন জাতি উহাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়াছেন; কেহ কেহ বলেন, উহা ঈশ্বরের বাণী, কেহ কেহ বলেন, উহা পূর্ব্ব শিক্ষার ফল; যাহাই হউক, উহা প্রবৃত্তির দমনকারী শক্তিরূপে কার্য্য করিয়াছিল। আমাদের মনের একটা প্রবৃত্তিতে বলে, এই কাণ্ড কব, আর একটা বলে, করিও না। আমাদের ভিতরে কতকগুলি প্রবৃত্তি আছে, সেগুলি ইন্দ্রিয়ের মন্য দিয়া বাহিরে যাইবার চেষ্টা করিতেছে, আর তাহার পশ্চাতে, যতই ক্ষীণ হউক না কেন, আর এগুটি স্বর বলিতেছে, বাহিরে যাও না। এই দুইটা ব্যাপারের সংস্কৃত নাম—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। প্রবৃত্তিই আমাদের সকল কন্দের মূল। নিবৃত্তি হইতেই ধর্ম্মের উদ্ভব। ধর্ম্ম আরম্ভ হয়, এই ‘করিও না’ হইতে; আধ্যাত্মিকতাও এই ‘করিও না’ হইতেই আরম্ভ হয়। যেখানে এই ‘করিও না’ নাই, সেখানে ধর্ম্মের আরম্ভই হয় নাই, বৃথিতে হইবে। এই ‘করিও না’—এই নিবৃত্তির ভাব আসিল। মানুষের ধারণা তাহাদের যুদ্ধলীল পাশবপ্রকৃতি দেবতাসত্তেও উন্নত হইতে লাগিল।

একগুণে মানুষের হৃদয়ে একটু ভালবাসা প্রবেশ করিল। অবশ্য খুব অল্প ভালবাসাই তাহাদের হৃদয়ে আসিয়াছিল, আর এখনও যে উহা বড় বেশী, তাহা নহে। প্রথম উহা জাতিতে বদ্ধ ছিল; এই দেবগণ কেবল তাঁহাদের সম্প্রদায়কেই মাত্র ভাল বাসিতেন। প্রত্যেক দেবতাই জাতীয় দেবতামাত্রই ছিলেন, কেবল সেই বিশেষ জাতির রক্ষক মাত্রই ছিলেন। আর অনেক সময় ঐ জাতির অঙ্গেরা আপনাদিগকে ঐ দেবতার বংশধর বলিয়া বিবেচনা করিত, যেমন ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিভিন্ন বংশীয়েরা আপনাদিগকে তাঁহাদের এক সাধারণ গোষ্ঠীপতির বংশধর বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। প্রাচীন কালে কতকগুলি জাতি ছিল, এখনও আছে, যাহারা আপনাদিগকে সূর্য্য ও চন্দ্রের বংশধর বলিয়া বিবেচনা করিত। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সকলে আপনাদিগকে সূর্য্য-বংশীয় বলিতেন, ১৩০৭ ।]

ধ্বংসের বড় বড় বীৰ সম্রাট্‌গণের কথা পাঠ করছিলেন। ইহাৰা প্রথমে চন্দ্র সূর্য্যের উপাসক ছিলেন ; ক্রমশঃ আপনাদিগকে ঐ চন্দ্রসূর্য্যদেবের বংশধর বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। স্মৃতবাং যখন এই জাতীয় ভাব আদিত লাগিল, তখন একটু ভালবাসা আসিল, পরস্পরের প্রতি একটু কঠোর ভাব আনিল, একটু সামাজিক শৃঙ্খলার উৎপত্তি হইল, আর অমনি এই ভাবও আদিত লাগিল, আমবা পরস্পরের দোষ সহ্য ও ক্ষমা না করিয়া, কিরূপে একত্রে বাস করিতে পারি? মানুষ কি করিয়া অস্তিত্ব কোন না কোন সময়ে নিজ মনের প্রবৃত্তি সংযম না করিয়া, অপরের— এমন কি, এক জনেরও সহিত বাস করিতে পারে? উহা অসম্ভব। এইরূপেই সংযমের ভাব আইসে। এই সংযমের ভাবের উপর সমুদয় সমাজ প্রতিষ্ঠিত, আর আমরা জানি, যে নর বা নারী এই সহ্য বা ক্ষমারূপ মহান শিক্ষা না শিখিয়াছেন, তিনি অতি কটোর জীবন বাপন করেন।

অতএব যখন এইরূপ ধর্মের ভাব আসিল, তখন মানুষের মনে বিচ্ছিন্ন উচ্চতর, অপেক্ষাকৃত অধিক নীতিমূলক একটু ভাবের আভাস আসিল। প্রাচীন দেবগণ—চক্ৰল, সমর পাবণ, মত্ৰপারী, গোমাংসভুক্ দেবগণ—যাহাদের দক্ষ মাংসের গন্ধে এবং তীব্র সুবাস আচ্ছাদিত হইত—প্ৰথম আনন্দ ছিল—তাঁহাদের দিগ্‌বে কেমন গোলমালে ঠেকিতে লাগিল। কখন কখন ইন্দ্র হয় ত এত মদ্যপান করিতেছেন যে, তিনি মাটিতে পড়িয়া অবোদ্যভাবে বসিতে আরম্ভ করিলেন! এরূপ দেবতায় আর লোকের বিশ্বাস স্থাপন অসম্ভব হইল। তখন সকলেরই অভিশঙ্কি অব্যবহিত—জিজ্ঞাসিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল—দেবতা দেবতার কার্যের অভিশঙ্কি জিজ্ঞাসিত হইতে লাগিল। অমুক দেবতার অমুক কার্যের হেতু কি? কোন হেতুই পাওয়া গেল না। স্মৃতবাং লোকে এই সকল দেবতা পরিচায়ক করিল, অথবা তাহারা দেবতার আরো উচ্চতর ধারণা করিতে লাগিল। তাহারা দেবতার কাগাগুলির মধ্যে যে গুলি ভাল, যে গুলি তাহারা বুঝিতে পারিল, সেগুলি সব গ্রহীত করিল, আর যে গুলি বুঝিতে পারিল না বা যে গুলি তাহাদের ভাল বলিয়া বোধ হইল না, সে গুলিকেও পৃথক্ করিল; এত ভালগুলির সমষ্টিতে তাহারা দেবদেব এই আখ্যা প্রদান করিল। তাঁহাদের উপাখ্য দেবতা তখন দেবগণের শক্তির পরিচায়ক রহিলেন না, শক্তি হইতে আরও কিছু অধিক তাঁহাদের পক্ষে আশ্রয়ক হইল। তিনি নীতিপরায়ণ দেবতা হইলেন; তিনি মানুষকে ভালবাসিতে লাগিলেন,

ভাষ্য।—কেবলং সম্বত্ত্বিক্রিয়াফলমেব তন্ত্ৰ কৰ্ম্মণঃ শ্রাং যশ্রাং কায়েন মনসা বুদ্ধ্যাচ কেবলৈম মত্তবর্জিতৈরীশ্বরায়ৈব কৰ্ম্ম কৰোমি ন মম ফলায় ইতি মমত্ববুদ্ধিশূন্যৈরিত্তিগ্নৈরপি কেবলশব্দঃ কায়াদিভিরপি প্রত্যেকমভিসম্বধ্যতে সৰ্ব্ববাপারেষু মমতাবর্জনাং যোগিনঃ কৰ্ম্মিণঃ কৰ্ম্ম কুপ্তস্তি সঙ্গং ত্যক্তা। ফল-বিষয়মাত্মশুদ্ধয়ে সম্বত্ত্বিক্রয়ে ইত্যর্থঃ । তস্মাৎ তত্রৈব তবাধিকারঃ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—তাঁহার কৰ্ম্মের ফল কেবল চিত্তশুদ্ধিই হয়, যে হেতু দেহ মন বুদ্ধি দ্বারা এবং কেবল ইন্দ্রিয়নিচয়ের দ্বারা যোগী (অর্থাৎ) কৰ্ম্মিগণ সকল ব্যাপারেই মমতা বর্জন করিবার জন্ত সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আত্মশুদ্ধি (অর্থাৎ) চিত্তশুদ্ধির জন্ত কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। এই শ্লোকে ‘কেবল’ এই শব্দটির অর্থ মমত্ববুদ্ধিশূন্য (অর্থাৎ) মমতাবর্জিত, আমি ঈশ্বরার্থ কৰ্ম্ম করিতেছি, ইহার ফল আমার লক্ষ্য নহে, এই প্রকার বুদ্ধি দ্বারা যে ইন্দ্রিয় পরিচালিত হয়, তাহাকেই ‘কেবল ইন্দ্রিয়’ বলা যায়। দেহাদি প্রত্যেক পদার্থের সহিত ‘কেবল’ শব্দের অঙ্গর্য করিতে হইবে। সেই কারণে সেই কৰ্ম্মেতেই তোমার অধিকার, এইজন্ত তুমি কৰ্ম্মই কর ॥ ১১ ॥

যুক্তঃ কৰ্ম্ম ফলং ত্যক্তা শান্তিমাশ্নোতি নৈষ্টিকীম্ ।

অযুক্তঃ কামকারণে ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥ ১২ ॥

অর্থঃ।—যুক্তঃ কৰ্ম্মফলং ত্যক্তা নৈষ্টিকীং শান্তিমাশ্নোতি, অযুক্তঃ কাম-কারণে ফলে সক্তঃ নিবধ্যতে ॥ ১২ ॥

মূলানুবাদ।—ঈশ্বরার্থ কৰ্ম্মকর্ত্তা কৰ্ম্মফলকে ঈশ্বরে পরিত্যাগ করিয়া, নৈষ্টিকী শান্তি লাভ করিতে পারে। অযুক্ত (অর্থাৎ ঈশ্বরার্থ কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান যেন না করে, সেই অযুক্ত) ব্যক্তি বামনা বশে ফলে সক্ত হইয়া নিবদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

ভাষ্য।—যস্মাচ্চ যুক্ত ঈশ্বরায় কৰ্ম্মাণি ন মম ফলায় ইত্যেবং সমাহিতঃ সন্ কৰ্ম্মফলং ত্যক্তা পরিত্যজ্য শান্তিঃ মোক্ষাখ্যাং আশ্নোতি নৈষ্টিকীং, নিষ্ঠায়াং ভবাং, সম্বত্ত্বিক্রিয়ানপ্রাপ্তিসৰ্ব্বকৰ্ম্মসংগ্ৰাসজ্ঞাননিষ্ঠাক্রমেণ ইতি বাক্যশেষঃ । যন্ত পুনরযুক্তোহসমাহিতঃ কামকারণে করণং কারঃ কামস্ত কারঃ কামকারঃ তেন কামকারণে কামপ্রেরিতত্তয়া ইত্যর্থঃ । মম ফলায় ইদং কৰোমি কৰ্ম্ম ইত্যেবং ফলে সক্তো নিবধ্যতে, অতঃপু যুক্তো-ভবেত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যসুবাদ ।—(আরও) যে কারণে যুক্ত, (অর্থাৎ) ঈশ্বরের জ্ঞানই কর্ম, আমার ফলের জ্ঞান নহে, এই প্রকার নিষ্কর্মবিশিষ্ট (কর্মী) কর্মফলকে পরিত্যাগ করিয়া, নৈষ্ঠিকী (অর্থাৎ) জ্ঞাননিষ্ঠার ফলস্বরূপ মোক্ষনামক শান্তিকে লাভ করিয়া থাকে, (অর্থাৎ) “কর্মীস্থান করিতে করিতে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞানপ্রাপ্তি, সর্বকর্মসংন্যাস ■ জ্ঞাননিষ্ঠা লাভ করিয়া,” (পরে মোক্ষ লাভ করিতে পারে), এতদূর পর্য্যন্ত বাক্যের শেষাংশ । যে ব্যক্তি কিন্তু অযুক্ত, (অর্থাৎ) অসমাহিত (বাহার ফলে কামনা আছে, ঈশ্বরার্থ কর্মের অস্থান নাই, তাহাকেই অসমাহিত বলা যায়), সে ব্যক্তি, কামকাব দ্বারা, (অর্থাৎ) “আমি ফল লাভেব জগৎ কার্য্য করিতেছি,” এই বুদ্ধিতে ফলে আসক্ত হইয়া নিবদ্ধ হয় । কার শব্দের অর্থ করণ, কামের কবণ এই তাৎপর্য্যে কামকার শব্দটী এই স্থানে প্রযুক্ত হইয়াছে । কামকার দ্বারা এষ্ট প্রকাব পসোগ করিলে বুঝা যায় যে কামের প্রেরণায় । এই কারণে তুমি যুক্ত হও ইহাই অর্থ ॥ ১২ ॥

সর্বকর্মাণি মনসা সংগ্ৰহাস্তে সুখং বশী ।

নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্কনু ন কারয়নু ॥ ১৩ ॥

অর্থঃ ।—বশী (জিতেন্দ্রিয়ঃ) দেহী সর্বকর্মাণি মনসা সংগ্ৰহাস্তে নৈব কুর্কনু, (নবা) কারয়নু, নবদ্বারে পুরে সুখং (যথাস্থাৎ তথা) আস্তে ॥ ১৩ ॥

মূলসুবাদ ।—জিতেন্দ্রিয় দেহী নিজের বোন প্রকাব কর্ম না করিয়া, কিহা কাহারও দ্বারা না করাষ্টয়া, বিবেকবুদ্ধিদ্বারা সকল প্রকার কর্মের অভিমান পরিত্যক্ত পূর্ণক নবদ্বার পুর স্বরূপ এই দেহে সুখে বিদ্যমান থাকে ॥ ১৩ ॥

ভাষ্য ।—যস্য পরমার্থদর্শী স সর্বাণি কর্মাণি সর্বকর্মাণি সংগ্ৰহাস্তে পরিত্যজ্য নিতাং নৈমিত্তিকং কামাং প্রতিষিদ্ধং চ সর্বকর্মাণি তানি মনসা বিবেকবুদ্ধ্যা কর্মাদাবকর্মদর্শনেন সংতাজ্যোত্যাঃ । আস্তে তিষ্ঠতি সুখং ত্যক্তবাঙ মনঃকার-চেষ্টো নিরাসঃ প্রসন্নচিত্ত আয়নোহস্ত্র নিবৃত্তবাহুসর্বপ্রয়োজন ইতি সুখমাস্তে ইত্যুচ্যতে বশী জিতেন্দ্রিয় ইত্যর্থঃ ক কথমাস্তে ইত্যাহ নবদ্বারে পুরে সপ্তদ্বার-ণ্যানি আশ্রয় উপলব্ধিরাণি অর্থাৎ যে মূত্রপূরীষবিসর্গার্থে তৈর্দ্বারৈর্নবদ্বারং পূরয়ুচ্যতে শরীরং পূরমিব পুরমাত্মৈকশ্বামিকং তদর্থপ্রয়োজনৈশ্চেন্দ্রিয়মনো-বুদ্ধিবিষয়েরনেকফলবিজ্ঞানস্রোতঃপদাটকঃ পৌরৈরিবাধিষ্ঠিতঃ তস্মিন্ নবদ্বারে পুরে দেহী সর্বং কর্ম সংগ্ৰহাস্তে ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যসুবাদ ।—যে ব্যক্তি কিন্তু পরমার্থদর্শী, সে ব্যক্তি সকল কর্ম পরিত্যাগ

করিয়া (অর্থাৎ) নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য । প্রতিবিজ্ঞ এই সর্বপ্রকার কাম্য, মনঃ (অর্থাৎ) বিবেকবুদ্ধির দ্বারা কাম্যাদিতে অকর্ষদৃষ্টির সাহায্যে পরিত্যাগ করিয়া, বশী, (অর্থাৎ) জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি, সুখে অবস্থিতি করে, (অর্থাৎ) বাক্য মনঃ ও কায়ের চেষ্টা পরিহারপূর্বক, বিনা আশ্রমে, প্রসন্নচিত্তে, আত্মব্যতিরিক্ত সকল বস্তুতে বাহ্য প্রয়োজন বুদ্ধির নিবৃত্তি করিয়া অবস্থিতি করাকেই, সুখের সহিত অবস্থান বলা যায় । কোথায়, কি প্রকারে অবস্থিতি করে ? (তাহাই বলা হইতেছে) নবদ্বারযুক্ত পুরে । আত্মার উপলব্ধির দ্বারস্বরূপ সাতটা ছিদ্র শীর্ষে এবং মূত্র ও পুরীষের পরিত্যাগের জন্ত নিম্নদেহে দুইটি ছিদ্র, এই নয়টি দ্বারের সহিত যুক্ত শরীরকে পুর বলা যায়, কারণ ইহাও পুরের স্তায়, প্রভুস্থানীয় এক আত্মার ভোগের সাধন ; ইন্দ্রিয় মন এবং বুদ্ধির বিষয়, আত্মার ভোগসাধন, নানাজাতীয় ফল ও বিজ্ঞানের উৎপাদক—শরঙ্গস্পর্শাদিরূপ পুরবাসিনজনও এই দেহরূপ পুরে বাস করিয়া থাকে ; সেই নবদ্বারযুক্ত পুরে পূর্বোক্ত জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সুখে বাস করিয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

ভাষ্য ।—কিং বিশেষণেন ? সর্বোহি দেহী সংজ্ঞাসী অসংজ্ঞাসীবা দেহ এবান্তে, তত্রানর্থকং বিশেষণমিতি উচ্যতে যন্ত অজ্ঞোদেহী দেহেন্দ্রিয়সংঘাতাত্মদর্শী, স সর্বোহপি গেহে ভূমাবাসনে বা আসে ইতি মন্যতে । নহি দেহমাত্রাত্মদর্শিনো-
গেহইব দেহ আ ইতি প্রত্যয়ঃ সম্ভবতি । দেহাদিসংঘাতব্যতিরিক্তাত্মদর্শিনস্ত
দেহ আসে ইতি প্রত্যয় উপপত্ততে । পরকর্ম্মণাঞ্চ পরস্মিন্ আত্মনি অবিত্যয়া
অধ্যারোপিতানাং বিদেহজ্ঞানেন মনসা সংন্যাস উপপত্ততে । উৎপন্নবিবেক-
জ্ঞানন্ত সর্বকর্ম্মসংঘাসিনোহপি গেহইব দেহ এব নবদ্বারে পুরে আসনং
প্রারম্ভফলকর্ম্মসংস্কারশেষাত্মরূপত্যা দেহ এব বিশেষবিজ্ঞানোৎপত্তদেহেবান্তে
ইত্যন্তোব বিশেষণফলং ।

ভাষ্যানুবাদ ।—বিশেষ করিয়া বলিবার কি প্রয়োজন ? সংজ্ঞাসী বা অসং-
জ্ঞাসী সকল দেহীই দেহেতেই অবস্থান করিয়া থাকে, সুতরাং জিতেন্দ্রিয় তত্ত্ব-
জ্ঞানী দেহেতে সুখে থাকেন, এই প্রকারে বিশেষ করিয়া বলা নিত্ৰয়োজন ।
এই প্রকার শঙ্কর সমাধান করিবার জন্য বলা যাইতেছে যে, যে ব্যক্তি অজ্ঞ
(অর্থাৎ) দেহ ও ইন্দ্রিয়নিচয়ে বাহ্যর আত্মাভিমান আছে, সাধারণতঃ সে
বিবেচনা করিয়া থাকে যে, আমি ভূমিতে বা আসনে আছি । বাহ্যর দেহেতে
আত্মজ্ঞান আছে, সে যেমন গৃহে আছি ইহা ভাবিয়া থাকে, সেইরূপ আমি
দেহে আছি এই প্রকার ভাবিতে পারে না । যে ব্যক্তি কিত্ত দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি
১লা কান্দন. ১৬০৭ ।] উদ্বোধন । ২১

হইতে আত্মাকে পৃথক্ বলিয়া জানিয়াছে, তাহারই “আমি দেহেতে আছি” এই প্রকার প্রতীতি হইতে পারে। আত্মা হইতে ভিন্ন দেহাদির কর্ম, অবিজ্ঞা-প্রভাবেই আত্মাতে আরোপিত হইয়া থাকে, সেই সকল আরোপিত কর্মের সংশ্রাস বিচার প্রভাবেই হইয়া থাকে। যাহার বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে এবং যে ব্যক্তি সর্বকর্মসংশ্রাসী তাহার পক্ষেই এই নন্দ্যারম্ভ পুরস্করণ দেহে গৃহের জায় স্থিতি প্রতিপন্ন হয়। যে কর্ম ফল দিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহার অবশিষ্টাংশ ও তাহার সহকারী সংস্কারের অন্তরুত্তি অপরিহার্য্য, এই কারণ এই দেহ থাকিতে থাকিতেই, তাহার বিশেষ জ্ঞানের উৎপত্তি হইলেও সে দেহেতেই সুখে অবস্থিতি করে, এই প্রকার বিশেষ করিয়া নির্দেশ করা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। বিরান ও অবিদ্বানের জ্ঞানের পার্থক্যকে অপেক্ষা করিয়াই, এই প্রকার বিশেষ নির্দেশ করা হইয়াছে। ১৩ ॥

ভাষা —যতপি কার্য্যকরণ কর্ম্মণি অবিজ্ঞয়া আত্মনি অধ্যাবোপিতানি সংশ্রাস্তে ইত্যুক্তং তথাপি আত্মসমবায়িতু কর্ত্ত্বং কারয়িত্বঞ্চ সাদিতাশঙ্ক্যাহ নৈবকুর্ন্তন স্বয়ং ন কার্য্যকরণানি ক্রিয়াসু প্রবর্ত্তয়ন্। কিং যং তৎ কর্ত্ত্বং কারয়িত্বঞ্চ দেহিন আত্মসমবায়ি সং সংশ্রাস্তাভ্যং ভবতি যথা গচ্ছতোগতির্গমন-ব্যাপারপরিভাষা ন স্ত্যং তদ্বং কিংবা স্বত এবা আত্মানান্তি। অত্রোচ্যতে নান্ত্যাশ্রয়ঃ স্বতঃ কর্ত্ত্বং কারয়িত্বঞ্চ উক্তংহি “অধিকার্যোহয়মুচ্যতে” শরীর-স্বোহপি কৌন্তয় ন করেতি ন লিপ্যতে ইতি “ধ্যাতীয় লেলায়তীব” ইতি ■ ক্রতে: ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—যদি চ এই স্থলে সামান্ত্রতঃ বলা হইয়াছে যে, “কার্য্য (দেহ) ও করণ (ইঞ্জিয়) প্রভৃতির ধর্ম্ম অজ্ঞানের দ্বারা আত্মাতে আরোপিত হইয়া থাকে” তাহার সংশ্রাস করিয়া দেহে অবস্থিত হয়। তথাপি আত্মার নিষ্কর্ত্ত্ব ও কারয়িত্বও হইতে পারে? এই প্রকার শঙ্কা করিয়া তাহার উত্তর স্বরূপে বলা হইতেছে যে, আত্মা নিজেও কোন প্রকার কার্য্য না করিয়া অথবা দেহ বা ইঞ্জিয় নিচয়কে কোন কার্য্যে প্রবর্ত্তিত না করিয়া এই দেহে সুখে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। এইক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতেছে যে যেমন কোন ব্যক্তি স্বয়ং গমন করে এবং তাহার গমনাত্মকলব্যাপারের নিবৃত্তি হইলে, সেই ব্যক্তির গমনের অভাব হয়, সেইরূপ আত্মার স্বভাবসিদ্ধ কর্ত্ত্ব কিম্বা কারয়িত্ব সংশ্রাসের দ্বারা নিবৃত্ত হইয়া থাকে, ইহাই বুঝান হইতেছে? অথবা স্বতই আত্মাতে কর্ত্ত্ব বা কারয়িত্ব নাই, ইহাই বুঝান হইতেছে? ইহার উত্তর

স্বরূপে এই বলা হইতেছে যে, আত্মার স্বতঃ কর্তৃত্ব বা কারয়িত্ব নাই, কারণ এই গীতাশাস্ত্রেই বলা হইয়াছে যে, “অধিকার্যোহয়মুচ্যতে” (আত্মা অবিক বলিয়া শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে), “শরীরস্থোহপি ন কৌন্তেয় ন কেরোতি ন লিপ্যতে” (হে কৌন্তেয় আত্মা শরীরস্থিত হইলেও কিছু করে না এবং কোন প্রকার পাপপুণ্যে লিপ্ত হয় না) এবং স্রষ্টাভেদে উক্ত হইয়াছে যে “ধ্যায়তীব, লেয়নাতীব” (আত্মা ধ্যাতা ও ক্রীড়াকর্তার তায় প্রতীত হয়) ॥ ১৩ ॥

ন কর্তৃত্বং ন কৰ্ম্মাণি লোকস্ত সৃজতি প্রভুঃ ।

ন কৰ্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্ত প্রবর্ততে ॥ ১৪ ॥

অর্থ ।—প্রভুঃ (আত্মা) লোকস্ত কর্তৃত্বং কৰ্ম্মাণি বা ন সৃজতি (তথা) কৰ্ম্মফলসংযোগং ন সৃজতি, স্বভাবস্ত প্রবর্ততে ॥ ১৩ ॥

মূলানুবাদ ।—প্রভু (আত্মা) লোকের কর্তৃত্ব কৰ্ম্মনিচয় কিংবা কৰ্ম্মফল-সংবন্ধের সৃষ্টি করেন না, কিন্তু স্বভাব (মায়ার) দ্বয় প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

ভাষ্য ।—ন কর্তৃত্বমিতি । ন কর্তৃত্বং স্বতঃ কুর্শ্বিতি নাপি কৰ্ম্মাণি রথঘট-প্রাসাদাদীনি ঈপ্সিততমানি লোকস্ত সৃজতি উৎপাদয়তি প্রভুরাত্মা নাপি রথা-দিকৃতবতঃ তৎফলেন সংযোগং ন কৰ্ম্মফলসংযোগং । যদি কিঞ্চিদপি স্বতো ন কেরোতি ন কারয়তি চ দেহী কস্তহি কুর্শ্বন কারয়ন্ত প্রবর্ত্ত ইত্যা-চাতে স্বভাবস্ত স্বোভাবঃ স্বভাবঃ অবিনাশলক্ষণা প্রকৃতিমায়্যা প্রবর্ত্ততে দৈবী হীত্যাদিনা বক্ষ্যমাণা ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—ন কর্তৃত্বং ইত্যাদি (শ্লোকের অর্থ) “প্রভু” আত্মা স্বয়ং কোন প্রকারে কর্তৃত্ব করেন না এবং “তুমি কৰ্ম্ম কর” ইত্যাদি প্রকারে প্রেরণা দ্বারা কাহাকেও রথ ঘট বা প্রাসাদাদি নির্মাণ কাৰ্য্যে প্রবর্ত্তিত করেন না । কিংবা যে ব্যক্তি রথাদি কাৰ্য্যের উৎপাদন করে, তাহার অভিলষিত ফলের সম্বন্ধরূপ যে কৰ্ম্মফল-যোগ তাহাও করেন না । আত্মা যদি দ্বয়ং কিছুই না করেন এবং অপরের দ্বারাও না করান, তাহা হইলে কে তবে করে বা করাইয়া থাকে ? এই প্রকার জিজ্ঞাসার উত্তর স্বরূপে বলা যাইতেছে যে, স্বভাব (অর্থাৎ) অবিনাশলক্ষণী প্রকৃতি মায়াই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ; দৈবীহেমা ইত্যাদি শ্লোকে এই স্বভাবের পরিচয় দেওয়া যাইবে ॥ ১৪ ॥

নাদত্তে কস্তচিৎ পাপং ॥ চৈব স্কৃতং প্রভুঃ ।

অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহুস্তি জন্তবঃ ॥ ১৫ ॥

অর্থঃ।—প্রভুঃ কস্তচিৎ পাপং ন আদত্তে, (তথা কস্তচিৎ) স্কৃতং
 ॥ চৈব (আদত্তে) অজ্ঞানেন জ্ঞানং আবৃতং তেন জন্তবঃ মুহুস্তি ॥ ১৫ ॥

মূলানুবাদ।—আত্মা কাহারও পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না; অজ্ঞা-
 নের দ্বারা জ্ঞান আবৃত হইয়াছে, সেই জন্ত প্রাণীসকল মুগ্ধ হয় ॥ ১৫ ॥

ভাষ্য।—পরমার্থন্তু না দত্তে ন গৃহীতি ভক্ত্যপি কস্তচিৎ পাপং ন চৈবা-
 দত্তে স্কৃতং ভট্টকঃ প্রযুক্তং বিভূঃ । কিমর্থং হি ভট্টকঃ পূজাদিরূপং
 বাগদানচোমাদিকং চ স্কৃতং প্রযুক্তং ইত্যাহ অজ্ঞানেন আবৃতং জ্ঞানং
 বিবেকবিজ্ঞানং, তেন মুহুস্তি কৰোমি কারয়ামি ভোক্ষ্যে ভোজয়ামি ইত্যেবং
 মোহং গচ্ছন্তি অবিবেকিনঃ সংসারিণো জন্তবঃ ॥ ১৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—পরমার্থতঃ কিন্তু প্রভু (আত্মা) কোন ভক্তেরও পাপ
 গ্রহণ করেন না অথবা ভক্তগণের প্রদত্ত পুণ্যও গ্রহণ করেন না। (তিনি যদি
 গ্রহণ না করেন) তবে ভক্তগণ কেন পূজা বা জপ ছোমাদিরূপপুণ্য
 তাঁহাকে অর্পণ করে? (ইহাব উত্তর এই যে) অজ্ঞানের দ্বারা (জীব-
 গণের) বিবেকবিজ্ঞান আবৃত হইয়া থাকে, এই কারণ অবিবেকী সংসারী
 জীবগণ “আমি করিতেছি, আমি করাইতেছি, আমি ভোগ করি, আমি
 ভোগ করাইতেছি” ইত্যাদি প্রকার মোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ ।

তেষামাদিত্যবজ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরং ॥ ১৬ ॥

অর্থঃ।—যেষাং তু তদজ্ঞানং আত্মনঃ জ্ঞানেন নাশিতং, তেষাং জ্ঞানং
 আদিত্যবৎ তৎপরং প্রকাশয়তি ॥ ১৬ ॥

মূলানুবাদ।—যাহাদের কিন্তু সেই অজ্ঞান, আত্মজ্ঞানের দ্বারা নাশিত
 হইয়াছে, তাহাদের আদিত্যের স্থায় (নির্মল) জ্ঞান পরব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশ
 করিয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

ভাষ্য।—জ্ঞানেনেতি । জ্ঞানেন তু যেন অজ্ঞানেনাবৃত্য মুহুস্তি জন্তবঃ
 তদজ্ঞানং যেষাং জন্তুনাং বিবেকজ্ঞানেন তু আত্মবিষয়েণ নাশিতমাত্মনো
 ভবতি তেষামাদিত্যবদ্ যথাআদিত্যঃ সমস্তং রূপজাতং প্রকাশয়তি, তদজ্ঞ-
 জ্ঞানং জ্ঞেয়ং বস্তুসৰ্ব্বং প্রকাশয়তি তৎপরং পরমার্থতত্ত্বম্ ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—জ্ঞানেন ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। যে জ্ঞানের দ্বারা আবৃত হইয়া প্রাণীসকল মোহ প্রাপ্ত হয় সেই অজ্ঞান, যাহাদের আত্মবিষয় বিবেকবিক্তান দ্বারা নাশিত হয়, আদিত্য যে প্রকার সকলরূপকে অবভাসিত করে, সেইরূপ তাহাদের সেই জ্ঞান জ্ঞেয় বস্তু (অর্থাৎ) সেই পরমার্থতত্ত্ব ব্রহ্মকে সর্বস্বরূপে প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

তদ্বুদ্ধিস্তদাঙ্গানস্তমিষ্ঠাস্তংপরায়ণাঃ ।

গচ্ছন্তাপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধৃতকল্মষাঃ ॥ ১৭ ॥

অর্থ।—তদ্বুদ্ধয়ঃ তদাঙ্গানঃ তন্মিষ্ঠাঃ তংপরায়ণাঃ জ্ঞাননির্ধৃতকল্মষাঃ অপুনরাবৃত্তিং গচ্ছন্তি ॥ ১৭ ॥

মূলানুবাদ।—যাহাদের বুদ্ধি পরমাত্মবিষয়িনী, যাহারা পরব্রহ্মকেই আত্মা বলিয়া বুঝিয়াছে, যাহাদের পরব্রহ্মেই নিষ্ঠা, যাহাদের পরব্রহ্মই পরায়ণ এবং যাহাদের জ্ঞানের উদয়ে সকল প্রকার পাপ দূর হইয়াছে, তাহারা ই মোক্ষলাভ করিতে পারেন ॥ ১৭ ॥

ভাষ্য।—যংপরং জ্ঞানপ্রকাশিতং । তন্মিন গতা বুদ্ধির্দেযং তদ্বুদ্ধয়ঃ তদাঙ্গানঃ তদেব পরং ব্রহ্ম আত্মা যেবাং তে তদাঙ্গানঃ তন্মিষ্ঠা নিষ্ঠা অভিনিবেশস্তংপরায়ণাং সর্বাণি কল্মষাণি সংগ্রহ ব্রহ্মণোব অবস্থানং যেবাং তে তন্মিষ্ঠাঃ তংপরায়ণাশ্চ তদেব পরময়নং গতির্দেযং ভবতি তে তংপরায়ণাঃ কেবলান্নরতয় ইত্যর্থঃ । যেবাং জ্ঞানেন নাশিতমাত্মনোহজ্ঞানং তে গচ্ছন্ত্যেবংবিধা অপুনরাবৃত্তিং অপুনর্দেহসম্বন্ধং জ্ঞাননির্ধৃতকল্মষা যথোক্তেনজ্ঞানেন নির্ধৃতো নাশিতঃ কল্মষঃ পাপাদিসংসারকারণদোষো যেবাং তে জ্ঞাননির্ধৃতকল্মষা যতয় হত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—যে পবমতত্ত্ব জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত হয়, তাহাকেই যাহাদের বুদ্ধি অবলম্বন করে, তাহারা ই “তদ্বুদ্ধি” (এই শব্দের দ্বারা প্রতিপাদিত হয়), সেই পরব্রহ্মেই যাহাদের আত্মা, তাহারা ই “তদাঙ্গা” (এই শব্দের দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে), সেই পরব্রহ্মেই যাহাদের অবস্থান তাহারা ই “তন্মিষ্ঠ”, সেই পরব্রহ্মেই যাহাদের পরম গতি তাহারা ই “তংপরায়ণ” (অর্থাৎ) কেবল আত্মাতেই যাহাদের অনুরাগ, (তাহারা ই এই সকল বিশেষণের দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে), যাহাদের সেই আত্মার অজ্ঞান জ্ঞানের দ্বারা নাশিত হইয়াছে, তাহারা ই জ্ঞাননির্ধৃতকল্মষ হইয়া ১লা. ক. কন, ১৩০৭ ।] উষোধন । ২৫

(অর্থাৎ) পাশ প্রভৃতি সংসারকারণ দোষ সকল, জ্ঞানের দ্বারা বিনাশিত করিয়া) “অপুনরাবৃত্তি” পুনর্বার দেহের সহিত অসম্বন্ধ (অর্থাৎ) মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে, যতিগণই এই প্রকার লক্ষণসম্পন্ন ইহাই অর্থ ॥ ১৭ ॥

বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।

ভুনিচৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮ ॥

অর্থঃ।—পণ্ডিতাঃ বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে গবি, হস্তিনি, ভুনি স্বপাকে চ সমদর্শিনঃ (ভবন্তি) ॥ ১৮ ॥

মূল্যানুবাদ।—যাহাদের আত্মতত্ত্বজ্ঞান হইয়াছে, তাঁহারা বিদ্যা ও বিনয়-যুক্ত ব্রাহ্মণ, গো, হাতী, কুকুর ও স্বপাক প্রভৃতি সকল জীবই সমদৃষ্টিযুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥

ভাষ্য।—যেহাং জ্ঞানেন নাশিতমাত্মনোহজ্ঞানং তে পণ্ডিতাঃ কথং তত্বং পশুস্তীকৃচ্চাতে বিদ্যাবিনয়সম্পন্নো বিদ্যা চ বিনয়শ্চ বিদ্যাবিনয়ো বিনয় উপশমঃ তাভ্যাং বিদ্যাবিনয়ভ্যাং সম্পন্নো বিদ্যাবিনয়সম্পন্নো বিদ্বান্ বিনী-তশ্চ যো ব্রাহ্মণস্তস্মিন্ ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ভুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ বিদ্যাবিনয়সম্পন্নো উত্তমসংস্কারবতি ব্রাহ্মণে সাত্ত্বিকে মধ্যমায়াং চ রাজস্যাং চ গবি সংস্কারহীনায়াং অতত্ত্বমেব কেবলতামসে হস্ত্যা-দৌচ সত্বাদিশুভৈঃ তজ্জৈশ্চ সংস্কারৈরুত্থা রাজসৈশ্চ তামসৈশ্চ সংস্কারৈ-রত্যন্তমেগাম্পৃষ্টং সমমেকমবিক্রিয়ং ব্রহ্ম দ্রষ্টুং শীলং যেহাং তে পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—যাহাদের আত্মবিষয়ক অজ্ঞান, জ্ঞানের দ্বারা নাশিত হয়, সেই সকল পণ্ডিতগণ কিরূপ তত্ত্ব দর্শন করিয়া থাকেন (তাহাই বলা যাইতেছে যে), “বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন” বিদ্যা ও বিনয় (এই প্রকার তাৎপর্য্যে) বিদ্যাবিনয় (শব্দটা ব্যবহৃত হইয়াছে), সেই বিদ্যাবিনয় যাহার আছে, সে বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন । এই স্থলে বিনয় শব্দের অর্থ উপশম, (অর্থাৎ) বিদ্বান্ ও বিনীত ব্রাহ্মণে, গরুতে, হাতীতে, কুকুরে এবং চণ্ডালে (মর্কট) পণ্ডিতগণ সমদর্শী হইয়া থাকেন । ব্রাহ্মণ উত্তমসংস্কারযুক্ত ■ সত্ত্বপ্রকৃতিসম্পন্ন গাভী, রাজঃপ্রকৃতিসম্পন্ন এবং একেবারে সংস্কারহীন এবং কেবল তমঃপ্রকৃতি-সম্পন্ন হস্তিপ্রভৃতি এই সকল প্রকার জীবের মধ্যে অবস্থিত হইয়াও বাহা, সত্বাদিশুভ ও তজ্জনিত সংস্কার এবং রাজস ও তামস সংস্কার দ্বারা

73 630
4

১৫ই ফাল্গুন; ৪র্থ সংখ্যা; ১৩০৭

1259609

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

MAY. 19.

স্বামী বিবেকানন্দ ।]

[৪র্থ ভাগের পর ।

(চালি

BURLINGHAMS

আমাদের দেশের চেয়ে ইউরোপে ও আমেরিকায় মলমূত্রাদি ত্যাগে বড়ই লজ্জা। আমরা হচ্ছি নিরাস্রিতোজী — এক বাঁড়ি ঘাস পাত আহার। আবার বেজায় গরম দেশ, এক দমে লোটার জল খাওয়া চাই। পশ্চিমী চাষা সেরতর ছাত্ত খেলে; তার পর, পাতকোকে পাতকোই খালি করে ফেল্লে, জল খাওয়ার চোটে। গরমী কালে আমরা বাঁশ বার করে দিই, লোককে জল খাওয়াতে। কাজেই সে সব যায় কোথা বল। দেশ বিষ্ঠা-সূত্রময় না হয়ে যায় কোথা? গরুর গোরাল, ঘোঁড়ার আস্তাবল, আর বাঘ, দিল্লির পিঁজরার তুলনা কর দিকি।

কুকুর আর ছাগলের তুলনা কর দিকি? পাশ্চাত্য দেশের আহার মাংস-ময়, কাজেই অন্ন; আর ঠাণ্ডা দেশ, জল ফল খাওয়া নাই বল্লেই হয়। ভদ্রলোকের খুদে খুদে গ্লাসে একটু মদ খাওয়া। কপাসীরা জলকে বলে, ব্যাঙ্গের রস; তা কি খাওয়া চলে? এক আমেরিকান জল খায় কিছু বেশী, কারণ ওদের দেশ গরমী কালে ভদ্রের গরম, নিউইর্ক কলকাতার চেয়েও গরম। আর জর্মানরা বড় “বিসর” পান করে, কিন্তু সে খাবার সঙ্গে নয় বড়।

ঠাণ্ডা দেশে সর্দি লাগবার সদাই সম্ভাবনা; গরম দেশে খেতে বসে ঢুক ঢুক জল। এরা কাজেই না হেঁচে যায় বোথা, আর আমরা ঢেঁকুর না তুলেই বা যাই কোথা। এখন দেখ নিয়ম — এ দেশে খেতে বসে যদি ঢেঁকুর তুলেছ, ত সে বেআদবীর আর পার নাই। কিন্তু কুমাল বার করে, তাতে ভড় ভড় করে সিকুনি ঝাড়, এদের তাম্র ঘেমা হয় না। আমাদের ঢেঁকুর না তুললে নিমজ্জক খুনীই হন না; কিন্তু পাঁচজনের সঙ্গে খেতে খেতে ভড় ভড় করে সিকুনি ঝাড়াটা কেমন?

ইংলণ্ডে, আমেরিকায় মলমূত্রের নামটি আনবার যো নাই, মেয়েদের সামনে। পাইখানায় যেতে হবে চুরি করে। পেট গরম হয়েচে, বা পেটের বোনও প্রকার অস্বস্তির কথা মেয়েদের সামনে বলবার যো নাই।

অবস্থা বুড়ী টুড়ী আলাপী আলাপা কথা। মেয়েরা মলমূত্র চেপে মরে বাবে,

বুড়ী পুরুষের সামনে নামটিও আনবে না।

আমেরিকা দেশে অতি নয়। মেয়েদের মলমূত্রের স্থান, তার আর একটা দোর পুরুষদের; অনেক স্থানে এক দোর ঘর আলাদা। এরা এ দোর দিয়ে যাচ্ছে, ওরা এ দোর দিয়ে যাচ্ছে। মাত্রার ছ ধারে মাঝে মাঝে প্রশ্রাবের স্থান, তা খালি পিঠটা ঢাকা পড়ে মাত্রা মেয়েবা দেখছে, তাই লজ্জা নাই, আমাদের মত। অবশ্য মেয়েবা অমন অনাবৃত স্থানে যায় না। জর্মানদের আরও কন।

ইংবেজ আর আমেরিকানরা কথা বার্তারও বড় সাবধান, মেয়েদের সামনে। সে ঠাজ্‌বলবার পর্যন্ত যো নাই। ফরাসীবা আমাদের মত মুখ গোলা; জর্মান, কম পত্ৰি সকলের সামনে স্থিতি করে।

কিন্তু প্রেম প্রণয়ের কথা অবশ্যে মায় ছেয়েয়, তারে বোনে বাপে তা চলেছে। বাপ মায়ের প্রণয়ীর ভবিষ্যৎ বরের) কথা নানা রকম ঠাট্টা করে মেয়েকে জিজ্ঞাসা কচ্ছে। ফরাসীর মেয় তার অমনতমুণী, ইংবেজর মেয়ে ব্রীড়াশীলা, আর মার্কিনের মেয়ে চোট্‌পাট জবাব দিচ্ছে। চুশ্বন, আলিসনটা পর্যন্ত দোষাবহ নয়, অলীল নয়। সে সব কথা কওয়া চলে। আমাদের দেশে প্রেম প্রণয়ের নাম গন্ধটী পর্যন্ত গুরুজনদের সামনে হবার যো নাই।

এদেব অনেক টাকা। অতি পরিষ্কার এবং কেতা দোরস্ত কাপড় না পরলে, সে ছোটলোক, তাব সমাজে যাগাব যো নাই। প্রত্যহ ধোপদস্ত কানিজ কলার প্রভৃতি ছাগর তিনবার বদলাতে হবে ভদ্রলোকে। গরীবরা অতি সত পাবে না। ওপরের কাপড়ে একটি দাগ, একটি কোঁচকা থাকলেই মুকিল। নখের কোণে, হাতে, মুখে একটু ময়লা থাকলেই মুকিল। গরমীতে পচেই ময়, আর ঘাই হুক্, দস্তানা পবে যেতেই হবে, লইলে রাস্তায় হাত ময়লা হয় এবং সে হাত কোন স্ত্রীলোকের হাতে দিয় সন্তান কদাটা অতি অভদ্রতা। ভদ্রসমাজে থুথুফেলা বা কুলকুচো করা বা দাঁত ঘোঁটা ইত্যাদি করলে তৎক্ষণৎ চণ্ডালত্ব প্রাপ্তি !!

ধর্ম এদের শক্তিপূজা, আদা বামাচার রকমের; পঞ্চ মকারের শেষ অঙ্গগুলো বাদ দিয়ে। “বামে বামা- দক্ষিণে পানপাত্রঃ—অগ্রে ঞ্চন্তঃ মরীচ- সহিতঃ শুকরস্তোক্ষমাংসং...কৌলো ধর্মঃ পরমগহনো যোগীনাংপাগম্যঃ।”

প্রকাশ্য, স্বর্কসাধারণ, শক্তিপূজা বামাচার, মাতৃভাগও যথেষ্ট। প্রটেষ্টান্ট
■ ইউরোপে নগ্নত্ব—ধর্ম ত ক্যাথলিক। সে ধর্ম জিহোবা, যীশু, ত্রিমূর্তি,

সব অঙ্কুরান, জেগে বসেছেন “মা”। শিশু-যৌবন-কোলে “মা”। লক্ষ স্থানে, লক্ষ রকমে, লক্ষ রূপে, অট্টালিকা, বিরাট মন্দির, পথ প্রান্তে, পূর্ণকুটারে “মা” “মা” “মা”! বাদমা ডাক্ছে “মা”, জঙ্গ বাহাদুর (Field-martial) সেনাপতি ডাক্ছে “মা”, ধ্বজা হস্তে সৈনিক ডাক্ছে “মা”, পোতবক্ষে নাবিক ডাক্ছে “মা”, জীর্ণ স্ত্রী দীঘর ডাক্ছে “মা”, রাস্তার কোণে ভিখারি ডাক্ছে “মা”। “ধন্য মেরি”, “ধন্য মেরী” দিনরাত এ ধ্বনি উঠেছে।

আর মেয়ের পূজা। এ শক্তি পূজা কেবল কাম নয়, কিন্তু যে শক্তি পূজা, কুমারী সধবা পূজা, আমাদের দেশে কাশী কালীঘাট প্রভৃতি তীর্থস্থানে হয়, বাস্তবিক, প্রতাপ, কল্পনা নয়—সেই শক্তি পূজা। তবে আমাদের পূজা ঐ তীর্থস্থানেই, সেই ক্ষণমাত্র; এদের দিন, রাত, বারমাস। আগে স্ত্রীলোকের আসন, আগে শক্তির বসন, ভূষণ, ভোজন, উচ্চ স্থান, আদর, খাতির। এ যে সে স্ত্রীলোকে পূজা, চেনা অচেনার পূজা, ভদ্রকুলের ত কথাই নাট, রূপসী যুবতার ত কথাই নাই। এ পূজা ইউরোপে অরিস্ত করে মূরেরা, মুসলমান অরামিশ্র মূরেরা, যখন তারা স্পেন বিজয় করে, আট শতাব্দি রাজত্ব করে সেই সময়। তাদের থেকে ইউরোপে সভ্যতার উন্মেষ, শক্তিপূজার অভ্যুদয়। মর ভুলে গেল, শক্তিহীন স্ত্রী-হীন হল। স্বপ্নানু্যত হয়ে আফ্রিকার কোণে অসভ্যপ্রায় হয়ে বাস করতে লাগলো, আর সে শক্তির সঞ্চার হলো ইউরোপে; “মা” মুসলমানকে ছেড়ে উঠলেন কৃষ্ণানের ঘরে।

(ফ্রান্স—পারি।)

এ ইউরোপ কি? কালো, আদ্যকালো, হলুদ, লাল, এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকার সমস্ত মানুষ এদের পদানত কেন? এরা কেনই বা এ কলিমুগের একাধিপতি?

এ ইউরোপ বুঝতে গেলে, পাশ্চাত্য ধর্মের আকর ত্র্যাস থেকে বুঝতে হবে। পৃথিবীর আধিপত্য ইউরোপে, ইউরোপের মহাকেন্দ্র পারি। পাশ্চাত্য সভ্যতা, রীতি, নীতি, আলোক আঁধার, ভাল মন্দ, সকলের শেষ পরিপুষ্ট ভাব এইখানে, এই পারি নগরীতে।

এ পারি এক মহাদমুজ—মণি, মুক্ত, প্রবাল-যথেষ্ট, আবার মৎস্য কুণ্ডীর

অনেক । এই ফ্রান্স ইয়ুরোপের কৰ্মক্ষেত্র । সুন্দর দেশ— চীনের কতক অংশ ছাড়া, এমন দেশ আর কোথাও নাই । নাতিশীতোষ্ণ, অতি উষ্ণরা, অতি রষ্টি নাই, অনারষ্টিও নাই, সে নির্মল আকাশ, মিঠে বোদ, ঘাসের শোভা, ছোট ছোট পাড়া, চিনার, বাজ প্রভৃতি গাছ, ছোট ছোট নদী, ছোট ছোট প্রসবণ । সে জলে কণ, স্থলে মোহ, বায়ুতে উন্নততা, আকাশে আনন্দ । প্রকৃতি সুন্দর, মানুষও সৌন্দর্যপ্রিয় । আবালবৃদ্ধবনিতা, ধনী দরিদ্র, তাদের ঘর দোর, ক্ষেত ময়দান, ঘাস মেজে, মাঁজিরে গুড়িয়ে ছবি থানি করে রাখছে । এক জাপান ছাড়া, এ ভাব আর কোথাও নাই । সে ইন্দ্রবন অট্টলিকাপুঞ্জ, নন্দনকানন উদ্যান, উপবন, মায় চামার ক্ষেত, সকলের মধ্যে একটু রূপ, একটু সূক্ষ্ম দেখবার চেষ্টা, এবং সফলও হয়েছে ।

এই ফ্রান্স প্রাচীনকাল হতে গোলওয়া (Gaulois), ফ্রাংক, ফ্রাঁ (Franks) প্রভৃতি জাতির সংঘর্ষ ভূমি ; এই ফ্রাঁ জাতি রোম সাম্রাজ্যের দিনাশের পর ইউরোপে একাধিপত্য লাভ করলে ; এদের বাদসা শালমাগুন ইয়ুরোপে ক্রুশচান্ ধর্ম তলওয়ারের দাপটে চালিয়ে দিলেন, এই ফ্রাঁ জাতি হতেই আসিয়া খণ্ডে ইয়ুরোপের প্রচার,—তাই আজও ইউরোপী আমাদের কাছে ফ্রাঁকি, ফেরিজি, প্লাঁকি, ফিলিজ, ইত্যাদি ।

সভ্যতার আকর প্রাচীন গ্রীক ডুবে গেল, রাজচক্রবর্তী রোম বর্বর-আক্রমণ-তরঙ্গে তলিয়ে গেল, ইয়ুরোপের আলো নিবে গেল, এদিকে আর এক অতি বর্বরজাতির আসিয়াখণ্ডে প্রাচীর হলো—আরব জাতি । মহাবেগে সে আরব-তরঙ্গ পৃথিবী ছাইতে লাগলো । মহাবল পারস্ত আরবের পদানত হলো, মুসলমান ধর্ম গ্রহণ কর্তে হল, কিন্তু তার ফলে মুসলমানধর্ম আর এক রূপ ধারণ করলে । সে আরবি ধর্ম আর পার-সীক সভ্যতা সম্মিশ্রিত হলো ।

আরবের তলওয়ারের সঙ্গে সঙ্গে পারস্ত সভ্যতা ছড়িয়ে পড়তে লাগলো । সে পারস্ত সভ্যতা প্রাচীন গ্রীসে ভারতবর্ষ হতে নেওয়া । পূর্ব, পশ্চিম, হৃদিক্ হতে মহাবলে মুসলমান তরঙ্গ ইউরোপের উপর আঘাত করলে, সঙ্গে সঙ্গে বর্বর অন্ধ ইউরোপে জ্ঞানালোক ছড়িয়ে পড়তে লাগলো । প্রাচীন গ্রীকদের বিদ্যা, বুদ্ধি, শিল্প, বর্ধরাক্রান্ত ইত্যাদিতে প্রবেশ করলে, ধরা-রাজধানী রোমের যুতশরীরে প্রাণস্পন্দন হতে লাগলো—সে স্পন্দন ফ্রান্স নগরীতে প্রবল রূপ ধারণ করলে,

প্রাচীন ইতালী নব জীবনে বেঁচে উঠতে লাগলো,—এর নাম রেনেসাঁস, Renaissance, নব জন্ম। কিন্তু সে নব জন্ম হলো ইতালীর। ইউরোপের অন্যান্য অংশের তখন প্রথম জন্ম। সে ক্রিস্টানী ষোড়শ শতাব্দিতে, যখন আকবর, জাহাঁগির, শাহজাহাঁ প্রভৃতি মোগল সম্রাট ভারতে মহাবল সাম্রাজ্য তুলেছেন, সেই সময়, ইউরোপের জন্ম হল।

ইতালী বৃদ্ধা জাত, একবার সাঁড়া শব্দ দিয়ে আবার পাশ ফিরে গেলো। সে সময় নানা কারণে ভারতবর্ষও জেগে উঠছিল কিছু। আকবর হতে তিন পুরুষের রাজত্বে বিদ্যা বুদ্ধি শিল্পের আদব যথেষ্ট হয়েছিল, কিন্তু অতি বৃদ্ধ জাত, নানা কারণে আবার পাশ ফিরে গেলো।

ইউরোপে, ইতালীর পুনর্জন্ম গিয়ে লাগলো বলবান, অভিনব, নূতন ফাঁ জাতিতে। চারিদিক হতে সভ্যতাব ধারা সব এসে ফ্রান্স নগরীতে একত্র হয়ে নূতন রূপ ধারণ করলে; কিন্তু ইতালী জাতিতে সে বীৰ্য্য ধারণের শক্তি ছিল না, ভাবতের মত সে উন্মেষ ঐ খানেই শেষ হয়ে যেত, কিন্তু ইউরোপের সৌভাগ্য, এই নূতন ফাঁ জাতি আদরে সে তেজ গ্রহণ কবলে। নবীন-রক্ত, নবীন জাত সে তরঙ্গে মহাসাহসে নিজের তরণী ভাসিয়ে দিলে। সে স্রোতের বেগ ক্রমশই বাড়তে লাগলো, সে এক ধারা শত ধারা হয়ে বাড়তে লাগলো; ইউরোপের আর আর জাতি লোমূণ হয়ে খাল কেটে সে জল আপনার আপনার দেশে নিয়ে গেল এবং তাতে নিজেকে জীবনীশক্তি দেলে তার বেগ, তার বিস্তার বাড়তে লাগলো, ভারতে এসে সে তরঙ্গ লাগলো, জাপান সে বহুদূর বেঁচে উঠলো, সে জল পান করে মত্ত হয়ে উঠলো; জাপান এনিমার নূতন জাত।

এই পারি নগরী সে ইউরোপী সভ্যতা-গঙ্গার গোমুখ। এ বিরাট রাজধানী মর্তের অমরাদেবী, সদানন্দনগরী। এ ভোগ, এ বিলাস, এ আনন্দ, না লওনে, না বর্জনে, না আব কোথায। লওনে, নিউইয়র্কে যন আছে; বর্জনে বিদ্যাবুদ্ধি যথেষ্ট, নেই সে ফরাসী মাটি, আর সর্দাপেক্ষ। নেই সে ফরাসী মানুষ। যন থাক্, বিদ্যাবুদ্ধি থাক্, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য থাক্—মানুষ কোথায়? এ অদ্বুত ফরাসী চরিত্র প্রাচীন গ্রীক মত জন্মেছে যেন—সদা আনন্দ, সদা উৎসাহ, অতি ছেবলা, আবার অতি গম্ভীর, সকল কাজে উত্তেজনা, আবার বাধা পেলেই নিকুৎসাহ। কিন্তু সে নৈরাশ্র ফরাসী মুখে বেশীকণ থাকে না, আবার জেগে ওঠে।

এই পারি বিশ্ববিদ্যালয় ইয়ুরোপের আদর্শ। হুনিয়ার বিজ্ঞান সভা এদের আকাদেমির নকল ; এই পারি ঔপনিবেশ সাম্রাজ্যের গুরু, সকল ভাষাতেই বুদ্ধ শিল্পের সংজ্ঞা এখনও অবিকাংশ ফরাসী ; এদের রচনার নকল, সকল ইয়ুরোপী ভাষায় ; দর্শন, বিজ্ঞান শিল্পের এই পারি খনি, সকল জায়গায় এদের নকল ।

এরা হচ্ছে সভ্যের আর সব জাত যেন পাড়ারোয় : এরা য করে, তা ৫০ বৎসর, ২৫ বৎসর পবে জর্জাণ ইংরেজ প্রভৃতি নকল করে, তা বিদ্যায় হক্, বা শিল্পে হক্, বা সমাজনীতিতেই হক্। এই ফরাসী সভ্যতা স্কটল্যাণ্ডে লাগলো, স্কট্‌রাজা ইংলণ্ডেব রাজা হলেন, ফরাসী সভ্যতা ইংলণ্ডকে জাগিয়ে তুললে ;—ঋটবাজ ষ্টুয়ার্ট বংশের সময় ইংলণ্ডে বয়াল সোসাইটি প্রভৃতির সৃষ্টি ।

আর এই ফ্রান্স স্বাধীনতার আवास। প্রজাশক্তি মহাবেগে এই পারি-নগরী হতে ইয়ুরোপ তোলপাড় করে ফেলেছে, সেই দিন হতে ইয়ুরোপের নূতন মূর্তি হয়েছে। সে এগালিতে, লিবার্তে ফ্রাতের্নিভের, Egalite' liberte' fraternite' ধ্বনি ফ্রান্স হতে চলে গেছে ; ফ্রান্স অত্যাচার, অত্যাচার উদ্দেশ্য অত্যাচার করছে, কিছু ইয়ুরোপের অত্যাচার জাত এখনও সেই ফরাসী বিপ্লব মক্ক করছে ।

একজন স্কটল্যাণ্ড দেশের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত আমার সেদিন বল্লেন, যে পারি হচ্ছে পৃথিবীর কেন্দ্র ; যে দেশ যে পরিমাণে এই পারি নগরীর সঙ্গে নিজেদের যোগ স্থাপন কর্তে সক্ষম হবে, সে জাত তত পরিমাণে উন্নতি লাভ করবে। কথাটা কিছু অতিরঞ্জিত সভ্য, কিন্তু এ কথাটাও সভ্য, যে যদি কারু কোনও নূতন ভাব এ জগতকে দেবার থাকে, ত এই পারি হচ্ছে সে প্রচারের স্থান। এই পারিতে যদি ধ্বনি ওঠে, ত ইউরোপ অবশ্যই প্রতিধ্বনি করবে। ভাস্কর, চিত্রকর, গাইয়ে, নর্তকী এই মহানগরীতে প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ কর্তে পারলে, আর সবদেশে সহজেই প্রতিষ্ঠ হয় ।

আমাদের দেশে এ পারি নগরীর বদ নামটী স্নতে পাওয়া যায়,—এ পারি মহা কল্যাণ, বোদ্ধাপূর্ব, নরককুণ্ড। অবশ্য এ কথা ইংরেজরাই বলে থাকে, এবং অন্তঃদেশের যে সব লোকের পরমা আছে এবং জিহ্বোপস্ত ছাড়া দ্বিতীয় ভোগ জীবনে অসম্ভব, তারা অংশ বিলাসময় জিহ্বোপস্থের উপকরণময় পারিই দেখে ।

কিন্তু লণ্ডন, বার্লিন, ভিয়েনা, নিউইয়র্ক ও ঐ বারবানিত-পূর্ণ, ভোগের উদ্যোগ-পূর্ণ; তবে তফাৎ এত, সে অল্প দেশের ইলিয় চর্চা পশ্চিম; পাবিসের, সভ্য পারির গয়লা সোণার পাত নোড়া। বুনোশোরের পাঁকে লোঠা, আর ময়ূরের পেখন-ধরা নাচে বেতফাৎ, অস্ত্রাত্মক সহরের পৈশাচিক ভোগ আর এ পারির বিলাসের সেই তফাৎ।

ভোগ বিলাসের ইচ্ছা কোন্ জাতিতে নেই বল? নইলে ছুনিয়ার বার ছু'পরগা হয়, সে অমনি পারিনগরী অভিমুখে ছোট্ট কেন? রাজা বাদসারী চুপি সাড়ে নাম ভাড়িয়ে এ বিলাস-বিবর্তে স্নান করে পাত্র হতে আসেন কেন? ইচ্ছা সর্বদেশে, উদ্যোগের ক্রটি কোথাও কম দেখি না; তবে এরা সুসজ্জ হয়েছে, ভোগ করতে জানে, বিলাসেব সপ্তমে পৌঁছেছে।

তাও অধিকাংশ কদম্ব নাচ তামাসা বিদেশীর জন্ত; ফরাসী বড় সাবধান, বাজে প্রজ্ঞা কবে না। এই ঘোর বিলাস, এই সব হোটেল, ক্যাসে, যাতে এক বার খেলে সর্ববাস্ত হতে হয়, এ সব বিদেশী আহাম্মক ধনীদেব জন্ত। ফরাসীরা বড় হুসভ্য, আগব কাগদা বেজায়, খাতির খুব করে, পরস্যা গুলি সব বার করে নেয়, আর নুচুকে নুচুকে হাঁপে।

তা ছাড়া, আর এক গামসা এই যে, আমেরিকা, জার্মানি, ইংরেজ প্রভৃতির খোলা সমাজ, বিদেশী বাঁ করে সব দেখতে শুন্তে পায়। ছ'চার দিনের আলাপেই আমেরিকা বাড়িতে দশদিন বাস করার নিমন্ত্রণ করে; জার্মানি ওজুপ; ইংরেজ একটু বিলম্ব। ফরাসী এ বিষয়ে বড় তফাৎ, পরিবারের মধ্যে অত্যন্ত পরিচিত না হলে আর বাস কতে নিমন্ত্রণ করে না। কিন্তু যখন বিদেশী ঐ প্রকার সুবিধা পায়, ফরাসী পরিবার দেখবার জন্বার অবকাশ পায়, তখন আর এক ধারণা হয়। বলি, মেছোজার দেখে অনেক বিদেশী যে আমাদের জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধে মহামত প্রকাশ করে—দেউ কেমন আহাম্মকি। তেমনি এ পারি। অবিবাহিতা মেয়ে এদেশে আমাদের দেশের মত সুরক্ষিতা, তারা সমাজে প্রায় মিশতে পায় না। বের পর তবে নিজের স্বামীর সঙ্গে সমাজে মেলে। বেথা মায়ে বাপে দেয়, আমাদের মত। আর এরা আমোদপ্রিয়, কোনও বড় সামাজিক ব্যাপার নর্ত্তকীর নাচ না হলে সম্পূর্ণ হয় না। যেমন আমাদের বে গুজো সর্বত্র নর্ত্তকীর আগমন। ইংরেজ গুলবাটা মুখ, অন্ধকার দেশে বাস করে, সদা নিরানন্দ, ওদের মতে এ বড় অশ্লীল, কিন্তু থিয়েটারে হলে আর দোষ নাই। এ কথাটাও

বলি যে এদের নাচটা আমাদের চক্ষে অশ্লীল বটে, তবে এদের সঙ্গে গেছে। নেংটি নাচ সর্বত্র, ও গ্রাহ্যর মধ্যেই নয়। কিন্তু ইংরেজ আমেরিকা দেখতেও ছাড়বে না, আর ঘরে গিয়ে গাল দিতেও ছাড়বে না।

স্ত্রী সম্বন্ধী আবার পৃথিবীর সর্বদেশেই একরূপ, অর্থাৎ পুরুষ মানুসের অল্প স্ত্রীসংসর্গে বড় দোষ হয় না, কিন্তু স্ত্রীলোকের বেলোটায় মুঞ্চিল। তবে করাসী পুরুষ একটু খোলা, অল্প দেশের ধনী লোকেরা যেমন। এ সম্বন্ধে বে পরোয়া ভেমন। আর ইউরোপী পুরুষসাদারণ ও বিষয়টা অত দোষের ভাবে না। অবিবাহিতের ও বিষয়ে পাশ্চাত্য দেশে বড় দোষের নয়; বরং বিজ্ঞার্থী যুবক ও বিষয়ে একান্ত বিরত থাকলে, অনেক স্থলে তার মা বাপ দোষাবহ বিবেচনা করে। পাহে ছেলেটা “মেনি যুথো” হয়। পুরুষের এক গুণ পাশ্চাত্য দেশে চাই—সাহস; এদের “ভার্চু” Virtue শব্দ আর আমাদের “বীরত্ব” একই শব্দ। ঐ শব্দের ইতিহাসেই দেখ, এরা কাকে পুরুষের সত্যতা বলে। মেয়ে মানুসের পক্ষে সত্যতা অত্যা-বশ্যক বটে।

এ সকল কথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক জাতির এক একটা নৈতিক জীবনোদ্দেশ্য আছে, সেইখানটা হতে সে জাতির রীতি নীতি বিচার কর্তে হবে। তাদের চক্ষে তাদের দেখতে হবে। আমাদের চোখে এদের দেখা, আর এদের চক্ষে আমাদের দেখা, এ দুই ভুল।

আমাদের উদ্দেশ্য এ বিষয়ে এদের ঠিক উদ্দেশ্য, আমাদের ব্রহ্মচারী (বিজ্ঞার্থী) শব্দ আর কামজয়িত্ব এক। বিজ্ঞার্থী আর কামজয়িত্ব একই কথা।

আমাদের উদ্দেশ্য মোক্ষ। ব্রহ্মচর্য্য বিনা তা কেমনে হয় বল? এদের উদ্দেশ্য ভোগ, ব্রহ্মচর্য্যের আবশ্যক তত নাই; তবে স্ত্রীলোকের সতীত্ব নাশ হলে ছেলে পিলে জন্মায় না এবং সমগ্র জাতির ধ্বংস। পুরুষ মানুষে দশ গুণা বে করলে তত ক্ষতি নাই, বরং বংশ বৃদ্ধি খুব হয়। স্ত্রীলোকের একটা ছাড়া আর একটা এক সঙ্গে চলে না—কল বক্ষ্যাত্ত। কাজেই সকল দেশে স্ত্রীলোকের সতীত্বের উপর বিশেষ আগ্রহ, পুরুষের বাড়ার ভাগ। ‘প্রকৃতিং শাস্তি তুংনি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি।’

(ক্রমশঃ ।)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

[নরেন্দ্র ও ভবনাত্তের মাষ্টারের সহিত মিলন ।]

মাষ্টার তখন বরাহনগরে দিদির বাড়ীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দর্শন করা অবধি সর্বক্ষণ তাঁহারই চিন্তা করেন। সর্বদাই যেন সেই আনন্দময় মূর্তি দেখিতেছেন ও তাঁহার সেই অমৃতময়ী কথা শুনিতেছেন। ভাবিতে লাগিলেন, এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ কিরূপে এই সব গভীর তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলেন ও জানিলেন? আর এত সহজে এই সকল কথা বুঝাইতে মাষ্টার এ পর্য্যন্ত কাহাকেও কখনও দেখেন নাই। কখন তাঁহার কাছে যাইবেন ও আবার তাঁহাকে দর্শন করিবেন, এই কথা তাত্র দিন ভাবিতেছেন। দেখিতে দেখিতে রবিবার আসিয়া পড়িল। বরাহনগরের নেপাল বাবুর সঙ্গে বেলা ৩টা ৪টার সময় দক্ষিণেশ্বরের বাগানে আসিয়া পৌঁছিলেন। দেখিলেন, সেই পূর্বপরিচিত ঘরের মধ্যে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ছোট তক্তপোষের উপর বসিয়া আছেন। ঘরে এক ঘর লোক। রবিবারে অবসর হইয়াছে, তাই ভক্তেরা দর্শন করিতে আসিয়াছেন। এখনও মাষ্টারের সঙ্গে কাহারও আশপ হয় নাই। মাষ্টারও সভামধ্যে এক পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন। দেখিলেন, ভক্তদের সঙ্গে সহাস্তবদনে ঠাকুর কথা কহিতেছেন।

একটি ঊনবিংশতিবর্ষব্যস্ত ছোকরাকে উদ্দেশ্য করিয়া ও তাঁহার দিকে তাকাইয়া অনেক কথা যেন কত আনন্দিত হইয়া বলিতেছিলেন। ছেলেটির নাম নরেন্দ্র, কলেজে পড়েন ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যাত্রাপ্রাত করেন। কথাগুলি তেজঃপরিপূর্ণ; চক্ষু দুটি সাতিশয় উজ্জ্বল। ভক্তের চেহারা।

মাষ্টার অনুমানে বুঝিলেন যে, কথাটি বিষয়সত্ত্ব সংসারী ব্যক্তির সম্বন্ধে হইতেছিল। যারা কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর করে, ও ধর্ম ধর্ম করে, তাদের ঐ সকল ব্যক্তির নিন্দা করে। আব সংসারে কত ছুটি লোক আছে, তাদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, এই সব কথা হইতেছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (নরেন্দ্রের প্রতি) নরেন্দ্র! তুই কি বলিস? সংসারী

■ শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (শ্রীম—কথিত) প্রথম ভাগ ছাপা হইতেছে।

লোকেরা কত কি বলে । কিন্তু দ্যাখো, হাতী যখন চলে যায়, পেছনে কত জানোয়ার কত রকম চীংকার করে । কিন্তু হাতী ফিরেও চায় না । তাকে যদি কেউ নিন্দা করে, তুই কি মনে করবি ?

মাতৃত ন'র য়ণ ।

নরেন্দ্র । আমি মনে করব কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে ।

ঈরামকৃষ্ণ । (সহাস্যে) নারে, অতো দু নয় । ঈশ্বর সন্দভূতে আছেন, তবে ভাল লোকের সঙ্গে মাথামাখি চলে, মন্দ লোকের কাছ থেকে তফাত থাকতে হয় । বাঘের ভিতরও নারায়ণ আছেন ; তা বলে বাঘকে আশঙ্কন করা চলে না । বাঘ নারায়ণকে দূর থেকে প্রণাম করবে ।

"একটা গল্প শোন । কোন এক বনে একটি সাধু থাকেন । তাঁর অনেকগুলি শিষ্য । তিনি একদিন শিষ্যদের উপদেশ দিলেন যে, সন্দভূতে নারায়ণ আছেন, এইটো জেনে সকলকে নমস্কার করবে । একদিন একটি শিষ্য গোমের জন্তু কাট আনতে বনেও মধ্যে গিছলো । এমন সময়ে একটা রব উঠলো ' কে কোথায় আছ পালাও,—একটা পাগলা হাতী যাচ্ছে ।' সন্ধাই পালিয়ে গেল, কিন্তু শিষ্যটি পালাল না । সে জানে যে, হাতীও নারায়ণ, তবে কেন পালাব ? এই বলে দাঁড়িয়ে রইল, আর নমস্কার করে ছব স্তুতি করতে লাগলো । এ দিকে মাহত টেচিয়ে বলচে, 'পালাও 'পালাও' । শিষ্যটি তবুও নড়লো না । শেষে হাতীটা শুঁড়ে কবে তুলে নিয়ে তাকে এক ধারে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল । শিষ্য ক্ষতবিক্ষত হয়ে ও অচেতন হয়ে পড়ে রইল । এই সংবাদ পেয়ে গুরু ও অন্যান্য শিষ্যেরা তাকে আশ্রমে ধরাধরি করে নিয়ে গেল । আর ঔষধ দিতে লাগলো । ঋণিকক্ষণ পরে চেতনা তলে গুরু জিজ্ঞাসা করা গেল, তুমি কেন হাতী আসছে শুনেও চলে গেলে না ? সে বলে, গুরুদেব যে আমার বলে দিছিলেন যে, নারায়ণই মানুষ জীব জন্তু সব হয়েছেন । তাই আমি হাতী নারায়ণ আসছে দেখে সেখান থেকে সরে যাই নাই । গুরু তখন বল্লেন যে, হাতী নারায়ণ আসছিলেন বটে, তা সত্য ; কিন্তু বাবা, মাহত নারায়ণ তো তোমায় বারণ করেছিলেন । যদি সবই নারায়ণ, তবে তার কথা বিশ্বাস করলে না কেন ? মাহত নারায়ণের কথা শুনেতে হয় ।

"শাস্ত্রে আছে আপো নারায়ণঃ—জল নারায়ণ, কিন্তু কোনও জল ঠাকুর-সেবার চলে, অবার কোন জলে আঁচান, বাসন মাজা, কাপড় কাচা, কেবল

চলে; কিন্তু খাওয়া বা ঠাকুর সেবা চলে না। তেমনি সাধু, অসাধু, ভক্ত, 'অভক্ত', সকলেরি হৃদয়ে নারায়ণ আছেন; কিন্তু অসাধু অভক্ত হুঁষ্ট লোকের সঙ্গে ব্যবহার চলে ন'। মাখামাখি চলে না। কাহারও সঙ্গে কেবল মুখের আলাপ পর্য্যন্ত চলে, আবার কাহারও সঙ্গে তাও চলে না। ঐরূপ লোকদের কাছ থেকে তফাতে থাকতে হয়।”

একজন ভক্ত। মহাশয়! যদি হুঁষ্ট লোক অনিষ্ট করতে আসে বা অনিষ্ট করে, তা হলে কি চূপ করে থাকা উচিত?

গৃহস্থ ও তমোগুণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। লোকের সঙ্গে বাস করতে গেলেই হুঁষ্ট লোকের হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করবার জন্ত একটু তমোগুণ দেখান দরকার। কিন্তু সে অনিষ্ট করবে বলে, উন্টে তার অনিষ্ট করা উচিত নয়।

“এক মাঠে রাখালরা গরু চরাতে। সেই মাঠে একটা ভয়ানক বিষাক্ত সাপ ছিল। সকলেই সেই সাপের ভয়ে অত্যন্ত সাবধানে থাকতো। এক দিন একটা ব্রহ্মচারী সেই মাঠের পথ দিয়ে আসছিল। রাখালেরা দৌড়ে এসে বলে, ঠাকুর মহাশয়! ও দিক দিয়ে যাবেন না। ■ দিকে একটা ভয়ানক বিষাক্ত সাপ আছে। ব্রহ্মচারী বলেন, বাবা তা হউক, আমার তাতে ভয় নাই, আমি মন্ত্র জানি। এই কথা বলে ব্রহ্মচারী সেই দিকে চলে গেল। রাখালেরা ভয়ে কেউ সঙ্গে গেল না। এ দিকে সাপটা ফণা তুলে দৌড়ে আসছে। কিন্তু কাছে না আসতে আসতে ব্রহ্মচারী যেই একটি মন্ত্র পড়লেন, ‘অমনি সাপটা কেঁচোর মতন পায়ের কাছে পড়ে রইল। ব্রহ্মচারী বলেন, ওরে! তুই কেন পরের হিংসা করে করে নেড়াস, আমি তোকে মন্ত্র দিব, এই মন্ত্র জপলে তোর ভগবানে ভক্তি হবে, আর হিংসা প্রবৃত্তি থাকবে না। এই বলে সাপকে মন্ত্র দিলেন। সাপটা মন্ত্র পেয়ে গুরুকে প্রণাম করলে, আর জিজ্ঞাসা করলে, ঠাকুর! কি করে সাধনা করব বলুন। গুরু বলেন, এই মন্ত্র জপ করো, আর কাহারও হিংসা করো না। ব্রহ্মচারী যাবার সময় বলেন, আমি আবার আসবো।

“এই রকমে কিছুদিন যায়। রাখালেরা দেখে যে, সাপটাই আর কামড়াতে আসে না। ডালা মারে, তবুও রাগ হয় না, যেন কেঁচোর মতন হয়ে গেছে। একদিন এক জন রাখাল তার কাছে গিয়ে লেজ ধরে খুব ঘুরপাক দিয়ে সাপটাকে আছড়ে আছড়ে ফেলে দিল। সাপটার মুখ দিয়ে রক্ত ঊঠতে

লাগল, আর সে অচেতন হয়ে পড়লো। নড়ে না চড়ে না। রাখালরা মনে করলে যে সাপটা মরে গেছে। এই মনে করে তারা সব চলে গেল।

“অনেক রাতে সাপের চেতনা হলো। তখন সে আশ্বে আশ্বে অতি-কষ্টে তার গর্ভের ভিতর চলে গেল। শরীর চূর্ণ হয়ে গিচ্ছিল। নড়বার শক্তি নাই। অনেক দিনের পর যখন অস্থিচূর্ণসার হয়ে গেছে, তখন বাহিরে আহ্বারের চেষ্টায় রোজ রাতে এক একবার চরতে আসতো। রাখালদের ভয়ে দিনের বেলায় আসত না। মস্ত লগ্না অবধি আর জীবহিংসা করে না। মাটি, পাতা, গাছ থেকে পড়ে গেছে, এমন ফল খেয়ে প্রাণধারণ করতো।

“প্রায় এক বৎসরের পর ব্রহ্মচারী সেই পথে আবার এলেন। এসেই সাপের সন্ধান করলেন। রাখালেরা বলে, সে সাপটা মরে গেছে। ব্রহ্মচারীর কিঙ্ক ও কথা বিশ্বাস হলো না। তিনি জানেন, ‘ও যে মস্ত নিয়েছে, তাহা সাধন না হলে দেহত্যাগ হবে না।’ খুঁজে খুঁজে সেট দিকে তাঁর দেওয়া নান ধরে, ডাকতে লাগলেন। সে গুরুদেবের আওয়াজ শুনে গর্ত থেকে বেরিয়ে এলো, ‘ও গুব ভক্তিভাবে প্রণাম করলে। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করলেন, তুই কেমন আছিস? সে বলে, আজ্ঞে ভাল আছি। ব্রহ্মচারী বলেন, তবে তুই এত রোগী হয়ে গেছিস কেন? সাপ বলে, ঠাকুর! আপনি আদেশ কবেছেন,—ক’হারও হিংসা কোরো না। তাই পাতাটা ফলটা খাই বলে বোধ হয় রোগী হয়ে গেছি। ওর সবুজ হয়েছিল কি না, তাই কাক উপর ক্রোধ নাট, সে একেবারেই ভুলেই গিচ্ছিলো যে রাখালেরা তাকে মেরে ফেলবার জোগাড় করেছিল। ব্রহ্মচারী বলেন, শুধু না খাওয়ার দক্ষা এরূপ অবস্থা হয় না, অবশ্য আরো কোন কারণ আছে; তুই ভেবে দেখ। সাপটার তখন মনে পড়লো যে রাখালেরা তাকে আছাড় মেরেছিল। তখন সে বলে, ঠাকুর এখন মনে পড়েছে বটে, রাখালেরা আমার একদিন আছাড় মেরেছিল। তা তরা অজ্ঞান, তারা তো জানে না যে আমার মনের কি অবস্থা। আমি যে কাঁধকেও কামড়াব না বা কোনরূপ অনিষ্ট করবো না, তা তারা কেমন করে জানবে? ব্রহ্মচারী বলেন, ছি! তুই এতো বোকা, তুই আপনাকে বক্ষা করতে জানিস না; আমি তোকে কামড়াইতেই বারণ করেছি, তোকে তো ফাঁস করতে বারণ করি নাই; তুই ফাঁস করে তাদের ভয় দেখাস নাই কেন?

“তাই বলছি, দৃষ্ট লোকের কাছে ফাঁস করতে হয়, তাদের ভয় দেখাতে।

হয়, পাছে অনিষ্ট করে; কিন্তু তাদের গায়ে বিষ ঢালিতে নাই, তাদের উষ্টে অনিষ্ট করতে নাই।

তিন প্রকৃতি।

“ঈশ্বরের সৃষ্টিকে নানী রকম জীব, জন্তু, গাছ পালা, এই সব আছে। জা'না? যারেব মধ্যে ভালও আছে; মন্দও আছে। বাঘের মত হিংস্র জানোয়ারও আছে। গাছের মধ্যে অমৃতের স্রাব ফল হয় এমন গাছও আছে, আবার বিষ ফল হয় এমন গাছও আছে। তেমনি মানুষের মধ্যে ভালও আছে, মন্দও আছে, সাধু আছে, আবার অসাধুও আছে, সংসারী জীবও আছে, আবার তত্ত্ব আছে।

Are all men equal ?

“জীব চারি প্রকার,—বদ্ধজীব, মুমুকুজীব, মুক্তজীব ও নিত্যজীব। নিত্য-জীব—যেমন নারদাদি। এঁরা সংসারে থাকেন, জীবের মঙ্গলের জন্তু—জীবদিগকে শিক্ষা দিবার জন্ত।

“বদ্ধজীব বিষয়ে আনন্দ হয়ে থাকে, আর ভগবানকে ভুলে থাকে—ভুলেও ভগবানের চিন্তা করে না।

“মুমুকুজীব—যারা মুক্ত হবার ইচ্ছা করে। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ মুক্ত হতে পারে, কেউ পারে না।

“মুক্তজীব—যারা সংসারে কামিনী কাঞ্চনে বদ্ধ নন—যেমন সাধু মহা-আরা; ষাঁদের মনে বিষয়বুদ্ধি নাই, আর যারা সর্বদা হরিপাদপদ্ম চিন্তা করেন।

“যেমন জাল ফেলা হয়েছে পুকুবে। ছ'চারটা মাছ এমন সেয়ানা যে কখনও জালে পড়ে না—এরা নিত্যজীবের উপমাশ্রল। কিন্তু অনেক মাছই জালে পড়ে। এদের মধ্যে কতকগুলি পালাবার চেষ্টা করে; এরা মুমুকুজীবের উপমাশ্রল। কিন্তু সব মাছেই পালাতে পারে না। ছ'চারটা ধপাঙ্ ধপাঙ্ করে জাল থেকে পালিয়ে যায়—তখন জেলেরা বলে—ঐ একটা মস্ত মাছ পালিয়ে গেল। কিন্তু যারা জালে পড়েছে, অধিকাংশই পলাতেও পারে না। আর পালাবার চেষ্টাও করে না। বরং জাল মুখে করে পুকুরের পানির ভিতর গিয়ে চুপ করে মুখ শুঁজড়ে শুয়ে থাকে—মনে করে, “আর কোন ভয় নাই আর আমরা বেশ আছি।” কিন্তু জানে না যে জেলে হড়্, হড়্ করে টেনে আড়ায় তুলবে। এরাই বদ্ধজীবের উপমাশ্রল।

সংসারী লোক ।

বদ্ধজীবেরা সংসারের কামিনী ও কাঞ্চনে বদ্ধ হইবে—হাত পা বাঁদা—
আবার মনে করে যে ঐ সংসারের কামিনী ও কাঞ্চনেতেই স্তব্ধ হবে, আর
নির্ভয়ে থাকবে ; কিন্তু জানে না যে এতেই মৃত্যু হবে। বদ্ধজীব যখন মরে,
তখন তার পরিবার বলে, ‘তুমি তো চলে, আমার কি করে গেলে ?’ আবার
এগনি মায়া যে, প্রদীপটাতে বেশী সলতে জ্বলে বলে, ‘তেল পুড়ে যাবে,
সলতে কমিয়ে দাও।’ এ দিকে মৃত্যুশয্যা শুয়ে রয়েছে।

“বদ্ধজীবেরা ঈশ্বরচিন্তা করে না। যদি অবসর হয়, তা হলে হয় আবেল
তাবেল ফালতো গল্প করে. নয় মিছে কাজ কবে। জিজ্ঞাসা করলে বলে,
আমি চুপ করে থাকতে পারি না, তাই বেড়ি বাঁধছি। হয় তো সময় কাটে না
দেখে তাস্ খেলতে কারন্ত করিল।”

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

একজন ভক্ত। মহাশয়, এরূপ সংসারী জীবের কি কোন উপায় নাই ?

শ্রীধামকৃষ্ণ। অবশ্য উপায় আছে। মাঝে মাঝে মাধুসঙ্গ করতে হয়,
আর মাঝে মাঝে নির্জনে থেকে ঈশ্বরচিন্তা করতে হয়। আর বিচর
করতে হয়। তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়, ‘আমাকে ভক্তি বিশ্বাস দাও।’

বিশ্বাসের বল ।

“বিশ্বাস হয়ে গেলেই হ’ল। বিশ্বাসের চেয়ে আর জিনিস নাই।

(কেনারের প্রতি) “বিশ্বাসের কত জোর তা তুমি শুনেছ ? পুরাণে
আছে রামচন্দ্র যিনি সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, তাঁর লঙ্কায় যেতে সেতু বাঁধতে
হ’ল। কিন্তু হনুমান রামনামে বিশ্বাস করে লাক দিয়ে সমুদ্রের পারে গিয়ে
পড়ল ! তার আর সেতুর দরকার হয় নাই।

“বিতীষণ একটী পাতায় রাম নাম লিখে, ঐ পাঁচটি একটী লোকের
কাপড়ের খোঁটে বেঁধে দিচ্ছিল। সে লোকটি সমুদ্রের পারে যাবে। বিতীষণ
তাকে বলেন, তোমার ভয় নাই, তুমি বিশ্বাস করে জলের ওপর দিয়ে চলে
যাও ; কিন্তু দেখো, যাই অবিশ্বাস করবে, অমনি জলে ডুবে যাবে। লোকটি
বেশ সমুদ্রের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছিল। এমন সময়ে তার ভারি ইচ্ছা হ’ল
যে কাপড়ের খোঁটে কি বাঁধা আছে একবার তাকো। খুলে দেখ যে কেবল
রাম নাম লেখা রয়েছে। তখন সে ভাবলে, এ কি ! শুধু রাম নাম একটি
লেখা রয়েছে ! যাই অবিশ্বাস, অমনি ডুবে গেল।

“যার ঈশ্বরের বিশ্বাস আছে, সে যদি মহাপাতক করে—গো, ব্রাহ্মণ, স্ত্রী হত্যা করে, ভবুও ভগবানে এই বিশ্বাসের বল সে সব ভারি ভারি পাপ থেকে উদ্ধার হতে পারে। সে যদি বলে, আর আমি এমন কাজ করবো না, তার কিছুতেই ভয় হয় না।

মহাপাতক ও নামের মাহাত্ম্য।

“এই বলিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণ গান গাইতে লাগিলেন,—

“আমি দুর্গা দুর্গা বলে যা যদি মরি।

আখেরে এ দিনে, না তাব কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী ॥

নাশিগো ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ভ্রম, সুরাপান আদি বিনাশি নারী।

এ সব পাতক, না ভাবি তিলেক, ব্রহ্মপদ নিতে পারি ॥

(নরেন্দ্র ।)

শ্রীকৃষ্ণ নরেন্দ্রের কথা পড়িল। ভক্তদের সম্বোধন করে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বল্লেন—

“এই ছেলেটিকে দেখছ, এখানে এক রকম। চরম্ব ছেলে বাবার কাছে যখন বসে যেন জুজুটি; আবার চাঁদনীতে যখন খেলে তখন আর এক মুক্তি। এরা নিত্য গিকের থাকে। এরা সংসারে কখনও বদ্ধ হয় না। একটু বস হলেই চৈতল্য হয়, আর ভগবানের দিকে চলে যায়। এরা সংসারে আসে জীব লিঙ্কার জন্ত। এদের সংসারের বস্তু কিছু ভাল লাগে না—এরা কামিনী কাঞ্ছনে কখনও আসক্ত হয় না।

“বেদে আছে হোমা পাখীর কথা। খুব উঁচু আকাশে সে পাখী থাকে। সেই আকাশেতেই ডিম পাড়ে। ডিম পাড়লেই ডিমটা পড়তে থাকে—কিন্তু এত উচ্চ যে অনেকদিন থেকে ডিম পড়তে থাকে। ডিম পড়তে পড়তে ফুটে যায়। তখন ছানাটা পড়তে থাকে। পড়তে পড়তে তার চোক ফোটে। ডানা বেরোয়। চোখ ফুটলেই দেখতে পায় যে সে পড়ে যাচ্ছে, আর মাটিতে লাগলে একেবারে চুরমার হয়ে যাবে। তখন সে পাখী মার দিকে একেবারে চোঁচা দৌড় দেয়, আর উঁচুতে উঠে যায়।

নরেন্দ্র উঠিয়া গেলেন। সভামধ্যে কেদার, প্রাণকৃষ্ণ, মাষ্টার ইত্যাদি অনেকে ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ভক্তদের প্রতি) ষাণ্ঠো, নরেন্দ্র গাইতে বাজাতে পড়া

শুনায় সব ভাতেই ভাল । সেদিন কেদারের সঙ্গে তর্ক করছিল । কেদারের কথাগুলো কচ্ কচ্ করে কেটে দিতে লাগল । (মাষ্টারের প্রতি) ইংরাজিতে কি কোন তর্কের বই আছে ?

মাষ্টার । হাঁ ইংরাজীতে Logic (ত্রায়শাস্ত্র) আছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আচ্ছা, কি রকম একটু বল দেখি ।

মাষ্টার এইবার মুঞ্চিলে পড়িলেন । বলিলেন—

“এক রকম আছে, সাধারণ সিদ্ধান্ত থেকে বিশেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছান ।
যেমন,—

সব মানুষ মরে যাবে ।

পণ্ডিতেরা মানুষ ।

অতএব পণ্ডিতেরা মরে যাবে ।”

“আর এক রকম আছে, বিশেষ দৃষ্টান্ত বা ঘটনা দেখে সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছান ; যেমন,—

এ কাকটা কালো ;

■ কাকটা কালো ;

(আবার) যত কাক দেখছি, সবই কালো ;

অতএব সব কাকই কালো ।

“কিন্তু এ রকমে সিদ্ধান্ত করলে ভুল হতে পারে ; কেন না, হয় তো খুঁজতে খুঁজতে আর এক দেশে শাদা কাক দেখা গেল । আর এক দৃষ্টান্ত—যেখানে বৃষ্টি, সেইখানে মেঘ ছিল বা আছে ; অতএব এই সাধারণ সিদ্ধান্ত হ'ল, যে মেঘ থেকে বৃষ্টি হয় । আরো এক দৃষ্টান্ত,—

এ মানুষটির বত্রিশ দাঁত আছে ।

ও মানুষটির বত্রিশ দাঁত ।

(আবার) যে কোন মানুষ দেখছি তারই বত্রিশ দাঁত আছে ।

“অতএর সব মানুষেরই বত্রিশ দাঁত আছে ।” এরূপ সাধারণ সিদ্ধান্তের কথা ইংরাজি ত্রায়শাস্ত্রে আছে ।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ কথাগুলি শুনিলেন যাত্র । শুনিতে শুনিতেই অকৃতমন হইলেন । কাজে কাজেই আর এ বিষয়ে বেশী প্রশঙ্গ হইল না ।

তিনি মানুষের হিত করিতে লাগিলেন । কিন্তু দেবতার ধারণা তখনও অক্ষুণ্ণ রহিল । তাঁহারা তাঁহার নীতিপরায়ণতা এবং শক্তিও বর্দ্ধিত করিলেন মাত্র । জগতের মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নীতিপরায়ণ পুরুষ এবং এতদ্ব্যতীত সর্ব-শক্তিমানও হইলেন ।

কিন্তু জোড়া তড়া দিয়া বেশী দিন চলে না । যেমন জগদ্রহস্তের সূক্ষ্মা হুসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা হইতে লাগিল, তেমনি ঐ রচনায় যেন আরও রহস্যময় হইতে লাগিল । দেবতা বা ঈশ্বরের গুণ যেমন সমগুণাত্মক শ্রেণী নিয়মে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, সন্দেহও সন্দেহরূপ সমগুণিতাত্মক শ্রেণী নিয়মে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল । যখন লোকের জিহ্বাভা নামক নিষ্ঠুর ঈশ্বরের ধারণা ছিল, তখন সেই ঈশ্বরের সহিত জগতের সামঞ্জস্য বিধান করিতে যে বর্ষ পাইতে হইত, তাহা অপেক্ষা এখন যে ঈশ্বরের ধারণা উপস্থিত হইল, তাহার সহিত জগতের সামঞ্জস্যদান কঠিন হইয়া পড়িল । সর্বশক্তিমান এবং প্রেমময় ঈশ্বরের রাজ্যে একপ পৈশাচিক ঘটনা কেন ঘটে ? কেন স্থখ অপেক্ষা দুঃখ এত বেশী ? সাধুতাব যত আছে, তাহা অপেক্ষা অসাধুতাব এত বেশী কেন ? আমরা কিছু খায়াপ দেখিব না, বলিয়া ঢোক বুজিয়া থাকিতে পাবি, কিন্তু তাহাতে এই জগৎ যে একটি নীভংস জগৎ, তাহার কিছু পরিবর্তন হয় না । খুব ভাল বলিলে বলিতে হয়, ট্যান্টালাসের * নরকস্বরূপ, তাহা হইতে উহা কোন অংশে উৎকৃষ্ট নহে । প্রবল প্রবৃত্তি সব রহিয়াছে, ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার প্রবল বাসনা, কিন্তু পূরণ করিবার উপায় নাই ! আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের হৃদয়ে এক তরঙ্গ উঠিল—তাহাতে আমাদের কোন কার্যে অগ্রসর করিল, আর আমরা এক পদ যাই অগ্রসর হই, অমনি ধাক্কা আইসে । আমরা সকলেই যেন ট্যান্টালাসের মত এই জগতে ভীষন ধারণ করিতে এবং মরিতে যেন পিণিনির্বন্ধে অভিশপ্ত ! ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সীমাবদ্ধ জগতের ভিতরে যতদূর উচ্চ আদর্শ হইতে পারে, সেই সকলের অতীত সব আদর্শ

* গ্রীকদিগের মধ্যে একটি পৌরাণিক গল্প আছে । তাহাতে বর্ণিত আছে যে, ট্যান্টালাস নামক এক রাজা পাতালে এক হুদে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন । ঐ হুদের জল তাঁহার ওষ্ঠ পর্য্যন্ত আসিত এবং যখনই তিনি পিপাসা নিবারণ করিবার জল গান করিতে উদ্যত হইতেন, অমনিই জল সরিয়া যাইত । তাঁহার মাথার উপর নানাবিধ জল ঝুলিত এবং যখনই তিনি স্নান নিবৃত্তি করিবার জন্য ঐ হাত দিয়া লইতে যাইতেন, অমনি উহা সরিয়া যাইত ।

আমাদের মস্তিষ্কে আসিতেছে, কিন্তু যদি আমরা সে গুণি কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করি, অর্থাৎ দেখিতে পাইব যে গুণিকে কখনই কার্যে পরিণত করিতে পারা যায় না। বরং আমরা চতুর্দিকস্থ স্রোতে পৌষিত হয়ে, চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পবনগুহে পরিণত হই। অর্থাৎ যদি আমি এই আদর্শের জগ্গে চেষ্টা পরিচালনা করিয়া কেবল সাংসারিক ভাবে থাকিতে চাই, তাহা হইলেও আমাকে পশুজীবন যাপন করিতে হয়, আর আমি অবনত হইয়া যাঠ। কোন দিকেই সুখ নাই। যাহারা এই জগতেই যেমন জন্মিয়াছে, সেই রূপই থাকিতে চায়, তাহাদেরও অদৃষ্টে ছুঃখ। যাহারা আবার সত্যের জগৎ— এই পাশব জীবন হইতে কিছু উন্নত জীবনের জগৎ প্রাণ দিতে আগ্রহ হয়, তাহাদের আবার সত্যের জগৎ অসুখ। ইহা বাস্তবিক ঘটনা; ইহার আর কিছু ব্যাখ্যা নাই। ইহার কোন ব্যাখ্যা হইতে পারে না, কিন্তু বেদান্ত বাহিরে যাইবার পথ দেখাইয়া দেন। এই সকল বৃত্তান্তের সময় আমাকে এমন অনেক কথা বলিতে হইবে, যাঁহাতে সময়ে সময়ে তোমরা ভয় পাইবে, কিন্তু আমি যাহা বলি, তাহা স্মরণ রাখিও, উহা দেশ করিয়া হস্তম করিও, দিব্যরাত্র ঐ সম্বন্ধে চিন্তা করিও। তাহা হইলে উহা তোমার অন্তরে প্রবেশ করিবে, উহা তোমাদিগকে উন্নত করিবে এবং তোমাদিগকে সত্য বুঝিতে এবং সত্যে বাস করিতে সমর্থ করিবে।

এই জগৎ যে ট্যান্টালোসের নবকল্পরূপ, ইহা কোন মত বিশেষ নহে, ইহা বাস্তবিক সত্য কথা—আমরা এই জগৎসম্বন্ধে কিছু জানিতে পারি না, আবার আমরা জানি না, তাহাও বলিতে পারি না। এই জগৎশৃঙ্খলের অস্তিত্ব আছে, তাহাও আমি বলিতে পারি না, আবার যখন আমরা উহার সম্বন্ধে চিন্তা করিতে যাই, তখন আমরা দেখিতে পাই, আমরা কিছুই জানি না। উহা আমার মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ ভ্রম হইতে পারে। আমি হয়ত কেবল স্বপ্ন দেখিতেছি মাত্র। আমি স্বপ্ন দেখিতেছি, আমি তোমার সম্বন্ধে কথা কহিতেছি, আমার তুমি আমার কথা শুনিতেছ। কেহই ইহার বিপরীত প্রমাণ করিতে পারেন না। ‘আমার মস্তিষ্ক’ ইহাও একটা স্বপ্ন হইতে পারে, আর বাস্তবিকও ত কেহ নিজের মস্তিষ্ক কখন দেখে নাই। আমরা উহা কেবল মানিয়া লইতেছি মাত্র। সকল বিষয়েই এইরূপ। আমার নিজের শরীরও আমি মানিয়া লইতেছি মাত্র। আবার আমি জানি না, তাহাও বলিতে পারি না। জ্ঞান ও অজ্ঞানের মধ্যে এই অবস্থান, এই রহস্যময়

কুহেলিকা—এই সত্য মিথ্যার মিশ্রণ—কোথায় মিশিয়াছে, কে জানে ? আমরা স্বপ্নের মধ্যে বিচরণ করিতেছি, অর্ধনিদ্রিত, অর্ধ জাগ্রত—সারা জীবন এক কুহেলিকায় আঁধার—ইহাই আমাদের প্রত্যেকেরই দশা ! সব ইন্দ্রিয়জ্ঞানের এই দশা । সকল দর্শনের, সকল গর্ভিত বিজ্ঞানের, সকল প্রকার গর্ভিত মানবজ্ঞানেরও এই দশা—এই পরিণাম । ইহাই ব্রহ্মাণ্ড ।

ভূতই বল, আত্মাই বল, মনই বল, অর যাহাই বল না কেন, যে কোন নামই উহাকে দাও না কেন, বাপা এই একই—আমরা বলিতে পারি না, উহাদের অস্তিত্ব আছে, বলিতে পারি না যে, উহাদের অস্তিত্ব নাই । আমরা উহাদিগকে একও বলিতে পারি না, আবার বহুও বলিতে পারি না । এই আলো আঁধারের খেলা—নানাবিধ দুর্দলতা—দুর্বিজ্ঞেয়, দুর্বিভাজ্য, কিষ্ট তথাপি বহিয়াছে—বাস্তবিক বাপার অথচ বাস্তবিক নহে, জাগ্রত আবার ঘন নিদ্রিত ! ইহা প্রকৃত ঘটনা—ইহাকেই মায়া বলে । আমরা এই মায়াতে জন্মিয়াছি, আমরা ইহাতেই জীবিত রহিয়াছি, আমরা ইহাতেই চিন্তা করিতেছি, ইহাতেই স্বপ্ন দেখিতেছি । আমরা এই মায়াতেই দার্শনিক, আমরা ইহাতেই সাধু, গুণু তাহাই নহে, আমরা এই মায়াতেই কখন দানব কখন বা দেবতা হইতেছি । চিন্তারথে আরোহণ করিয়া যতদূর যাও, তোমার ধারণাকে উচ্চ হইতে উচ্চতর কর, উহাকে অনন্ত অথবা যে কোন নাম দিতে ইচ্ছা হয়, দাও, ঐ ধারণাও এই মায়ারই ভিতরে । ইহার বিপরীত হইতেই পারে না, আর মানুষের সমস্ত জ্ঞান কেবল এই মায়ার সাধারণ ভাব আবিষ্কার করা, উহার প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞান । এই মায়া নামরূপেরই কার্য্য । যে কোন বস্তুরই আকৃতি আছে, যাহা কিছু তোমার মনের মধ্যে কোন প্রকার ভাবের উদ্দীপনা করিয়া দেয়, তাহাই মায়ার অন্তর্গত, কারণ, যেমন জন্মান দার্শনিকগণ বলেন, যাহা কিছু দেশকাল-নিমিত্তের অধীন, তাহাই মায়ার অন্তর্গত ।

এক্ষণে ফের সেই ঈশ্বর-ধারণা-সম্বন্ধে কি হইল, তাহার বিচার করা যাউক । পূর্ন সংসারের যে অবস্থা চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতে অনায়াসেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, পূর্বোক্ত ঈশ্বরধারণা—একজন ঈশ্বর আমাদের অনন্তকাল ধরিয়া ভালবাসিতেছেন—ভালবাসা অবশ্য আমাদের ধারণামত—একজন অনন্ত সর্গশক্তিমান ■ নিঃস্বার্থ পুরুষ এই জগৎ শাসন করিতেছেন, তাহা হইতেই পারে না । এই মঙ্গল ঈশ্বরধারণার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে কবির ১৫ই বঙ্কন, ১৩০৭ ।]

সাহসের আশ্রয়ক। তোমার জায়গার দয়াময় ঈশ্বর কি? কবি জিজ্ঞাসিতে-
ছেন, তিনি কি মনুষ্যরূপ বা পশুরূপ তাহার লক্ষ লক্ষ সন্তানের বিনাশ দেখিতে-
ছেন না? কারণ, এমন কে আছে, যে এক মুহূর্তও অপরকে না মারিয়া জীবন
ধারণ করিতে পারে? তুমি কি সহস্র সহস্র জীবন সংহার না করিয়া একটী
নিখাদ ও আকর্ষণ করিতে পার? তুমি জীবিত রহিয়াছ, লক্ষ লক্ষ জীব মরিতেছে
বলিয়া। তোমার জীবনের প্রতি মুহূর্ত, প্রত্যেক নিশ্বাস যাহা তুমি গ্রহণ
করিতেছ, তাহা সহস্র সহস্র ব্যক্তির মৃত্যুরূপ, আর তোমার প্রত্যেক গতি
লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির মৃত্যুরূপ। কেন তাহারা মরিবে? এ সম্বন্ধে একটী
অতি প্রাচীন ঐতিহাসিক কথা প্রচলিত আছে,—“উহারা ত অতি নীচ জীব।”
মনে কব যেন তাহাটী হইল—কিন্তু ইহা একটী অসীমায়িত বিষয়। কে
বাগিতে পারে, কীট মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ, কি মনুষ্য কীট হইতে শ্রেষ্ঠ? কে
প্রমাণ করিতে পারে, এটা ঠিক, কি ওটা ঠিক? মানুষ গৃহ নির্মাণ করিতে
পারে অথবা যন্ত্র আবিষ্কার করিতে পারে, তবে মানুষই শ্রেষ্ঠতর। এ কথা
বলিলে ইহাও বলা যাইতে পারে, কীট গৃহ নির্মাণ করিতে পারে না বা যন্ত্র
আবিষ্কার করিতে পারে না বলিগাই শ্রেষ্ঠ। এ পক্ষেও যেমন যুক্তি নাই,
ও পক্ষেও তদ্রূপ নাই।

যাক সে কথা, উহারা অতি হীন জীব ধরিয়া লইলেও, তাহারা মরিবে
কেন? যদি তাহারা হীন জীব হয়, তাহাদেরই ত আরো বাঁচা বেশী দরকার।
কেন তাহারা বাঁচিবে না? তাহাদের জীবন ইঞ্জিয়েই বেশী আবদ্ধ, সুতরাং
তাহারা তোমার আমার অপেক্ষা সহস্র গুণ সুখ দুঃখ বোধ করে। কুকুর
ব্যাভ্র যেক্রপ ক্ষুধার সহিত ভোজন করে, কোন্ মানব সেক্রপ ক্ষুধার সহিত
ভোজন করিতে পারে? ইহার কারণ, আমাদের সমুদয় কার্যপ্রবৃত্তি
ইঞ্জিয়ে নহে,—বুদ্ধিতে—আয়ায়। কিন্তু কুকুরের ইঞ্জিয়েই প্রাণ পড়িয়া
রহিয়াছে, তাহারা ইঞ্জির স্পের দ্বারা উত্তত হয়, তাহারা এত আনন্দের সহিত
ইঞ্জির সুখ ভোগ করিবে, আমরা মনুষ্যেরা সেক্রপ করিতে পারি না, আর
এই সুখও যত থানি, দুঃখও তাহার সমপরিমাণ।

যতখানি সুখ, ততখানি দুঃখ। যদি মনুষ্যের প্রাণীরা এত তীব্রভাবে সুখ
অনুভব করিয়া থাকে, তবে ইহাও সত্য, তাহাদের দুঃখবোধও তেমনি তীব্র—
মানুষের অপেক্ষা সহস্র গুণে তীব্রতর—তাহাদিগকে মরিতে হইবে! তাহা
হইলে হইল এট, মানুষ মরিতে যত কষ্ট অনুভব করিবে, অপর প্রাণী তাহার
১১৬ উদ্বোধন। [৩য়—৪র্থ সংখ্যা ;

শত শত ভাগ করিবে, তথাপি আমরাইগকে তাহাদের কষ্টেওঁ বিষয় না ভাবিয়া তাহাদিগকে মারিতে হয় । ইহাই মায়া ; আর যদি আমরা মনে করি, একজন সগুণ ঈশ্বর আছেন, যিনি ঠিক মানুষেরই মত, যিনি সব সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইলে ঐ যে সকল ব্যাখ্যা মত প্রভৃতি, যাৎকালে বল, মন্দের মধ্য হইতে ভাল হইয়াছে, তাহা পর্যাপ্ত হয় না । ইউকেনা শত শত সহস্র সহস্র উপকার—মন্দের মধ্য দিয়া উহা কেন আসিবে ? এই দিক্‌স্থ অনুসারে তবে আমিও নিজ পক্ষেইয়ের স্বার্থের জন্য অপরের গল কাটিব । সুতরাং ইহা কোন যুক্তি হইল না । কেন মন্দের মধ্য দিয়া ভাল হইবে ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে, কিন্তু এই প্রশ্নের ত উত্তর দেওয়া যায় না ; ভারতীয় দর্শন ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল ।

বেদান্ত সকল প্রকার ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকতর সাঙসের সহিত সত্য অর্থেষণে অগ্রসর হইয়াছেন । বেদান্ত মাঝখানে এক জারগায় গিয়া তাঁহার অন্তসন্ধান স্বাগত রাখেন নাট, আর তাঁহার পক্ষে অগ্রসর হইবার এক সুবিধাও ছিল । বেদান্তধর্মের বিকাশের সময় পুনোঁত সম্প্রদায় সত্য-বেশিগণের মুখ বন্ধ করিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন নাই । ধর্ম সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল । তাঁহাদের সঙ্কীর্ণতা ছিল—সামাজিক প্রাণীতে । এখানে (ইংলণ্ডে) সমাজ খুব স্বাধীন । ভারতে সামাজিক বিষয়ে স্বাধীনতা ছিল না, কিন্তু ধর্মমত সম্বন্ধে ছিল । এখানে লোকে পোষাক যেক্রপ পরুক না কেন, কিম্বা যাহা ইচ্ছা করুক না কেন, কেহ কিছু বলে না বা আপত্তি করে না, কিন্তু চর্কে একদিন যাওয়া বন্ধ হইলেই, নানা কথা উঠে । সত্য চিন্তার সময় তাঁহাকে আগে হাজার বার ভাবিতে হয়, সমাজ কি বলে । অপর পক্ষে, ভারতবর্ষে যদি একজন অপর জাতির হাতে খাণ, অমনি সমাজ তাহাকে জাতিচ্যুত করিতে অগ্রসর হইয়া থাকে । পূর্ক পুরুষেরা যেক্রপ পোষাক করিতেন, তাহা হইতে একটু পৃথক্ক্রপ পোষাক করিলেই, বাস, তাহার সর্কনাশ । আমি শুনিয়াছি, প্রথম রেলগাড়ী দেখিতে গিয়াছিল বলিয়া একজন জাতিচ্যুত হইয়াছিল । মানিয়া লইলাম, ইহা সত্য নহে, কিন্তু আমাদের সমাজের এই গতি । কিন্তু আবার ধর্ম বিষয়ে দেখিতে পাট, নাস্তিক, জড়বাদী, বৌদ্ধ, সবল রকমের ধর্ম, সবল রকমের মত, অদ্বুত রকমের, তন্নানক তন্নানক মত লোকে প্রচার করিতেছে, শিক্ষা পাইতেছে,— এমন কি, দেবপূর্ণ মন্দিরের দ্বারদেশে ব্রাহ্মণেরা জড়বাদিগকেও ঈড়াইয়া ১৫ই কাঙ্কন, ১৮০৭ ।]

তাহাদেরই দেবতার নিন্দা করিতে দিতেছেন! ইহা তাহাদের—ধর্ম উদারতা ও মহত্বের পরিচায়কই বটে।

বুদ্ধ খুব বুদ্ধ বংশে দেহরক্ষা করেন। আমার এজন্য আমেরিকান বৈজ্ঞানিক বস্তু বুদ্ধদেবের জীবনী পড়িতে বড় ভাল বাসিতেন। তিনি বুদ্ধদেবের মূর্তি ভাববাসিতেন না, কারণ বুদ্ধদেব ক্রুশে বিদ্ধ হন নাই। কি ভ্রমাত্মক ধারণা! বড় লোক হইতে গেলেই পুন হইতে হইবে! ভারতে একপ ধারণা প্রচলিত ছিল না। বুদ্ধদেব তাহাদের দেবতা, এমন কি, তাহাদের দেবদেব জগৎশাসনকর্তা পশ্চাত্ত অস্বীকার করিয়া তাহাদেরই দেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তিনিই আপনার বুদ্ধবংশে মৃত্যুদুখে পতিত হন। তিনি ৮৫ বৎসর বাচিয়াছিলেন, আর তিনি অন্ধ দেশ তাহার ধর্ম আনিয়াছিলেন।

চার্কাৎকোৱা ভয়ানক ভয়ানক মত প্রচািন করিতেন—ঊনবিংশ শতাব্দীতেও লোকে একপ স্পষ্ট খোলা খাটি জড়বাদ প্রচারে সাহস করে না। এই চার্কাকগণ মন্দিরে নিন্দে নগবে নগবে প্রচার করিতেন—ধর্ম মিথ্যা—উহা পুরোহিতগণের স্বার্থ চর্চিতার্থ করিবার উপায় মাত্র, বেদ ভণ্ড ধর্ম নিশাচর দিগের রচনা—জীষণও নাই, অগ্নাও নাই। যদি আত্মা থাকেন, তবে জী পুত্রের প্রণয়াকৃষ্ট হইয়া কেন তিনি ফিরিয়া আসেন না? তাহাদের এই ধারণা ছিল যে, যদি আত্মা থাকেন, তবে মৃত্যুর পরও তাহার ভালবাসা প্রণয় সব থাকে, তিনি ভাল থাকিতে, ভাল পরিতে চান। এইরূপ ধারণাসম্পন্ন হইলেও নেহই চান্দাওদিগের উপ কোন অত্যাচার করে নাই।

আমরা ধর্মবিষয়ে স্বাধীনতা দিয়াছিলাম, তাহার ফলস্বরূপ এখনও ধর্ম-জগতে আমাদের মহাশক্তি বিরাজিত। তোমরা সামাজিক বিষয়ে সেই স্বাধীনতা দিয়াছ, তাহার ফল—তোমাদের অতি সুন্দর সামাজিক প্রণালী। আমরা সামাজিক উন্নতি বিষয়ে কিছু স্বাধীনতা দিই নাই, সুতরাং আমাদের সমাজ সঙ্কীর্ণ। তোমরা ধর্মসম্বন্ধে স্বাধীনতা দাও নাই, ধর্মবিষয়ে প্রচলিত মতের বহিঃক্রম করিলেই অমনি বন্দুক তরবারি বাতির হইত; তাহার ফল, ইউরোপীয় ধর্মভাব সঙ্কীর্ণ। ভারতে সমাজের শৃঙ্খল খুলিয়া দিতে হইবে, আর ইউরোপে ধর্মের শৃঙ্খল খুলিয়া লইতে হইবে। তবেই উন্নতি হইবে। যদি আমরা এই আধ্যাত্মিক নৈতিক বা সামাজিক উন্নতির ভিত্তরে যে একত্ব রহিয়াছে, তাহা ধরিতে পারি, যদি জানিতে পারি, উহার একই পদার্থের বিভিন্ন বিকাশমাত্র, তবে ধর্ম আমাদের সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিবে, আমা-

দের জীবনের প্রতি যত্নই ধর্ম ভাবে পূর্ণ হইবে। ধর্ম আমাদের জীবনের প্রতি কার্য্যে প্রবেশ করিবে— ধর্ম বলিতে বাহ্য কিছু বুঝায়, সেই সমুদয় আমাদের জীবনে তাহার প্রভাব বিস্তার করিবে। বেদান্তের আলোকে তোমরা বুঝিবে, সব দিক্তান কেবল ধর্মেরই বিভিন্ন বিকাশমাত্র ; ভগবতের আর সব জিনিষও ঐরূপ।

তবে আর্মবা দেখিলম, স্বাধীনতা থাকাতেই ইউরোপে এই সকল বিজ্ঞানের উপ-ভ্র ও শ্রীকৃষ্টি হইয়াছে, আর আমরা দেখিতে পাই, আশ্চর্য্যের বিষয়, সকল সমাজেই তইটী দল দোপতে পাওয়া যায়। এক দল সংহারক, আর এক দল সংগঠনকারী। মনে কর, সমাজে কোন দোষ আছে, অমনি এবদল উঠিয়া অমান গালাগালি করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহারা অনেক সময় গোঁড়ামাত্র হইয়া দাঁড়ায়। সকল সমাজেই ইহাদিগকে দেখিতে পাইবে, আর জীলো-কেরাই অধিকাংশ এই চাঁৎকারে যোগ দিয়া থাকে, কারণ তাহারা স্বভাবতই ভাবপ্রবণ। যে কোন ব্যক্তি দাঁড়াইয়া কোন বিষয়ের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করে, তাহারই দলবুদ্ধি হইতে থাকে। ভাঙ্গা সহজ ; একজন পাগল সহজে বাহা ইচ্ছা ভাঙ্গিতে পারে, কিন্তু তাহার পক্ষে কিছু গড়া কঠিন।

সকল দেশেই এইরূপ অসদ্বিষয়ের প্রতিবাদা কোন না কোন আকারে বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায়, আর তাহারা মনে করে, কেবল গালাগালি দিয়া, কেবল দোষ প্রকাশ করিয়া দিয়াই তাহারা লোককে ভাল করিবে। তাহাদের দিক্ হইতে দেখিলে মনে হয় বটে, তাহারা কিছু উপকার করিতেছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহারা অধিক অনিষ্টই করিয়া থাকে। কোন জিনিষ ত আর এক দিনে হয় না। সমাজ একদিনে নিশ্চিত হয় নাই, আর পরিবর্তন অর্থে— কারণ দূর করা। মনে কর, এখানে অনেক দোষ আছে, কেবল গালাগালি দিলে কিছু হইবে না, কিন্তু মূল গমন করিতে হইবে। প্রথমে ঐ দোষের হেতু কি নির্ণয় কর, তার পর উহা দূর কর, তাহা হইলে উহার ফলস্বরূপ দোষ আপনিই চলিয়া যাইবে। চাঁৎকারে কোন ফল হইবে না, তাহাতে বরং অনিষ্টই আনয়ন করিবে।

অপর দলের— ইহাদের কথা বলা হইয়াছে— তাহাদের জগত্রে সহায়ত্ব ছিল। তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, দোষ নিবারণ করিতে হইলে উহার কারণ পর্য্যন্ত গমন করিতে হইবে। ইহাবই বড় বড় সাধুগণ। একটী কথা তোমাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, ভগবতের সকল শ্রেষ্ঠ আচার্য্যগণই বলিয়া গিয়াছেন, আমরা নাশ করিতে আগি নাই, পূর্কে বাহা ছিল, ওলা কাশন, ১৩০৭।]

তাঁহাকে সম্পূর্ণ করিতে আসিয়াছি। অনেক সময় আচার্য্যগণের এইরূপ মহৎ উদ্দেশ্য না বুঝিয়া তাঁহারা সাধারণ লোকের মতে সায় দিয়া তাঁহাদের অল্প-যুক্ত কার্য্য করিয়াছেন, বলিয়া থাকে। এখনও অনেকে এইরূপ বলিয়া থাকে যে, ইহারা যাহা সত্য বলিয়া ভানিতেন, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে সাহস করিতেন না, ইহারা কতকটা বাপুরুষ ছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। এই সকল একদেশদর্শীরা এই সকল মহাপুরুষগণের হৃদয়স্থ প্রেমের অনন্ত শক্তি অতি অল্পই বুঝিতে পারে। তাঁহারা জগতস্থ জনগণকে তাঁহাদের সম্ভানস্বরূপ দেখিতেন। তাঁহারই যথার্থ পিতা, তাঁহারই যথার্থ দেবতা, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই জন্ত অনন্ত সহানুভূতি এবং ক্ষমা—তাঁহারা সর্বদা সহ এবং ক্ষমা করিতে প্রস্তুত। তাঁহারা জানিতেন, কি করিয়া মানবসমাজ সংগঠিত হইবে; সুতরাং তাঁহারা অতি ধীরভাবে, অত্যন্ত সহৃদয়ের সহিত তাঁহাদের সমাজীবনী ঔষধ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। লোককে তাঁহারা গালাগালি দেন নাই বা ভয় দেখান নাই, কিন্তু অতি ধীরভাবে তাঁহাদিগকে এক এক পদ করিয়া পথ দেখাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ইহারা উপনিষদের লেখক। তাঁহারা সম্পূর্ণ জানিতেন, ঈশ্বরের প্রাচীন ধারণা সকল উন্নত-নীতি-সম্বত ধারণার সহিত মেলেনা। তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে জানিতেন, ঐ সকল খণ্ডন-কারীদের ভিতরই অধিক সত্য আছে; তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে জানিতেন, বৌদ্ধ ঐ নাস্তিকগণ যাহা প্রচার করিতেন, তাহার মধ্যে অনেক মহৎ মহৎ সত্য আছে, কিন্তু তাঁহারা ইহাও জানিতেন, যাহারা পূর্বমতের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখা না করিয়া নূতন মত স্থাপন করিতে চাহে, যাহারা যে সূত্রে মালা গ্রহিত, তাহাকে ছিন্ন করিতে চাহে, যাহারা শূন্যের উপর নূতন সমাজ গঠন করিতে চাহে, তাহারা সম্পূর্ণরূপে অকৃতকার্য্য হইবে।

আমরা কখনই নূতন কিছু নির্মাণ করিতে পারি না, আমরা কেবল পুরাতন বস্তুর স্থান পরিবর্তন করিতে পারি মাত্র। বীজই বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, সুতরাং আমরাদিগকে ধৈর্য্যের সহিত শাস্ত্রভাবে লোকের সত্যাত্মস্বাক্ষানের জন্ত নিযুক্ত শক্তিকে পরিচালন করিতে হইবে, যে সত্য পূর্ণ হইতেই জাত, তাহারই সম্পূর্ণভাবে জানিতে হইবে। সুতরাং ঐ প্রাচীন ঈশ্বরধারণা বর্তমান কালের অল্পযুক্ত বলিয়া একেবারে উড়াইয়া না দিয়া, তাঁহারা উহার মধ্যে যাহা সত্য আছে, তাহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, তাহার কল রূপদান-দর্শন। তাঁহারা প্রাচীন দেবতাসকল এবং জগতের শাস্তা এক ঈশ্বরের

হইয়াছে। বিরূপে যষ্টী বিভক্তির দ্বারা নির্দিষ্ট হইল? অর্থাৎ এই স্বত্রে, বিভক্তি বিহীন নির্দেশ করা যাইবে। যেমন কৃপ উঃ রঃ লঃ এইরূপ বিচ্ছেদ করিয়া “কৃপোর্বোলঃ” স্বত্র নিষ্পাদিত হইয়াছে। এই স্থলে এইরূপ অর্থ হইবে যে কৃপ ধাতুর ঞ্কারের যষ্টী বিভক্তিতে উঃ হইয়াছে। র্ ইহার যষ্টী বিভক্তিতে রঃ হইয়াছে। ল্ টহার যষ্টী বিভক্তিতে লঃ হইয়াছে। সুতরাং কৃপ ধাতুর ঞ্কারের স্থানে ঞ্কার এবং র্ স্থানে ল্ হইবে; এইরূপই য’ন অর্থ হইল, তখন এই স্থানে ঞ্কারও যষ্টী বিভক্তি নির্দিষ্ট হওয়াতে, একদেয় বিকৃত হইলেও রূপান্তর হইবে না। অতএব “কৃপ্তশিখ” এই স্থলেও ‘৯’ প্রত হইবে।

ভাষায়ুল।—অথবা পুনরস্ত অনিশেষণ। নয় চোক্তং রাজঃ ক চ রাজ-কীয়ম্ অল্লোপোন উচি প্রাপ্নোতীতি। নৈব দোষঃ। বক্ষ্যতেত্যৎ স্বাদীনাম্ সংপ্রসারণে নকারান্তগ্রহণমনকারান্তপ্রতিষেধার্থমিতি। তৎপ্রকৃতমুক্তরত্নাহ-বর্তিষ্যতে। অল্লোপোনঃ নকারান্তপ্রতিষেধমিতি।

বক্ষ্যতে।—অথবা পুনঃ যষ্টী বিভক্ত বিশিষ্ট না হইয়া সাধারণরূপেই হউক। যদি বল যে, সাধারণরূপে (অবিশেষরূপে) প্রয়োগ করিলে, “রাজঃ ক চ,” এই স্বত্র দ্বারা রাজকীয়ম্ শব্দ সিদ্ধ হইলে, অল্লোপোহনঃ ৬।৪।১৩। (কোনও শব্দের অঙ্গস্থিত অবয়ববিশিষ্ট কোনও “নকার” হইলে, সেই নকার যদি সর্জনাম (১) বিশিষ্ট সংজ্ঞা না হয়, আর তৎপরে যদি অয়চ্ আদি বিশিষ্ট আদি (২) পরে থাকে, পুনঃ সেই ন কার যদি অনুভাগের অন্তর্স্থিত হয়, তাহা হইলে, সেই নকারের পূর্ববর্তী অকারের লোপ হয়) এই স্বত্রানুসারে, রাজন্ শব্দের লুপ্ত নকার প্রযুক্তও, রাজকীয় শব্দের ‘জ’কারস্থিত ঞ্কারের লোপ হইবে। সুতরাং ‘রাজকীয়’ এই শুদ্ধ প্রয়োগ না হইয়া রাজকীয় এই রূপ শুদ্ধ প্রয়োগ হইবে।

এই স্থলে দোষ হইবে না। যে হেতু “অয়বমঘোনামতদ্ধিতে” ৬।৪।১৩। (তদ্ধিত ভিন্ন ভ (৩) সংজ্ঞা বিশিষ্ট, ঞ্, য়, এবং মঘবন্ শব্দের

(১) স্ব ও যন্ অম্ ও এই পক্ষ বিভক্তির সর্জনাম সংজ্ঞা হয়, ব্রীষকিঙ্গ তিহ্ম অস্ত্র।

(২) স্ব হইয়াছে আদিতে বার (যে সকল বিভক্তির), তাহাকে আদি বলে। যথা স্ব, ঙ্, বস্, অম্, ওট্, শস্ ইত্যাদি।

(৩) যকার আদিতে আছে এবং স্বরবর্ণ আদিতে আছে, এমন সর্জনাম ভিন্ন আদি বিভক্তি পরে থাকিলে তাহার পূর্বস্থিত শব্দের ভ সংজ্ঞা হয়।

অনু ভাগ পরে থাকিলে, সংপ্রসারণ (১) হইয়া থাকে।) এই স্বত্বে
অনু প্রতীতি শব্দের সংপ্রসারণ প্রদেখে যে, (নকারান্ত শব্দ হইলেও
পুনঃ) নকারান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা অনকারান্ত শব্দের বারগের
জন্মই হইয়াছে, এইকপ বলিতে হইবে। প্রকৃতি গত সেই স্বত্র উত্তরো-
ত্তর অমুবৃদ্ধি করিতে হইবে। তাহা হইলে ‘অল্লোপোহঃ’ এই স্বত্বেও
নকারান্তের গ্রহণ হইবে। স্বতরাং এষ্ট স্বত্বে এইরূপ অর্থ হইবে যে,
প্রত্যক্ষদৃষ্ট নকারবিশিষ্ট অনুভাগেরই, অকার লোপ হয়। তাহা হইলেই
রাজকায় শব্দের অন্তর্গত রাজনশব্দের নকার প্রত্যক্ষদৃষ্ট নহে বলিয়া, এ
স্থলে অকারের লোপ হইবে না। রাজকীয় এইরূপ অন্তর্গত প্রয়োগও
হইবে না।

ভাষামূল্য—ইহ তর্হিকৃতপুশিখঃ। অমৃত ইতি প্রতিষেধঃ প্রাপ্নোতি।
সংপ্রতিষেধাক্তঃ। ২। রবতপ্রতিষেধাক্ততৎসিদ্ধাতি। গুরোরবত ইতি
বক্ষ্যামি যত্রাবত ইচ্ছাচাতে। দোহু ঋকারঃ দোহু ওকারঃ। অত্র ন
প্রাপ্নোতি। গুরোরবতঃ হ্রস্বভেতি বক্ষ্যামি। স এষ স্বত্বেভেদেন ৯ কারো-
পদেশঃ প্লুতার্থ সংপ্রত্যখ্যায়তে দৈব্যা মহতোবংশস্তব্ধট্টাঙ্কযতে।

বঙ্গানুদ।—তবে ‘কৃতপুশিখঃ’ এইস্থলে, গুরোবন্তোহনস্ত্যাপোঠ্যকৈকস্ত
প্রাচাম্। ৮ ২ ৮ ৬ (দ্বল হইতে সম্বোধন করিলে সেই অ হত থাকে, যদি ঋকার
ভিন্ন অল্প কোন স্বর বর্ণ হয় এবং সেই স্বর বর্ণ যদি গুরু হয়, তবে সেই স্বর
বিকল্পে প্লুত হয়) এই স্বত্রানুসারে, ঋকার পরে থাকিলে প্লুতের নিষেধ
হয় বলিয়া, ঋকার স্থানে ৯ কার হওয়াতে, ৯ কার পরে থাকিলেও প্লুতের
নিষেধ প্রাপ্ত হইবে।

এই স্থানে দোষ ঘটিবে না। আমরা স্বত্বের রূপান্তর করিব। প্রত্যক্ষ
দৃষ্ট রকার বিশিষ্ট ঋকারের প্লুত নিষেধ হয়। ১। ২। বার বিশিষ্ট ঋকারের
প্লুত নিষেধ করিলেই ৩। কারের প্লুত স্বর সিদ্ধ হইবে। এক্ষণে এইকপ স্বত্র
হইবে যে, “গুরোরবন্তোহনস্ত্যাপোঠ্যকৈকস্ত প্রাচাম্”। এইরূপ স্বত্র করিলে,
সমস্ত ঋ কারের প্লুত নিষেধ না হইয়া যাচাতে রকার প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়, এই
রূপ ঋ কারেরই নিষেধ প্রাপ্ত হইবে। অতএব ঋ কার স্থানে ৩। কার হইলেও,
৯ কারেতে র কার প্রত্যক্ষ দৃষ্ট নহে বলিয়া প্লুত নিষেধ হইবে না।

(১) ‘ঋ’কার স্থানে ইকার, ‘ব’কার স্থানে উকার, রকার স্থানে ঋ, লকার স্থানে
৩। আদেশ হইলে, তাহাকে সংপ্রসারণ কহে।

যদি র কার বিশিষ্ট স্বাক্ষর প্রসূত নিষেধ হয়, এই রূপই বলা যায় ; তবে “হোত্ব স্বাক্ষর” সন্ধি হইয়া হোত্বকার দীর্ঘ স্বাক্ষর হইলে, তাহারও স্বাক্ষরকারেতে স্বাক্ষর, প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে বলিয়া প্রসূত নিষেধ হইবে, অর্থাৎ হোত্বকার এই স্থানে স্বাক্ষর প্রসূত হইবে না ।

এই স্থলে নিষেধ প্রাপ্তি হইবে না । যেহেতু এস্থলে এইরূপ সূত্র করিব, যে গুণেরগতঃ হ্রস্বসানন্ত্যাস্যোপেক্ষ্য প্রচাম্ । তাহা হইলে, কেবল হ্রস্ব স্বাক্ষরই প্রসূত নিষেধ প্রাপ্ত হইবে । ‘হোত্বকার’ এই স্থলে প্রসূতের নিষেধ প্রাপ্তি হইবে না । এইরূপ করিলে ৯ কার উপদেশ বিনাট কাণ্য সিদ্ধিও হইবে ।

এই প্রকারে পাণিনিরূপিত সূত্রের রূপান্তর করিয়া প্রুতি প্রভৃতিতে, ৯ কার উপদেশ ব্যতীতও প্রয়োগসিদ্ধি করিয়া, ৯ কারের প্রত্যাখ্যান (খণ্ডন) করা ; যেমন অতি বৃহৎ বংশোপরিষ্ঠিত লট্ (পক্ষী বিশেষ বা ফল বিশেষ) কে অতি কষ্টে টানিয়া নামান হয় ।

ভাষামূল ।—এওঙ্ । ঐউচ্ ইতি । ইদং বিচার্যতে । ইমানি সন্ধ্যক্ষরাণি তপরানি গোপদিশ্চরন্ । এং ওং ঙ্ । ঐং উং চ্ ইতি । অতপরানি বা যথার্থমিতি । কচাত্ত বিশেষঃ ।

সন্ধ্যক্ষরেষু তপরোপদেশেচতুগরেষ্ঠাংমূল* । সন্ধ্যক্ষরেষু তপরোদেশেচতু-
পরোচ্চারণং কৰ্ত্তব্যম্ ।

বঙ্গানুবাদ ।—এ ও ঙ্ । ঐ ঐ চ্ । এই স্থলে এই বিচার করা যাইতেছে যে, এ ঐ ও ঐ এই সন্ধি (১) অক্ষর সমূহ তপরাস্ত বিশিষ্ট, “এং, ওং, ঙ্ । ঐং উং চ্” । এইরূপ উপনিষ্ট হওয়া উচিত, অথবা অতকারান্ত বিশিষ্ট গ্রন্থোক্ত বিধানবৎ উপদেশ করা কৰ্ত্তব্য ? (যেমন গ্রন্থে এ ও ঙ্, ঐ ঐ চ্ আছে, সেই রূপই হইবে ?)

ইহাতে বিশেষ কি ? ভাবার্থঃ—যেদূর গ্রন্থে লিখিত আছে সেইরূপ উল্লেখ করিলে কি দোষ হইবে এবং তকারান্ত বিশিষ্ট উচ্চারণ করিলে বিশেষ

(১) দুই বর্ণের পরস্পর মিলন হইলে, সেই মিলনকে সন্ধি কহে । একাবে, এবং ই মিলিত হইয়া ‘এ’ হইয়াছে । ওকাবে, অ এবং উ মিলিত হইয়া ‘ও’ হইয়াছে । একারে, অ এবং ই মিলিত হইয়া ‘ঐ’ হইয়াছে । ওকাবে অ এবং উ মিলিত হইয়া ‘ঔ’ হইয়াছে ; (একার এবং ওকাবে বিবৃতির প্রযুক্ত হওয়াতে, বিবৃত প্রযুক্ত বিশিষ্ট একার ওকার হইতে, তুল্য বর্ণ প্রযুক্ত হইয়া উৎপন্ন হইবেও, পৃথক্ হয়) । এই জন্যই এ ঐ ও ঐ ইত্যদিককে সন্ধি স্বাক্ষর বলে ।

কি লাভ হইবে? বরং ত কার উচ্চারণ করিলেই 'ত'কার রূপ একটী বর্ণ অতিরিক্ত উচ্চারণ জন্ম গৌরব হওয়াতে দোষই হইবে। যদি সন্ধি অক্ষরেতে ত কারের উপদেশ করা যায়; তবে তকার উচ্চারণরূপ একটী অতিরিক্ত কার্য্য কর্তব্য হইবে। * নক্ষি অক্ষরসমূহে, ত কারেব যি উচ্চারণ করা যায়; তবে ত কারের অতিরিক্ত উচ্চারণ জন্ম গৌরব হওয়াতে, উচ্চারণকারীর পক্ষেই দোষ হইবে।

ভাষামূল।—পুত্যাতিষ্মজিবিঃ। পুত্যাতিষ্মজাশ্রয়ো বিসির্গসিধ্যতি। গোত্রাত নোতত্রাত ইত্যাত্মনীচ চ অচ উত্তবজ্ঞ যনো য়ে ভবত ইতি দিবচনং ন প্রাপ্নোতি। ইহ প্রত্যাত্ত্ব উত্তিকান্ন উদত্তে ভীত পপ্প ইতি অচীন্ডিউডাগান্না ন প্রাপ্নোতি।

বস্তুবাদ।—তাৎপর্যার্থঃ—শাস্ত্রকারদিগেব মতে যদি, কোনও অর্দ্ধমাত্রা বিশিষ্ট বর্ণও উচ্চারণ না করিলে কার্য্য নিকি হয়, তাহা হইলে তাঁহারা কিছুতেই সেই বর্ণ উচ্চারণ করেন না। শাস্ত্রকারগণ কোনও স্বত্র করিতে গিয়া যদি অর্দ্ধমাত্রাও লাঘব করিতে পারেন, তাহা হইলে, পুত্র উৎসবের ত্যাম আনন্দ অচ্যুত করেন। এক্ষণ অবস্থার যদি ত বার উচ্চারণ ভিন্নও কার্য্য নিকি হয়, তাহা হইলে “এৎ ওৎ ড্” এইকপ স্বত্র কবা একান্তই অসম্ভব।

এতদ্বিন্ন তকার উচ্চারণে দোষান্তরও প্রদর্শিত হইতেছে।

বার্ত্তিকার্য্য।—সন্ধি অক্ষরে তকার উচ্চারণ করিলে, পুত্ৰ প্রভৃতি কার্য্যে অচ্ (স্বর) বিধান কর করা বর্ত্তব্য। *।

যদি ‘এওৎ’ ‘ঐ ও চ্’ ইত্যাদেব মধ্যে, তকার উচ্চারণ করা যায়, (১) তবে পুত্ৰ প্রভৃতি কার্য্য করণার সময়, অচ্ (স্বর) নিমিত্ত বিধান সিদ্ধ হইবে না। যথা গোত্রাত নোত্রাত এই স্থলে অনচ্চি। ৮। ৪। ৪৭। অচ্ প্রত্যাহারের পরস্থিত বর্ষ প্রত্যাহারান্ত বর্ণেব দ্বিত্ব হয় এই বলিয়া, গোত্র এবং নোত্র এই পুত্ৰ অচের (স্বরের) পক্ষে বর্ষ প্রত্যাহারান্তর্গত তকারেব দ্বিত্ব হইবে না। যেহেতু দীর্ঘ ওকারেরই তবারান্ত পাঠ করাতে অচ্ ধর্ম্ম প্রাপ্তি হইয়াছে।

(২) তপসসকালসা ১৭০০ ত কার পক্ষে আছে যার এমন যে বর্ণ অথবা ত কারের পরস্থিত যে বর্ণ, সেই বর্ণেব সনকালোটি সংজ্ঞা হয়। যেমন ‘অৎ উৎ উৎ’ এই সকল স্থলে ত কার পরে থাকিতে কেবল একমাত্র উচ্চারণের কালের সমান হ্রস্ব অকার, হ্রস্ব ইকার এবং হ্রস্ব উকারেরই গ্রহণ হইবে। দীর্ঘ অকার ইকার আদির গ্রহণ হইবে না। সেইরূপ এই স্থলেও যদি এৎ ওৎ ড্। এৎ ওৎ চ্ এই স্থলে দীর্ঘ অকার ওকার একার ওকার ভিন্ন পুত্ৰ একাদির গ্রহণ হইবে না। সুতরাং অচ্ সংজ্ঞা মধ্যে পুত্ৰ একার ওকার একার ওকারেরও গ্রহণ হইবে না।

প্লুত ও তার কি ঔকারের অচ্ প্রাপ্তি হয় নাই। আর তাত্‌ঐঔত্‌-
কাযন, উদঙ্‌ভোঃপগব এইস্থলে (উমোহ্রস্বাদিঙমুগ্নিতাম্ । ৮। ৩। ৩২।
হ্রস্বের পরে যে ঔম্ প্রত্যাহাব, সেই ঔম্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ পরে আছে
যার, এমন যে পদ, সেই পদের পর অচ্ থাকিলে, ঔম্ অগম হয়)। এই
সূত্রানুসারে অচ্ পরে থাকিলে, যে ঔম্‌ট আগম প্রাপ্তি হইয়া থাকে, তাহা
হইবে না। যে হেতু প্লুত ও তার কি প্লুত ও তার অচ্ প্রত্যাহার মধ্যে গৃহীত
হয় নাই।

ভাষামূল।—প্লুতসংজ্ঞা চ। *। প্লুত সংজ্ঞা চ ন সিধ্যতি। ঐত্‌ত্‌কাযন।
ঔত্‌পগব। উকালোজ্‌ হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতসংজ্ঞা ভবতীতি প্লুতসংজ্ঞা ন প্রাপ্নোতি।

বঙ্গানুবাদ।—এওঙ্‌। ঐঔচ্‌ এথলে এ ও প্রভৃতি তকাবাস্ত ভিন্ন পাঠ
করিলে, একারাদিঃ প্লুত সংজ্ঞাও হইবে না। *।

তকার রহিত এওঙ্‌ ঐঔচ্‌ পাঠ করিলে, তাহাদের প্লুত সংজ্ঞাও সিদ্ধ
হইবে না। যেমন ‘ঐত্‌ত্‌কাযন’, ‘ঔত্‌ পগব’ এই স্থলে উকালোজ্‌ হ্রস্ব-
দীর্ঘপ্লুতঃ ১। ২। ২৭। (উ উ উত্‌, ইহাদের উচ্চারণ কালেই ছার কাল
যার, তাহাদের বথাক্রমে হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত সংজ্ঞা হয়) এই সূত্রানুসারে ঐকারের
এবং ঔকারের প্লুত সংজ্ঞা হইবে না।

ভাষামূল।—সন্ত্‌ তর্হাত পরাণি। অতপব এ চ ইগ্‌ হ্রস্বাদেশে *। যন্ত্‌-
তপর্যণি এচ ইগ্‌ হ্রস্বাদেশইতি বক্তব্যম্। কিম্‌ প্রয়োজনম্। এচোহ্রস্বাদেশ-
শাসনেষর্ক একারোহর্ক ওকারে বা মা ভূদিত্তি।

বঙ্গানুবাদ।—যদি তকারান্ত বিশিষ্ট এওঙ্‌ ঐঔচ্‌ সূত্র করিতে, এত দোষই
ঘটে; তবে তকারান্ত রহিতই সূত্র করা যাউক।

যদি তকার রহিতই ‘এওঙ্‌’ ‘ঐঔচ্‌’ সূত্র করা যায়, তবে ‘এচ ইগ্‌ হ্রস্বাদেশে’
এই সূত্রে ‘ইক্‌’ প্রত্যাহারের গ্রহণ করিতে হইবে। *।

গদি তকার রহিত সূত্র করা যায় তবে এচ ইগ্‌ হ্রস্বাদেশে ১। ১। ৪৮।
(এচ্‌ প্রত্যাহারের স্থানে, হ্রস্ব আদেশ কর্তব্য হইলে, ইক্‌ প্রত্যাহারস্থ বর্ণই
হইবে) এই সূত্রে ইক্‌ আদেশ করা কর্তব্য হইবে।

কেন ‘ইক্‌’ আদেশ করা কর্তব্য হইবে?

প্রথম (১) সাম্যাতা নিবন্ধন, হ্রস্ব আদেশ করিলে, ইকার উকারাদি না

(১) প্রথম দুই প্রকার। আভ্যন্তর এবং বাহ্য। আভ্যন্তর প্রথম চারি প্রকার
বর্ণা;—সৃষ্ট, ইয়ৎ সৃষ্ট, বিবৃদ্ধ ও সংবৃদ্ধ। বাহ্য প্রথম এগার প্রকার বর্ণা;—বিদ্যত,
১৫ই ক.স্তন, ১৩০৭। } উদ্বোধন। ১২৫

হইয়া, অর্ধমাত্রাবিশিষ্ট একার অর্ধমাত্রাবিশিষ্ট ওকারান্ত হইতে পারে ।
সুওরাং এচ্ প্রত্যাহারস্থলে হ্রস্ব আদেশ বিধান করিলে, অর্ধ একার বা অর্ধ
ওকার বিশিষ্ট বর্ণ না হউক, এই ভ্রান্ত তকারান্ত সূত্র বিধান করা দূর্বৃত্য ।

ভাষামূল ।—নম্র চ ব্যস্তানি তপরাণি তেনাপোতদ্বক্তব্যম্ । ইমানেচৌ
সমাহারবর্ণৌ মাত্রাণ্যেচ্চ মাত্রাবর্ণৌবর্ণয়োঃ তয়োহু স্বাদেশ্যামন্যেযু বদা-
চিদগ্নঃ স্তাং কদাচিদগ্নেবর্ণৌ । না কদাচিদগ্নং হৃদিত ।

বঙ্গানুবাদ ।—কেবল মাত্র ত কারান্ত সূত্র না করিলেই যে এই দোষ ঘটিবে
তাঁহা নহে । কিন্তু ব্যস্তার মতে, ত কারান্তবিশিষ্ট সূত্র করা হইবে, তাহার
মতেও “হ্রস্ব আদেশ কর্তব্য হইলে, এচ্ প্রত্যাহার স্থানে ইচ্ প্রত্যাহারান্ত বর্ণই
হইবে,” এইরূপ বর্ণিত হইবে । সেহেতু এই যে ঐ ও ইহার সমাহার বর্ণ
(অকার ইকার সমাহৃত অর্থাৎ একত্রীকৃত হইয়া ঐ, অ, উ একত্রীকৃত হইয়া ও
হওয়াতে, ইহার সমাহার বর্ণ ঐ ওনাতে, ইহাদের স্থানে হ্রস্ব আদেশ হইলে,
কখনও অবর্ণ হইবে, কখনও ইবর্ণ অর্থাৎ উর্ণ হইবে । কেন না ঐকার
এবং উকারেতে যখন অকার এবং ইকার বা উকার আছে, তখন তাহাদের
স্থানে হ্রস্ব আদেশ হইলে, কখনও বা হ্রস্ব অ, কখনও বা হ্রস্ব ই বা উ ই

সংহার, ঘোষ, অঘোষ, ভ্রজ প্রাণ, মণপ্রাণ, ষাণ, নাদ, উদাত্ত, অনুদাত্ত, ও স্বরিত ।
কোনও প্রসংগে, সদৃশতম আদেশ হইয়া থাকে । একা একাবের কণ্ঠ তালু স্থান বলিয়া,
তাহার স্থানে হ্রস্ব আদেশ হইলে, ইকারেও তালু স্থান হওয়াতে, ইকারই হইবে । ওকার
ওকারের কণ্ঠ ওষ্ঠ স্থান বলিয়া, তাহার স্থানে হ্রস্ব আদেশ হইবে, উকারের ওষ্ঠস্থান
হওয়াতে, উকারই হইবে । কিন্তু যদি কণ্ঠতালু কিম্বা কণ্ঠ ওষ্ঠ বিশিষ্ট কোনও হ্রস্ববর্ণ
পাওয়া যায়, তবে ঐ ঐ ও ইহাদের স্থলে দৈর্ঘ্যবর্ণ হইবে । সুতরাং অর্ধমাত্রা
বিশিষ্ট ‘একার’ এবং ‘ওকার’ হইবে । কেন না, ‘ইকার’ এবং ‘উকার’ ইহাদের সদৃশ
স্থান হইলেও সদৃশতম স্থান নহে । হ্রস্ব একার এবং ওকারেই কণ্ঠ তালু এবং
কণ্ঠোষ্ঠ স্থান বলিয়া একার এবং ওকারই হইবে । যে হেতু তাহাদের স্থানে কোনও
আদেশ হইলে, সেই আদেশ তাহা সদৃশতম বর্ণেরই হইয়া থাকে ।

এও ভ্. ঐ ওচ্. এই সূত্রে যদি তকারান্ত বিশিষ্ট এবং ওং ঐং ঔং পাঠ না করা যায়,
তবে ইহাদের (একারাদির) হ্রস্ব বিধান কে বাণ করিলে যে, একাদির স্থলে হ্রস্ব
আদেশ প্রাপ্ত হইলে, হ্রস্ব একাদি প্রাপ্ত হইবে না ? এবং, ওং, ঐং, ঔং তকারান্ত বিশিষ্ট
পাঠ হইলেই, তকারান্ত বিশিষ্ট বর্ণ, সেই বর্ণের সমান কালিক বর্ণকে গ্রহণ করে বলিয়া,
এং, ঔং গ্রহণে ছই মাত্রা কাল বিশিষ্ট একার ওকারেই গ্রহণ হইবে । হ্রস্ব একার বা
ওকারের গ্রহণ হইবে না । এই জন্যই তকারান্ত বিশিষ্ট সূত্র করা কর্তব্য ।

হইবে। কখনও, কেবল ঐকার স্থানে ইকার, অথবা ঐকার স্থানে উকারই প্রাপ্ত হইবে না। কিন্তু ঐ ঐ স্থানে অ ওয়া কখনও কঠব্য নহে। অতএব ঐ ঐ স্থানে হ্রস্ব আদেশ করিলে, কখনও হ্রস্ব ‘অ’ না হয়, এই ক্ষুদ্র ‘ইক্’ প্রত্যাহারই (ই উ), হ্রস্ব আদেশ দানে, গ্রহণ করা কঠব্য।

ভাষ্যমূল।—প্রত্যাখ্যায়তে এতৎ। ঐচোচোত্তরভূগ্ৰহাদিতি। যদি প্রত্যাখ্যানপক্ষঃ ইদমপি প্রত্যাখ্যায়তে। সিদ্ধমেতঃ সমানত্বাদিতি। নতু চৈতঃ সমানত্ববর্জক্ একারোদ্ধক্ ওকারঃ। ন তৌ স্তঃ। যদি হি তৌ স্মাতং তাবো-
নায়নুপদিশেৎ। নতু চ ভোগজ্জন্দাগানং নাশ্রয়গিরাণায়গীচা অর্জমেকারমর্জ-
মোকানং চানীকতে। সুখাতে এ অর্থহনুতে। অধ্বর্গো ও অদ্বিভিঃ সূতম্।
শুক্রে তে এ অস্ত্রজতং তেণ অস্ত্রাদিতি। পারিষদকৃতিরেবা তত্র ভবতাম্।
নৈবতি লোকে নাশ্রয়িন্ বেদেহর্জক্ একারোদ্ধক্ ওকারোবাতি।

বঙ্গভাষায়।—‘ঐ’ ‘উ’ স্থানে হ্রস্ব আদেশ করিলে, ‘অ’ কার স্বভাবতঃই প্রতি-
নিবৃত্ত হইবে। যেহেতু ঐ ‘উ’ উচ্চারণে, উত্তরাংশই (ই এবং উ) বিশেষ
রূপে উচ্চারিত হইয়া থাকে। পূর্বাংশ ‘অ’ কারের সেই রূপ বিশেষ
উচ্চারণ হয় না। এই ক্ষুদ্রই ঐ ঐ স্থানে হ্রস্ব হইয়া অকার প্রাপ্তি হওয়া
অসম্ভব বলিয়া, ইহা প্রত্যাখ্যান করা যাইতেছে। হে তকারান্ত স্ত্রকারী
ব্যক্তি, যদি প্রত্যাখ্যান পক্ষই অবলম্বন করিলে, তবে তকারান্তরহিত স্ত্রকারী
আমরাও, তোমার উপায়েতেই ‘ইক্’ আদেশ প্রত্যাখ্যান করিব। যদি বল
যে, ঐ ঐ স্থানে হ্রস্ব আদেশ কঠব্য হইলে, ইক্ আদেশ অনাবশ্যক হইলেও,
এ ও স্থানে কি হইবে?

এতদ্বত্তরে আমরা ইচ্ছা করি যে, একার এবং ওকার স্থানে, যখন কেবল
মাত্র তালু এবং ওষ্ঠ স্থানই সিদ্ধ আছে, তখন একার স্থানে হ্রস্ব আদেশ হইলে
ইকার, এবং ওকার স্থানে হ্রস্ব আদেশ হইলে উকারই হইবে। যেহেতু
একার এবং ইকারের তালু স্থানঃ ওকার এবং উকারের ওষ্ঠস্থানঃ। ১)

(১) ঐ কার এবং ও কারের যথাক্রমে কঠ তালু এবং ওষ্ঠ স্থান মানিলেও ভাষ্যকার
পতঞ্জলি একার এবং ওকারের কঠ তালু এবং ওষ্ঠ স্থান স্বীকার করেন না। বরং
একারের তালু এবং ওকারের কেবলমাত্র ওষ্ঠ স্থানই স্বীকার করেন। সুতরাং একার ওকার
স্থানে হ্রস্ব আদেশ হইলে ইকার উকারই হইবে। যেহেতু তালু বা ওষ্ঠস্থান বিশিষ্ট একার
বা ওকার স্থানে, ভাষ্যর সমস্থান বিশিষ্ট ইকার বা উকার না হইয়া অকার হওয়া কোনও-
রূপে সম্ভবপর হইতে পারে না।

যদি কোনও প্রসঙ্গ ক্রমে তাহার সদৃশতম বর্ণই আদেশ হয়, তবে অপেক্ষাকৃত সদৃশতর স্থান প্রযুক্ত অর্ধবাত্রাবিশিষ্ট একার অর্ধবাত্রাবিশিষ্ট ওকারই আদেশ হওয়া উচিত।

তাহা হইবে না। যেহেতু অর্ধ মাত্রা বিশিষ্ট একার বা ওকার বলিয়া কোনও বর্ণই নাই।

যদি এইরূপ কোনও বর্ণ থাকার সম্ভব হয়, তাহা হইলে সেই বর্ণও পুনরায় উপদেশ করা কর্তব্য।

যদি বল ওহে! অর্ধ একার বা ও কার উপদেশের কোনও প্রয়োজন নাই; যেহেতু “সাতামুগ্রিমাধায়ণীয়” (১) গণ অর্ধ মাত্রা বিশিষ্ট একার ও ‘ওকার পাঠ করিয়া থাকেন; যেমন:—‘সুজাতে এ অখস্থনুতে। অধ্বযো ও অদৃভিঃ স্তম্ভ। শুক্রং তে এ অশ্রুজ্ঞতং তে এ অশ্রুদিতি,” সামবেদের এই সমস্ত প্রয়োগ স্থলে, অর্ধ একার এবং ওকার পাঠ করা হেতুই জানা যাইবে যে, অর্ধ একার এবং অর্ধ ওকার শব্দ শাস্ত্রে প্রসিদ্ধই রহিয়াছে। সুতরাং অর্ধ এ বা ঐ উপদেশের কোনও প্রয়োজন নাই।

সামবেদের শাখা বিশেষে এইরূপ পাঠ হেতু, বলা যাইতে পারে না যে, অর্ধ এ কার বা ও কারের পাঠ আবশ্যকই হইবে। অথবা শব্দ শাস্ত্রে প্রসিদ্ধই আছে; কেননা ইহা কেবল মাত্র সেই শাখা অধ্যয়ন শীল ব্যক্তিগণের, সভাতে পাঠ কারবার জন্তই, অর্ধ ‘এ’ বা ‘ও’ পাঠ করা হইয়া থাকে। বিস্তৃত ইহা কোনও রূপ গৌণিক ব্যবহারে বা শাস্ত্রে অথবা অজ্ঞ কোনও বেদে এরূপ অর্ধ একার বা ওকার বিশিষ্ট কোনও বর্ণ নাই। সুতরাং বেদ বিশেষের শাখা বিশেষ পাঠকারীগণের কেবল মাত্র সভাতেই পাঠ করিবার জন্ত যে, অর্ধ একার বা ওকার পাঠ হইয়া থাকে, তাহা কখনও শাস্ত্রে প্রবর্তিত করা যাইতে পারে না।

ভাষ্যসূত্র —এবমাদেশে দীর্ঘগ্রহণম্।

একাদেশ দীর্ঘগ্রহণং কর্তব্যম্। আনুগোদীর্ঘোবৃদ্ধিরেচিদীর্ঘ ইতি। কিং প্রয়োজনম্। আন্তর্গাত্ত্রিমাত্র চতুর্মাত্রাণাং স্থানিমাং ত্রিমাত্রাচতুর্মাত্রা আদেশামাভিব্যক্তি। খট্টা ইন্দ্রঃ খট্টোদকম্। খট্টা উদকম্ খট্টোদকম্। খট্টা জৈষা খট্টোবা। খট্টা উড়া খট্টোড়া। খট্টা এলকা খট্টোলকা। খট্টা ওদনঃ খট্টোদনঃ। খট্টা ত্রিতিকায়নঃ খট্টোতকায়নঃ। খট্টা ওগবঃ খট্টোপগব ইতি।

(১) সাম বেদের শাখা বিশেষ।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য । ১২৫৭।

স্বামী বিবেকানন্দ ।]

[১০৪ পৃষ্ঠার পর ।

যাক্, মোদা এমন সহর আর এ ভূমণ্ডলে নাই। পূর্বকালে এ সহর ছিল আর একরূপ, ঠিক আমাদের কালীর বাঙ্গালীটোলার মত। আঁকা বাঁকা গলি রাস্তা, মাঝে মাঝে ছোটো বাড়ি এক করা খিলান, দেলের গায়ে পাভকো, ইত্যাদি। এবারকার এক্ষিবিষনে একটা ছোট পুরাণ পারি তৈরি করে দেগিয়েছে। সে পারি কোথায় গেছে, ক্রমিক বদলেছে, এক একবার লড়াই বিদ্রোহ হয়েছে, কতক অংশ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে, আবার পরিষ্কার নূতন ফরদা পারি সেই স্থানে উঠেছে।

বর্তমান পারি অধিকাংশই তৃতীয় ষ্ট্রাপোলেম'র তৈরি। তৃত্যাপোলেম' মেরে কেটে জুলুম করে বাদসা হলেন। ফরাসী সেই প্রথম বিপ্লব হওয়া অবধি সতত টলমল; কাজেই বাদসা, প্রজাদের খুশী রাখবার জন্ত, আর পারি-নগরীর সতত চঞ্চল গরীব লোকদের কাজ দিয়ে খুশী করবার জন্ত, ক্রমাগত রাস্তা ঘাট তোরণ থিয়েটার প্রভৃতি গড়তে লাগলেন। অবশ্য পারির সমস্ত পুৰাতন মন্দির তোরণ স্তম্ভ প্রভৃতি রৈল। রাস্তা ঘাট সব নূতন হয়ে গেল। পুরাণ সহর পনার পাঁচিল সব ভেঙ্গে বুলভারের অভ্যদর হতে লাগল এবং তাঁ হতেই এ সহরের সর্বোত্তম রাস্তা, পৃথিবীতে অদ্বিতীয় শাঁজেনিজে রাস্তা তৈরি হল। এ রাস্তা এত বড় চওড়া, যে মধ্যখানে, এবং ছপাশ দিয়ে বাগান চলেছে এবং এক স্থানে অতি বৃহৎ গোলাকার হয়ে দাঁড়িয়েছে—তার নাম প্লাস্ দ লা কনকর্দ, Place de la concorde. এটি প্লাস্ দ লা কনকর্দের চারিদিকে প্রায় সমান্তরালে ফ্রাঁসের প্রত্যেক জেলার এক এক ষাষ্ট্রিক নারীমূর্তি। তার মধ্যে একটি মূর্তি হচ্ছে স্ট্রাস্-বুর্গ-নামক জেলার। ঐ জেলা এখন ডইচ্ (জার্মান্) রা ১৮৭২ সালের লড়াইয়ের পর হতে কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু সে দুঃখ ফ্রাঁসের আজও যায় না, সে মূর্তি দিন রাত প্রোভোদিষ্ট কুল মালায় ঢাকা। যে রকমের মালা লোকে আত্মীয় স্বজনের পোরের উপর দিয়ে আসে, সেই রকম বৃহৎ বৃহৎ মালা দিন রাত সে মূর্তির উপর কেউ না কেউ দিয়ে যাচ্ছে।

দিল্লির চাঁদনিচৌক কতক অংশে এই প্লাস্ দ লা কনকর্দের মত এককালে ছিল বলে বোধ হয়। স্থানে স্থানে জয়স্তম্ভ, বিজয় তোরণ, আর বিরাট নর-

ন্যায়ী সিংহাসনে ভাস্কর্য্য মূর্তি। মহাবীর প্রথম ত্রাপোলেঅঁর আরক এক সুবৃহৎ ধাতুনির্মিত বিজয়স্তম্ভ। তার গায়ে ত্রাপোলেঅঁর সময়েব যুদ্ধ বিজয় মূর্তি। উপরে তাঁর মূর্তি। আর একস্থানে প্রাচীন দুর্গ বাস্তিল (Bastille) ধ্বংসের আরক চিহ্ন। তখন রাজাদের একাধিপত্য ছিল, যাকে তাকে যখন তখন জেলে পুরে দিত। বিচার না, কিছু না, রাজা এক হুকুম লিপে দিতেন; তার নাম লেট্র'ন কাশে—মানে রাজমুদ্রাঙ্কিত লিপি। তার পর, সে ব্যক্তির আর কি করেছে কি না, দোষী কি নির্দোষী, তাঁর আর জিজ্ঞাসাপড়া নেই, একবারে নিয়ে পুস্লে সেই বাস্তিলে;—সেখান থেকে বড় কেউ আর বেরুত না। রাজাদের প্রণয়িনীরা কারুর উপর চটলে, রাজার কাছ থেকে ঐ শীগটা করিয়ে নিয়ে সে ব্যক্তিকে বাস্তিলে ঠেলে দিত। পরে যখন দেশ শুদ্ধ লোক এ সব অত্যাচারে ক্ষেপে উঠলো, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সব সমান, ছোট বড় কিছুই নয়, —এ ধ্বনি উঠল, পারির লোক উন্নত হয়ে রাজারানীকে অক্রমণ করলে, সে সময় প্রথমেই এ মাহুঘের উপর মাহুঘের অত্যাচারের ঘোর নিদর্শন এ বাস্তিল ভূমিসাৎ করলে, সে স্থানটার এক রাত ধরে নাচ গান আমোদ করলে। তার পর, রাজা পাগিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁকে ধরে ফেললে, রাজার খন্তর অষ্ট্রিয়ার বাদশা জামায়ের সাহায্যে সৈন্য পাঠাচ্ছেন শুনে প্রজারা ক্রোধে অন্ধ হয়ে রাজারানীকে মেরে ফেললে, দেশশুদ্ধ লোক স্বাধীনতা সাম্যের নামে মেতে উঠলো, ফ্রাঁস প্রজাতন্ত্র হল, অভিজাত ব্যক্তির মধ্যে যাকে ধরতে পারলে তাকেই মেরে ফেললে, কেউ কেউ উপাধি টুপাধি ছেড়ে প্রজার দলে মিশে গেল। শুধু তাই নয়, বললে, “ভূমিয়া শুদ্ধ লোক তোমরা ওঠ, রাজা ফালা অত্যাচারী সব মেরে ফেল, সব প্রজা স্বাধীন হক, সকলে সমান হক।” তখন ইউরোপ শুদ্ধ রাজারা ভয়ে অস্থির হয়ে উঠলো—এ আগুন পাছে নিজেদের দেশে লাগে, পাছে নিজেদের সিংহাসন গড়িয়ে পড়ে যায়; তাই তাকে নেবার জন্য এক পরিকর করে চারিদিক থেকে ফ্রাঁস আক্রমণ করলে। এদিকে প্রজাতন্ত্রের কর্তৃপক্ষেরা “লা গাজি আ দাঁজে” “জন্মভূমি বিপদে”, এই ঘোষণা করে দিলে; সে ঘোষণা আগুনের মত দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। ছেলে বুড়ো, মেয়ে মদে “মার্সাইএ” মহা গীত গাইতে গাইতে, উৎসাহপূর্ণ ফ্রাঁসের মহাগীত গাইতে গাইতে, দলে দলে জীর্ণবসন, সে শীতে নগ্নপদ, অত্যাচার ফরাশী প্রজা-কোষ বিরাট সমগ্র ইউরোপী চমুর সম্মুখীন হল, বড় ছোট ধনী দরিদ্র সব বন্দুক বাড়ি বেকল—পরিজ্ঞাপার.....বিনাশার চ হুকুতাৎ বেকল। সমগ্র ইউরোপ

সে বেগ সহ্য করতে পারলে না। ফরাসী জাতির অগ্রে সৈন্যদের স্বন্ধে দাঁড়িয়ে এক বীর,—তঁার অঙ্গুলি হেলনে ধরা কাপতে লাগল, তিনিই নাপোলেন।

স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, বন্দুকের নশীমুখে, তলওয়ারের ধারে, ইউরোপের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়ে দিলে, তিন রঙ্গা ককার্ডের জয় হল। তার পর, গ্রাপোলেন অ' ফ্রাঁস মহারাজাকে দৃঢ়বদ্ধ সাবয়ব করার জন্য বাদসা হলেন। তার পর তাঁর কার্য শেষ হল, ছেলে হলনা বলে সুখ দুঃখের সন্ধিনী ভাগ্য-লক্ষী রাজ্ঞী জোসেফিনকে ত্যাগ করলেন, অষ্ট্রিয়ার বাদশার মেয়ে বে করলেন। জোসেফিনের সঙ্গে সঙ্গে সে ভাগ্য ফিরলো, কৃষ জয় কর্ত্তে গিয়ে বরফে তাঁর ফোঁজ ম'রা গেল। ইউরোপ বাগ্ পেয়ে, তাঁকে শের করে সিংহাসন ত্যাগ করিয়ে একটা দ্বীপে পাঠিয়ে দিলে, পুরান রাজ্য অথবাণর এক-জনকে তক্তে বসালে।

মরা সিঙ্গি সে দ্বীপ থেকে পালিয়ে আবার ফ্রাঁসে হাজির হল, ফ্রাঁস লোক আবার তাঁকে মাথায় করে নিলে, রাজা পালাল; কিন্তু অদৃষ্ট ভেদেছে, আর বুড়লো না—আবার ইউরোপ গুচ্ছ পড়ে, তাঁকে হারিয়ে দিলে। গ্রাপোলেন অ' ইংরেজদের এক জাহাজে উঠে শরণাগত হলেন। ইংরেজরা তাঁকে সেন্ট হেলেনা নামক দূর একটা দ্বীপে বন্দী রাখলে আমরণ। আবার পুরান রাজা এল, তাঁর ভাইপো রাজা হল। আবার ফ্রাঁসের লোক ক্ষেপে উঠলো, রাজা কাজা ভাড়িয়ে দিলে, আবার প্রজাতন্ত্র হল। মহাবীর ন্যাপোলেন অ'র এক ভাইপো এ সময় ক্রমে ফ্রাঁসের প্রীতিপাত্র হলেন, ক্রমে একদিন বড়যন্ত্র করে নিজেকে বাদসা ঘোষণা করলেন। তিনি ছিলেন তৃতীয় গ্রাপোলেন অ'; দিন কতক তাঁর খুব প্রতাপ হল। কিন্তু জর্জাণ যুদ্ধে হেরে, তাঁর সিংহাসন গেল, আবার ফ্রাঁস প্রজাতন্ত্র হল। সেই অবধি প্রজাতন্ত্র চলেছে।

যে পরিণাম-বাদ ভারতের প্রায় সকল সম্প্রদায়ের মূলভিত্তি, এখন সে পরিণাম-বাদ ইউরোপী বহির্বিজ্ঞানে প্রবেশ করেছে। ভারত ছাড়া অগ্রজ সকল দেশের ধর্ম্মে ছিল এই যে, হুনিয়াটা সব টুকরা টুকরা, আলাদা আলাদা। সেখর একজন আলাদা, প্রকৃতি একটা আলাদা, মানুষ একটা আলাদা, ঐ রকম পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, গাছ, পালা, মাটি, পাথর, ধাতু প্রকৃতি সব আলাদা আলাদা। ভগবান ঐ রকম আলাদা আলাদা করে সৃষ্টি করেছেন।

জ্ঞান মানে কি না বহুদ্র মধ্যে এক দেখা। যে গুলো আলাদা, তফাৎ বলে-আপাততঃ বোধ হচ্ছে, তাদের মধ্যে ঐক্য দেখা। যে সম্বন্ধে এই

ঐক্য মানুষ দেখতে পায়, সেই সম্বন্ধটাকে “নিয়ম” বলে ; ঐরি নাম শ্রাক্ত-
তিক নিয়ম ।

পূর্বে বলেছি যে, আমাদের বিজ্ঞা বুদ্ধি চিন্তা সমস্ত আধ্যাত্মিক, সমস্ত বিকাশ
ধর্ম্মে । তার পাশ্চাত্যে ঐ সমস্ত বিকাশ বাইরে, শরীরে, সমাজে । ভারত-
বর্ষে চিত্তাশীল মনীষীরা ক্রমে বুঝতে পারলেন যে, ও আলাদা ভাবটা ভুল
ও সব আলাদার মধ্যে সম্বন্ধ রয়েছে, মাটি, পাথর, গাছ, পালা, জন্তু, মানুষ,
দেবতা, এমন কি ঈশ্বর স্বয়ং, এর মধ্যে ঐক্য রয়েছে, অদ্বৈতবাদী এর চরম
সীমানা পৌঁছুলেন, বলা যে, সমস্তই সেই একের বিকাশ । বাস্তবিক এই
অধ্যাত্ম অধিভূত জগৎ এক, তার নাম “ব্রহ্ম” ; আর ঐ যে আলাদা আলাদা
বোধ হয়ে গেল, ওর নাম দিলেন “মায়া”, “অবিজ্ঞা” অর্থাৎ অজ্ঞান । এই
হলো জ্ঞানের চরম সীমা ।

ভারতবর্ষের কথা ছেড়ে দাও, বিদেশে যদি একথাটা এখন কেউ বুঝতে
না পারে, ত তাকে আর পণ্ডিত কি করে বলি । মোক্ষ এদের অধিকাংশ
পণ্ডিতই এটা এখন বুঝেছে, এদের রকম দিয়ে, জড় বিজ্ঞানের ভেতর দিয়ে ।
তা সে এক কেমন করে বহু হল, এ কথা আমরাও বুঝি না, এটাও বোঝে না ।
আমরাও সিদ্ধান্ত করে দিয়েছি যে, ওখানটা বুদ্ধির অতীত । এটাও তাই
করেছে । তবে সেই এক কি কি রকম হয়েছে, কি কি রকম জাতি-বাস্তবিক
পাচ্ছে, এটা বোঝা যায় এবং এইটাব খোজের নাম বিজ্ঞান Science ।

কাজেই এখন এদেশে প্রায় সবাইই পরিণামবাদী, Evolutionist
যেমন ছোট জানোয়ার বদলে বদলে বড় জানোয়ার হচ্ছে, বড় জানোয়ার কখন
কখন ছোট হচ্ছে, লোপ পাচ্ছে । তেমনি মানুষ যে এতটা স্থূলভা অস-
হায় হুম্ব করে জন্ম গেলে, এ কথা আর কেউ বড় বিশ্বাস করছে না । বিশেষ
এদের বাপ-দাদা, কাল না পশু, বর্ষক ছিল, তা থেকে অল্প দিনে এই কাণ্ড ।
কাজেই এরা বলছে যে, সমস্ত মানব ক্রমে ক্রমে অসভ্য অবস্থা থেকে উঠেছে
এবং উঠছে । আদিম মানুষ কঠ পাপনের যন্ত্র তন্ত্র দিয়ে কাজ চালাত,
চামড়া বা পাঁতা পেরে দিন কাটাত, পাণ্ডের গুফার বা পানির বাসার মত
কুঁড়ে ঘরে গুজ্রান করত । এব নিদর্শন সর্বদেশের মাটির নীচে পাওয়া
যাচ্ছে এবং কোনও কোনও স্থলে সে অবস্থার মানুষ স্বয়ং বর্তমান । ক্রমে মানুষ
খাত্ত ব্যবহার কর্তে শিখলে, সেনরম খাত্ত টিন আর তামা । তাকে মিশিয়ে
বস্ত্রস্ত্র অস্ত্রসস্ত্র করতে শিখলে । প্রাচীন, গ্রীক, রোম, মিশরীরাও অনেক দিন

পর্যন্ত লোহার ব্যবহার জান্ত না, যখন তারা অপেক্ষাকৃত সভ্য হয়েছিল, বই পত্র পর্যন্ত লিখতো, সোণা রূপো ব্যবহার করত, তখন পর্যন্ত। আমেরিকা মহাদ্বীপের আদিম নিবাসিদের মধ্যে মেক্সিকো পেরু মায়া প্রভৃতি জাতি অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম ছিল, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মন্দির নির্মাণ করত, সোণা রূপোর খুব ব্যবহার ছিল (এমন কি ঐ সোণা রূপোর লোভেই স্প্যানি লোকেরা তাদের ধ্বংস সাধন করলে)। কিন্তু সে সমস্ত কাজ চক্ৰবর্তি পাথরের অস্ত্র দ্বারা অনেক পরিশ্রমে করতো, লোহার নাম গন্ধও জান্তো না।

আদিম অবস্থায় মানুষ তীর ধনুক বা জালাদি উপায়ে জন্তু জানোয়ার মাছ মেরে খেত, ক্রমে চাষ বাস শিখলে, পশু পালন করতে শিখলে। বনের জানোয়ারকে বশে এনে নিজের বাজ করাতে লাগলো। অথবা সময়মত আহারের জন্ত জানোয়ার পালতে লাগলো। গরু, বাঁড়া, শূকর, হাতি, উট, ভেড়া, ছাগল, মুরগি প্রভৃতি পক্ষী মানুষের গৃহপালিত হতে লাগলো। এর মধ্যে কুকুর হচ্ছেন মানুষের আদিম বন্ধু।

আবার চাষ বাস আরম্ভ হলো। যে ফল মূল শাক সব্জি ধান চাল মানুষ খায়, তার বুনো অবস্থা আর এক রকম। এ মানুষের যত্নে বুনো ফল, বুনো ঘাস নানা প্রকার সূক্ষ্ম বৃহৎ ও উপাদেয় চালে পরিণত হলো। প্রকৃতিতে আপনা আপনি দিন রাত অদল বদল ত হচ্ছেই। নানাজাতের বৃক্ষ লতা পশু পক্ষী শরীরসংসর্গে দেশ-কাল-পরিবর্তনে নবীন নবীন জাতির সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু মানুষ সৃষ্টির পূর্বে পর্যন্ত প্রভৃতি ধীরে ধীরে তরু লতা জীব জন্তু বদলাচ্ছিলেন। মানুষ জন্মে অবধি সে ছড় মুড় করে বদলে দিতে লাগলো। গাঁ সাঁ করে একদেশের গাছ পালা জীব জন্তু অথবা দেশে মানুষ নিয়ে যেতে লাগলো, তাদের পরস্পর মিশ্রণে নানা প্রকার অভিনব জীব জন্তুর, গাছ পালার জাত মানুষের দ্বারা সৃষ্ট হতে লাগলো।

আদিম অবস্থায় বিবাহ থাকে না, ক্রমে ক্রমে যৌন সম্বন্ধ উপস্থিত হলো। প্রথম বৈবাহিক সম্বন্ধ সর্বসমাজে “মা”য়ের উপর ছিল। বাপের বড় ঠিকানা থাকতো না। মায়ের নামে ছেলে পুত্রের নাম হত। মেয়েদের হাতে সমস্ত ধন থাকতো, ছেলে মানুষ করার জন্ত। ক্রমে ধন পত্র পুরুষের হাতে গেল, মেয়েরাও পুরুষের হাতে গেল। পুরুষ বলে, “যেমন এ ধন খাত আমার, আমি চাষ বাস করে বা লুণ্ঠ ত্যাজ করে উপার্জন করেছি, এতে যদি কেউ ভাগ বগায়, ত আমি বিরোধ করবো,” তেমনি বলে, “এ মেয়েগুলো আমার,” এতে

যদি কেউ হস্তার্পণ করে, ত বিরোধ হবে ।” বস্তুমান বিবাহের সূত্রপাত হলো । মের মাহুব, পুরুষের চাট বাটি গোলাম প্রভৃতি অধিকারের জায় হলো । প্রাচীন রীতি—এক দলের পুরুষ অন্য দলে বে কর্তৃত্ব । সে বিবাহও অবর-দস্তি মেয়ে ছিনিয়ে এনে । ক্রমে সে কাড়াকাড়ি বদলে গেল, স্বৈচ্ছার বিবাহ চললো ; কিন্তু সবল বিষয়ের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আভাস থাকে । এখনও প্রায় দর্পদেগে বরকে একটা নকল আক্রমণ করে । বাঙ্গালাদেশে, ইউরোপে, চাল দিয়ে বরকে আঘাত করে, পশ্চিমাঞ্চলে কনের আত্মীয় মেয়েরা বরবাতীদের গালি গালাজ করে ইত্যাদি ।

সমাজ সৃষ্টি হতে লাগল । দেশভেদে সমাজের সৃষ্টি । সমুদ্রের ধারে যারা বাস করতো, তারা অধিকাংশই মাছ ধরে জীবিকা করতো ; যারা সমতল জমীতে, তাদের চাম্বাদ ; যারা পার্বত্য দেশে, তারা ভেড়া চরাতে । যারা মরু-মরুদেশে, তারা ছাগল, উঠ, চরাতে লাগল । কতকদল জঙ্গলের মধ্যে বাস করে, শীকার করে খেতে লাগলো । যারা সমতল দেশ পেলে, চাম্বাস্ শিখলে, তারা পেটের দায়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে, চিন্তা করবার অবকাশ পেলে, তারা অধিকতর সভ্য হতে লাগল । কিন্তু সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে শরীর দুর্বল হতে লাগল । যাদের শরীর দিন রাত খোলা হাওয়ায় বাস করে, মাংস প্রধান আহার, তাদের, আর যারা ঘরের মধ্যে বাস করে, শস্তপ্রধান আহার কলে, অনেক পার্থক্য হতে লাগলো । শীকারী বা পশুপাল বা মৎস্যজীবী, আহারের অনাটন হলেই, ডাকাং বা বোঝেটে হয়ে সমতলবাসীদের লুটতে আরম্ভ করলে । সমতলবাসীরা আত্মরক্ষার জন্ত, ঘনঘলে সন্নিবিষ্ট হতে লাগলো, ছোট ছোট রাজ্যের সৃষ্টি হতে লাগলো ।

দেবতাবা ধান চাল খায়, সুসভ্য অবস্থা, গ্রাম, নগর, উজ্জানে বাস, পরিধান বোনা কাপড় ; আর অসুরদের পাহাড়, পর্বত, মরুভূমি বা সমুদ্র তটে বাস, আহার বস্ত্র জিনোয়ার, বস্ত্র ফণ মূল, পরিধান ছাল ; আর বুনো জিনিস বা ভেড়া ছাগল গরু দেবতাদের কাছে থেকে বিনিময়ে বা ধান চাল । দেবতার শরীর শ্রম সহিতে পারে না, দুর্বল । অসুরের শরীর উপবাস কছু কষ্ট সহনে বিলক্ষণ পটু ।

অসুরের আধাবাভাব হলেই, দল বেঁধে পাহাড় হতে, সমুদ্র কূল হতে, গ্রাম নগর লুটতে এলো । কখনও বা ধন ধানের লোভে দেবতাদের আক্রমণ করতে লাগলো । দেবতারা বহুজন একত্র না হতে পারলেই অসুরের হাতে মৃত্যু ।

আর দেবতার বুদ্ধি শ্রবণ হয়ে, নানা প্রকার যন্ত্র তন্ত্র নিশ্চয় করতে লাগলো। ব্রহ্মাঙ্গ, গুরুডাঙ্গ, বৈষ্ণবাঙ্গ, শৈব্যাঙ্গ সব দেবতাদের; অশুরের সাধারণ ক্রম, কিন্তু পারে বিষম বল। বারম্বার অশুর দেবতাদের হাথিয়ে দেয়, কিন্তু অশুর সভ্য হতে জানে না, চানবাস করতে পারে না, বুদ্ধি চালাতে জানে না। বিজয়ী অশুর যদি বিজিত দেবতাদের স্বর্গে রাজ্য করতে চায়, ত সে কিছু দিনের মধ্যে দেবতাদের বুদ্ধি কোশলে দেবতাদের দাস হয়ে পড়ে থাকে। নতুনা অশুর লুণ্ঠ করে সরে আপনার স্থানে যায়। দেবতারা যখন একত্রিত হয়ে, অশুরদের তাড়ায়, তখন, হয় তাদের সমুদ্র মধ্যে তাড়ায়, না হয় পাহাড়ে, না হয় জঙ্গলে তাড়িয়ে দেয়। ক্রমে ছ দিকেই দল বাড়তে লাগলো, লক্ষ লক্ষ দেবতা একত্র হতে লাগলো, লক্ষ লক্ষ অশুর একত্র হতে লাগলো। মহা সংঘর্ষ, মেশা মিশি, জেতা জিতি, চলতে লাগলো। এ সব রকমের মাছুষ মিলে মিলে বর্তমান সমাজ, বর্তমান প্রথা সকলের সৃষ্টি হতে লাগলো। নানা রকম নূতন ভাবের সৃষ্টি হতে লাগলো, নানা বিজ্ঞান আলোচনা চললো। এক দল লোক ভোগোপযোগী বস্তু তৈয়ার করতে লাগল—হাত দিয়ে বা বুদ্ধি করে। একদল সেই সব ভোগ্য দ্রব্য রক্ষা করতে লাগলো। সকলে মিলে সেই সব দ্রব্য বিনিময় করতে লাগলো। আর মাঝখান থেকে এক দল ওতান্দ, এ জায়গার জিনিষটা ও জায়গার নিয়ে যাবার বেতন স্বরূপ, সমস্ত জিনিষের অধিকাংশ আত্মসাৎ করতে শিখলো। এক জন চাস করলে, এক জন পাহারা দিলে, এক জন বয়ে নিয়ে গেল, আর এক জন কিনলে। যে চাস কলে, সে পেলে শুষ্ক; যে পাহারা দিলে, সে জুলুম করে কতকটা অংগ ভাগ নিলে; অধিকাংশ নিলে বাবসাদার, যে বয়ে নিয়ে গেল। যে কিনলে, সে এ সকলের দাম দিয়ে মলো!! পাহারাওয়ার নাম হলো রাজা, মুটের নাম হলো সওদাগর। এ দল কাজ করলে না—কঁাকি দিয়ে মুড়ো মারতে লাগলো। যে জিনিষ তৈরি কর্তে লাগল, সে পেটে হাত দিয়ে হা ভগবান্ ডাকতে লাগলো।

ক্রমে এই সকল ভাব পর্যাচাপেচি, মহা গেরোর উপর গেরো, ~~ত~~ গেরো হয়ে, বর্তমান মহা জটিল সমাজ উপস্থিত হলেন। কিন্তু ছিট্ মরে না। যে গুলো পূর্ব জন্মে ভেড়া চরাতে, মাছ ধরে খেত, সে গুলো সভ্য জন্মে বেষ্টে, ডাকাতি প্রভৃতি হতে লাগলো। বন্ নাই, যে সে শীকার করে; কাছে পাহাড় পর্বতও নাই, যে ভেড়া চরায়; জন্মের দরুণ শীকার বা ভেড়া চরণ বা মাছ ধরা কোনটারই সুবিধা পায় না—সে কাজেই ডাকাতি করে, চুরি করে, সে

যায় কোথা ? সে প্রাতিঃস্মরণীয়াদের কালের মেয়ে, এ জন্মে ত আর এক সঙ্গে অনেক বর বে করতে পায় না, কাজেই হয় বেষ্ঠা। ইত্যাদি রকমে নানা চঞ্চের, নানা ভাবের, নানা সভ্য অসভ্য দেবতা অসুর জন্মের নাস্তব একত্র হয়ে হয়েছে সমাজ। কাজেই সকল সমাজে এই নানারূপে ভগবান্ বিরাজ কর্ছেন। সাধু নারায়ণ, ডাকাত্ নারায়ণ, ইত্যাদি। আবার যে সমাজে যে দলে সংখ্যায় অধিক, সে সমাজের চরিত্র সেই পরিমাণে দৈবী বা আত্মরী হতে লাগলো।

জম্মুদ্বীপের তামাম্ সভ্যতা—সমতল ক্ষেত্রে, বড় বড় নদীর উপর, অতি উর্বর ভূমিতে উৎপন্ন—ইয়ংচিকিয়ং, গঙ্গা, সিন্ধু, ইউফ্রেটিস্ তীর। এ সকল সভ্যতারই আদ্য ভিত্তি চাম্ বাস্। এ সকল সভ্যতাই দেবতা-প্রধান। আর ইউরোপের সকল সভ্যতাই প্রায় পাহাড়, না হয় সমুদ্রময় দেশে জন্মেছে—ডাকাত্ আর বেষ্টে এ সভ্যতার ভিত্তি, এতে অসুর ভাব অধিক। (ক্রমশঃ)

মুক্তি ।

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী ।

এ জীবন সমস্তার কিবা হল সমাধান,
জন্মাবধি এ চিন্তায় তীব্রতৃষ্ণাক্ত প্রাণ ।
সদীম মানব মতি, অদীম অনন্তে গতি,
গান্তে কেন অনন্তের প্রতিচ্ছায়া বিদ্রুমান্,
সুখে কেন দুঃখাভাস, অজ্ঞানে কেন বা জ্ঞান ?
জন্ম মনে মৃত্যু কেন, হাসিতে কান্নার স্বর,
আলোতে আঁধার কেন, স্বরগে নরক ভর ?
উথানে পতন কেন, যৌবনে বার্দ্ধক্য পুন,
এ দ্বন্দ্ব তরঙ্গাঘাতে দ্বিভুবন বিচলিত ;
দেশকানিনিমিত্ততা-চক্রে সবি নিষ্পেষিত ।
এ দারুণ চিন্তাভারে হতাশাস জীবকুল,
হৃদয় ভেদিয়ে তাই উঠিছে বিলাপ রোল ।
শান্তি কি নাহিক তবে, আসিতে বাইতে হবে,—

এ ভাবে কি বার বার, কলেব পুতুল প্রার ?
 তবে কি সে মুক্তিবাদ নিশার স্বপন তার ?
 না—না—শুন, আশীষি সছত্রে আগুয়ান ;
 “চই ভেবে জীব ! তুমি কেন রেশে ত্রিয়মাণ ?
 একি তব্ব অনুহান, অদ্বিতীয় প্রাণান,
 দ্বিরূপী অলোক লালা দেখাইছে চনৎকার,
 কিছুমাত্র ভেদ নাই সে তব্ব তোনাতে আর।”
 এ সত্যে একান্ত নিষ্ঠ য়েই জন ধলা মাঝে,
 জনম মরণ দুঃখ দুখ তর ঘুচিয়াছে ।
 চিত্তাশ্রয় নিবভয়, মাংসীকপে সন্ন রয়,
 দৈতদৃশ্য তার কাছে মক্ষ-মরিচীকা-ময় ।
 অগ্নিদগ্ধ সূত্র সঙ্গ জগৎ প্রভাত হয় ।
 না লভিল এ সত্য যে মানব শরীর ধরি,
 বৃথা তাব ধর্ম্য কর্ম,—জীবন্ত সে আছে মরি ।
 হউক দোস্তবাদী, ভজুক বা দেবতাদি,
 অথবা ককক কর্ম্য যত ইচ্ছা মনে লয় ;
 মোহহিমিত্তি জ্ঞান বিনে কদাচ ন মুক্তি হয়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত !*

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

(নরেন্দ্র ও ভবনাথের মাষ্টারের সহিত মিলন)

[সমাধিমন্দিরে ।]

শ্রীম——।]

[১১২ পৃষ্ঠার পর ।

সভাভঙ্গ হইল । ভক্তেরা এদিক ওদিক পাঁচিচারি করিতে লাগিলেন । মাষ্টারও পঞ্চবটী ইত্যাদি স্থানে বেড়াইতে লাগিলেন । তখন বেলা আনাজ টো । কিয়ৎক্ষণ পরে মাষ্টার ঠাকুর রামকৃষ্ণের ঘরের দিকে আসিয়া দেখিলেন, ঘরের

* প্রথম ভাগ ছাপা হইতেছে ।

উদ্বোধনের ছোট বারাদার মধ্যে অল্পত ব্যাপার হইতেছে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। নবোক্ত গান করিতেছেন; ছুই চারি জন ভক্ত দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। নাট্যের আদিয়া গান শুনিতে লাগিলেন। গান শুনিয়া আকৃষ্ট হইয়া রহিলেন। ঠাকুরের গান ছাড়া এমন মধুর গান তিনি কখনও শুনে নাই। হঠাৎ ঠাকুরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অর্থাৎ হইয়া রহিলেন। দেবীবেন, ঠাকুর দাঁড়াইয়া নিঃশব্দ, চক্ষুর পাণ্ডা গড়িতেছে না। বিশ্বাস প্রবাস বসিছে কি না বসিছে। নিজস্বা বসিতে এক জন ভক্ত বসিলেন, এর নাম সন্ন্যাসি। নাট্যের এরূপ কখনও দেখেন নাই, শুনে নাই। অর্থাৎ হইয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন, ‘ভগবানকে চিন্তা করিয়া নাট্য কি এত বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়? না জিনি বত দুই বিশ্বাস ভক্তি থাকিলে একপ হয়!’ গানটি এই—

‘চিৎসন মন মানস হরি চিন্তন নিরঞ্জন।

(কিবা) অল্পম ভক্তি, নোহন চুপতি, ভক্ত-হৃদয়-রঞ্জন ॥

নবরাগে রঞ্জিত, কোটি শরী বিনিন্দিত; (কিবা) বিজলী চমকে,

সে রূপ-আগোকে, পূর্বেক শিহরে জী-না।’

গানের এই চরণটি গাহিবার সময় ঠাকুর রামকৃষ্ণ শিহরিতে লাগিলেন। দেহ কোমলিত হইতে লাগিল। চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে যেন কি দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন। না জানি ‘কোটি শরী বিনিন্দিত’ কি অল্পম রূপ দর্শন করিতেছিলেন। এরই নাম কি ভগবানের চিত্তরূপ-দর্শন? কত সাধন করিলে, কত তপস্কার ফলে, কতখানি ভক্তি বিশ্বাসের বশে একপ জৈবদর্শন হয়?

আবার গান চলিতে লাগিল,—

“হৃদ কমলাদনে ভজ তাঁর চরণ,

দেখ শাস্ত্র মনে, প্রেম নয়নে, অপরূপ প্রিয়দর্শন।”

আবার সেই ভুবনমোহন হাঙ্গ—শরীর মেইরূপ নিঃশব্দ ও তিমিত হোচন, কিং কি যেন অপরূপ রূপ দর্শন করিতেছিলেন; আর সেই অপ-রূপ রূপ দর্শন করিয়া যেন মহানন্দ ভাসিতেছিলেন।

এইবারে গানের শেষ হইল। নরেন্দ্র গাইলেন—

“চিদানন্দরসে, ভক্তিব্যাগাদেশে, হও রে চিরমগন।

(চিদানন্দ রসে, হায়রে)

(প্রেমানন্দরসে)

সমাদির ও প্রেমানন্দের এই অদ্ভুত ছবি হৃদয়মধ্যে গ্রহণ করিয়া মাঠার গৃহে প্রত্যাহ্বান করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে হৃদয়মধ্যে সেই স্বপ্নোন্মত্তকায়ী মধু সঙ্গীতের ফুট উঠিতে লাগিল,—

প্রেমানন্দ রসে হও রে চিরমগন।

(হরিপ্রেমে মত্ত হয়ে)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নরেন্দ্র-ভবনাধাদি ভক্তদের সঙ্গে আনন্দ।

তাহার পরদিনও ছুটি ছিল। বেলা ৩টার সময় মাঠার আবার আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর রামকৃষ্ণ সেই পূর্বপরিচিত ঘরে বসিয়া আছেন। মেজের মাত্র পাতা। সেখানে নরেন্দ্র, ভবনাথ, আরও দুই এক জন বসিয়া আছেন। কয়টিই ছোকরা; ১৯, ২০ বৎসর বয়স। ঠাকুর সহাস্তবন্দন, ছোট তক্তপোষের উপর বসিয়া আছেন, আর ছোকরাদের সহিত আনন্দের কথাবার্তা করিতেছেন।

মাঠার ঘবে প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়াই ঠাকুর উঠিয়াত করিয়া ছোকরা-দের বলিয়া উঠিলেন, 'ঐ রে আবার এসেছে!'—বলিয়াই হাত। মাঠার আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বসিলেন। আগে হাতছোঁড় করিয়া দাঁড়াইয়া প্রণাম করিতেন—ইংবাজিপড়া লোকেরা যেনন করে। কিন্তু আজ তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে শিখিয়াছেন। তিনি আসন গ্রহণ করিলে, ঠাকুর রামকৃষ্ণ বেন হসিতেছিলেন, তাহাই নরেন্দ্রাদি ভক্তদের বুঝাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন,—

"দ্যাখ্ একটা ময়ূরকে বেলা চারটার সময় আফিম খাইয়ে দিছিল। তার পর দিন ঠিক চারটার সময় সেই ময়ূরটা এসে উপস্থিত—আফিমের নেপা লেগেছিল—মোহাত শবেছিল—তাই আবার ঠিক সময়ে আফিম খেতে এসেছে।" (হাস্য)

মাঠার মন মনে ভাবিতে লাগিলেন, ইনি ত ঠিকই কথা বলিতেছেন। বাড়ীতে যাই, কিন্তু দিবানিশি ইহার দিকে মন পড়িয়া পাবে—কখন দেখিব, কখন দেখিব। এখানে কে যেন টেনে আনিলে। মনে করলেন হঠাৎ জায়গায় যাবার যো নাই, এখানে আসুকই হবে। এইকপ ভাবিতেছেন, ঠাকুর এ দিকে ছোকরাগুলির সহিত অনেক ফটিনাটি করিতে লাগিলেন, যেন তার।

বয়স্ক। হাসির লহরী উঠিতে লাগিল, যেন আনন্দের হাট বসিয়াছে। মাষ্টার অবাক হইয়া এই অদ্ভুত চরিত্র দেখিতে লাগিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, ইহারই কি পূর্ণদিনে সমাধি ও অদুইপূর্ণ প্রেমানন্দ দেখিয়াছিলাম? সেই বাস্তবই কি আজ প্রাকৃত বোনের ভাষা ব্যবহার করিতেছেন? ইনিই কি আমার প্রথমদিনে উপদেশ দিবার সময় তিরস্কার করিয়াছিলেন? ইনিই কি আমার ‘তুনি কি জ্বালা’ বলেছিলেন? ইনিই কি আমার নিরাশ্রয় হুইট সত্য বলেছিলেন? ইনিই কি আমার বসিয়াছিলেন যে, জীবনই সত্য, আর সংসারই সনতই অনিত্য? ইনিই কি আমার সংসার দাসীর মত থাকিতে বলিয়াছিলেন?

ঠাকুর রামকৃষ্ণ আনন্দ করিয়া ভাছেন ও মাষ্টারকে এক একবার দেখিতে-ছেন। দেখিলেন, তিনি অবাক হইয়া বসিয়া আছেন। তখন বামলালকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “ভ্রাতৃ-এর একটু উত্তের বেশী কি না, তাই এতটু গম্ভীর। এরা এতো হাসি খুণী করছে, কিন্তু এ চুপ করে বসে আছে।” মাষ্টারের বয়স তখন ২৫২৬ হইবে।

‘ব্রহ্মকল্পতরু’।

কথা কহিতে কহিতে পবন ভক্ত হনুমানের কথা উঠিল। হনুমানের পট একখানি ঘরের দেয়ালে ছিল। ঠাকুর বলিলেন, ‘দেখ, হনুমানের কি ভাব! ধন, মান, দেহস্থ, কিছুই চায় না, কেবল ভগবানকে চায়! যখন ফটক-তন্ত থেকে ব্রহ্মত্ব নিয়ে গুলিয়ে, তখন হনুমানের অনেক বকম ফল নিয়ে লোভ দেখাতে লাগল। ভাবলে, ফলের বোভ নেমে এসে অস্ত্রটা যদি ফেলে দেয়, কিন্তু হনুমান ভুগবার ছেলে নয়। হে ভগ্নে,—

আমায় কি ফলের অভাব,

পেয়েছি যে ফল জনম মফল,

মোক্ষ-ফলের রক্ষা বাস জুড়য়ে।

ঐ বাস-ব্রহ্মত্ব-মূলে বসে পশু—

যখন যে ফল বাস্তা গেল ফল প্রাপ্ত হই,

ফলের কথা কই (ধনী গো) ও ফল প্রাপ্তক নই,

যাব তোমাদের প্রতিফল যে দিয়ে।

পুনঃ সমাধি।

গান গাইতে গাইতেই আবার সেই সমাধি। অবস্থা আবার নিঃশব্দ দেহ,

স্তিমিত লোচন, দেহ স্থির, বসিয়া আছেন—ফটোগ্রাফে যেরূপ ছবি দেখা যায়। ভক্তেরা, যাহারা এঠমাত্র এত হাসি খুসি করিতেছিল, সবদেই এসদৃষ্টি হইয়া সেই অদ্ভুত অবস্থা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সমাধি-অবস্থা মাষ্টার এই দ্বিতীয়বার দর্শন করিলেন।

অনেক ক্ষণ পরে ঐ অবস্থার পরিবর্তন হইতে লাগিল। দেহ শিথিল হইল, মুখ সহাস্ত হইল, চন্দ্রিৎসব আবার নিজের নিজের কার্য করিতে ফিরিতে লাগিল। ঠাকুর চক্ষের কোণ দিয়া অনন্যাত্ম বিমর্জন করিতে করিতে ‘রান’ ‘রান’ এই নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

মাষ্টার ভাবিতে লাগিলেন, এই মহাপুরুষই কি ছেলেদের সঙ্গে ফচকমি করিতেছিলেন। তখন ঠিক যেন পাঁচ বছরের বালক।

ঠাকুর পূর্বপ্রকৃতিস্থ হইয়া আবার প্রাকৃত লোকের জায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। মাষ্টারকে ও নবেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলেন,—“তোমরা দু’জনে ইংরাজীতে কথা কও ও তর্ক বিচার করো, আমি উনবা।” মাষ্টার ও নবেন্দ্র উভয়ে এই কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন। দু’জনে কিছু কিছু আলাপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বাঙ্গালাতে। ঠাকুরের সামনে মাষ্টারের তর্ক বিচার আর সম্ভব নয়—তাঁর তর্কের ঘর ঠাকুরের কৃপায় এক রকম বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অতএব তিনি আর কিরূপে তর্ক বিচার করিবেন? ঠাকুর আর একবার জিদ করিলেন, কিন্তু ইংরাজীতে তর্ক করা আর হইল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

(অসুরঙ্গ সঙ্গে)

পাঁচটা বাজিয়াছে। ভক্ত কয়টি যে যার বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। কেবল মাষ্টার ও নবেন্দ্র রহিলেন। নবেন্দ্র গাড়ু লইয়া হাঁসপুকুর ও ঝাউতীর দিকে মুখ ধুইতে গেলেন। মাষ্টারও ঠাকুর বাড়ী? এদিক ও দিক পায়চারি করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কুঠীর কাছ দিয়া হাঁসপুকুরের দিকে আসিতে লাগিলেন। দেখিলেন, পুকুরের দক্ষিণ দিকের মিঁড়ির চাতালের উপর ঠাকুর রামকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, আর নবেন্দ্র গাড়ু হাতে করিয়া মুখ ধুইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, “দেখ্ আর একটু বেশী বেশী আশুবি। তবে নূতন আশুহিস্ কি না। প্রথম আলাপের পর নূতন সকলেই ঘন ঘন আসে, যেমন নূতন—পতি। কেমন আশুবি তো?” নবেন্দ্র বলিলেন, “হঁ। চেষ্টা করবো।” আবার সকলেই কুঠীর পথ দিয়া ঠাকুরের

ঘরে আসিতে লাগিলেন। কুঠীর কাছে মাষ্টারকে ঠাকুর বলিলেন, “দেখ চাষারা হাতে গরু কিনতে যায়। তারা ভাল গরু মন্দ গরু বেশ চেনে। আমার নীচে হাত দিয়ে দেখে। কোনও গরু ল্যাঞ্জে হাত দিলে শুয়ে পড়ে ; মে গরু কেনে না। কিন্তু যে গরু ল্যাঞ্জে হাত দিল তিড়িং মাড় কবে লাফিয়ে উঠে। সেই গরুকেই পছন্দ কবে। এই যে নরেন্দ্রকে দেখছো, এ সেই গরুর জাত। ভিতরে খুব তেজ আছে।” এই বলিয়া ঠাকুর হাতিতে লাগিলেন। “আবার কেউ কেউ শোক আছে যেন চিড়ের ফলার, আঁট নাই, ছোঁর নাই, ভাং ভাং করছে।”

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর ঘরে বসিয়া ঈশ্বরচিন্তা করিতে লাগিলেন ও মাষ্টারকে বলিলেন, “তুমি নরেন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করগে যাও। আমার বন্ধবে কি রকম ছেলে।”

মাষ্টার, অনেক ক্ষণ পরে যখন আরতি হইয়া গেল, টাননির কাছে বেড়াইতে বেড়াইতে নরেন্দ্রকে দেখিতে পাঠিলেন। পরস্পর আলাপ হইতে লাগিল। নরেন্দ্র বলিলেন, আমি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের। কলকাতা পড়িতছি, ইত্যাদি।

রাত হইয়াছে—মাষ্টার এটবার বিদায় গ্রহণ করিবেন, কিন্তু যাইতে আর পারিতেছেন না। তাই নরেন্দ্রের নিকট হইতে চলিয়া আসিয়া ঠাকুর হারুকৃষ্ণকে খুঁজিতে লাগিলেন। তাঁহার গান শুনিয়া হৃদয় মন মুগ্ধ হইয়াছে। আবার বড় সাধ যে, তাঁর মুখের গান শুনিতে পান। খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলেন, মা কালীর মন্দিরের সম্মুখ নাটমন্দিরমধ্যে একাকী ঠাকুর পাদচারণ করিতেছেন। মা মন্দিরের দ্বার দুই পার্শ্বে আলো জলিতেছিল। দুই নাটমন্দিরে একটি আলো জলিতেছিল। আলো ■ অন্ধকার মিশ্রিত হইল যেমন হয়, সেইরূপ দেখা দিতেছিল।

মাষ্টার সঙ্কটচিত্তে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আজ আর কি গান হবে ?” ঠাকুর বলিলেন, “না, আজ আর গান হবে না।” এই বলিয়া কি যেন মনে পড়িল, অমনই বলিলেন, “তবে এক কণ্ঠ করো। আমি বলার সময় বাড়া বলি কীতায় দাব, তুমি বেণু, সেখানে গান হবে।” মাষ্টার বলিলেন, “যে আজ্ঞে।”

শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারের সঙ্গে (নাট মন্দির বেড়াইতে বেড়াইতে)। “আচ্ছা, তোমার একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আনাকে তোমার কি বোধ হয় ?”

মাষ্টার চুপ করিয়া রহিলেন। তখন ঠাকুর বলিলেন, “তোমার কি বোধ হয় ? আমার কয় আনা জ্ঞান হয়েছে ?”

মাষ্টার। আনা এ কথা বুঝিতে পারিতেছি না। তবে একপ জ্ঞান বা তত্ত্ব বা বিশ্বাস কখন কোথাও দেখি নাই।

একপ কথাবার্তার পর মাষ্টার প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। সঙ্গে কটক পর্য্যন্ত আসিয়া আবার কি মনে পড়িল, অমনই ফিরিলেন। আবার নাটমঞ্চের ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে আনিয়া উপস্থিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। আবার যে ফিরে এলে ?

মাষ্টার। আজ্ঞে বড়মাতৃয়ের বাড়ী—যেতে দেবে কি না; তাই সেখানে যাব না ভাবছি। এইখানে এসেই আপনার সঙ্গে দেখা করব।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না গো, তা কেন ? তুমি আমার নাম করবে। বলবে তাঁর কাছে যাব, তা হলেই—কেউ আমার কাছে নিয়ে আসবে।

মাষ্টার যে আজ্ঞা বলিয়া আবার প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণমহোৎসব ।

প্রেরিত পত্র ।

মাদ্রাজ ।

মাদ্রাজ মহোৎসব অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তিথিপূজার দিন, সমস্ত দিন ধরিয়া পূজা হয় ; পরে রাত্রি বারটার সময় হোম সমাপন করিয়া কণ্ঠ সাঙ্গ করা হয়। সে দিবস প্রায় তিন শত ভক্তলোক প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। রবিবার মহোৎসবের দিন পঞ্চাশ মনেরও অধিক চাল রন্ধন করা হয় এবং ছয় সহস্রেরও অধিক কন্ডালি প্রসাদ পায়। অপরাহ্নের সময় এত অধিক ভিড় হইয়াছিল যে আর বসিয়া থাওয়ানো সুবিধা হইল না। তখন ভাত, ডাল, কড়মু প্রভৃতি এসঙ্গে মাখিয়া তাল তাল করিয়া দেওয়া হইতে লাগিল। মাদ্রাজের অনেক ভক্তলোক সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পবিত্রেশন করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এদিকে ভক্তলোকদের জল স্নান করিয়া বস্ত্র পরিধান করা হইয়াছিল। প্রায় ৫০০ ভক্তলোক প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। জলখাবারের মধ্যে ফলই সমস্ত, আর মিষ্টিরি। শ্রীশ্রীপঃমহোৎসবমঙ্গলারাজের শ্রীবিগ্রহ একটি বিমানের মধ্যে বিরাজ করিতে-ছিলেন। নানাবিধ কুসুমমালায় ও কমলী বৃক্ষে সুসজ্জত হইয়া বিমানটি পরম রমণীয় হইয়াছিল। তাহারই সম্মুখে সঙ্কীর্ণ হইতে লাগিল। সঙ্কীর্ণের পরে প্রসাদ গ্রহণ, পরে অপরাহ্ন চারিটার পর, মহাত্মা আচার্য্যের স্মৃতি,

(ঐকৈক পরমতাগী,) তামিল ভাষায় ভক্তি সম্বন্ধে প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করিয়া সকলকে সান্ত্বিত্য প্রীতি দিয়াছিলেন । পরে শ্রীশ্রীপরমহংস মহারাজ কিসের জন্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই সম্বন্ধে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ কিছু বলিয়া ছিলেন । তাহার পর Mr. Drew রামকৃষ্ণ মিশনের উপর বিশেষ মহাত্ম-ভূতি প্রকাশ করিয়া কিছুক্ষণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন । পরে এখানকার হাই-কোর্টেব প্রসিদ্ধ উকিল ঐযুক্ত সন্দেবরাম আয়ার কিছুক্ষণ বক্তৃতা করিলেন । তিনি বলিলেন যে যদিও ভারতবর্ষ অল্প সকল বিষয়ে পশ্চাৎপদ হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে ইহা যে জগতেব শিক্ষক, তাহাতে অগ্রমাত্র সন্দেহ নাই । হিন্দুধর্ম সামাজিক এবং সাংগত । তাহার পরে গৃহস্থানী মহাত্মা বিলিগিরি আঞ্জেলার সকলকে ধন্যবাদ দিয়া সভাব কাণ্ড শেষ করিলেন ।

চেঙ্গটীয়া ।

বিগত ১১শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ১৩০৭, যশোহরের অন্তর্গত চেঙ্গটীয়া ধর্ম্মাশ্রমে দর্শনাত্মক রামকৃষ্ণোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে । ঐ উপলক্ষে তথায় কীর্ত্তন বক্তৃতা ও প্রসাদ বিতরণ হইয়াছিল । প্রায় ৪০০ লোক সমাগত হইয়াছিলেন ।

পাঁচকথা ।

“চোর” “চোর”—আমি, আমার কয়েকটা বন্ধু ও একজন হিন্দুস্থানী চাকর উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে বেড়াবার কালে এক রাত অখালায় কোনও ভদ্রলোকের বাড়িতে অতিথি হয়েছিলাম । গরম কাল ; রাত প্রায় ১টা ; আমি এক ঘরে শুয়ে আছি ও পাশেব ঘরে আমার বন্ধু কয়েজন এবং বারাণ্ডায় হিন্দুস্থানী চাকরটা শুইয়া আছে । গরমে আমার ঘুম হ’চ্ছে না ; আব সকলেই নিদ্রিত । এক বুড়ো কুনৌ, আমাব ঘরে এক খানা টানা পাখা ছিল, সে খানা আশ্তে আশ্তে টান্ছে । বুড়ো মানুষ, পাখা টান্তে টান্তে, ঘুমের ঘোরে এনবারে হুম করে বারাণ্ডার উপর পড়ে গেছে । যেই হুম করে পড়ে গেল, আর বাড়ির মধ্যে এক মহা কোলাহল উঠলো । বাঁহারা ঘুমুচ্ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন, “চোর, চোর” বলে চোঁচয়ে উঠলেন । অমনি আর একজন আরও উচ্চৈঃস্বরে “চোর, চোর” বলে চীৎকারে যোগ দিলেন । হিন্দুস্থানী চাকরটা একেবারে বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উঠে, লাঠী ঘোরাতে ঘোরাতে বাড়ির চার দিকে “চোর, চোর” বলে চক্কর দিতে লাগ্লাম । আমি ভাড়াভাড়ি উঠে বোঝাতে গেলাম, “ওহে, ভয় নেই, পাখাওয়ালা পড়ে গেছে ।” পাখাওয়ালা বলতে লাগ্লাম, “বাবু, ভয় নেই, ভয় নেই, আমি, আমি ?” কে কার কথা শোনে ? “চোর, চোর”—মহা হলুহল উঠলো । শেষে, আলো জ্বলে, হিন্দুস্থানী চাকর-টাকে কাপ ধরে বসাই, তবে সব ঠাণ্ডা হয় । ভগবান্ সম্বন্ধে যত তর্ক বিচার বাহু বিতণ্ডা দগাদগি হয়, সে সবও কি অন্ধকারে এই রকম “চোর চোর” বলে চোঁচান না কি ?

ভাব হইতেও উচ্চতর ভাবমণ্ডল আবিষ্কার করিতে লাগিলেন—উহাকেই নিগূর্ণ পূর্ণরূপ বলে—এই নিগূর্ণরূপের ধারণায়, তাঁহার জন্মের মধ্যে এক অখণ্ড সত্তা দেখিতে পাওয়াছিল।

যিনি এই বহুত্বপূর্ণ জগতে সেই এক অখণ্ডরূপকে দেখিতে পান, যিনি এই মরজগতে সেই এক অনন্ত জীবন দেখিতে পান, যিনি এই জড়তা ও অজ্ঞানপূর্ণ জগতে সেই একস্বরূপকে দেখিতে পান, তাঁহাকেই শাস্ত্রী শাস্তি, আর কাহারও নহে, আর কাহারও নহে ।

মায়া ও মুক্তি ।

কবি বলেন, “ আমরা জগতে প্রবেশ করিবার সময় আমাদের পশ্চাদ্দেশে যেন হিরণ্ময় জলদজাল লইয়া প্রবেশ করি ।” কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে, আমরা সকলেই একপা মহিমা-মণ্ডিত হইয়া সংসাবে প্রবেশ করি না ; আমাদের অনেকেই কুজ্ঞাটিকার কালিমা পশ্চাতে টানিয়া জগতে প্রবেশ করি ; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । আমরা, আমাদের মধ্যে সকলেই, যেন দুষ্কক্ষেত্রে যুদ্ধের জন্ত প্রেরিত হইয়াছি । কাঁদিয়া আমাদেরকে এই জগতে প্রবেশ করিতে হইবে—যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আপনার পথ কবিতা লইতে হইবে—এই অনন্ত জীবন সমুদ্রের মধ্যে পশ্চাতে কোন চিহ্ন পরিত্যাগ না করিয়া পথ করিয়া লইতে হইবে—সম্মুখে আমরা অগ্রসর, পশ্চাতে অনন্ত যুগ পড়িয়া রহিয়াছে, সম্মুখেও অনন্ত । এইরূপে আমরা চলিতে থাকি, অবশেষে মৃত্যু আসিয়া আমাদেরকে এই ক্ষেত্রে হইতে অপসারিত করিয়া দেয়—জয়ী বা পরাজিত কিছু নিশ্চয় নাই—ইহাই মায়া ।

বালকের হৃদয়ে আশা বলবতী । বালকের বিস্ফারিত নয়নদমকে সমুদ্রই যেন একটা সোনার ছবি বলিয়া প্রতিভাত হয় ; সে ভাবে, আমার ধাড়া ইচ্ছা, তাহাই হইবে ; কিন্তু বাই সে অগ্রসর হয়, অমনি প্রতি পদবিক্ষেপে প্রকৃতি যজ্ঞদ্রুত প্রাচীর স্বরূপে তাহার গতিরোধ করিয়া দণ্ডায়মান হয় । বার বার এই প্রাচীর ভঙ্গ করিবার উদ্দেশে সে বেগে তরুণ উৎপত্তি হইতে পারে । সারা জীবন যেমন সে অগ্রসর হয়, অমনিই তাহার আদর্শ যেন তাহার সম্মুখে হইতে সরিয়া সরিয়া যায়—পেষে মৃত্যু আসিয়া হস্ত নিস্তার ; ইহাই মায়া ।

বৈজ্ঞানিক উঠিলেন—মহা জ্ঞানপিপাসু । তাঁহার পক্ষে এমন কিছুই নাই, যাহা তিনি না ভাগ করিতে পারেন, কোন চেষ্টাতেই তাঁহাকে নিরুৎসাহ করিতে পারে না । তিনি ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া, প্রকৃতির একটীর পর একটী গুপ্তত্ব আবিষ্কার করিতেছেন—প্রকৃতি অনন্তস্থল হইতে পর্যাণ্ত রহস্য উদ্ঘাটন করিতেছেন—কিন্তু উহার উদ্দেশ্য কি ? এ সব করিবার উদ্দেশ্য কি ? আমরা এই বৈজ্ঞানিকের গৌরব কবির কেন ? কেন তিনি যশোভাজ করিবেন ? প্রকৃতি কি, মানুষ যত্নের জানিতে পারে, তদপক্ষে অনন্তগুণে অধিক জানিতে পারেন না ? তাহা হইলেও তিনি কি জড়া নহেন ? জড়ের অনুকরণে গৌরব কি ? প্রকৃতি, যে কোন পরিমাণের হউক না কেন, বজ্র, যত দূর ইচ্ছা দূরে নিক্ষেপ করিতে পারেন ! যদি কোন মানুষ তাহার শতাব্দের একাংশ করিতে পারে, তবে আমরা তাহাকে একেবারে অকাণ্ডে তুলিয়া দিই । কিন্তু ইহার কারণ কি ? প্রকৃতির অনুকরণ—মৃত্যুর অনুকরণ—জাড়ের অনুকরণ—অচেতনের অনুকরণের জন্ত কেন তাঁহার প্রয়াস করিব ?

মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অতি বৃহত্তম পদার্থক পর্যাণ্ত খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিতে পারে, তথাপি উহা জড়শক্তি । জড়ের অনুকরণে কি ফল ? তথাপি আমরা মারা ভীষন কেবল উহার জন্তই চেষ্টা করিতেছি ; ইহাই মায়া ।

ইঞ্জিয়গণ মনুষ্যকে টানিয়া বাহিরে লইয়া যায় । যেখানে কোন ক্রমে সুখ পাওয়া যায় না, মানুষ সেখানে সুখের অন্বেষণ করিতেছে । অনন্ত যুগ ধরিয়া আমরা সকলেই এই উপদেশ পাইতেছি—এ সব বুঝা ; কিন্তু আমরা শিখিতে পারি না । নিজে না ঠেকিলে শিখাও অসম্ভব । ঠেকিতে হইবে—হয়ত তীব্র আঘাত পাইব । তাহাতেই কি আমরা শিখিব ? না, তখনও নহে । পতঙ্গ যেমন পুনঃ পুনঃ অগ্নি অভিযুখে ধাবমান হয়, আমরাও তেমনি পুনঃ পুনঃ বিষয় সমূহের নিকে বেগে বাইতেছি—যদি কিছু সুখ পাই । ফিরিয়া ফিরিয়া আবার নূতন উৎসাহে বাইতেছি । এইকপেই আমরা অগ্রসর হই । শেষে প্রতারিত ও ভগ্নহস্তপদ হইয়া অবশেষে মরিয়া যাই—ইহাই মায়া ।

আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সঘর্ষেও তৃপ্ত । আমরা জগতের রহস্যমীমাংসার চেষ্টা করিতেছি—আমরা এই জিজ্ঞাসা, এই অনুসন্ধান প্রবৃত্তিকে বন্ধ করিয়া রাখিতে পারি না ; কিন্তু আমাদের ইহা জানিয়া রাখা উচিত, জ্ঞান লক্ষ্য বস্তু নহে—কয়েক পদ অগ্রসর হইলেই, অনাদি অনন্ত কালের প্রচীর আসিয়া মধ্যে ব্যবধানস্বরূপে দণ্ডায়মান হয়, আমরা উহা

লজ্জন করিতে পারি না । কয়েক পদ অগ্রসর হইলেই, অসীম দেশের ব্যবধান আসিয়া উপস্থিত হয়—উহাকে অতিক্রম করা যায় না ; সমুদয়ই অনতিক্রমণীয় ভাবে কার্য্যাকারণরূপ প্রাচীরে মীমাংসক । আমরা উহাদিগকে ছাড়াইয়া যাইতে পারি না । তথাপি আমরা চেষ্টা করিয়া থাকি । চেষ্টা আমাদেরকে করিতেই হয়—ইহাই মায়া ।

প্রতি নিশ্বাসে, হৃদয়ের প্রতি আঘাতে, আমাদের প্রত্যেক গতিতে আমরা বিবেচনা করি, আমরা স্বাধীন, আবার সেই মুহূর্ত্তেই আমরা দেখিতে পাই, আমরা স্বাধীন নই । ক্রীতদাস—প্রকৃতির ক্রীতদাস আমরা—শরীর, মন, মৰ্ম্ম চিন্তা এবং সকল ভাবেই প্রকৃতির ক্রীতদাস আমরা । ইহাই মায়া ।

এমন জননীও নাই, যিনি তাঁহার সন্তানকে অদ্বুত শিশু—মহাপুরুষ বলিয়া বিশ্বাস না করেন । তিনি সেই ছেলেটাকে লইয়াই মাতিয়া থাকেন—সেই ছেলেটির উপর তাঁহার সমুদয় প্রাণটা পড়িয়া থাকে । ছেলেটা বড় হইল—হরত মহা মাতাল, গম্ভীরা হইয়া উঠিল—জননীর প্রতি অদৃষ্টাবহার করিতে লাগিল । যতই এই অদৃষ্টাবহার বাড়িতে থাকে, মায়ের ভালবাসাও তত বাড়িতে থাকে । জগৎ উহাকে মায়ের নিঃস্বার্থ ভালবাসা বলিয়া খুব প্রশংসা করে—তাহাদের স্বপ্নেও মনে উদয় হয় না যে, সেই জননী জন্মাবধি একটা ক্রীতদাসীতুল্যমাত্র—তিনি না ভালবাসিয়া থাকিতে পারেন না । সহস্রবার তাঁহার ইচ্ছা হয়, তিনি উহা ত্যাগ করিবেন, কিন্তু তিনি পারেন না । তিনি কতকগুলি পুষ্পরাশি উহার উপর চড়াইয়া, উহাকেই আশ্চর্য্য ভালবাসা বলিয়া ব্যাখ্যা করেন । ইহাই মায়া ।

জগতে আমরা সকলেই এইরূপ । নারদও একদিন ত্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, ‘প্রভু, তোমার মায়া কিরূপ, তাহা দেখাও ।’ কয়েক দিন গত হইলে কৃষ্ণ নারদকে সঙ্গে লইয়া একটা অরণ্যে লইয়া গেলেন—অনেক দূর গিয়া, কৃষ্ণ বলিলেন, ‘নারদ, আমি বড় তৃষ্ণার্ত্ত, একটু জল আনিয়া দিতে পার ?’ নারদ বলিলেন, ‘প্রভু, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, আমি জল লইয়া আসিতেছি ।’ এই বলিয়া নারদ চলিয়া গেলেন । ঐ স্থান হইতে কিয়দূরে একটা গ্রাম ছিল ; নারদ সেই গ্রামে জলের অল্পসন্ধানে প্রবেশ করিলেন । তিনি একটা ঘারে গিয়া ঘা মারিলেন, দ্বার উন্মুক্ত হইল, একটা পরমা স্নানরতী কন্যা তাঁহার সম্মুখে আসিলেন । তাঁহাকে দেখিয়াই নারদ সমুদয় ভুলিয়া গেলেন । তাঁহার প্রভু যে তাঁহার জন্ত অপেক্ষা করিতেছেন, তিনি যে তৃষ্ণার্ত্ত, হরত তৃষ্ণায় তাঁহার মা চৈত্র, ১৩০৭ ।]

উদ্বোধন ।

প্রাণবিরোধ হইবার উপক্রম হইয়াছে, নারদ এ সমুদয় ভুলিয়া গেলেন। তিনি সব ভুলিয়া সেই কল্যাণীর সহিত কণাবাস্তা কহিতে লাগিলেন—ক্রমে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রণয়ের সঞ্চায় হইল। তখন নারদ সেই কল্যাণীর নিকট ঐ কল্যাণীর জন্ত প্রার্থনা করিলেন—বিবাহ হইয়া গেল—তঁাহারা সেই গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন—ক্রমে তাঁহাদের সন্তানসন্ততি হইল। এইরূপে দ্বাদশবর্ষ অতিবাহিত হইল। তাঁহার শ্বশুরের মৃত্যু হইল—তিনি শ্বশুরের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন এবং গুলকলত্র ভূমি পশু সম্পত্তি গৃহ প্রভৃতি লইয়া বেশ সুখে সচ্ছন্দে কাটাতে লাগিলেন। অন্ততঃ তাঁহার বোধ হইতে লাগিল, তিনি বেশ সুখে সচ্ছন্দে আছেন। এই সময় সেই দেশে বন্যা আসিল। একদিন রাত্রিকালে নদী বেলা অতিক্রম করিয়া উভয় কূল প্লাবিত করিল, আর সমুদয় গ্রামটাই জলমগ্ন হইল। অনেক বাড়ী পড়িতে লাগিল—মানুষ পশু সব ভাসিয়া গিয়া ভুলিয়া বাইতে লাগিল—স্রোতের বেগে সবই ভাসিয়া যাইতে লাগিল। নারদকে পলায়ন করিতে হইল। এক হাতে তিনি স্ত্রীকে ধরিলেন, অপর হস্তদ্বারা হুইটো ছেলেকে ধরিলেন, আর একটি ছেলেকে কাঁধে গাইয়া এই ভয়ঙ্কর নদী হাটুরা পার হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিয়দূর অগ্রসর হইলেই তরঙ্গের বেগ অত্যন্ত হৃদয়িক বোধ হইল। নারদ স্বকল্প শিশুটিকে কোন ক্রমে রাখিতে পারিলেন না; সে পড়িয়া গিয়া তরঙ্গে ভাসিয়া গেল। নিরাশায় দুখে নারদ চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহাকে রক্ষা করিতে গিয়া আর একজন—বাহার হাত ধরিয়াছিলেন, সে হাত ফসকাইয়া ভুলিয়া গেল। অবশেষে তাঁহার পত্নী, বাহাকে তিনি তাঁহার বত শক্তি ছিল, সমুদয় প্রয়োগ করিয়া ধরিয়াছিলেন, তরঙ্গের বেগে তাঁহাকেও হাত ছিনাইয়া লইল, আর তিনি কূলে নিষ্কপ্ত হইয়া মৃত্তিকার গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন ও অতি কাতর স্বরে নিলাপ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে কে যেন তাঁহার পৃষ্ঠদেশে মূর্ছ আঘাত করিল; কে যেন বলিল, ‘বৎস, কই, জল কই? ভূমি জল আনিতে গিয়াছিলে, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছি। ভূমি আশ বর্টা হইল গিয়াছে।’ আশ বর্টা! নারদের মনে দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রান্ত হইয়াছিল, আর আশ বর্টার মধ্যে এই সমস্ত দৃশ্য তাঁহার মনের ভিতর দিয়া চলিয়াছিল—ইহাই মায়া। কোন না কোনরূপে আমরা এই মায়া ভিতর রহিয়াছি। এ ব্যাপার বুঝা বড় কঠিন—বিষয়টীও বড় জটিল। ইহার

ভাংপৰ্য্য কি ? ভাংপৰ্য্য এই—বাণীপার বড় ভয়ানক—সকল দেশেই মহা-পুরুষগণ এই তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, সকল দেশের লোকেই এই তত্ত্ব শিক্ষা পাইয়াছে, কিন্তু খুব অল্প লোকেই ইহা বিশ্বাস করিয়াছে ; তাহার কারণ এই, নিজে না ভুগিলে, নিজে না ঠেকিলে আমরা ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না। বাস্তবিক বলিতে গেলে—সমুদয়ই বুঝা—সমুদয়ই মিথ্যা।

সর্বদংহারক কাল আসিয়া সকলকেই গ্রাস করেন, কিছু আর অবশিষ্ট রাখেন না। তিনি পাপকে গ্রাস করেন, পাপীকে গ্রাস করেন, রাজাকে প্রজাকে, স্ত্রীর কুংসিং সকলকেই গ্রাস করেন, কাহাকেও ছাড়েন না। সবই সেই এক চরম গতি বিনাশের দিকে অগ্রসর হইতেছে। আমাদের জ্ঞান, শিল্প, বিজ্ঞান, সবই এই এক অনিবার্য গতি মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে। কেহই ঐ তরঙ্গের গতিরোধে সমর্থ নহে, কেহই ঐ বিনাশভিমুখী গতিকে এক মুহূর্তের জন্তও রোধ করিয়া রাখিতে পারে না। আমরা উহাকে ভুলিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতে পারি, যেমন কোন দেশে মহামারী উপস্থিত হইলে মৃত্যুপান মৃত্যু এবং অজ্ঞাত বৃথা চেষ্টা করিয়া লোকে সমুদয় ভুলিতে চেষ্টা করিয়া পক্ষাঘাতগ্রস্তের ন্যায় গতিশক্তিহীন হইয়া থাকে। আমরাও এই রূপে এই মৃত্যুচিন্তাকে ভুলিবার জন্ত অতি কঠোর চেষ্টা করিতেছি—সর্ব প্রকার ইঞ্জিয় সুখের দ্বারা ভুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু তাহাতে উহার নিরুত্তি হয় না।

লোকের সম্মুখে দুই পথ আছে। তন্মধ্যে একটি পথ সকলেই জানেন—তাহা এই :—“জগতে দুঃখ আছে, কষ্ট আছে, সব সত্য, কিন্তু ও সম্বন্ধে মোটেই ভাবিও না। ‘বান্ধজীবং সুখং জীবং ঋণং কৃত্বা মৃতং পিবেৎ।’ দুঃখ আছে বটে, ওদিকে নজর দিও না। যা একটু আধটু সুখ পাও, তাহা ভোগ করিয়া লও, এই সংসারচিত্রের ছায়ায় অংশের দিকে লক্ষ্য করিও না—কেবল আলোকময় অংশের দিকেই লক্ষ্য করিও।” এই মতে কিছু সত্য আছে বটে, কিন্তু ইহাতে ভয়ানক বিপদাশঙ্কা আছে। ইহার মধ্যে সত্য এইটুকু যে, ইহাতে আমাদের কার্যে প্রবৃত্ত রাখে, আশা এবং এইরূপ একটা প্রত্যক্ষ আদর্শ আমাদের কার্যে প্রবৃত্ত ও উৎসাহিত করে বটে, কিন্তু উহাতে এই এক বিপদ আছে যে, শেষে হতাশ হইয়া সব চেষ্টা ছাড়িয়া দিতে হয়। যাহারা বলেন, “সংসারকে যেমন দেখিতেছ, তেমনই গ্রহণ কর; যত দূর স্বচ্ছন্দে থাকিতে পার থাক, দুঃখকষ্ট সমুদয় আসিলেও তাহাতে সন্তুষ্ট থাও, ১৯০৭।”

উদ্বোধন।

থাক, অর্থাৎ পাইলে বল—উহারা আঘাত নহে, পুষ্পবৃষ্টি, দাসব্যং পরিচালিত হইলেও বল আমি মুক্ত, আমি স্বাধীন, অপরের নিবট এবং নিজের নিকট ক্রমগত মিথ্যা কথা বল, কারণ সংসারে থাকিবার—জীবনধারণ করিবার ইহাই একমাত্র উপায়,” তাহাদিগের বাধ্য হইয়া অবশেষে ইহা করিতে হয়। ইহাকেই পাকা সাংসারিক জ্ঞান বলে, আর এই উনবিংশ শতাব্দীতে এই জ্ঞান যত সাধারণ, কোন কালে উহা এত সাধারণ ছিল না; তাহার কারণ এই, লোক এখন যেমন তীব্র আঘাত পাইয়া থাকে, কোন কালে এত তীব্র আঘাত পাইত না, প্রতিদ্বন্দ্বিতাও কখন এত অধিক ও তীব্র ছিল না, মানুষ এক্ষণে তাহার অপর ভ্রাতার প্রতি যত নিষ্ঠুর, তত কখন ছিল না, আর এই জটাই এক্ষণে এই মানুষ প্রদত্ত হইয়া থাকে। বর্তমানকালে এই উপদেশই অধিক পরিমাণে প্রদত্ত হইয়া থাকে, কিন্তু এই উপদেশ কোন ফল হয় না, কোন কালেই হয় না। গলিত শব্দকে আর কতগুলি ফুল চাপা দিয়া রাখা যায় না—অসম্ভব বেশী দিন চলে না; এক দিন ফুলগুলি উঠিয়া যাইবে, তখন সেই সব পূর্ণাপেক্ষা দীর্ঘতম রূপে প্রতিভাত হইবে। আমাদের সমুদয় জীবনও এই প্রকার। আমরা আমাদের পুরাতন পচা বা সোণার কাপড়ে মুড়িয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে পারি, কিন্তু এক দিন আসিবে, যখন সেই সোণার কাপড় সরিয়া পড়িবে, আর সেই ক্ষত অতি দীর্ঘতমভাবে নয়ন সমক্ষে প্রকাশিত হইবে। তবে কি কিছু আশা নাই? এ কথা সত্য যে, আমরা সকলেই মায়ার দাস, আমরা সকলেই মায়ার জগৎগ্রহণ করিয়াছি, মায়াতেই আমরা জীবিত।

তবে কি কোন উপায় নাই, কোন আশা নাই? আমরা যে সকলেই অতি দুর্দশাপন্ন, এই জগৎ যে বাস্তবিক একটা কারাগার, আমাদের পূর্ক হইতে প্রাপ্ত মর্হিমার ছটাও যে একটি কারাগৃহমাত্র, আমাদের বুদ্ধি এবং মনও যে বারাস্তরূপ, তাহা শত শত যুগ ধরিয়া লোকে জ্ঞাত আছে। মানুষ বাহাই বলুক না কেন, এমন লোকই নাই, যিনি কোন না কোন সময়ে ইহা প্রাণে গ্রহণে অগ্রভব না করিয়াছেন। বুদ্ধেরা এটি আরো তীব্রভাবে অনুভব করিয়া থাকে, কারণ, তাহাদের সারা জীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা রহিয়াছে; প্রকৃতির মিথ্যা ভাষা তাহাদিগকে বড় অধিক ঠকাইতে পারে না। এই বন্ধন অতিক্রমের উপায় কি? এই বন্ধনগুলিকে অতিক্রম করিবার কি কোন উপায় নাই? আমরা দেখিতেছি, এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার—এই বন্ধন

আমাদের সম্মুখে পশ্চাতে সর্বত্র থাকিলেও, এই দুঃখ কষ্টের মধ্যেই, এই জগতেই, যেখানে জীবন ও মৃত্যু একার্থক, এখানেও এক মহাবাহী সকল যুগে, সকল দেশে, সকল ব্যক্তির হৃদয়াভ্যন্তরে দিয়া যেন উদ্ভিত হইতেছে, “দৈবী হেমা গুণময়ী মম মায়া হরতায়া । মাংসেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ।” “আমার এই দৈবগুণময়ী মায়া অতি কষ্টে অতিক্রম করা যায় । বাহারা আমার শরণাপন্ন হন, তাঁহারা এই মায়া অতিক্রম করেন ।” “হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোকগণ, আইস, আমি তোমাদিগকে আশ্রয় দিব ।” এই বাণীই আমিদিগকে ক্রমাগত সম্মুখে অগ্রসর করিতেছে । মানুষ ইহা শুনিয়াছে, এবং অনন্ত যুগ ইহা শুনিতেছে । যখন মানুষের সবই যায় যায় হইয়াছে গোদ হয়, যখন আশা ভঙ্গ হইতে থাকে, যখন মানুষের নিজ বলের প্রতি বিশ্বাস নষ্ট হইয়া যায়, যখন সমুদয়ই যেন তাঁহার আঙ্গুল গলিয়া গলাইতে থাকে এবং জীবন একটা ভয়স্বপ্নে পরিণত হয় মাত্র, তখনই সে এই বাণী শুনিতে পায়—আর ইহাই ধর্ম ।

তাহা হইলেই হইল, একদিকে এই অভয়বাণী, এই আশাপ্রদ বাক্য যে, এই সমুদয়ই কিছুই নয়, সমুদয়ই মায়া, ইহা উপলব্ধি কর, কিন্তু মায়ার বাহিরে বাইবার পথ আছে । অপর দিকে, আমাদের সাংসারিক ব্যক্তিগণ বলেন, “ধর্ম দর্শন এ সব রাজে জিনিষ লইয়া মাথা বকাইও না । জগতে বাস কর ; এই জগৎ ঘোর অন্ততপূর্ণ বটে, কিন্তু যতদূর পার, ইহার সদ্ব্যবহার করিয়া লও ।” সাদা কথায় ইহার অর্থ এই, তত্ত্বভাবে দিবা রাত্র প্রত্যয়পূর্ণ জীবন থাপন কর—তোমার ক্ষতগুলি যতদূর পাব ঢাকিয়া রাখ । তালির উপর তালি দাও, শেষে আদত জিনিষটাই যেন নষ্ট হইয়া যায়, আর তুমি কেবল একটা তালির উপর তালি হইয়া যাও । ইহাকেই বলে—সাংসারিক জীবন । বাহারা এইরূপ জোড়াতাড়া তালি লইয়া সন্তুষ্ট, তাহারা কখন ধর্মলাভ করিতে পারিবে না । যখন জীবনেব বর্তমান অবস্থায় ভয়ানক অশান্তি উপস্থিত হয়, যখন নিজের জীবনের উপরও আর মমতা থাকে না, যখন এইরূপ তালি দেওয়ার উপর ভয়ানক ঘৃণা উপস্থিত হয়, যখন মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার উপর ভয়ানক বিতৃষ্ণা জন্মায়, তখনই ধর্মের আরম্ভ হয় । সেই কেবল প্রকৃত ধার্মিক হইবার যোগ্য হইতে পারে, যে বুদ্ধদেব বোধিবৃক্ষের নিম্নে দাঁড়াইয়া দৃঢ়ত্বের যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারে, যখন এই সাংসারিকতার ভাব তাঁহার নিকটও আবির্ভাব হইয়াছিল, তিনি বুদ্ধিতে পারিতেছেন, এ সমুদয়ই

ভুল, অথচ কোন পথ বাহির পারিতেছেন না। একবার তাঁহার প্রেলোভন আসিল,—সত্যের জন্ত অতুস্কান পরিত্যাগ কর, সংসারে ফিরিয়া গিয়া প্রাচীন প্রতারণাপূর্ণ জীবন যাপন কর, সকল জিনিসকে তাহার ভুল নাম দিয়া ডাক, নিজের নিকট এবং সকলের নিকট দিনরাত মিথ্যা বলিতে থাক,—এইরূপ প্রেলোভন তাঁহার নিকট একবার আসিয়াছিল, কিন্তু সেই মহাবীর অভুল বিক্রমে তৎক্ষণাৎ উহা জয় করিয়া ফেলিলেন, তিনি বলিলেন, “অজ্ঞানভাবে কেবল খাইয়া পরিয়া জীবনযাপনাপেক্ষা মৃত্যুও শ্রেয়ঃ, পরাজিত হইয়া জীবনযাপনাপেক্ষা যুদ্ধক্ষেত্রে মরা শ্রেয়ঃ।” ইহাই ধর্মের ভিত্তি। যখন মানুষ এই ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হয়, তখন সে সত্যলাভ করিবার পথে চলিয়াছে, সে জৈবর লাভ করিবার পথে চলিয়াছে, বৃদ্ধিতে হইবে। ধার্মিক হইবার জন্ত প্রথমেই ঐক্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আবশ্যক। আমি নিজের পথ নিজে করিয়া লইব। সত্য জানিব, অথবা এই চেষ্টায় জীবন সমর্পণ করিব। কারণ, এ দিকে ত কিছুই নাই, শূন্য, দিবারাত্রি অস্থির হইতেছে। অত্যাশা স্বন্দর আশাপূর্ণ তরুণ পুরুষ কলাকান বৃদ্ধ। আশা আনন্দ অথ এ সকল মুকুলসদৃশের জ্ঞান কল্যাকার শিশিরপাতেই নষ্ট হইবে। এত এই দিকের কথা; অপর দিকে, জন্মের প্রেলোভন রহিয়াছে—জীবনের সমুদয় অশুভ জয় করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এমন কি, জীবন এবং জগতের উপর পর্য্যন্ত জয়ী হইবার আশা রহিয়াছে। এই উপায়েই মানুষ নিজ পদের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারে। অতএব যাহারা এই জয়লাভের জন্ত, সত্যের জন্ত, ধর্মের জন্ত চেষ্টা করিতেছে, তাহারা এই সত্য পথে রহিয়াছে, আর বেদসকল ইহাই প্রচার করেন। “নিরাশ হইও না; পথ বড় কঠিন—যেন ক্ষুরধারের জ্বর দুর্গম; তাহা হইলেও নিরাশ হইও না; উঠ, জাগ এবং তোমার চরণ আদর্শে উপনীত হও।”

বিভিন্ন ধর্মসমূহ, তাহারা যে আকারেই মানুষের নিকট আসুক না কেন, সকলেরই এই এক মূল ভিত্তি। সকল ধর্মই জগৎ হইতে বাহিরে যাঁহিবার—মুক্তিদ—উপদেশ দিতেছে। এই ধর্মসকল সংসার ও ধর্মের সামঞ্জস্য সাধন করিতে আইসে না, বরং ধর্মকে নিজ আদর্শে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিতে আইসে, সংসারের সঙ্গে মিলিয়া নিশিয়া ঐ আদর্শকে ছোট করিয়া ফেলে না। প্রত্যেক ধর্মই ইহা প্রচার করিতেছেন, আর বেদান্তের কর্তব্য—বিভিন্ন ধর্ম ভাব সকলের সামঞ্জস্যসাধন, যেমন এই মাত্র আমরা দেখিলাম, এই মুক্তিতবে জগতের উচ্চতম ও নিম্নতম সকল ধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য রহিয়াছে। আমরা

একেবারে স্পৃষ্ট নহে, সেই সম এক অবিক্রিয় ব্রহ্মকেই দর্শন করাই
যাহাদের স্বভাব, তাহারা ই সমদর্শী পণ্ডিত ॥ ১৮ ॥

ইতৈব তৈর্জিজ্ঞাতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতঃ মনঃ ।

নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ভ্রুক্ণি তে স্থিতাঃ ॥ ১৯ ॥

অর্থঃ ।—যেবাং মনঃ সাম্যে স্থিতং তৈরিতৈব সর্গোজিতঃ হি (যস্মাং)
ব্রহ্ম সমং নির্দোষং তস্মাৎ তে ব্রহ্মণি স্থিতাঃ ॥ ১৯ ॥

মূলানুবাদ ।—যাহাদের মনঃ সাম্যে অবস্থিত, তাহারা এই লোকেই জন্ম
জয় করিতে সমর্থ হইয়াছে, যে কারণ নির্দোষ ব্রহ্মই সম, এই কারণ
তাহারা ব্রহ্মতেই অবস্থিত ॥ ১৯ ॥

ভাষ্য ।—নবতোষ্যাম্মাস্তে দোষবস্তুঃ “সমাসমাত্যাং বিষমসমে পূজাতঃ”
ইতি স্মৃতেঃ, নচে দোষবস্তুঃ কথং ইতৈব জীবন্তিরেব তৈঃ সমদর্শিতঃ
পণ্ডিতৈর্জিতোবশীকৃতঃ সর্গঃ জন্ম যেষাং সাম্যে সর্বভূতেষু ব্রহ্মণি সমতায়ে
স্থিতং নিশ্চলীভূতং মনোহন্তঃকরণং । নির্দোষং যদুপি দোষবৎসু স্বপাদিষু
মুট্টন্তদোষৈর্দোষবদিব বিত্যাব্যতে, তথাপি তদোষৈরস্পৃষ্টমিতি নির্দোষং
দোষবর্জিতং হি যস্মাং নাপি স্বগুণভেদভিন্নং নিগুণত্বাচ্চৈতন্য বক্ষ্যতি চ
ভগবান্ ইচ্ছাদীনাং ক্ষেত্রধর্মজং অনাদিহান্নিগুণত্বাচ্চ । নাপাস্ত্যাবিশেষা
আত্মনো ভেদকাঃ সৃষ্টি প্রতিশরীরং তেষং প্রমাণানুপপত্তেরতঃ সমং ব্রহ্ম
একঞ্চ তস্মাদ্ভ্রুক্ণোব তে স্থিতাত্মান দোষগন্ধমাত্রমপি তান্ স্পৃশতি
দেহাদিসংঘাতাস্বদর্শনাভিমানাতাবাং দেহাদিসংঘাতাস্বদর্শনাভিমানবদ্ বিষয়ত্ব
তং ব্রহ্ম সমাসমাত্যাং বিষমসমে পূজাত ইতি পূজাবিসয়ত্ব-বিশেষণং
দৃশ্যতে ॥ ব্রহ্মবিৎ ষড়্ভবিষ্কৃতুর্কেন্দনিত্যিতি পূজাদানাদৌ গুণবিশেষসম্বন্ধঃ কারণং
ব্রহ্ম তু সর্বগুণদোষবর্জিতমিতি ব্রহ্মণি তে স্থিতা ইতি যুক্তম্ কর্মবিষয়ক
সমাসমাত্যাং ইত্যাদি ইদং তু সর্বকর্মগর্যানিবিষয়ং প্রস্তুতং সর্বকর্ম্মাণি মনসা
ইত্যারভা আ অধ্যায়পরিসমাপ্তেঃ ॥ ১৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—একগে এই প্রকার শঙ্কা হইতেছে যে চণ্ডাল প্রভৃতির
অন্নভোজন করিতে নাই, সুতরাং তাহারা সদোষ । উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট
ব্যক্তিকে যথাক্রমে অপকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট পূজা করিলে (পাপ হয়), এই প্রকার
স্মৃতি (প্রমাণ দ্বারা ইহা জানা যায় যে ঐ সকল অপকৃষ্ট ব্যক্তিকে ও
উৎকৃষ্ট ব্যক্তিকে একরূপ জ্ঞান করা উচিত নহে) ইহার উপর, এই বলা

যাইতেছে যে, তাহারা (ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির নিকট) দোষযুক্ত নহে কেন ? (তাহাই শ্রোত্বের দ্বারা বলা হইতেছে) সেই সকল সমদর্শী পণ্ডিতগণ বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতেই সর্গ (অর্থাৎ) জন্মকে বশীকৃত করিয়া থাকেন, যাহাদের মন (অর্থাৎ) আশ্রয়করণ সাম্যো (অর্থাৎ) সকল প্রাণীতেই সমভাবে অবস্থিত ব্রহ্মতেই স্থিত (অর্থাৎ) নিশ্চল হইয়া থাকে; যে কাণে ব্রহ্ম নির্দোষ ও সম, যত্বাপি দোষযুক্ত স্বপাকাদিতে (স্থিত বলিয়া) মূঢ়গণ সেই স্বপাকাতির দোষে ব্রহ্মকেও দোষযুক্তের ত্রায় বোধ করিয়া থাকে, তাহা হইলেও প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্ম নির্দোষ, অর্থাৎ সকল প্রকার দোষ-বর্জিত, যে কারণ চৈতন্য নিগূর্ণ এবং নিগূর্ণত্বনিবন্ধনই উহা স্বগত গুণবিশেষবশতঃ বিভিন্ন হইতে পারে না। ভগবানও বলিলেন যে, ইচ্ছা-প্রভৃতি গুণ ক্ষেত্রের ধর্ম, আত্মার অনাদিত্য ও নিগূর্ণত্ব নিবন্ধন (পরমাত্মা বিকারী নহেন) ইত্যাদি। এবং প্রত্যেক নিত্যদ্রব্যে বিद्यমান বৈশেষিক মত সিদ্ধ বিশেষ্যনামক বস্তুর দ্বারাও আত্মার ভেদ সাধিত হইতে পারে না, কারণ প্রতিশরীরভেদে আত্মগত তাদৃশ বিশেষ বস্তুর স্বীকারে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এইজন্ত ব্রহ্ম সম এবং এক, এই জন্ত তাহারা ব্রহ্মতেই স্থিত, সূতরাং (পরমার্থ দৃষ্টিতে) তাহাদের অণুমাত্রও দোষের স্পর্শ হইতে পারে না। কারণ তাহাদের দেহাদিসংঘাতে আত্মদর্শনজনিত অভিমান নিবৃত্ত হইয়াছে। “সম এবং অসম ব্যক্তির বিষয় ও সমভাবে পূজা করিলে প্রত্যবায় হয়”, এই প্রকার ধর্মশাস্ত্রের বিষয় দেহাদিসংঘাতে আত্মাভিমান-শালী জীব। সেই প্রকার জীবের পক্ষেই ব্রহ্মবিদ, ষড়ঙ্গবিদ, চতুর্বেদবিদ ইত্যাদি পাত্রগত গুণ ভেদে পূজা ও দানাদিতে বিশেষ বিধানও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সর্বজগতের কারণ এক সর্বপ্রকার গুণ ও দোষ হইতে বিনির্মূল, এই কারণে তাহারা ব্রহ্মতেই অবস্থিত, এইরূপ যাহা বলা হইয়াছে, তাহা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। “সমাসমভায়াং” ইত্যাদি ধর্মশাস্ত্রের বিষয়-কর্মী জীব। সর্বকর্ম্মাণি সংশ্রুত ইত্যাদি শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া এই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত যাহা কিছু বলা হইয়াছে, তাহা সর্বকর্ম্মসংশ্রা-সীর বিষয়েই প্রকৃত আছে ॥ ১৯ ॥

ন প্রজুষোং পিয়ং প্রাপ্য নোদ্রিজেং প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্ ।

স্থিরবুদ্ধিরসংসৃচো ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ২৪ ॥

অর্থঃ ।—স্থিবুদ্ধিঃ অসম্মূঢ়ঃ ব্রহ্মণি স্থিঃ ব্রহ্মবিদ্ প্রিয়ং প্রাপ্য ন প্রহ-
যেৎ (তথা) অপ্রিয়ং প্রাপ্য ন উদ্বিজেৎ চ ॥ ২০ ॥

মূলানুবাদ ।—ব্রহ্মত্র ব্যক্তি, স্থিরবুদ্ধি সন্মোহশূন্য এবং সৰ্বদা ব্রহ্মদর্শন
তৎপর (হইবে), সে প্রিয়বস্তু লাভ করিলে হুট্ট হইবে না এবং অপ্রিয় প্রাপ্তিতে
উদ্বিগ্ন হইবে না ॥ ২০ ॥

ভাষ্য ।—যস্মাৎ নির্দোষং সমং ব্রহ্ম আত্মা তস্মাৎ ন প্রহযেৎ ন প্রহর্ষং
কুর্গ্যাৎ প্রিয়মিষ্টং প্রাপ্য লব্ধ্বা নোদ্বিজেৎ প্রাপ্যেব চাপ্রিয়ং অনিষ্টং
লব্ধ্বা দেহমাত্রাদ্যদর্শনঃ হি প্রিয়াপ্রিয়প্রাপ্তৌ হর্ষদ্বিষাদস্থানে । ন কেবলা-
দ্যদর্শিনস্তদ্য প্রিয়াপ্রিয়প্রাপ্ত্যসম্ভবাৎ । কিঞ্চ সৰ্বভূতেষু একঃ সগো নির্দোষ
আত্মা ইতি স্থিরা নির্বিচিকিৎসা বুদ্ধিযুক্ত সস্থিবুদ্ধিঃ অসম্মূঢ়ঃ সন্মোহ-
বর্জিতঃ তত্র যথোক্ত ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতোহকর্ষকং সৰ্বকর্ষসংগ্রাসীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—যে কারণে ব্রহ্ম নির্দোষ সম এবং আত্মা, সেই কারণে
প্রিয় (অর্থাৎ) ইষ্ট লাভ করিয়া প্রহুট্ট হইবে না এবং অপ্রিয় (অর্থাৎ)
অনিষ্ট লাভ করিয়া উদ্বিগ্ন হইবে না । যাহারা শরীরেতেই আত্মাভিমাত্রী,
তাহাদেরই প্রিয় বা অপ্রিয় বস্তু প্রাপ্তি হর্ষ বা দ্বিষাদের কারণ হয় । ব্রহ্মই
আত্মা, এই প্রকার জ্ঞান যাহার হইয়াছে, তাহার প্রিয় বা অপ্রিয় প্রাপ্তির
সম্ভাবনা নাই । আরও সকল প্রাণিতেই এক ও সম আত্মা কোন প্রকার
দোষসংস্কৃত নহে, এই প্রকার স্থিব (অর্থাৎ) সংশয়হীন বুদ্ধি যাহার
হইয়াছে, তাহাকেই স্থিরবুদ্ধি বলা যায় । স্থিববুদ্ধি ॥ সন্মোহবর্জিত
হইবে । (এবং) যথোক্ত ব্রহ্মস্বকপকে জানিয়া ব্রহ্মস্থিত (অর্থাৎ) “অকর্ষ-
কং” সৰ্বকর্ষসংগ্রাসী (হইবে), ইহাই অর্থ ॥ ২০ ॥

বাহ্যস্পর্শেষমজ্ঞানাদিন্দ্রিয়ানি যং সুখম্ ।

স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ২১ ॥

অর্থঃ ।—আত্মনি যং সুখং (বর্ত্ততে, তৎ) অক্ষয়ং সুখং বাহ্যস্পর্শেব
অসক্তাত্মা ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা স (যোগী) অশ্নুতে ॥ ২১ ॥

মূলানুবাদ ।—আত্মাতেই যে সুখ বিজ্ঞান রহিয়াছে সেই অক্ষয় সুখ
তাহারই হইয়া থাকে, যে ব্যক্তির অন্তঃকরণ বাহ্য-বিষয়সমূহে আসক্ত নহে
এবং ব্রহ্মবিষয়ক সনাধিতে যাহার অন্তঃকরণ সৰ্বদা যুক্ত থাকে ॥ ২১ ॥

ভাষ্য ।—কিঞ্চ ব্রহ্মণি স্থিতঃ বাহ্যস্পর্শেষু বাহ্যাসক্তে স্পর্শাচ্চ বাহ্যস্পর্শাঃ,
১লা চৈত্র, ১৩০৭ ।] উদ্বোধন । ১৫৫

দৃশ্যস্তে ইতি স্পর্শাঃ শব্দাদয়ো বিষয়াস্তেষু বাহ্যস্পর্শেষু আসক্ত আত্মা অন্তঃ-
করণং যন্ত সোহং অসক্তাত্মা বিষয়েষু প্রীতিবর্জিতঃ সন্ বিদতি গভতে
আত্মনি যৎ সুখং তদ্বিনশীত্যেতৎ । স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা ব্রহ্মণি যোগঃ সমাধিঃ
ব্রহ্মযোগস্তেন ব্রহ্মযোগেন যুক্তঃ সমাহিতস্তম্ভিন্বাপ্ত আত্মান্তঃকরণং
যন্ত স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্রুতে ব্যাপ্নোতি । তস্মাদ্বাহবিষয়-
প্রীতিঃ কণিকায় ইল্লিরাণি নিবর্তয়েদাম্ভক্ষয়সুখার্থীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—আরও ব্রহ্মেতে অবস্থিত (হইতে হইলে কি হইতে
হইবে তাহা বলিতেছেন), বাহ্যস্পর্শসমূহে (অর্থাৎ) বাহিরের শব্দাদি-
ভোগ্য বিষয়নিচয়ে অসক্তাত্মা, বাহার আত্মা (অর্থাৎ) অন্তঃকরণ অনা-
সক্ত সেই অসক্তাত্মা অর্থাৎ বিষয়ে প্রীতিবর্জিত হইলে, আত্মাতে যে সুখ
(আছে), তাহাই লাভ করিয়া থাকে । সেই ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা অক্ষয়
সুখ লাভ করিয়া থাকে, ব্রহ্ম যোগ (অর্থাৎ) সমাধি (এই অর্থে) ব্রহ্ম
যোগ (এই শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে), বাহার আত্মা (অর্থাৎ) অন্তঃকরণ সেই
ব্রহ্মযোগেতে যুক্ত (অর্থাৎ) ব্যাপ্ত আছে, সেই ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা ।
সেই কারণে আত্মাব অক্ষয় সুখ বে কামনা করে, সে কণিক বাহবিষয়-
প্রীতি হইতে ইল্লিয় সকলকে নিবৃত্ত করিবে ইহাই অর্থ ॥ ২১ ॥

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা হুঃখযোনয় এব তে ।

আত্মস্তঃস্তঃ কোন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২ ॥

অর্থঃ ।—হে কোন্তেয় ! যে ভোগাঃ সংস্পর্শজাঃ তে হুঃখযোনয় এব
(তথা) আত্মস্তঃস্তঃ, তেষু বুধঃ ন রমতে ॥ ২২ ॥

মুলানুবাদ ।—(এই কারণেও বাহ্যবিষয়প্রীতি হইতে মনকে নিবৃত্ত করিবে
কারণ) বিষয়েব সহিত ইল্লিয়ের সংস্পর্শজনিত যে সুখভোগ সকল হয়,
তাহা হুঃখের কারণ হইয়া থাকে । হে কোন্তেয়, ঐ সকল ভোগ আদিও
অন্তযুক্ত, পণ্ডিত ব্যক্তি ঐ সকল বাহ্যবিষয়ভোগে প্রীতীলাভ করে না ॥ ২২ ॥

ভাষ্য ।—ইতচ্চ নিবর্তয়েৎ যে হি যস্মাৎ সংস্পর্শজা বিষয়েস্তি সংস্পর্শেভ্যো
জাতা ভোগাভুক্তয়ঃ হুঃখযোনয় এব অবিকৃত্তত্বাৎ । দৃশ্যস্তে হি আধ্যা-
ত্মিকাদীনি হুঃখানি তন্নিমিত্তান্তেব । যথেষ্ট লোকে তথা পরলোকেহপি গম্যত
এব শব্দাৎ । ন সাসারে সুখস্তগন্ধরাসপ্রাপ্তীতি বুদ্ধা বিষয়মৃগতৃষ্ণি-
কায় ইল্লিরাণি নিবর্তয়েৎ । ■ কেবলং হুঃখযোনয় আত্মভবস্তচ্চ আদি-
১৫৬ উদ্বোধন । [৩য়—৫ম সংখ্যা ;

বিষয়েঞ্জিরসংযোগে। ভোগানামস্তচ্চ তদ্বিরোগ এবাত আত্মস্তবন্তোহনিত্যা-
মধ্যক্ষণভাবিত্বাদিত্যর্থঃ। কৌন্তেয়, ন তেষু রমতে যুগঃ ভোগেষু বিবেকী অবগত-
পরমার্থতত্ত্বোক্তান্তমূঢ়ানামেব বিষয়েষু রতিদৃষ্টতে যথা পশুপ্রভৃতীনাং ॥ ২২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—এই কারণেও নিবৃত্ত করিবে, কারণ বিষয় ও ইঞ্জিরের
পরস্পর সংযোগ হইতে উৎপন্ন যে সকল ভোগ (অর্থাৎ) ভুক্তি, তাহার
দুঃখকারণ, কারণ ঐ সকলই অজ্ঞানের কার্য্য। দেখিতেও পাওয়া যায়,
আধ্যাত্মিক প্রভৃতি দুঃখ তাহার নিমিত্ত হইয়া থাকে। যেমন এই লোকে,
সেই প্রকারে শাস্ত্রপ্রমাণ বলে পরলোকেও হইয়া থাকে, ইহা বুঝিতে পারা
যায়। এই সংসারে সুখের লেশমাত্রও নাই, ইহা বুঝিয়া বিষয়মুগ্ধত্ব
হইতে ইঞ্জির সকলকে নিবৃত্ত করিবে, তাহার কেবল যে দুঃখযোনি তাহাই
নহে, তাহাদের আদি ও অন্ত আছে; বিষয়ের সহিত ইঞ্জিরের সংযোগই
ভোগের আদি এবং তাহার বিরোগই ভোগের অন্ত; সুতরাং সকল ভোগই
অনিত্য, কারণ ভোগ আদিতো নাই, পরেও থাকে না, কেবল মধ্যস্থ
থাকে। হে কৌন্তেয়, যুগ (অর্থাৎ) বিবেকী সেই ভোগসমূহে প্রীতি লাভ
করে না, কারণ সে ভোগেব অসারতা বুঝিয়াছে এবং নিত্য ব্রহ্মেরও
স্বরূপ জানিতে পারিয়াছে। পশুপক্ষী প্রভৃতির গ্রাস যাহারা অত্যন্ত মুঢ়,
তাহাদেরই বিষয়সমূহে প্রীতি দেখিতে পাওয়া যায় ॥ ২২ ॥

শক্ৰোত্তীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাং ।

কামক্ৰোধোত্তবং বেগং স যুক্তঃ স স্তুখী নরঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়।—ইহৈব শরীরবিমোক্ষণাং প্রাক্ কামক্ৰোধোত্তবং বেগং সোঢ়ুং
যঃ শক্ৰোতি স নরঃ যুক্তঃ স্তুখী (চ) ॥ ২৩ ॥

মূলানুবাদ।—এই লোকেই মরণের পূর্বে কাম ও ক্রোধের বেগ ধারণ
করিতে যে সমর্থ হয়, সেই মনুষ্যই যুক্ত এবং সেই স্তুখী ॥ ২৩ ॥

ভাষ্য।—অয়ং চ শ্রেয়োমার্গপ্রতিপক্ষী কষ্টতমোদেষঃ সর্কানর্থপ্রাপ্তি-
হেতুর্হ'নিবার্য্যশ্চেতি তৎপরিহারে যত্নাধিক্যং কর্তব্যমিত্যাহভগবান্। শক্ৰোতি
উৎসহতে ইহৈব জীবনেন যঃ সোঢ়ুং প্রসহিতুং প্রাক্ পূর্ব্বং শরীরবিমোক্ষণা-
দামরণাং। মরণসীমাকরণং জীবতোহবশ্যস্তাবী হি কামক্ৰোধোত্তবোবেগো-
দনস্তনিমিত্তবান্ হি সইতি যাবদ্মরণং তাবদ্ব্যবশ্যন্তীয় ইত্যর্থঃ। কাম ইঞ্জির-
গোচরপ্রাপ্তে ইষ্টে বিষয়ে ক্রয়মাণে স্বর্গ্যমাণে বাস্তুভূতে সুখহেতো বা গর্দ-
লা ইত্যে, ১৩০৭।]

উদ্বোধন।

১৫৭

তৃষ্ণা সকামঃ । ক্রোধশ্চ আয়নঃ শ্রতিকূলেষু দুঃখহেতুসু দৃশ্যমাণেষু
 স্মরণ্যমাণেষু বা যোদেবঃ সক্রোধঃ তৌ কামক্রোধৌ উদ্ভবো যত কাম-
 ক্রোধোদ্ভবো বেগঃ রোমাঞ্চনয়টনেত্রদানিলাজ্জহংসকরণপ্রকোভরূপঃ
 কামোদ্ভবো বেগঃ । গাত্রপ্রকম্পপ্রস্বেদসদ্যোষ্টিপুটরক্তনেত্রাদিলিঙ্গঃ
 ক্রোধোদ্ভবো বেগঃ তং কামক্রোধোদ্ভবং বেগং য উৎসহতে প্রসহতে সোঢ়ং
 প্রশহিতুং স যুক্তো যোগী সুখী চেহ লোকে নরঃ ॥ ২৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—এইটাই মোক্ষমার্গের প্রতিপক্ষ এবং অত্যন্তক্লেশসাধ্য
 দোষ এবং ইহাই সকল অনর্থপ্রাপ্তির হেতু, এই জন্ত ইহার নিবারণ করা
 উচিত এবং ইহার পরিহার করিবার জন্ত বিশেষ যত্ন করিতে হইবে, ইহাই
 বলিতেছেন ভগবান ।

এই লোকেই (অর্থাৎ) ভীষ্ম অবস্থায় যে ব্যক্তি মরণের পূর্বকাল
 পর্য্যন্ত কামক্রোধোদ্ভববেগ সহন করিতে সমর্থ হয় ; মরণ পর্য্যন্ত সৌগা
 করিবার তাৎপর্য্য এই যে কাম ও ক্রোধ হইতে উৎপন্ন বেগ, জীবিতব্যক্তির
 পক্ষে অবশ্যস্বাভাবী, কারণ তাহার নিমিত্ত অনন্ত । সুতরাং আশ্রয়
 উৎসাহকে বিশ্বাস করিবে না । অভিলষিত সুখস্বরবস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত
 মিশ্রিত হইলে অথবা ক্ষত হইলে কিংবা পূর্বে অনুভূত ছিল বলিয়া কোন
 কারণ বশতঃ স্মরণ-পথে উপস্থিত হইলে, তাহার উপর যে গর্জি অর্থাৎ তৃষ্ণা
 হয়, তাহারই নাম কাম । সে সকল বস্তু দুঃখহেতু, সুতরাং আশ্রয় প্রাপ্তি-
 কুল, সেই সকল বস্তুর দর্শন শ্রবণ বা স্মরণ হইলে যে দেহ উৎপন্ন হয়,
 তাহাকেই ক্রোধ বলা যায় । সেই কাম ও ক্রোধ হইতে যে বেগ উৎপন্ন
 হয়, তাহাকে কামক্রোধোদ্ভব বেগ বলা যায় । শরীরে রোমাঞ্চ হইলে ও
 হৃষ্টবদন প্রভৃতি চিহ্নের দ্বারা অন্তঃকরণের যে চাঞ্চল্যকে বাহিরের লোকে
 অনুমান করিয়া থাকে, তাহারই নাম কামোদ্ভব বেগ । শরীরে কম্প, প্রস্বেদ,
 অধরোষ্ঠের দংশন, আরক্ত নেত্র প্রভৃতি চিহ্নের দ্বারা অন্তঃকরণের যে চাঞ্চল্য
 অনুমিত হয়, তাহাকে ক্রোধোদ্ভব বেগ কহা যায় । যে ব্যক্তি সেই কাম এবং
 ক্রোধ হইতে উৎপন্ন বেগকে সহন করিতে সমর্থ হয়, সেই যুক্ত (অর্থাৎ)
 যোগী এবং ইহলোকে সেই মনুষ্যই সুখী ॥ ২৩ ॥

যোস্তঃসুখোস্তরামস্তথাস্ত্যজ্যোতিরেব যঃ ।

স যোগী ব্রহ্মনির্দীপং ব্রহ্মভূতোহধিগচ্ছতি ॥ ২৪ ॥

অম্বয় ।—যঃ অন্তঃসুখঃ অন্তরারামঃ তথা যঃ অন্তর্জ্যোতিঃ এব স যোগী ব্রহ্মভূতঃ (নৃ) ব্রহ্মনির্বাণং অধিগচ্ছতি ॥ ২৪ ॥

মূলানুবাদ ।—যে অন্তঃসুখ, যাহার অন্তরাশ্মাতেই ক্রীড়া এবং অন্তরাশ্মাই যাহার নিকট জ্যোতিঃ স্বরূপে প্রকাশমান, সেই যোগী ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া (এই জীবনেই) ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করিয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

ভাষ্য ।—কথং ভূতচ্চ ব্রহ্মণিস্থিতো ব্রহ্ম প্রাপ্নোতীত্যাহ । অন্তঃসুখঃ অন্তরায়ানি সুখং যত্র সোহন্তঃসুখঃ তথা অন্তরায়ানি আরাম আক্রীড়া যত্র সোহন্তরায়ানন্তরণোন্তরায়ৈব জ্যোতিঃ প্রকাশোবন্ত সোহন্তর্জ্যোতিরৈব বদৈদৃশঃ স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মণি নিমৃতিং মোক্ষমিহ জীবন্মৈব ব্রহ্মভূতঃ সন্ন্যাসগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ২৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—কি প্রকার হইলে ব্রহ্মতে স্থিত হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইতে পারে ? (তাহাই বলা যাইতেছে) যে “অন্তঃসুখ” (অন্তঃশব্দের অর্থ আশ্মা) আশ্মাতেই যাহার সুখ, তাহাকেই অন্তঃসুখ বলা যায়, যে ব্যক্তি “অন্তরারাম” আশ্মাতেই যাহার আরাম (অর্থাৎ) আক্রীড়া সেই অন্তরারাম, এইরূপ যে অন্তর্জ্যোতিঃ, আশ্মাই যাহার জ্যোতিঃ (অর্থাৎ সন্দীপ) প্রকাশ, সেই অন্তর্জ্যোতিঃ । এই প্রকার লক্ষণসম্পন্ন যে যোগী সে ব্রহ্মনির্বাণ (অর্থাৎ) ব্রহ্মতেই ‘নিবৃতি’ মোক্ষ, এই লোকেই বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে ব্রহ্মের স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমম্বয়ঃ কীণকন্মবাঃ ।

ছিন্নদৈবধাতাশ্চানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ২৫ ॥

অম্বয় ।—কীণকন্মবাঃ ছিন্নদৈবধাতাশ্চানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ স্বয়ঃ ব্রহ্ম নির্বাণং লভন্তে ॥ ২৫ ॥

মূলানুবাদ ।—বিগতপাপ সংশয়শূন্য সমাহিতচেতঃ এবং সর্বভূতহিতনিবৃত্ত অধিগণ ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

ভাষ্য ।—কিঞ্চ ব্রহ্মনির্বাণং মোক্ষমম্বয়ঃ সমাগৃদর্শিনঃ সংশ্রাসিনঃ কীণকন্মবাঃ কীণপাপাদিদোষাচ্ছিন্নদৈবধাতাশ্চিন্নসংশয়া যতাশ্চানঃ সংযতেজিয়াঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ সর্বেষাং ভূতানাং হিতে অন্নকুলো রতাঃ অহিংসকা ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—আরও “পাষি” সমাগৃদর্শনশীল সংশ্রাসী, “কীণকন্মব” পাপাদিদোষতীন, “ছিন্নদৈব” সংশয়শূন্য, “যতাশ্চান” সংযতেজিয় ও সর্বভূতের ওলা চৈত্র, ১৩০৭ ।] উদোধন । ১৮৯

মঙ্গল পরায়ণ (অর্থাৎ) অহিংসক ব্যক্তিগণ “ব্রহ্মনির্কাণ” মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্ ।

অভিতো ব্রহ্মনির্কাণং বর্ততে বিদিতাশ্বিনাম্ ॥ ২৬ ॥

অর্থঃ ।—বিদিতাশ্বিনাং কামক্রোধবিযুক্তানাং যতচেতসাং যতীনাং অভিতঃ ব্রহ্মনির্কাণং বর্ততে ॥ ২৬ ॥

মূলানুবাদ ।—যাহারা সম্যগ্দর্শী, যাহাদের কাম ও ক্রোধ নাই এবং যাহারা সংযতচেতা সেই যক্তিগণের উভয়ত (অর্থাৎ দেহপাতের পূর্বে ও পরে) মোক্ষ হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

ভাষ্য ।—কিঞ্চকামবিযুক্তানাং কামশ্চ ক্রোধশ্চ কামক্রোধৌ তাভ্যাং বিযুক্তানাং যতীনাং সংশ্রাসিনাং যতচেতসাং সংযতাস্তঃকরণানাং অভিত উভয়তো জীবতাং মৃতানাঞ্চ ব্রহ্মনির্কাণং মোক্ষোবর্ততে বিদিতাশ্বিনাম্ বিদিতোজ্ঞাত আত্মা যেষাং তে বিদিতাশ্বিনস্তেষাম্ বিদিতাশ্বিনাং সম্যগ্দর্শিনামিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—আরও, যাহারা কাম ও ক্রোধ এই উভয় বর্জিত, যাহারা যতি (অর্থাৎ) সংশ্রাসী, যাহারা যতচেতা (অর্থাৎ) সংযতাস্তঃকরণ এবং যাহারা “আত্মতত্ত্ব” সম্যগ্দর্শনশীল, তাহাদের জীবিতাবস্থায় এবং মৃত্যুর পরে উভয়তঃ ব্রহ্মনির্কাণ (অর্থাৎ) মোক্ষ আছেই ॥ ২৬ ॥

স্পর্শান্ কৃতা বহবাহাঃ স্কন্ধৈশ্চ বাস্তরে ভ্রবাঃ ।

প্রাণাপানৌ সমৌ কৃতা নাসাত্যস্তবচারিণৌ ॥ ২৭ ॥

যতেজিরমনোবুদ্ধির্মুনিষে মৌক্ষপরায়ণঃ ।

বিগতেচ্ছান্তয়ক্রোধে যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮ ॥

অর্থঃ ।—যঃ মুনিঃ মোক্ষপরায়ণঃ (সন্) বাহান্ স্পর্শান্ বহিঃ কৃতা (তথা) ভ্রবাঃ বাস্তরে চক্ষুঃ (কৃতা) চ নাসাত্যস্তবচারিণৌ প্রাণেপানৌ চ সমৌ কৃতা সদা যতেজিরমনোবুদ্ধিঃ বিগতেচ্ছান্তয়ক্রোধে (শ্রাৎ) স মুক্ত এব ॥ ২৭—২৮ ॥

মূলানুবাদ । যে মুনি মোক্ষপরায়ণ হইয়া বাহবিশয়নিচয়কে মনের মধ্যে প্রবেশ করিতে দিবে না এবং ক্রবয়ের মধ্যে চক্ষুঃ সন্নিবিষ্ট করিয়া নাসাত্যস্তর চারি প্রাণ ও অপান বায়ুকে, সমভাবাপন্ন করিবে এবং ইন্দ্রিয় নন ও বুদ্ধিকে

শুকদেব-চরিত । ১৫৫২

(ডাক্তার শশীভূষণ ঘোষ, এম, বি,।) ২-১৭৭

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি জন্মের উপদেশ আছে। তিনি বলিতেন, “তৃষ্ণা পাইরা থাকে, পুষ্কিনীর নীচের পাঁক ঘোলাইও না, উপর উপর জল পান কর, তৃষ্ণা নিবারণ হইবে। শাস্ত্রের নর্থ গ্রহণ কর, তোমার ধর্ম-পিপাসা নিবৃত্তি হইবে, কিন্তু শাস্ত্রের বাক্যার্থ লইয়া বিচার করিতে গেলে বুদ্ধি কলুষিত হইয়া যাইবে, তৃষ্ণা নিটিবে না।” তিনি আরও বলিতেন, ‘ধোমা পরিত্যাগ করিয়া শুধু চান পুটিনে গছ হইয়া না, ধান পোতা আবশ্যক। বিচার করিলে অনেক জিনিষ আনন্দেব নিকট অসার বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু সেই অসার কজন্য পরিত্যাগ করিয়া, সত্যমাত্র বাছিয়া লইতে চেষ্টা কর, সত্যের জীবনীশক্তি বিন্দুপ হইবে’। যনবাজোর সহিত অরণ্য মধ্যে সাবিত্রীর কথোপকথন কবিকল্পনা বোধ হইতে পারে, কিন্তু সাবিত্রীজীবনের সেই ঘটনা অবিস্মৃত ও অসত্য বিবেচনা কর, সত্যস্বর্গের অপ্রতিহতশক্তি, সত্যপ্রতিমার অপূর্ণ জলন্ত চিত্র আর দেখিতে পাইবে না। — বিনীত বিদীর্ণ করিয়া ধরিত্রীর আবির্ভাব। গীতাদেবীর পাতালে প্রবেশ ইতি। — পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে পতিভক্তির আদর্শ আবির্ভাব। চিরারাম পবিত্র দেবীমূর্তি অর্জুনী হইয়া পড়িবে। 6. JUN. 1907

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেই উপদেশ শিরোধার্য করিয়া তাঁহার পুষ্কিনীতে প্রণামপূর্বক আমরা অদ্য সংসারবৈরাগ্যের প্রথম স্তরের তেজোময়রূপ পরমযোগী ভগবান্ শুকদেবের পবিত্র চরিত্র আলোচনা করিব।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার অমৃতময়ী সরলবাক্যসংযোজনায় শুকদেবকে ‘নিদাগি খই,’ বা ‘প্রাতে তোলা মাথমে’র সহিত তুলনা করিতেন। যখন খই কুটিতে থাকে, তখন যে গুলি ছিটকাইয়া বাহিরে পড়ে, তাহাদের গায়ে দাগ লাগে না। ষাঁহার বালাকাল হইতে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া সাধনভজন করেন, তাঁহাদের মন স্বভাবতঃই নির্মল থাকে, সংসারের ময়লা স্পর্শ করিতে পারে না। বৈরাগ্যে মাথম তুলিলে ভাল মাথম উঠে না, অধিক বয়সের সাধকের জন্মধুর পবিত্র জীবন হয় না। আমরা শুকদেবের জীবন অনেক পুরাণাদিতে দেখিতে পাই, কিন্তু ‘নিদাগি খই’ বা ‘প্রাতে তোলা মাথমে’র তুল্য সেই জীবন মহাভারতে যেক্রপ প্রতিফলিত হইয়াছে, সেক্রপ আর কোথাও পাই না। মহা-

অবস্থায় পূর্বাপর সম্বন্ধ ও সরল ; অত্যাশ্রয় পূর্ণাঙ্গ মহাভারতের অনেক মৌলিক গুণীত হইয়া ও দুই একটা অসম্বন্ধ ঘটনা গ্রথিত করিয়া শুষ্ক ও মণ্ডিত হইয়াছে । এ কাব্য নামের মহাভারতের মৌলিক বর্ণনা অতুসরণ করিয়া পবিত্র গুরু-চরিত্র অংশীনে প্রবৃত্ত হইবে ।

লোক-সংসার-মন্দির দেববাস দিব্য-সদর্পে মনোবশন বশিত সুমেরু পর্বতে পুত্রাভেদ্য কঠোর ওষ্ঠ করিয়াছিলেন । যাহাতে তিনি পৃথ্বী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ সৃষ্ণ পৈর্য্যশালী পুত্র লাভ করিতে পারেন, এই অভি-
লাষে মনোহারা হইয়া একগত বংসর দেবসিদ্ধগন্ধর্কীপ্সরালোকপানপণ-
সেবিত দেবদেব উমাপতি মহাদেবের আরাধনা করেন । সেই আগরণ-
চেষ্টে যোগযুক্ত তেজস্বানু দ্বৈপায়নের তেজোদ্বারা জটায়ুগণ বহ্নিশিখাসদৃশ
প্রজ্জ্বলিত দৃষ্ট হইয়াছিল । তাঁহার ভক্তি ও তপস্যার প্রসন্ন হইয়া কুন্তময়ী
মনোহারিণী মালায় ভূমিতাপ্ত মণ্ডেখর আবির্ভূত হইয়া কহিলেন—“হে দ্বৈপায়ন,
অগ্নি, বায়ু, আকাশ যেনন স্বতঃস্ফূট, তেমন সুমহানু পুত্র মেইকপ শুদ্ধ হইবে ।
তোমার পুত্র ব্রহ্মভাবভাবী, ব্রহ্মনিশ্চয়বুদ্ধি, ব্রহ্মপরিচিহ্ন হইবে, ব্রহ্মকে
আশ্রয় করিয়া থাকিবে এবং নিজ তেজোদ্বারা ত্রিগোক আদরণ করিবে ।”

সত্যবতীনন্দন দেবদেবের সেই বর পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন ।
একদিন হোমার্থ অগ্ন্যুৎপাদনের অভিলাষী হইয়া অরণীযুগল গ্রহণ পূর্বক
মহান বরিতেছেন এমন সময়ে দুর্ভাগিনী অঙ্গীকা অঙ্গুরী তাঁহার নয়ন পথে
পতিত হইল । মহানু বৈদব্যাস বৈর্য্যসহকারে স্বীয় মনকে নিয়মিত করিতে
প্রয়াস পাইতে লাগিলেন । অগ্ন্যুৎপাদনাথ মনোনিবেশপূর্বক হৃদয়স্থবেগ
সংবরণ বরিতে উত্তত হইলে, অঙ্গীমধ্যে তাঁহার তেজের অংশ প্রদীপ্ত হইল ।
অঙ্গুরী দুর্ভাগী বৈদব্যাসকে হৃদবহু অবলোকন করিয়া ভীতচিত্তে গুরুপক্ষিণী
রূপ ধারণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন । ব্রহ্মবিদ্যাস অবিদ্যাকৃত চিত্তে
পূর্ববৎ অরণীমগ্ন করিতে লাগিলেন । যজ্ঞকাষ্ঠসমুৎপন্নপ্রজ্জ্বলিত হতাশ-
নের স্মার সেই অরণীমগ্ন হইতে গুরুদেব স্বকীয় তেজে আবির্ভূত হইলেন ।
তাঁহার জন্মসময়ে অস্তঃরোক্ষ হইতে দণ্ড ও কৃষ্ণাজিন পতিত হইয়াছিল, স্বয়ং
গম্যদেবী অবিভূর্তা হইয়া জাত বালকের শরীরভ্যন্তর দোত ও পরিষ্কৃত
করিয়াছিলেন । পুত্রের জন্ম সময়ে ব্যাস গুরুরূপ অঙ্গুরী দর্শন করিয়াছিলেন
ছিলিয়া পুত্রের নাম শুক রাখিলেন । মহাদেব সেই মুনিপুত্রের উপনয়নসংস্কার
নির্মাণ করেন, এবং দেবরাজ ইন্দ্র কমণ্ডলু ও দেবাসন প্রদান করেন । অযোনি-

সম্ভব নির্মলদেহ দৈবশক্তিপরিচালিত শুকদেব সেই স্থানেই ত্রতচারী ও সমা-
হিত হইয়া বসতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবগুরু বৃহস্পতিকে উপাধ্যায়
রূপে বরণ করিয়া নিখিল বেদ ও ইতিহাসাদি অধ্যয়নপূৰ্ব্বক গুরুদক্ষিণাপ্রদানান্তর
গুরুকুল হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। ব্রহ্মদর্শী শুকদেবের মতি কোনরূপেই
গার্হস্থ্যমূলক আশ্রয়ভ্রমে অন্তরুক্ত হয় নাই। সে ক্ষণে তাঁহার এবমাত্র
আর্য্যনীয় বস্তু ছিল। এখন ব্রহ্মচর্য্য আশ্রয় করিয়া মোক্ষপথের পন্থিক হই-
বেন, কি গার্হস্থ্য জীবন অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণোচিত ন্যায়নৈতিকাদি কর্ম্মে
ব্যাপৃত থাকিবেন, এই চিন্তা তাঁহার মনোমদো উদ্ভিত হইল। শান্তি-অভিলাষী
শুকদেব পিতার নিকট মোক্ষদ্বার্য্য অধায়ে প্রবৃত্ত হইয়া যোগ ও কলিত্রোক্ত
শাস্ত্রশিক্ষায় অমুগত হইলেন। ব্রহ্মর্ষি বেদব্যাস তাঁহাকে ব্রহ্মশ্রীমুক্ত জ্ঞান
করিয়া কহিলেন—“তুমি মিথিলাদিপতি আমায় বহুমান রাজসি ভনকের নিকট
গমন কর, তিনিই তোমাকে নিখিল মোক্ষদ্বার্য্য কহিবেন।” [এই মিথিলাধ-
পতি রাজর্ষি জনক কে? ভারতের পৌরাণিক ইতিহাসে আমরা জনক নামে
অনেক রাজর্ষি দেখিতে পাই। ত্রৈত্যযুগে যে জনক যুভুজ্ঞ গণ করিয়া সীতাদেবী
শ্রীরামচন্দ্রকে প্রদান করেন এবং দ্বাপরযুগে শেষভাগে গুরুরূপে ভগবান্ শুকদেব-
কে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করেন, এ উভয় বর্ণনাই এক ব্যক্তি নহেন। এই
মিথিলা রাজবংশে অনেকানেক নরপতি রাজর্ষি জনক নামে অভিহিত হইয়া-
ছেন, ইহা পুথান পাঠে অবগত হওয়া যায়। ইঁহারা সবলেই জীবন্মুক্ত
ও বিদেহ জনক বলিয়া কথিত হইয়াছেন। জ্ঞান ও বিজ্ঞানমঙ্গল
ও জীবন্মুক্তের দৃষ্টান্তরূপে “জনকদ্বার্য্য” ভারতীয় মননদর্শন উল্লিখিত
হইয়াছেন। এখন বেদব্যাস মিথিলাশাস্ত্রজ হইয়া এই ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশের
নিমিত্ত একজন ক্ষত্রিয়ের নিকট নিজপুত্রকে প্রেরণ করিলেন কেন? ব্রাহ্মণ-
গণের শাস্ত্রবেত্তা, আচার্য্য ও উপদেষ্টা। ব্রাহ্মণ উপদেষ্টা পরিভাগ করিয়া
শুকদেব কঠিন ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশের নিমিত্ত ক্ষত্রিয়ের আশ্রয় কেন গ্রহণ করি-
লেন? এ স্থলে স্থানী বিবেকানন্দ শাস্ত্রাদি পর্যালোচনা করিয়া এই মত প্রকাশ
করিয়াছেন যে বৈদিক সময় হইতেই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মার্গাবলম্বী দুই বিরোধী
দল কলহে প্রবৃত্ত দেখিতে পাওয়া যায়। যোগব্রহ্মাদিবৈদিককর্ম্মপর ব্রাহ্মণগণ
কতিপয় ক্ষত্রিয় রাজভ্রগণ সাহায্যে আপনাদিগের প্রভুত্ব ও স্বার্থরক্ষণে দৃঢ়বৃত্ত।
অপরদিকে জ্ঞানমার্গাবলম্বী ও উপনিষদ-নিষ্ঠ অধিকাংশ রাজভ্রবর্গ কর্ম্মক্ষেত্রে
অসারতা। জ্ঞানের মোক্ষদ্বার্য্য প্রাপ্তিপাদনার্থ বহুপরিকর। উপনিষৎ পাঠে

অবগত হওয়া যাব যে, ঋষিতনয় ক্ষত্রিয়ের নিকট ব্রহ্মজ্ঞানান্তিলাষী হইয়া দণ্ডায়মান এবং পুণ্যে একবাক্যে বর্ণিত হইতেছে, ব্রহ্মজ্ঞানের নিমিত্ত সপ্তর্ষি বেনবাসপুত্র ভগবান্ শুকদেব রাজর্ষি জনবের দ্বারস্থ ।]

“এই কয়েকটী কথা শ্রবণ বানিও — ১। গমনকালে নিজ দেহপ্রভ^ব প্রদর্শন করিও না এবং স্নানযোগ্য হইও না, কিন্তু মরলভাবে গমন করিও, কার^ণ শক্তি-প্রদর্শনান্তিলাষ ও স্নানযোগ্য মোক্ষপথের কণ্টক । ২। বিশেষ অনুঃশ্বাস হইও না, তাহ হইলে দ্বিগুণে আসক্ত হইবে” । [সকল যোগশাস্ত্রে অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন মোক্ষপথের কণ্টক বলিয়া লিখিত আছে । যিনি এই শক্তি-লাভেই মস্তষ্ট থাকেন, তিনি মোক্ষপথ হইতে ভ্রষ্ট হন । পরমহংসদেব শক্তি-প্রদর্শন ব্যতীত দুপা করিতেন ; অনন্ত শক্তি তাহাব ভিতর, কিন্তু তিনি ইহা চির-পোষণ করিয়া গিয়াছেন । ভ্রাম্যমাণ বহি নিকটস্থ কোন কোন ভাগ্যবানকে চকিতেরত্তর নিজ স্বরূপ জানাইয়াছেন, কিন্তু পরক্ষণেই আবার মোহাচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছেন । তিনি বলিতেন, হাতি মরিগা আর হাতি বাঁচিল, তোর কি ? সাধারণ মনুষ্য এই অলৌকিক শক্তি দর্শনেই অকূষ্ট হয় । একজন কোন অলৌকিক শক্তি নিজ আদৃত করিয়া লোক মুগ্ধ করিতে পারেন, কিন্তু আধ্যাত্মিক বিষয়ে তিনি শক্তিহীন মানব মনুষ্য অগেফাও রূপাধীন ।] ৩। “রাজর্ষির নিকট নিজ মনুষ্যের নিমিত্ত অহংকার করিও না । তাহার বশীভূত হইবে ; তাহা হইলে সেই মোক্ষশাস্ত্রনিষারদ তোমাব সকল সংশয় অপনোদন করিবেন ।”

শুকদেব অন্তরীক পথে গমন করিতে সমর্থ হইলেও পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন । সনাতনশালী নগর, রমণীয় উদ্যান, বিচিত্ররত্নরাজি ভুচ্ছ করিয়া দেখিয়াও দেখিলেন না । ইন্দ্রিয়ভিষী শুকদেব মিথিলা রাজ্যের সন্নিধি ও সৌন্দর্য্য কন্যাদেবের সহিত দর্শন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন । ক্রমে সেই প্রশস্তিত্ত আদ্যরান মোক্ষচিন্তাপরায়ণ ব্যাসপুত্র মিথিলার রাজধানীতে উপনীত হইলেন । রাজধানীর দ্বারদেশে দ্বারপাল কর্তৃক বিদিত হইয়া রাজপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক ক্রমে রাজনিকেতনে উপস্থিত হইলেন । রাজপ্রাসাদ প্রবেশোন্মুখ শুকদেবে দ্বারপালগণ উগ্রবাক্যে তথায় প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল । আতপমস্তম্ভ, পঞ্চশ্রীহ, ক্ষুণ্ণ ও পিপাসাক্রিষ্ট ব্যাসপুত্র নিজোদ্য হইয়া আতপতাগে দণ্ডায়মান রহিলেন । কিছুক্ষণ অতীত হইলে রূপাবিষ্ট জনৈক দ্বারপাল তাঁহাকে রাসভবনের প্রথম প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করাইয়া দিল । দ্বারতপে সমুদ্যান শুকদেব মোক্ষচিন্তাপরায়ণ হইয়া মস্তষ্টচিত্তে তথায় উপবিষ্ট

রহিলেন। মুহূর্ত্ত পরে রাজমন্ত্রী কৃতাজলিপুটে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে রাজভব-
নের দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে লইয়া গেলেন। তথায় রমণীয়জলাশয়সম্বিত, পুষ্টিত-
পাদপশোভিত সুবিস্তীর্ণ প্রমোদনে প্রবেশ করাইয়া আসনপ্রদানার্থ রমণী-
গণের প্রতি আদেশপূর্ব্বক তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সেই রমণীগণ
সকলেই সুচারুবেশা, প্রিয়দর্শনা, স্তম্ভরক্কাশ্বরধারিণী, কাকিনভূষণা, আলাপ-
কুশলা, নৃত্যগীতনিপুণা, স্মিতপূর্ব্বভাগিনী, অপরাসদৃশকপশালিনী ও ভাবজ্ঞা।
পকাশ্যসংখ্যক তরুণী বারনরী শুকদেবকে পাত্ৰার্থ প্রদানপূর্ব্বক পূজা করিয়া
সুস্বাদু অন্নদান দ্বারা তাঁহার তৃপ্তি সাধন করিয়া পরে সেই রমণীয় প্রমোদন
হাস্যক্রীড়া ও গান করতঃ দর্শন করাইতে লাগিল। শুদ্ধবুদ্ধি সন্দেহহীন যতেন্দ্রিয়
শুকদেব তাহাতে চ্যুত বা কুপিত হইলেন না। রাত্রি উপস্থিত হইলে সেই বার-
যোষিতাগণ তাঁহাকে দেবযোগ্য রত্নভূষিত দিব্যশয্যা ও আসন প্রদান করিল।
তিনি মোক্ষবিষয় চিন্তা করিতে করিতে ধ্যানমগ্ন হইলেন। দৈর্ঘ্য হইতে
অবিচ্যুত শুকদেব এইরূপে দিনযামিনী যাপন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর নৃপতি জনক, পুরোহিত মন্ত্রী ও অন্তঃপুরবাসীজনগণপুরঃসর
শুকপুত্রের নিকট উদ্যত হইয়া তাঁহাকে যথাবিহিত পূজা করিলেন।
শুকদেব কহিলেন, “মহারাজ আপনার মঙ্গল হউক; পিতা আমাকে কহিয়াছেন,
‘জনক নামে বিখ্যাত বিদেহরাজ আমার যজমান; তিনি যোদ্ধাধর্ম্মবিষয়ে অতিজ্ঞ।
যদি তোমার অন্তঃকরণে যোদ্ধাধর্ম্মবিষয়ে কোন সংশয় থাকে, তাঁহার নিকট
গমন কর। তিনি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বিষয়ে তোমার সকল সংশয় ছেদন
করিবেন।’ আমি আপনার নিকট এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি—
ইহলোকে ব্রাহ্মণের কর্তব্য কি এবং কি প্রকারে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়।”
জনক বলিলেন “ব্রাহ্মণ উপনয়নের পর বেদপরায়ণ হইবেন, তপস্বী শুক-
শ্রবণ ও ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা অশ্রয়শূন্য হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক গার্হস্থ্যধর্ম্ম
অবলম্বনপূর্ব্বক স্বদারনিরত হইয়া বাস করিবেন। পরে পুত্র পৌত্র উৎ-
পাদনান্তর পূর্ব্বহৃত অগ্নির অর্চনা করিয়া অতিথিপ্রিয় হইয়া বনমধ্যে আশ্রমে
বসতি করিবেন। পরে অরণ্যমধ্যে আত্মাকে অগ্নিস্বরূপ করিয়া সুখচঃখ-
বিরহিত এবং বিরক্তচিত্ত হইয়া সন্ন্যাসাশ্রমে অবস্থিতি করিবেন।” শুকদেব
কহিলেন, “সুখহঃখবিহীন অন্তঃকরণে যদি জ্ঞান ও বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তবে কি
গার্হস্থ্যপ্রকৃতি আশ্রমত্রয়ে অবশ্যই বাস করিতে হইবে?” জনক বলিলেন
“জ্ঞান ও বিজ্ঞান ব্যতিরেকে মোক্ষলাভ হয় না; শুক উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে জ্ঞান-

লাভ হয় না। সংসারে বহুবার জন্মপরিগ্রহপূর্বক শোধিত বুদ্ধি দ্বারা চিন্তণ্ডি লাভ করিলে, প্রথম আশ্রমেই যৌক্তিকতা হইতে পারে। ব্রহ্মচর্য-আশ্রমই যাহার চিন্তণ্ডি হয়, তাহার অপর আশ্রমদ্বয়ে প্রয়োজন কি? রাজস ও তামস দেব সকলকে নিয়তই পরিত্যাগ করিবে। মাত্তিকপথ আশ্রাপূর্বক আপনি আপনাকে অবলোকন করিবে। সৰ্ব্বভূতে আত্মাকে এবং আত্মাতে সৰ্ব্বভূত দর্শন বরতঃ জল মাধা হংসাদিগ্ৰ জায় নিলিপ্ত থাকিবে। অল্প বাঞ্ছা বাঁহা হইতে ভীত নহেন এবং যিনি অল্প হইতে ভীত নহেন, বাঁহার ইচ্ছা দেব নাই, তিনিই ব্রহ্মভাব লাভ করেন। যিনি কৰ্ম্ম বাক্য ও মনের দ্বারা গীবেয় প্রীতি পাপ অভি-প্রায় না করেন, তিনিই ব্রহ্মভাব লাভ করেন। হে মহাত্মন, তোমাতে এই সমুদয় ভাৱ অবলোকন করিতেছি। তুমি বিবাহভিগাষ পরিত্যাগ করিয়াছ। আমার অপেক্ষা তোমার সমধিক বিজ্ঞান, উৎকৃষ্ট গতি ও পরম ঐশ্বর্য্য হইয়াছে। তোমার বিজ্ঞান উৎকৃষ্ট হইলেও বালাভান, সংশয় ও অবি-মোক্ষ জন্ত ভয়বশতঃ সে গতি অবগত হইতে সমর্থ হয় নাই। নান্দুশ ব্যক্তি কর্তৃক সংশয়চ্ছেদ হইলে, তুমি বিস্তৃত ব্যাংহাব দ্বারা জ্ঞানগ্রহি মোচনপূর্বক পরমগতি প্রাপ্ত হইবে। ব্রাহ্মণ, তোমার জ্ঞান কল্যাণে, বুদ্ধি স্থির হইয়াছে, নিয়ম বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছ। কিন্তু ব্যবহার ব্যতিরেকে সেই পবনপদ প্রাপ্ত হইবে না। সুখ ভূঞ্জে তোমার বিশেষ নাই, বুদ্ধি বিষয়গোলুপ নহে, নৃত্যগীতাদি দর্শন শ্রবণে ঐশ্বর্য্য ও অনুরাগ নাই। বহুগুণের প্রীতি অনুভব নাই। ভয়জনক বিষয়ে ভয় নাই। পায়ণ কাঞ্চনে সন্দর্শী হইয়াছ। ইহলোকে ব্রাহ্মণের যাহা প্রয়োজন এবং মোক্ষস্বরূপ, তাহাতেই তুমি বিভ্রম্নান রহিয়াছ।” বিত্তবুদ্ধি শুকদেব জনকের এই কথা শ্রবণপূর্বক আত্মনিশ্চয় করিয়া শাস্ত্র ও মৌনাবলম্বী হইয়া হিমশৈলের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। পিতার রমণীয় আশ্রমে উপনীত হইয়া প্রীতিতে জনকরাজের সহিত কথোপকথন পিতৃসমীপে নিবেদন করিলেন। সেই স্থানে অজ্ঞাত শিষ্যবেষ্টিত পিতা বৈপায়নের নিকট বেদ, ইতিহাস ও পুৰাণাদি শাস্ত্রাত্মকলনে ব্যাপৃত হইয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। অনন্তর বেদব্যাস অপরাপর শিষ্য সকলকে বেদপ্রচারার্থ আজ্ঞা দিয়া আকাশগঙ্গায় অবগাহনার্থ প্রস্থান করিলেন।

ইত্যবসরে দেবর্ষি নারদ সিদ্ধচারণসেবিত হিমাগমে উপনীত হইয়া সেই পবিত্র ব্যাসাশ্রমে গমনপূর্বক শুকদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। শুকদেব দেবর্ষি নারদকে যথোপযুক্ত পূজা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “ইহলোকে হিতকর কি” ?

নারদ বলিলেন, "বিদ্যার সমান চক্ষু নাই । সত্যের তুল্য ত তপত্তা নাট ।
রাগের সন্ধান হুঃখ নাই, ভ্যাগের তুল্য সুখ নাই । পাপকর্ম্য হইতে সত্য
নিবৃত্তিই পুণ্যশীলতা । যে মহুযাজ্ঞ লাভ করিয়া বিধ্বাংস হইয়াছে, সে মুক্ত ; যে
মুক্ত, সে ইহলোকে পরলোকে হুঃখভাগী হয় । বিষয়সঙ্গ হুঃখমোচনে সমর্থ
নহে, তাহা হুঃখেই লমণ । যিনি কল্যাণ কামনা করেন, তিনি সর্বপ্রযত্ন
কাম ও ক্রোধের নিগ্রহ করিবেন । অনুশংসভাবই পরমবর্ষ, ক্ষমা পরমবল, আত্ম-
জ্ঞান পরমজ্ঞান । সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই । বাহ্য ভূতগণের
অভ্যন্ত হিতকর, তাহাই সত্য । যিনি নিজ বশীভূত হস্তির সকল দ্বারা হস্তির
বিষয় ভোগ করেন, যিনি সর্পি-বিবয়ে অসঙ্গ, শাস্ত্র-চিন্তা, নিকিরকার, ও সমাধিত
হন, দেহাদির সহিত তদাত্ম্যরহিত ভাবে বর্তমান থাকেন, তিনি অচিরকাল
মধ্যে পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হন । এই সংসারে মৃত্যু, জরা ও ধ্বংস দ্বারা জীব সত্য
পীড়িত হইতেছে, অর্থাৎ বিষয়ে হিতজ্ঞ, অনিশ্চিত বস্তুতে ধ্রুবজ্ঞান, অনর্থ
বিসয়ে স্বাভিজ হইয়াছে । কোষবীর কীটের ভায় মানব আত্মজ তত্ত্ব দ্বারা
বেষ্টিত আপনাকে জানিতে পারে না । এই সংসার-পরিগ্রহে কি প্রয়োজন ?
সরোবরের পঙ্কাগর্বে নিমগ্ন বস্ত্র গজ যেমন বিশৌণ হয়, তদ্বং স্ত্রী পুত্র কুটুম্বগণে
আনন্দ জীব অধসর হইয়া থাকে । বিশাল জল দ্বারা আকৃষ্ট মৎস্য সকল
স্থলে উদ্ধৃত হইলে যেকোন হুঃখিত হয়, সেই জালে সমাকৃষ্ট জীবগণ তদ্রূপ
হুঃখিত বিবেকন কর । কুটুম্ব, পুত্র, পত্নী, শরীর, সখিত ধন, পরলোকে গমন
করিলে কিছুই থাকিবে না । স্বকীয় স্কৃত ও দ্রুত কর্ম্মমাত্র স্থায়ী হইবে ।
সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া অবশ হইয়া যখন ভোমাকে গমন করিতে হইবে, তখন
তুমি কেন অনর্থ আসক্ত হইয়া নিজ প্রয়োজন অহুষ্ঠানে বিরত রহিয়াছ ।
বিশ্রান্তিবিহীন, আগমনশূন্য, পাথেরবর্জিত অট্টালিক অন্ধকারাচ্ছন্ন দুর্গম
মাগে তুমি একাকী কি প্রকারে গমন করিবে ? ধর্ম্য ও অধর্ম্য পরিত্যাগ কর,
সত্য ও অন্ত পরিহার কর, সত্যানুত উভয় পরিহার করিয়া বদ্বারা ত্যাগ
করিতেছ, তাহাকেও ত্যাগ কর । সঙ্কল্পশূন্যতা হেতু ধর্ম্য পরিহার কর এবং
অলিপ্তানিবন্ধন অধর্ম্য বর্জন কর, বুদ্ধির দ্বারা সত্য অন্ত পরিত্যাগ কর,
এবং পরমার্থ-নিষ্কম-নিবন্ধন বুদ্ধিকে পরিত্যাগ কর । অধিমাংসশোণিত-
কর্ম্ম ও দুর্গকর্ম্মপ্ররোধপূর্ণ জরাসৌকসমাবিষ্ট রোগায়তন এই আনন্দ্য ভূতাবাস
শরীরের মমতা ত্যাগ কর ।

“বিষয় সমুদয় অতীত হইলে তাহাদের বে সমস্ত গুণ ছিল, তাহা চিত্তা

করিবে না। যে ব্যক্তি তাহাতে সমাদর করে, সে স্নেহবদ্ধ হইতে বিমুক্ত হয় না। যে বিষয়ে অনুরাগ জন্মিবে, তাহাতে দোষদর্শী হইবে। হৃৎখের বিষয় চিন্তা না করাই হৃৎখ বিনাশের মহৌষধ; হৃৎখ চিন্তা করিলে হৃৎখ দূর হয় না, বরঞ্চ অতিশয় বর্দ্ধিত হয়। প্রজ্ঞাদ্বারা মানস হৃৎখ ও ঔষাদদ্বারা দৈহিক হৃৎখ দূর করিবে; বিজ্ঞানের ইহাই সার্থ্য। রূপ, যৌবন, জীবন, ধনসঞ্চয়, আরোগ্য, প্রিয়সহবাস, এই সমুদয় অনিত্য, অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি তাহাতে আকাঙ্ক্ষা করিবেন না। ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমূহ মোহবশতঃ স্নেহ প্রকাশই মরণ তুল্য অপ্রিয়।

“যে মানব সূত্র হৃৎখ উভয়ই পরিত্যাগ করেন, তিনি নিরতিশয় সূত্রস্বরূপ ব্রহ্মভাব লাভ করিতে সমর্থ হন। পিপাসাব অন্ত নাই; তৃষ্টিই পরম সূত্র; অতএব পণ্ডিতেরা ইহলোকে সন্তোষকেই পরম ধন বলিয়া বিবেচনা করেন। গমন-লীল বরণ নিমেষ মাত্র অবস্থান করে না; স্বকীয় শরীরই অনিত্য। অতএব নিত্য বিষয়ের অন্বেষণ কর। মনুষ্য কামভোগে তৃপ্ত হইয়া বিষয় সঞ্চয় করিতে থাকিলে, ব্যাঘ্র যেমন মৃগাদিকে লইয়া যায়, তজ্জপ মৃত্যু তাঁহাকে গ্রহণ পূর্বক গমন করে। বাহাতে হৃৎখ বিমোচন হয়, তাহার উপায় অবলোকন কর। অশোক হইয়া কান্যারস্ত কর। মনুষ্য মুক্ত হইলেই হৃৎখহীন হয়। যিনি আত্মাতে অনুরক্ত হইয়া নিরপেক্ষ ও নিরলোভ ভাবে আত্মীয় রহেন এবং আত্মাকে সহায় করিয়া বিচরণ করেন, তিনিই সূত্রী হন।”

শুকদেব নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে তাহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, পুত্রদ্বারা দি প্রতিপাদনে মহান ক্লেশ, অতএব ক্লেশ নাই, অথচ মহেন্দ্রিতি হয়, এমন নিত্য স্থান কি আছে? অনন্তর ধর্ম্মের পরা-পরম্ব শুকদেব মুহূর্ত্তকাল আপনি আপনার উপায় নিশ্চয়ে প্রবৃত্ত হইয়া নিঃশেষ সর্বাঙ্গী পরমগতি নির্ণয় করিলেন, “আমি যে প্রকারে যোনিমন্ডল লাগ্নরে প্রত্যাবৃত্ত না হই, সর্কেপাধি-বিনির্মুক্ত হইয়া কিরূপে সেই পরম ধামে গমন করিব, যে স্থানে গমন করিলে পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে না হয়। সর্ব-পরিত্যাগ করিয়া আমি সেই পরমভাব আকাঙ্ক্ষা করিতেছি, যে স্থানে আমার আত্মা শান্তি লাভ করিবে এবং আমি অক্ষয় অব্যয় শাস্ত ভাবে অবস্থান করিতে সমর্থ হইব। যোগ ব্যতিরেকে কেহ সেই চরম গতি প্রাপ্ত হইতে পারে না। অতএব যোগাবলম্বনকরতঃ এই কলেবর পরিহার পূর্বক বায়ু স্বরূপে হোলোময় দিবাকর মণ্ডলে প্রবেশ করিয়া নিঃশব্দ চিত্তে সূর্য্যসদনে

বাস করিব । আমি সূর্য্যামণ্ডলে প্রবেশ করিব, সংশয় নাই । সূর্য্যমণ্ডলের সহিত সুরগণ আমার যোগদল অবলম্বন করুন ।”

অনন্তর শুকদেব দেবর্ষি নারদের অনুরোধে লাভ করিয়া মহাত্মভব কৃষ্ণ-বৈপাশ্বনকে অভিবাদন পূর্ব্বক আপনায় অভিলষিত বিষয় দ্বিজ্ঞাসা করিলেন । বাসদেব শুকের সেই কথা শুনিয়া প্রীত হইয়া বলিলেন, “হে পুত্র, তুমি এক্ষণে তাবৎকাল অবস্থান কর, বাবৎ হোমাকে দেখিয়া আমার নগ্ননন্দন প্রীত হয় । শুকদেব নিরপেক্ষ নিঃস্নেহ ও মুক্তসংশয় হইয়া মোক্ষের বিষয় নিরত চিন্তা করিতে মনঃ সমাধান করিলেন । তিনি পিতাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিদ্ধসত্ত্বনিবেদিত বিপুল কৈলাস শৈলের উপরিভাগে গমন করিতে লাগিলেন । শৈলশিখরে আরোহণ পূর্ব্বক নির্জল তৃণবিবর্জিত সমতল প্রদেশে উপবেশন করিলেন । তথায় পক্ষীগণাংশর বা উৎকটদর্শনবোণা বিষয় কিছুই ছিল না । তিনি তখন সর্ব্ব দক্ষ হইতে বিনিঃসৃত আত্মাকে দর্শন করিয়া সর্ব্বসংশয়-বিমুক্ত হইলেন । মোক্ষপথ প্রাপ্তির নিমিত্ত যোগাবলম্বন করিয়া নারদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “হে তপোধন ! আমি পথ নিরীক্ষণ করিলাম ; আপনায় স্থিতি হউক । আপনায় প্রসাদ আমি অভিলষিত স্থানে গমন করিব ।” সংসারে নিরপেক্ষ বালকবৎ দিগ্‌দর্শনধারী ভগবান্‌ ব্যাগতনয় শুকদেব ইহা কহিয়া ঈততঃ আকাশনার্গে পিচরণ করিতে লাগিলেন । রমণীয়-কুহুমিত-তরুকাশনসমন্বিতশৃঙ্গাকিনীমণিলাবণাহিনী বিষমতা জগীভারতী উৎকলী ॥ অত্যাশ্চর্য্য অপরোপ নিভান্ত উৎকলনর ও সম্ভ্রান্তচিত্ত হইয়া মহাত্মা তাঁহাকে আদ্য পথে গমন করিতে দেখিয়া নিঃশব্দে বিস্ময়াবিষ্ট হইল । তাহার বলিতে লাগিল, “এ কোন্‌ দেবতা উৎকলগতি অবলম্বনপূর্ব্বক নিঃস্পৃহ ও নিশ্চিত বিমুক্তের ন্যায় এ স্থানে আগমন করিতেছেন । কি আশ্চর্য্য ! দেবত্যাগরত ব্রাহ্মণের কি জ্ঞানসমাধান হইয়াছে ? ইনি পিতৃভক্ত দৃঢ়তপস্বী ও পিতার প্রিয়তম পুত্র । অতএব সেই অনন্যচিত্ত পিতাকর্ত্তৃক কি প্রকারে বিসর্জিত হইয়াছেন ।” পরে ধর্ম্মজ্ঞ শুকদেব অপ্সরাদিগের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক সকল দিক্‌, অন্তরীক্ষমণ্ডল, শৈলবন, মহারণ্যসহ মেদিনীতল, সরোবর ও গরিৎ সকল অবলোকন করিলেন । চতুর্দিক্‌ হইতে দেবতারা সমহমান কুতাঞ্জলিপুটে বৈপাশ্বন-তনয়কে দর্শন করিতে লাগিলেন । তিনি তৎকালে সেই দেবতা সফলকে এই কথা বলিলেন যে, ‘গিতা যদি শুক বলিয়া আহ্বান বন্দ্যঃ আমার অঙ্গুগমন করেন, তবে আপনায় সকলেই সমাহিত থাকিয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিবেন ।’

শুকদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া দিক্‌সরিৎ শৈলনিচয় চতুর্দিক্‌ হইতে এই প্রত্যুত্তর প্রদান করিল, ‘হে বিপ্রবর ! আপনি বাহা আজ্ঞা করিলেন, আমরা তাহা স্বীকার করিলাম । মহর্ষি আপনার কথা জিজ্ঞাসা করিলে আমরা সকলেই তাঁহাকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিব ।’

ব্রহ্মর্ষি শুক সত্ত্বগুণ দ্বারা লিঙ্গদেহাত্মক তম ও বাসনানয় রজোগুণ পরি-
ত্যাগ করতঃ সত্ত্বগুণকেও পরিত্যাগ করিলেন । অনন্তর প্রজ্জ্বলিত বিধুম
পাবকের স্থায় নিত্য নিগুণ লিঙ্গবর্জিত পরব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । সেই
মহাপুরুষের উপরম সময়ে জগতের দুঃখাত্মক উদ্ভাষাত দিগ্‌দাহ ও ভূমিকম্প
প্রভৃতি হইতে বাগিল । সহস্রাংশু প্রকাশিত হইলেন না । পাবক প্রজ্জ্বলিত
রাহলেন না । হ্রদ, নদী ও সাগর নক্ষন ক্ষুদ্র হইল ।

পুত্রমেহসমন্বিত বাসদেব শুকদেবকে একান্ত আনিয়া পুত্রের পশ্চাৎ
অনুসরণ করতঃ উচ্চৈঃস্বরে হা পুত্র হা পুত্র বলিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন ।
তখন সর্কগত, সর্কতোমুখ ও সর্কাত্মা শুকদেব দ্বাবন জঙ্গমাত্মক সনস্ত
বস্ত হইতে হা পুত্র এই শব্দ উচ্চারণ করতঃ প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন ।
অনন্তর মন্মাকিনী তীরে যে সমুদয় অঙ্গারীগণ জাঁড়া করিতেছিল, তাহারা
সেই মুনিসত্তমকে অবলোকন করিয়া অতিশয় ভীত ও লজ্জিত হইল । কেহ
কেহ ভলমধ্যে পিণীন রহিল, কেহ বা গুলতাদির অন্তর্গতে লুক্কায়িত হইল,
কেহ বা সত্বর হইয়া পরিধেয় বস্ত্র গ্রহণ করিল । তদর্শনে মহর্ষি নিজপুত্রের
মুক্ততা ও আপনার সজ্ঞতা জানিয়া খ্রীত ও লজ্জিত হইলেন । ইত্যবসরে
দেবগন্ধর্বপরিবৃত ভগবান শঙ্কর তাঁহার সমুখে অবস্থিত হইয়া পুত্র-
শোকসমস্ত বৈপারনকে মাস্তানাপূর্বক বলিলেন, “তুমি পূর্বের আশাব নিকট
আকাশাদি সদৃশ শুদ্ধসত্ত্ব বাগবান পুত্র প্রার্থনা করিয়াছিলে । তোমার তাদৃশ
লক্ষণসম্পন্ন পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া তপস্তা দ্বারা সমর্দ্ধিত হইয়াছিল এবং
আমার প্রমাদে ব্রহ্মভেজোন্ময় ও শুভী হইয়া দেবগণেরও হুস্তাপ্য পরমগতি
প্রাপ্ত হইয়াছে । অতএব তুমি তাহার নিমিত্ত কেন অনুশোচন করিতেছ ?
বাবৎকাল পর্য্যন্ত পর্কিত সকল বর্তমান থাকিবে, যে পর্য্যন্ত সাগর সমুদয় বিভা-
নান থাকিবে, তাবৎকাল পুত্রের সহিত তোমার কীর্তি প্রতিক্ষণরূপে অক্ষয়
হইবে । হে মহামুনে ! তুমি আমার প্রমাদে ইহলোকে সর্কতোভাবে অনুপায়িনী
সপুত্রের সদৃশী ছায়া দেখিতে পাইবে ।” মহামুনি বৈপারন ভগবান ব্রহ্মকর্তৃক
অযুত হইয়া পুত্রের ছায়া দর্শন করতঃ পরমহর্ষে অভিযুক্ত হইলেন ।

যিনি ভক্তিপরায়ণ হইয়া এই যোক্ষ ধর্ম সমন্বিত পবিত্র ইতিহাস ধারণা করেন, তিনি পরম পর লাভে সমর্থ হন ।

মৃত্যু ।

(শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, বি এ ।)

কোথা যাও দ্রুতপদে পথিক প্রবীণ,
ছিন্নকস্থা, জঠর জ্বালায় তহু ক্ষীণ ?
বুঝি অর্থ অধেষণে, চলিয়াছ কুণ্ডল মনে,
যাও,—যাও,—সন্মুখেতে গভীর গহন ;
মৃত্যু আই সন্মুখে ভীষণ !
কুবেরের প্রতিনিধি কে তুমি রাজন্,
আসন্ন ক্ষতিতল করিছ শাসন ?
ধনবল, জনবল, মরকত হর্ষাস্থল,
পেয়ে হুণে আছ বুঝি ? কর কি স্মরণ—
মৃত্যু আই সন্মুখে ভীষণ !
ছদ্মারি চলিছ রণে কেও বীরবর,
পদভরে ধরাভল কাঁপে থর থর ।
ভীম অসি প্রহরণে, বশিছ অরাতিগণে,
দিশিঙ্গয়ী বলি তোমা দাধানে ভুবন ;
মৃত্যু আই সন্মুখে ভীষণ !
নব-জাত শিশু তুমি প্রভাতের তারা,
অনন্ত সুখের উৎস,—মুখে হাসিভরা,
নাহি কপটতা ভান, পুণ্যালোকে জ্যোতিমান,
নিবিবে আঁধারে ওই সুবর্ণ বরণ,—
মৃত্যু আই সন্মুখে ভীষণ ।
কত আশা ঘণা তুমি সন্মুখে তোমার,
বহু শ্রম বিদ্যালাভে, ফুল পরিবার,
কত অর্থ কত মান, লভিতে তোমার প্রাণ,
উধাও উতলা ; ক্রমে কর কি স্মরণ—
মৃত্যু আই সন্মুখে ভীষণ !
রূপ-গৌরবিনী তুমি সুবোমল-কায়া,
কটাক্ষে জগৎ মুগ্ধ—মুগ্ধিমতী মায়া ;
ভালবিশ্ব অলকার, চন্দ্রিমা স্তিমিত প্রায়,
ক্রভঙ্গে বিশোল তব আত্মক ভুবন ;—
মৃত্যু আই সন্মুখে ভীষণ !

স্থিরবুদ্ধি বৈজ্ঞানিক তুমি অভিমানী,
পকত্বত ক্রোড়নক,—হেন অনুমানি ;
বায়ু বহ্নি বোম জলে, সঙ্গারী ভূমণ্ডলে,
প্রকৃতি নিয়ম লজ্জি গড়িছ নূতন ।

মৃত্যু অই সম্মুখে ভীষণ !

• মহামেধা দার্শনিক তর্কচূড়ামণি,
বাগ্মিতায়, প্রতিভায় স্তম্ভিতা ধরণী ।
প্রণয় গভীর দৃষ্টি, তন্ন তন্ন করি সৃষ্টি,
উদ্ভাবিলে কত তব জগদ'ন্দোলন ।

মৃত্যু অই সম্মুখে ভীষণ !

প্রেমিক স্বকবি কেহে উধাও পরণ,
প্রকৃতির উরে বসি তুলিছ স্মৃতি,
স্মরণিক নন্দরসে, প্রকৃতির ভাবাবেশে,
মান্য রঙ্গ ভঙ্গে কব বিশ্ব বিলোড়ন,—

মৃত্যু অই সম্মুখে ভীষণ !

কে এ কঠোর-কন্দিন্, মানি ত্যাগীধর,
ভূচ্ছ মুক্তি, লক্ষ জন্ম, কারুণ্য-কাতর,
দুর্বিতে নরেন্দ্র দুখ, কর্ম্মত্যাগ-পবাস্থখ ?
মৃত্যুঞ্জয় তুমি ? সম্মুখেতে, হে কণ্ঠে,*—

মৃত্যু অই সম্মুখে ভীষণ !

হে বীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, হৃদয়, রঙ্গম,
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা—কোথায় গমন ?
ভ্রম্মা আদি দেবগণ, কবিতোছ কি চিস্তন ?—
নেহার কালের আয়ে খিকট ব্যাদন ।

মৃত্যু অই সম্মুখে ভীষণ !

কে অই বসিয়ে শুভ্র হিমাচল শিবে,
“জন্ম মৃত্যু হীন আমি”—কহে দত্তভর,
মুখে শাস্তি সরলতা, পনিপূর্ণ অনিয়তা,
তেরাগের প্রতিমূর্তি, নির্ভীক হৃদয়,

শান্তিরসে আদ্বৈতব্দয় ।

* অনেকে মুক্তি স্বাধত না করিয়া, জন্মমৃত্যু ভয় না করিয়া, মনে করেন ও বলেন,
“আমরা মঠাভ্যাগী, আমরা ভগবতের মন্ত্রণের জন্ত লক্ষ লক্ষ জন্মগ্রহণ করিব ; আমরা মুক্তি
তুচ্ছ করি ।” বে মঠাপুরুষ মুক্তি প্রত্যাশ করিয়াছেন ও ইচ্ছা করিলে মুক্ত হইতে পারেন,
কবল তাঁহাই একপ বলা সাজে । অন্যের পক্ষে এরূপ বলা হাঁসির কথা ।

আর—না !

(:)

“বাঁবা জীবন” অনেক পড়িয়াছেন, অনেক গুনিয়াছেন, অনেক তর্কবিহর্কও করিয়াছেন, অনেক সাধন-ভজনও করিয়াছেন ; কিন্তু কিছু সিদ্ধান্ত করিতে পারিতেছেন না। ঘোর অশান্তি ; কিছুতেই বিশ্বাস হয় না, কিছুই তাঁর ভাল লাগে না। কাহারও সঙ্গে কথা কন না, সর্বদাই গভীর চিন্তাশাল। নিদ্রা পর্য্যন্ত গান না ; এমন কি খাওয়া দাওয়া পর্য্যন্তও, নাই বলিলেই হয়। অসুখ, তিনি যে অত্যন্ত সত্যপ্রিয়, তাহার সন্দেহ নাই। এমন তাঁর অবস্থা হইয়াছে যে, আর তিনি কোনও শোনা-কথার বিশ্বাস করিতে, কোনও মতেই পারেন না। সত্যর জন্ত জীবন যথার্থই উৎসর্গ করিয়াছেন। সত্য বিনা তাঁর জীবন যায়-যায়। বলেন—একটু গ্রহিও যদি কেহ খুলিয়া দেয় ত, আমার সব গ্রহি আপনা হইতেই খুলিয়া যায় ! আহা, দেখিলে খুবই দুঃখ হইত বটে, কিন্তু কি করিব বলুন, বাঁবাজীবন কাহারও কথার বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছিলেন না—এমন তাঁর অবস্থা (বা আবস্থা !) হইয়াছিল। পাঁচ জন সাধু-শাস্ত্রের কথা, শাস্ত্রের কথা, দর্শনের কথা, এমন কি—সিদ্ধগুরুর কথাতে পর্য্যন্তও তাঁর মন প্রবোধ মানছিল না। তাঁহার অশান্তির প্রধান কারণ—তিনি পুনর্জন্মে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না ; দেহত্যাগের পর মন বা আত্মার অস্তিত্ব যে থাকে, তা বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। সর্বদাই বলিতেন—ভীষের পরকাল (পুনর্জন্ম-প্রভৃতি) যদি না থাকিল, আর ধর্ম্য কর্ম, সংসার বা সন্ন্যাসের, আবশ্যক কি ? দুখী জীবনের ভার বহন করার, বা অনিত্য দেহের সুখ দুঃখাদি ভোগ করার, আর কোনও প্রয়োজন নাই ; আত্মহত্যাই শ্রেয়ঃ।

নিফল এবং চেঁচার অতীত বিবেচনায়, আমরা আর কেহ তাঁহাকে বড় একটা কিছু বলিতাম না। জানি—তিনি যখন যথার্থ সত্য-পিপাসু, দৈবর তাঁহাকে রক্ষা করিবেনই ; জান-চক্ষু তিনি ফুটাইয়া দিবেনই। আলোক দেখাইবার তিনিই একমাত্র মালিক। বাবাজীবন, জীবন একেবারে উৎসর্গ করিয়া, নিজেই যৎপরোনাস্তি চেঁচা করিতেছিলেন কিসে তাঁর বিশ্বাস হয়।

একদা তিনি গুনিলেন—কোথায় রাম-রাজার দেশ (—না, কি বলে, তাই) আছে, সেখান নাকি বাঁগরে বড় অতিথি-সেবা করে ; পণে থেকে অতিথি-

গণকে ডাকিয়া লইয়া বাইয়া, নাকি নানা প্রকার ফল মূল দ্বারা অতিথি-সংকার করু; পথ হারাইয়া গেলে, পথ দেখাইয়া দেয় ; ইত্যাদি ইত্যাদি । বাবাজীবন অমনি সেই দেশে ছুটিলেন—“যদি নিদেন এটাও সত্যি হয়, তাহা হ'লেও অনেকটা শাস্ত্রাদির কথা মান্তে পারি” ।

সমস্ত ঘুরে ফিরে দেখলেন—সর্বৈব মিথ্যে ।

শুনিলেন—চন্দ্রনাথে এক “সহস্রধারা” আছে, সেখানে নাকি “বোম্ বোম্” করিলেই জল পড়ে । সেখানে অমনি ছুটিলেন । সেখানেও দেখিলেন—“ওঁথৈবচ” । শুনিলেন কোথায় কিনি মেসমেরিজ্‌ম্‌এর দ্বারা ক্রেয়ারডয়েন্সে ভূত নামান প্রভৃতি নানাপ্রকার আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ব্যাপার করাইতে পারেন । বাবাজীবন সেখানেও ছুটিলেন । নিজেই মেসমেরাইজড্‌ হইতে চাহিলেন । ডাক্তার বাবু অনেক চেষ্টা করিলেন, তাঁহাকে কোন মতেই করিতে পারিলেন না ; শুধু তাঁকে নয়, তিন দিন ধরিয়া আর কাহাকেও ভালরূপ মেসমেরাইজড্‌ করিতে পারিলেন না । —এই ত সব ব্যাপার !

তার পর, ভৈরবী চক্র, শিখাচক্র, প্ল্যাকেট-চক্র, প্রভৃতি নানাপ্রকার রঙ-বেরঙের চক্রাচক্রে ঘুরিলেন ; কিছুতেই কিছু হইল না ।

অবশেষে, ষটনাশতঃ ২৪তঃ, তারকেস্বরে এসে উপস্থিত । সেখানে বাহারি “হত্যে” দিয়ে পড়ে আছেন, তাঁহাদিগকে বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন । একজন ভীষণ অন্নশূলের যোগী স্বপ্ন পাইলেন—“অমুক স্থানে অমুকের বাটিতে অমুক—তোমার গত জন্মের বাপ ; তুমি তাঁর নিকট বিশেষ অপরাধী ; বাও, তাঁর প্রসাদ খাওগে ; তিনি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইলেই, তুমি রোগমুক্ত হইবে” । বাবাজীবন এই সমস্ত শুনিয়াই ত আর কোথায় আছেন !—অমনি তাঁর সঙ্গ লইলেন । সঙ্গে সঙ্গে বাইয়া নিজে চাক্ষুষ দেখিলেন—তাঁর প্রসাদ খাইয়া তিনি বেশ সারিয়া যাইলেন । বাবাজীবন ঠাণ্ডা হইলেন । বিশ্বাস করিলেন—হ্যাঁ পুনর্জন্ম আছে ; হ্যাঁ ঠাকুর-দেবতাও আছে বটে ।

ব'লব কি মশাই ! ছ'দিন যেতে না যেতে, বাবাজীবন আবার সেই রকম গভীরত্ব প্রাপ্ত হ'লেন । বলেন, “ও—কিসে কি হ'ল—ভাল বোঝা গেল না । নিজের হ'ত ত বরং কিছু বৃদ্ধিতে পারতুম” । (এত যে, তারকেস্বরে তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল, সব যেন বানের জলে ভেসে গেল !)

যাক ; তার পর মাস কতক যায়, এমন সময়, বাবাজীবনের, হস্তে ও পায়ে—দেশে, দু জায়গায় দুই ভয়ানক বিস্ফোটক হয় । কোনও ঔষধেই কিছু বাগ মানিতেছে না ; কতান্ত্র কষ্ট পাইতেছেন । বাবাজীবন না পারেন খেতে, না পারেন শুতে, না পারেন চলিতে ; হৃদশার সীমা নাই ! (বাবাজীবন এ ধারে লোক বড় ভাল ছিলেন ; বড়ই সাধিক প্রকৃতি ; ঠিক সাধুর মতনই

ছিলেন)। ত্রিবি এক দিন বড় ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ে'ছেন, এমন সময় স্বপ্ন পান—অমুক জেলার অমুক গ্রামে সিংহবাহিনীর “মাড়োর” (মন্দিরের) একটু মাটি আনিয়া দাও ত সেরে যায়। বাবাজীবন বলেন, উঁ তা হচ্ছে না; ঢের ঠকেছি, আর ঠকছি না; এখানে যদি, ঠাকুর, এনে দাও ত হ'তে পারে। ঠাকুর বলেন—আচ্ছা, তা'ই হবে; কাল সকাল বেলা উঠে তোর কাছের পাখি। সকালে উঠে বাবাজীবন গতি'ই দেখেন পাশে কাগজে মোড়া একটু মাটি রচিয়াছে। কি করিবেন, যন্ত্রণার চোটে সেই মাটি, একটু একটু, দু'জায়গায় লাগাইয়া দিলেন। বিকাল বেলা দেখেন—আজেক কমিয়া গেছে। তার পরদিন প্রাতে, ফের আর একটু মাটি দিলেন। তৃতীয় দিনসে যন্ত্রণা আর কিছুই রহিল না। এইরূপ, ৫৭ দিনে একেবারে শুকাইয়া গেল। বাবাজীবনের ছন্দে আবার, বিশ্বাসের সঞ্চার হইল। সিংহবাহিনীর পূজাও কিছু পাঠাইয়া দিলেন।

ফের, মাস দুই যেতে না যেতে, মশাই! আবার—যে বাবাজীবন সেই বাবাজীবন! যে অশান্তি, সেই অশান্তি!! বলেন যে, ও—চাক্ষুষ কিছু না দেখলে বিশ্বাস রীতিমত হয় না।

“কি দেখতে চাও?”—“আমি আর কিছু বিশেষ দেখতে চাই না; কেবল যদি একটা ভূত দেখতে পাই ত, পুনর্জন্মের উপরে ঐক্য বিশ্বাস হ'য়ে যায়”। —“তা ঘোরো; আরও দিন কতক ঘুরে ফিরে দেখ”।

যেখানে শোনে বড় বড় ভৈরব, বড় বড় ব্রহ্মদেতা, বড় বড় ভূত-প্রেতের জায়গা, সেইখানেই, শ'ন-মঙ্গলবাব, আমানত, প্রভৃতি যোগ দেখে, সমস্ত রাত্রি একা জেগে ব'সে থাকেন—কখন ভূত-প্রেত আসবে, দেখবেন। (আশ্চর্য্য, মশাই! অনেকে অনেক দেখতে চায় বটে, কিন্তু আমাদের বাবাজীবনের মত দেখতে চা'বার জিনিষ আর কখন কেউ শুনেছেন কি? তাই, না হয়, দেবতাটা আসটা দেখতে চাও বাপু; তা নয়; কিনা—ভূত! বাবা:—যা দেখলে দাঁত-কপাটা যায়, যা দেখলে লোকে পালায়, যা দেখতে লোকে ঘৃণা করে!))।

যাক; এইরূপ, তিন চার মাস ভীষণ ভীষণ স্থানে “হতে” দিয়ে বেড়াবার পর, একদিন বাসায় এসে বাবাজীবন একা এক ঘরে শুইয়ে আছেন। চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছেন। এমন সময় স্বপ্ন দেখছেন:—এক প্রকাণ্ড ভাঙ্গা বাড়িতে গেছেন। অত বড় বাড়িতে জন-প্রাণিও নাই; কেবল খুলো আর জঞ্জাল। বেলা তখন ১২টা। তিনি একা এ-ঘর সে ঘর ঘুরে ফিরে দেখছেন; কোথাও কিছুই পাচ্ছেন না। এমন সময়, এক ভাঙ্গা মি'ড়ির চাঁতালের নীচে, বুঝলেন, একটা যেন অন্ধকার ঘর আছে। কোনও রকম ক'রে সেই ঘরটার দ্বারের পঞ্চ আনিকার করিলেন। তারপর, মশাই! ঘেয়ে দেখেন সেখানে—ভয়ানক ব্যাপার!! ঘরের ভিতরে দেয়ালের কোলে মন্ত একটা বেদী। ঘরটা খুব বড়। বেদীর হুঁমুখে অনেক জায়গা ঘরের ভিতর প'ড়ে আছে। বেদীর উপর পা ঝুলাইয়া একটা স্ত্রীলোক ব'সে আছেন;

রঙ—শ্রামবর্ণ ; মানুষের মতনই ভাল চেহারা ; মাথায় কাপড় নাই ; আলু-
লায়িত ঘন কেশজালে পৃষ্ঠদেশ পূর্ণ ; পরিধানে এক খানি কস্তা পেড়ে সাড়ি ;
মস্তক, মুখমণ্ডল, হস্তদ্বয়, ও চরণ যুগল ভিন্ন, সমুদয় অঙ্গই বজ্রে উত্তম আচ্ছা-
দিত, (মাথায় সিন্দূর, বা হস্তে গহনা প্রভৃতি ছিল কিনা—বাবাজীবন ভাল
করিয়া দেখেন নাই) ; নয়নে বা ক্র যুগলে অথবা ওষ্ঠ প্রদেশে কিছু মাত্রও
ভয়ের কারণ ছিল না—মূর্ত্তির সর্বত্রই (“অতিশুন্দর” না হউক) শূন্দর
বলিতে হইবে বৈ কি । পাঠক মহাশয়, মূর্ত্তিতে ত কিছুমাত্র ভয়ানক দেখি-
লেন না, কিন্তু (বলিতে গা শিচবিয়া উঠিতেছে) কীৰ্ত্তিতে—অতীব ভয়ানক !
নৃসিংহ মূর্ত্তির ছায় উরদেশে একটা মানুষকে শোয়াইয়া হই হাত দিয়া তাৎকালিক
খাইতেছিলেন । মানুষটা ঈষৎ জীবন্ত, কিন্তু মস্তমুগ্ধপ্রায় ; নড়িবার ক্ষমতা নাই ।
খাইতেছিলেনও যে কিছুমাত্র ভয়ানক রবমে (নৃসিংহের মত), তা নয় ।
মানুষটা স্ত্রী কি পুরুষ, তা তত বাবাজীবন বুঝতে পারেন নাই । পার্শ্বেই আর
একটী, নিচু কিন্তু বৃহৎ ধব ; সেই ঘরের ভিতর একটু উঁকি মেরে দেখেন যে,
কেবল মৃতদেহ আর কঙ্কাল । মৃতদেহগুলির মধ্যে কেহ কেহ অর্দ্ধভক্ষিত ।
ফিরিয়াই দেখেন—বেদৌর উপর “মা” আর নাই । কোথায় যে মা গেলেন,
কেনন করিয়া গেলেন, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না ।

যা হ'ক, এখানে, বাবাজীবন আমার, নিভাস্ত বালকের ছায় ডরিয়া উঠি-
লেন । নিজের কান্নার চোটে নিজেরই নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল । জাগরিত
হইয়া নিজেকে দেখিলেন—ক্ষিপ্তপ্রায় । কোন মতেই নিজের মনকে প্রবোধ
দিতে পারিতেছেন না । আলো জালিলেন ; হাত মুখ ধুইলেন ; মাথায়, বুকে
ও পায়ে জল দিলেন ; কিছুতেই কিছু “বাগ” মানিতেছে না । পাইখানায়
বাইলেন ; এ জিনিষ দেখ্, সে-জিনিষ দেখ্ ক'রে, নানাপ্রকারে মনকে প্রবোধ
দিতে চেষ্টা করিলেন, কিছুতেই শাস্তি হইল না । মনে করিলেন—যাঃ, বুঝি
সবই গেল ; এ'র চে'ও যে, কিছু সত্য না পেয়েছিলুম, সে ছিল ভাল ; শেষকালে
ক্ষেপে গেলুম গ ! সত্য অনুসন্ধান করিতে এসে কপালে শেষকালে, এই
ঘটিল !! বুকের ভিতর মাথার ভিতর যেন সর্বদাই কি করতে লাগল, অত্যন্ত
যন্ত্রণা ও ভয় ভিতরে যেন অনবরত হইতে লাগল, কিন্তু কি যন্ত্রণা বা কিসের
ভয়—কিছুই বুঝতে পারিতেন না ; কেবলই খুব চাঁৎকার ক'রে উঠতে ইচ্ছা
হইত । এইরূপ ক্ষিপ্ত ও ভীত অবস্থায় তাঁর তিন চারি দিন অতিবাহিত হইল ।
পরে এবটু প্রকৃতিস্থ হইয়া, বাবাজীবন বেশ বুঝিলেন—ভাগ্যোশ, ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর
ভূত দেখা দেন নি । এই একটা শাস্ত মেয়ে-ভূতের চেহারা, এক ক্ষণমাত্র-
সমন্বয়ের জন্ত, দেখিয়াই এই, না জানি তাঁদের নিজ মূর্ত্তি দেখিলে আমার কি
হইত ! খুব গুরুবল, তাই রক্ষে । খুব বুঝছি, হাড়ে হাড়ে বুঝছি—গুরু
যা ব'লে গেছেন—সব সত্যি ; শাস্ত্র যা বলছেন—সব সত্যি ; সাধুসহান্নাগণ যা
বলেন—সব সত্য ; যে যা বলে, প্রায় সমস্তই সত্য । বাবাঃ—“আর না” !
ঢের হ'য়েছে ; ঠাকুর ঘণন বুঝাবেন, বুঝবো । আমার ক্ষুদ্র মস্তিকে “আর না !”

যাহাকে অত্যন্ত ঘৃণিত কুসংস্কার বলি, আবার যাহা সর্বোচ্চ দর্শন, সকলগুলিরই এই এক সাধারণ ভিত্তি যে, তাহার সকলেই ঐ এক প্রকার সঙ্কট হইতে নিস্তারের পথ দেখাইয়া দেয়, এবং এই সকল ধর্ম্মের অবিকাংশগুলিতেই জগতের বহিঃস্থ কোন পুরুষের, যিনি নিজে প্রকৃতির নিয়মদ্বারা বদ্ধ নন, এক কথায় যিনি স্বয়ং মুক্ত, তাহার সাহায্যে এই মুক্তিলাভ করিতে হয় । এই মুক্ত পুরুষের স্বরূপ-সম্বন্ধে নানা গোলযোগ ও মতভেদ সত্ত্বেও, তিনি ব্রহ্ম, সত্ত্ব বা নিগুণ, মানুষ্যে ত্রায় তিনি জ্ঞানসম্পন্ন কি না, তিনি পুরুষ স্ত্রী বা ক্লীব, এইরূপ অনন্ত বিচার সত্ত্বেও, বিভিন্ন মতের অতি প্রবল বিরোধসত্ত্বেও, আমরা উহাদের সকলগুলির মধ্যেই একত্বের সূত্র সূত্র গিয়াছে দেখিতে পাই ; সুতরাং ঐ সকল বিভিন্নতা বা বিরোধ আমাদের ভীতি উৎপাদন করে না । আর এই বেদান্ত দর্শনে এই সূত্র সূত্র আবিস্কৃত হইয়াছে, আমাদের দর্শনসমক্ষে একটু একটু করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, আর ইহার প্রথম সোপান এই যে, আমরা সকলেই বিভিন্ন পথ দ্বারা এই এক মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতেছি ; সকল ধর্ম্মের এই সাধারণ ভাব ।

আমাদের সুখদুঃখ, বিপদ, কষ্ট সকল অবস্থার মধ্যেই আমরা এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতে পাই যে, আমরা ধীরে ধীরে সকলেই সেই মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতেছি । প্রশ্ন হইল, এই জগৎ বাস্তবিক কি ? কোথা হইতে ইহার উৎপত্তি, কোথায়ই বা ইহা যায় ? আর ইহার উত্তর প্রদত্ত হইল, মুক্তিতে ইহার উৎপত্তি, মুক্তিতে বিশ্রাম, এবং অবশেষে মুক্তিতে ইহার লয় । এই যে মুক্তির ভাব, আমরা যে বাস্তবিক মুক্ত, এই আশ্চর্য্য ভাব ছাড়িয়া আমরা এক মুহূর্ত্ত চলিতে পারি না, এই ভাব বাতীত তোমার সকল কার্য্য, এমন কি, তোমার জীবন পর্য্যন্ত ব্যথা । প্রতি মুহূর্ত্তে প্রকৃতি আমাদিগকে দাস বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছেন, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গেই এই অপর ভাবও আমাদের মনে উদয় হইতেছে যে, তথাপি আমি মুক্ত । প্রতি মুহূর্ত্তে যেন আমরা মায়া দ্বারা আবৃত হইয়া বদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছি, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই, সেই আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই, আমরা বদ্ধ এই ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আর এক ভাব আসিতেছে যে, আমরা মুক্ত । ভিতরে কিছু যেন আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে যে, আমরা মুক্ত । কিন্তু এই মুক্তিকে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে, আমাদের মুক্ত স্বভাবকে প্রকাশ করিতে যে সকল বাধা উপস্থিত হয়, তাহাও একরূপ অনতিক্রমণীয় । তথাপি ভিতরে, আমাদের অন্তরের অন্তস্তলে উহা যেন ১৫ই চৈত্র, ১৩০৭ ।] উদ্বোধন । [৪] ১৭৭

সবদা বলিতেছে, আমি মুক্ত, আমি মুক্ত । আর যদি তুমি জগতের বিভিন্ন ধর্ম সকল আলোচনা করিয়া দেখ, তবে তুমি বুঝিবে, তাহাদের সকল গুলিতেই কোন না কোনরূপে এই ভাব প্রকাশিত হইয়াছে । শুধু ধর্ম নয়—ধর্ম শব্দটিকে আগুনরা অত্যন্ত সঙ্গীর্ণ অর্থে গ্রহণ করিবেন না, সমাজের সমুদয় জীবনটী কেবল এই এক মুক্ত ভাবেই অভিব্যক্তিমাত্র । সকল সামাজিক গতিই সেই এক মুক্তভাবের অভিব্যক্তিমাত্র । যেন সকলেই, জাহ্নুক বা না জাহ্নুক, সেই স্বর শুনিয়াছে—যে স্বর বলিতেছে, “পরিশ্রান্ত ও তারাক্রান্ত সকলে আমার নিকট আইস ।” একরূপ ভাবাব বা একরূপ ভঙ্গীতে উহা প্রকাশিত না হইতে পারে, কিন্তু মুক্তির জন্ত আহ্বানকারী সেই বাণী কোন না কোনরূপে আমাদের সহিত বর্তমান রহিয়াছে । আমরা এখানে যে জন্মিয়াছি, তাহাও ঐ বাণীর কারণে, আমাদের প্রত্যেক গতিই উহার জন্ত । আমরা জানি বা না জানি, আমরা সকলেই মুক্তির দিকে চলিয়াছি, আমরা জ্ঞাত-সারে বা অজ্ঞাতসারে সেই বাণীর অনুসরণ করিতেছি । যেমন সেই মোহন বংশীবাদক বংশীবাদিনী দ্বারা আমাদের বালকগণকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, আমরাও তেমনি না জানিয়াই সেই মোহন বংশীব অনুসরণ করিতেছি ।

আমরা নীতিপরায়ণ কেন ? না, আমাদেরই সেই বাণীর অনুসরণ করিতে হয় । কেবল জীবাশ্ম নহেন, কিন্তু সেই নিম্নতম জড়পদার্থ হইতে উচ্চতম মানব পর্যন্ত সকলেই সেই স্বর শুনিয়াছেন, আর ঐ স্বরে গা ঢালিয়া দিবার জন্ত চলিয়াছেন । আন এই চেষ্টার পরস্পরে মিশ্রিত হইতেছে, এ উহাকে ঠেলিয়া দিতেছে—প্রতিদ্বন্দ্বিতা, আনন্দ, চেষ্টা, অর্থ, জীবন মৃত্যু সব আসিতেছে । আর এই বিশদ্রব্ধাও ঐ বাণীতে উপস্থিত হইবার জন্য উন্নত চেষ্টার ফল বই আর কিছুই নয় । আমরা ইহাই করিয়া চলিয়াছি । ইহাই দ্যাক্ত প্রকৃতি ।

এই বাণী শুনিতে পাইলে কি হয় ? তখন আমাদের সমুখস্থ দৃশ্য পরিবর্তিত হইতে থাকে । যখনই তুমি ঐ স্বর জানিতে পার, বুঝিতে পার উহা কি, তখন তোমার সমুখস্থ সমুদয় দৃশ্যই পরিবর্তিত হইয়া যায় । এই জগৎ, যাহা পূর্বে মায়াবী ভৎস যুদ্ধক্ষেত্র ছিল, তাহা আর কিছুতে, অপেক্ষাকৃত সৌন্দর্য্য-পূর্ণ সুন্দরতর কিছুতে পরিণত হইয়া যায় । প্রকৃতিকে অভিসম্পাত করিবার তখন আর আমাদের কিছু প্রয়োজন থাকে না, জগৎ অতি বীভৎস অথবা এসমুদয়ই-বুঝা, ইহা বলিবারও আমাদের প্রয়োজন থাকে না, আমাদের কাঁদিবার অথবা বিলাপ করিবারও কোন প্রয়োজন থাকে না । যখনই তুমি

ঐ স্বর জানিতে পার, তখনই তুমি বুঝিতে পার, এই সকল চেষ্টা, এই সকল যুদ্ধ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এই গোলমাল, এই নিষ্ঠুরতা এই সকল ক্ষুদ্র সুখাদির প্রয়োজন কি। তখন বুঝিতে পারা যায় যে, উহার প্রকৃতি স্বভাববশতই খটিয়া থাকে—আমরা জ্ঞাতমারে বা অজ্ঞাতসারে সেই স্বরের দিকে অগ্রসর হইতেছি বলিয়াই এই গুলি ঘটয়া থাকে। অতএব সমুদয় মানবজীবন, সমুদয় প্রকৃতি কেবল সেই মুক্তভাব অভিব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে মাত্র, স্বর্ঘ্যও সেই দিকে চলিয়াছে, পৃথিবীও স্তম্ভিত স্বর্ঘ্যের চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেছে, চন্দ্রও তাই পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সেই স্থানে উপস্থিত হইবার জন্য সকল গ্রহ ভ্রমণ করিতেছে এবং পবনও বহিতেছে। সেই মুক্তির জন্ত বহু তীব্র নিনাদ করিতেছে, মৃত্যুও তাহারই জন্ত চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সকলেই সেই দিকে বহিবার জন্ত চেষ্টা করিতেছে। সাধুও সেই দিকে চলিয়াছেন, তিনি না গিয়া থাকিতে পারেন না, তাহার পক্ষে উহা কিছু প্রশংসার কথা নহে। পাপীও তজ্জপ। খুব দানশীল ব্যক্তি সেই স্বর লক্ষ্য করিয়া সরলভাবে চলিয়াছেন, তিনি না গিয়া থাকিতে পারেন না; আবার ভয়ানক রূপণ ব্যক্তিও সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছেন। যিনি মহা সংকল্পশীল, তিনিও সেই বাণী শুনিয়াছেন, তিনি সেই সংকল্প না করিয়া থাকিতে পারেন না। আবার ভয়ানক অলস ব্যক্তিও তজ্জপ। এক জনের অপূর্ণ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক পদস্থলন হইতে পারে, আর যে ব্যক্তির খুব বেশী পদস্থলন হয়, তাহাকে আমরা দুর্বল বলি, আর খাঁহার পদস্থলন অল্প হয়, তাহাকে আমরা সং বলি। ভাল মন্দ এই দুইটা দুইটা বিভিন্ন বস্তু নহে, উহার একই জিনিষ; উহাদের মধ্যে ভেদ প্রকারগত নহে, পরিমাণ গত।

এক্ষণে দেখুন, যদি এই মুক্তভাবরূপ শক্তি বস্তুবিক সমুদয় জগতে কার্য্য করিতে থাকে, তবে আমাদের বিশেষ আলোচ্য বিষয় ধর্ম্মে প্রয়োগ করিলে দেখিতে পাই, সমুদয় ধর্ম্মই ঐ একভাব দ্বারাই নিরূপিত হইয়াছে। খুব নিম্নতল ধর্ম্মগুলির কথা ধরুন; সেই সকল ধর্ম্মে হইতে কোন মৃত পূর্ব্বপুরুষ অথবা ভয়ানক নিষ্ঠুর দেবগণ উপাসিত হন; এই দেবতা বা মৃত পূর্ব্বপুরুষের মোটামুটি ভাবটা কি? ভাবটা এই যে, ইহারা প্রকৃতি হইতে উন্নত, এই মান্ন দ্বারা বদ্ধ নন। অবশ্য তাহাদের প্রকৃতির ধারণা খুব সামান্য। তাহারা কেবল আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ শক্তি দ্বয়ের সহিত পরিচিত। উপাসক—একজন অজ্ঞ ব্যক্তি, খুব স্থূল ধারণা, তিনি গৃহের দেওয়াল অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন না, ১৫ই চৈত্র, ১৬০৭।]

অথবা শূন্য উড়িতে পাবেন না, সূতরাং তাঁহার সমস্ত ক্ষমতার ধারণা। এই টুকু যে, এই সকল বাধা অতিক্রম করা বা না করা, সূতরাং তিনি যে দেবগণের উপাসনা করেন, তাঁহার দেয়াল ভেদ করিয়া অথবা আকাশের মধ্যে দিয়া চলিয়া যাইতে পারেন, অথবা নিষ্করূপ পরিবর্তন করিতে পারেন। দার্শনিক ভাবে ইহার অর্থ কি? অর্থ এই যে, এখানেও সেই মুক্তির ভাব রহিয়াছে, তাঁহার দেবতার ধারণা পরিজ্ঞাত প্রকৃতির ধারণা হইতে উন্নত। আবার ঐহার তদপেক্ষা উন্নত দেবতার উপাসক, তাঁহাদের সম্বন্ধেও সেই একই মুক্তির অপরবিধ ধারণা। যেমন প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা উন্নত হইতে থাকে, তেমনি প্রকৃতির প্রভু আবার ধারণাও উন্নত হইতে থাকে; অবশেষে আমরা একেশ্বরবাদে উপনীত হই। এই মায়া—এই প্রকৃতি রহিয়াছেন, আর এই মায়ার প্রভু একজন রহিয়াছেন—ইহাই আমাদের আশার স্থল।

যেখানে প্রথম এই একেশ্বরবাদসূচক ভাবের আরম্ভ, সেইখানে বেদান্তেরও আরম্ভ। বেদান্ত ইহা হইতেও গভীরতর তত্ত্বানুসন্ধান করিতে চান। বেদান্ত বলেন, এই মান্নাপ্রপঞ্চের পশ্চাতে যে এক আত্মা রহিয়াছেন, যিনি মায়ার প্রভু, অথচ যিনি মায়ার অধীন নন, তিনি যে আমাদের দিকে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন এবং আমরাও যে সকলে তাঁহারই দিকে ক্রমাগত চলিতেছি, এই ধারণা সত্য বটে, কিন্তু এখনও যেন ধারণা স্পষ্ট হয় নাই, এখনও যেন এই দর্শন অস্পষ্ট ও অস্ফুট—যদিও উহা স্পষ্টতর যুক্তির বিরোধী নহে। যেমন আপনাদের স্তবগীতিতে আছে, ‘আমার ঈশ্বর তোমার অতি নিকটে’, বেদান্তীর পক্ষেও এই স্তুতি খাটিবে, তিনি কেবল একটা শব্দ পরিবর্তন করিয়া বলিবেন, ‘আমার ঈশ্বর আমার অতি নিকটে।’ আমাদের চরম পথ যে আমাদের অনেক দূরে, প্রকৃতির অতীত প্রদেশে, আমরা যে তাহার নিকট ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছি, এই তফাত তফাত ভাবে ক্রমশঃ আমাদের নিকটবর্তী করিতে হইবে, অবশ্য আদর্শের পবিত্রতা ও উচ্চতা বজায় রাখিয়া ইহা করিতে হইবে। যেন ঐ আদর্শ ক্রমশঃ আমাদের নিকট হইতে নিকটতর হইতে থাকে—অবশেষে সেই স্বর্গস্থ ঈশ্বর যেন প্রকৃতিস্থ ঈশ্বররূপে উপলব্ধ হন, শেষে যেন প্রকৃতিতে এবং সেই ঈশ্বরে কোন প্রভেদ থাকে না, তিনিই যেন এই দেহমন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে, অবশেষে এই দেহমন্দির রূপেই পরিজ্ঞাত হন, তাঁহাকেই যেন শেষে জীবাত্মা ও মাহুষ বলিয়া পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। এই থানেই বেদান্তের শেষ কথা। ঐহাকে ধর্মিগণ ১৮০

বিভিন্ন স্থানে অন্বেষণ করিতেছিলেন, তাঁহাকে এতক্ষণে জানা গেল । বেদান্ত বলেন, তুমি যে বাণী শুনিয়াছিলে, তাহা সত্য, তবে তুমি উহা শুনিয়া ঠিক পথে পরিচালিত হও নাই । যে মুক্তির মহা আদর্শ তুমি অনুভব করিয়াছিলে, তাহা সত্য বটে, কিন্তু তুমি উহা বাহিরে অন্বেষণ করিতে গিয়া ভুল করিয়াছ । ঐ ভাবকে তোমার খুব নিকটে নিকটে লইয়া আইস, যত দিন না তুমি জানিতে পার যে, ঐ মুক্তি, ঐ স্বাধীনতা তোমারই ভিতরে, উহা তোমার আত্মার অন্তরাত্মাস্বরূপ । এই মুক্তি বরাবরই তোমার স্বরূপই ছিল, এবং মায়া তোমাকে কখনই আক্রমণ করে নাই । এই প্রকৃতি কখনই তোমার উপর শক্তি বিস্তার করিতে সমর্থ ছিল না । বালককে ভয় দেখাইলে ঘেরূপ হয়, সেইরূপ তুমিও স্বপ্ন দেখিতেছিলে যে, প্রকৃতি তোমাকে নাচাইতেছেন, আর উহা হইতে মুক্ত হওয়াই তোমার লক্ষ্য । শুধু ইহা বুদ্ধিপূর্বক জানা নখে, প্রত্যক্ষ করা, অপরোক্ষ করা—আমরা এই জগৎকে যতদূর স্পষ্টভাবে দেখিতেছি, তদপেক্ষা স্পষ্ট ভাবে উহা উপলব্ধি করা । তখনই আমরা মুক্ত হইব, তখনই সকল গোলমাল চুকিয়া যাইবে, তখনই হৃদয়ের চঞ্চলতা সকল স্থির হইয়া যাইবে, তখনই সমুদয় বক্রতা সরল হইয়া যাইবে, তখনই এই বহুত্বভ্রান্তি চণিয়া যাইবে, তখনই এই ঐক্যভি, এই মায়া, এখনকার মত ভয়ানক, অবসাদকর স্বপ্ন না হইয়া অতি সুন্দররূপে প্রতিভাত হইবে, আর এই জগৎ এখন যেমন কারাগার প্রভীতমান হইতেছে, তাহা না হইয়া ক্রীড়াক্ষেত্র স্বরূপ প্রতিভাত হইবে, তখন বিপদে বিশৃঙ্খলা, এমন কি, আমরা যে সকল যন্ত্রণা ভোগ করি, তাহারাও ব্রহ্মভাবে পরিণত হইবে—তাহারা তখন তাহাদের প্রকৃত স্বরূপে প্রতিভাত হইবে—সবল বস্তুর পশ্চাতে, সকল বস্তুর সারসত্তা স্বরূপ তিনিই দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন দেখা যাইবে, আর বুঝিতে পারা যাইবে যে, তিনিই আমার প্রকৃত অন্তরাত্মাস্বরূপ ।

ব্রহ্ম ও জগৎ ।

অদ্বৈত বেদান্তের এই বিষয়টা ধারণা করা অতি কঠিন যে, অনন্ত ব্রহ্ম যিনি, তিনি সগীম হইলেন কিরূপে । এই প্রশ্ন মানুষ চিরকালই জিজ্ঞাসা করিবে, কিন্তু সারাজীবন এই প্রশ্নের অনুধ্যান করিয়াও মানুষের অন্তর হইতে এই প্রশ্ন বিদূরিত হইবে না—অনন্ত অগীম যিনি, তিনি সগীম হইলেন কিরূপে ?
[১৫ই চৈত্র, ১৩০৭.]

উদ্বোধন ।

১৮১

আমি এক্ষণে এই প্রশ্নটি লইয়া আলোচনা করিব। ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্ত আমি নিম্নলিখিত চিত্রের সাহায্য গ্রহণ করিব।

এই চিত্রে (ক) ব্রহ্ম, (খ) জগৎ। ব্রহ্ম জগৎ হইয়াছেন। এখানে

(ক) ব্রহ্ম	
(গ)	
দেশ	
কাল	
নিমিত্ত	
(খ) জগৎ	

জগৎ অর্থে শুধু জড়জগৎ নহে, সূক্ষ্ম জগৎ আধ্যাত্মিক জগতও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে হইবে—

স্বর্গ, নরক, এক বথায়, বাহা কিছু আছে, জগৎ অর্থে তৎসমুদয় বুঝিতে হইবে। মন এক প্রকার পরিণামের নাম, শরীর আর এক প্রকার পরিণামের নাম—উত্থাদি, ইত্যাদি; এই সব লইয়া জগৎ।

এই ব্রহ্ম (ক) জগৎ (খ) হইয়াছেন—দেশ-কালনিমিত্তের (গ) মধ্য দিয়া আসিয়া, অবৈত-

বাদের এই মূল কথা। দেশকালনিমিত্তরূপ আদর্শের মধ্য দিয়া ব্রহ্মকে আমরা দেখিতেছি, আর নীচের দিক হইতে দেখিলে এই ব্রহ্ম জগজ্ঞাপ দৃষ্ট হন। ইহা হইতে বেশ বোধ হইতেছে, যেখানে ব্রহ্ম, সেখানে দেশকালনিমিত্ত নাই। কাল তথায় থাকিতে পারে না, কারণ, তথায় মনও নাই, চিন্তাও নাই। দেশ তথায় থাকিতে পারে না, কারণ তথায় কোন পরিণাম নাই। গতি এবং নিমিত্ত বা কার্যকারণভাবও তথায় থাকিতে পারে না, যথায় একগাত্র সত্তা বিরাজমান। এইটী বুঝা এবং বিশেষরূপ ধারণা করা আমাদের আবশ্যক যে, বাহ্যকে আমরা কার্যকারণভাব বলি, তাহা ব্রহ্ম প্রপঞ্চরূপে অবনতভাবাপন্ন হইবার পর (যদি আমরা এইরূপ ভাষা প্রয়োগ করিতে পারি) আরম্ভ হয়। তাহার পূর্বে নহে; আর আমাদের ইচ্ছা বাসনা প্রভৃতি বাহা কিছু, সব তারপর হইতে আরম্ভ হয়। আমার বরাবর এই ধারণা যে, শোপেনহাওয়ার (Schopenhauer) বেদান্ত বুঝিতে এই জায়গায় ভ্রমে পড়িয়াছেন—তিনি এই ‘ইচ্ছা’কেই সর্বস্ব করিয়াছেন। তিনি ব্রহ্মের স্থানে এই ‘ইচ্ছা’কে বসাইতে চান। কিন্তু পূর্ণব্রহ্মকে কখন ‘ইচ্ছা’ বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে না, কারণ, ইচ্ছা জগৎপ্রপঞ্চের অন্তর্গত ■ পরিণামশীল, কিন্তু ব্রহ্ম (‘গ’ এর অর্থাৎ দেশকালনিমিত্তের উপরে) কোনরূপ গতি নাই, কোনরূপ পরিণাম নাই। ঐ (গ) এর নিম্নেই গতি—বাহ্য বা আস্তর সর্বপ্রকার গতির আরম্ভ; এই আস্তরিক গতিকেই চিন্তা বলে। অতএব, (গ) এর উপরে কোনরূপ ইচ্ছা থাকিতে পারে না, সুতরাং ‘ইচ্ছা’ জগতের কারণ ১৮২ উদ্বোধন। [৩য়—৬ষ্ঠ সংখ্যা ;

হইতে পারে না। আরো নিকটে অসিরা পর্যবেক্ষণ কর; আমাদের শরীরের সকল গতি ইচ্ছাপ্রযুক্ত নহে। আমি এই চেয়ারখানি নাড়িলাম। ইচ্ছা অবশ্য উহা নাড়াইবার কারণ, এই ইচ্ছাই পৈশিক শক্তিরূপে পরিণত হইয়াছে। এ কথা ঠিক বটে। কিন্তু যে শক্তি চেয়ারখানি নাড়াইবার কারণ, তাহাই আবার স্রবণ সুক্ষ্মসূক্ষ্মকেও সঞ্চালিত করিতেছে, কিন্তু 'ইচ্ছা' রূপে নহে। এই দুই শক্তিই এক ধরিয়। লইলেও যখন উহা জ্ঞানের ভূমিতে আরোহণ করে, তখনই উহাকে 'ইচ্ছা' বলা যায়, কিন্তু ঐ ভূমি আরোহণ করিবার পূর্বে উহাকে ইচ্ছা বলিলে উহাকে ভুল নাম দেওয়া হইল, বলিতে হইবে। ইহাতেই শোপেনহাওয়ারের দর্শনে বিশেষ গোলযোগ হইয়াছে। বরং এখানে 'প্রজ্ঞা ও সন্ধিৎ' শব্দদ্বয় ব্যবহার করিলে ভাল হয়। এই শব্দ দুইটা মনের সর্বপ্রকার অবস্থার সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইতে পারে। প্রজ্ঞা ও সন্ধিৎ ঠিক জ্ঞানের অবস্থা বা জ্ঞানের পূর্বাবস্থা নহে, বরং উহার এক প্রকার পরিণামমাত্র বলা যাইতে পারে। যাহা হউক, আমরা কোন বিষয়ের কারণ কেন জিজ্ঞাসা করি, তাহা এইবার বুঝা যাইবে। একটা প্রস্তর পড়িল, আমরা অমনি প্রশ্ন করিলাম, উহার পতনের কারণ কি? এই প্রশ্নের জ্ঞাত্যতা বা সম্ভবনীয়তা এই অনুমান বা ধারণার উপর নির্ভর করিতেছে যে, যাহা কিছু ঘটে তাহারই পূর্বে—প্রত্যেক গতিরই পূর্বে আর কিছু ঘটিয়াছে। এই বিষয়টা সৰ্ব্বদা আপনাদিগকে খুব স্পষ্ট ধারণা করিতে অনুরোধ করিতেছি, কারণ, যখনই আমরা জিজ্ঞাসা করি, এই ঘটনা কেন ঘটিল, তখনই আমরা মানিয়া লইতেছি যে, সব জিনিষেরই, সব ঘটনারই, একটা 'কেন' থাকিবে, অর্থাৎ উহা ঘটবার পূর্বে আর কিছু উহার পূর্ববর্তী থাকিবে। এই পূর্ববর্তিতা ও পরিবর্তিতাকেই 'নিমিত্ত' বা 'কার্য্যকারণতাব' বলে, আর যাহা কিছু আমরা দেখি, শুনি, অনুভব করি, সংক্ষেপে জগতের সমুদয়ই, একবার কাণে, আবার কাঁধে হইতেছে। একটা জিনিষ তাহার পরবর্তীর কারণ হইতেছে, কিন্তু আবার উহাই তাহার পূর্ববর্তী কোন কিছুর কার্য্য। ইহাকেই কার্য্যকারণের নিয়ম বলে, ইহাই আমাদের স্থির বিশ্বাস। আমাদের বিশ্বাস, জগতের প্রত্যেক পরমাণুই অপর সমুদয় বস্তুর সহিত, তাহা যাহাই হউক না কেন, তাহার সহিত সংযুক্ত আছে। আমাদের এই ধারণা কিরূপে আসিল, এই লইয়া ভয়ানক বাদান্তবাদ হইয়া গিয়াছে। ইউরোপে অনেক স্তম্ভস্বাদী (Intuitive) দার্শনিক আছেন, তাঁহাদের বিশ্বাস, ইহা মানবজাতির স্বভাবগত ধারণা, আবার

অনেকের ধারণা, ইহা ভ্রমোদর্শনলক্ষ, কিন্তু এই প্রশ্নের এখনও সীমাংসা হয় নাই। বেদান্ত ইহার কি সীমাংসা করেন, আমরা পরে দেখিব। অতএব আমাদের প্রথম ইহা বুঝা উচিত যে, ‘কেন’ এই প্রশ্নটি এই ধারণার উপর নির্ভর করিতেছে যে, উহার পূর্ববর্তী কিছু আছে, এবং উহার পরে আরো কিছু ঘটিবে। এই প্রশ্নে আর এক বিশ্বাস অন্তর্নিহিত রহিয়াছে যে, জগতের কোন পদার্থই স্বতন্ত্র নহে, সকল পদার্থেরই উপর উহার বহিঃস্থ অপর কোন পদার্থ কার্য্য করিতে পারে। জগতের সকল বস্তুই এইরূপ পরস্পর সাপেক্ষ—একটি অপরটির অধীন—কেহই স্বতন্ত্র নহে। যখন আমরা বলি, ‘ব্রহ্মের উপর কোন্ শক্তি কার্য্য করিল?’ তখন আমরা এই ভুল করিতেছি—ব্রহ্মকে জগতের সামিগ্গ কোন বস্তুব জ্ঞায় বোধ করিতেছি। এই প্রশ্ন করিতে গেলেই আমাদের অসুস্থ করিতে হইবে যে, সেই ব্রহ্মও অপর কিছুই অধীন—সেই নিরপেক্ষ ব্রহ্মসত্তাও অপর কিছুই দ্বারা বদ্ধ। অর্থাৎ ‘ব্রহ্ম’ বা ‘নিরপেক্ষ সত্তা’ শব্দটিকে আমরা জগতের জ্ঞায় মনে করিতেছি। পূর্বোক্ত রেখার উপরে ত আর দেশকালনিমিত্ত নাই, কারণ উহা একমেবাদ্বিতীয়ং, মনের অতীত। যাহা কেবল নিজেই অস্তিত্বে নিজে প্রকাশিত, যাহা একমাত্র একমেবাদ্বিতীয়ং, তাহার কোন কারণ থাকিতে পারে না। যাহা মুক্তস্বভাব—স্বতন্ত্র, তাহার কোন কারণ থাকিতে পারে না, কারণ, তাহা হইলে তিনি মুক্ত হইলেন না, বদ্ধ হইয়া গেলেন। যাহার ভিতর আপেক্ষিকতা আছে, তাহা কখন মুক্ত-স্বভাব হইতে পারে না। অতএব তোমরা দেখিতেছ, অনন্ত সান্ত্ব কেন হইল, এই প্রশ্নই ভ্রমান্বক—উহা স্ববিরোধী। এই সব স্মৃতি বিচার ছাড়িয়া দিয়া সাদাসিধে ভাবেও আমরা এ বিষয় বুঝাইতে পারি। মনে কর, আমরা বুঝিলাম, ব্রহ্ম কিরূপে জগৎ হইলেন, অনন্ত কিরূপে সান্ত্ব হইলেন, তাহা হইলে ব্রহ্ম কি ব্রহ্মই থাকিবেন—অনন্ত কি অনন্তই থাকিবেন? তাহা হইলে ॥ অনন্ত সান্ত্বই হইয়া গেলেন। মোটামুটি আমরা জ্ঞান বলিতে কি বুঝি? যে কোন বিষয় আমাদের মনের বিষয়ীভূত হয়, অর্থাৎ মনের দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়, তাহাই আমরা জানিতে পারি, আর যখন উহা আমাদের মনের বাহিরে থাকে অর্থাৎ মনের বিষয়ীভূত না হয়, তখন আমরা উহা জানিতে পারি না। এক্ষণে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, যদি সেই অনন্ত ব্রহ্ম মনের দ্বারা সীমাবদ্ধ হইলেন, তাহা হইলে তিনি আর অনন্ত রহিলেন না; তিনি সসীম হইয়া গেলেন। মনের দ্বারা যাহা কিছু সীমাবদ্ধ, সবই সসীম। অতএব, সেই ‘ব্রহ্মকে জানা’ এ কথা আবার

তত্ত্বি দীর্ঘগ্রহণ কৰ্ত্তব্যম্ । ন কৰ্ত্তব্যম্ । উপরিটাদ্যোগবিভাগঃ কৰিষ্যতে ।
অকঃ সৰ্বৰ্ণে একোভবতি । ততো দীৰ্ঘঃ । দীৰ্ঘশ্চ সতততি । যঃ একঃ পূৰ্বো-
পরয়োৱিত্যেবং নির্দিষ্ট ইতি ।

বঙ্গাহ্বাদ।—একটী মাত্র বর্ণ আদেশে, দীর্ঘ গ্রহণ কৰ্ত্তব্য । * । যদি
তকারান্তরহিত এওঙ্কঐঐচ্ছন্ন করা যায়, তবে, “কোনও বর্ণস্থলে একটী মাত্র
বর্ণ আদেশ করিতে হইলে, সেটী দীর্ঘ বর্ণ হয়, এইরূপ আদেশ করিতে হইবে” ।
আদৃগুণঃ ৬।১৮৭। (অবর্ণের পরে অচ্ প্রত্যাহার স্থিতবর্ণ অর্থাৎ স্বরবর্ণ থাকিলে,
উভয়ে মিলিয়া গুণরূপ একটী আদেশ হয়। যেমনঃ—উপেক্স) বৃদ্ধি রেচি ৬।১৮৮
(অবর্ণের পরে এচ্ প্রত্যাহারস্থিত বর্ণ অর্থাৎ এ ঐ ও ঔ থাকিলে, উভয়বর্ণ
মিলিয়া বৃদ্ধি রূপ এক আদেশ হয়। যেমনঃ—গঙ্গৌষঃ) এই সুত্রদ্বয়ে উভয়ে
মিলিয়া যে এক বর্ণ আদেশ করা হইয়াছে, সে স্থানে দীর্ঘরূপ একাদেশ করা
অবশ্যই কৰ্ত্তব্য হইবে ।

কি প্রয়োজনে দীর্ঘ গ্রহণ করিতে হইবে ?

অন্তরতমতা (১) প্রযুক্ত তিন মাত্রা বা চারি মাত্রা মিলিত বর্ণের স্থানে, যেহ
তিন মাত্রা চারি মাত্রা বিশিষ্ট কোনও বর্ণ আদেশ না হয়, এই জন্তই উভয় বর্ণ
মিলিয়া একাদেশ বিধান করিতে হইলে, সেই একাদেশ দীর্ঘরূপ একাদেশই
হইয়া থাকে, এইরূপ বলিতে হইবে ; নতুবা খটা শব্দের আকারে দুই মাত্রা
থাকতে এবং ইচ্ছাশব্দের ইকারে একমাত্রা থাকতে, যেখানে আকার এবং
ইকার মিলিয়া একার আদেশ হওয়াতে, খটেক্স আদেশ হইয়াছে ; সেই একারে
তিনি মাত্রাবিশিষ্ট একার শ্রবণ হইবে । এইরূপ খটা উদকন্ খটোদকম্ ।
খটা ঈশা এই উভয় শব্দের আকার এবং ঐকার প্রত্যেকেই দুই মাত্রা বিশিষ্ট
হওয়াতে, উভয়ে মিলিয়া চারি মাত্রাবিশিষ্ট খটেশা, এইরূপ একারবিশিষ্ট শব্দ
শ্রবণ হইবে । এবং খটা শব্দের দুই মাত্রা বিশিষ্ট আকারের সহিত, উচা
শব্দের দুই মাত্রা বিশিষ্ট উকার মিলিত হইয়া চারি মাত্রা বিশিষ্ট খটোচা
শব্দ হইবে । খটা শব্দের দুই মাত্রা বিশিষ্ট আকারের সহিত, এলকা শব্দের
দুই মাত্রা বিশিষ্ট একার মিলিত হইয়া, চারি মাত্রা বিশিষ্ট একার যুক্ত খটৈ-
লকা এইরূপ শব্দ হইবে । এইরূপ খটা শব্দের দুই মাত্রা বিশিষ্ট আকারের
সহিত, যথাক্রমে দুই মাত্রা বিশিষ্ট ওদন শব্দ মিলিত হইয়া, চারি মাত্রা বিশিষ্ট
খটৌদন, ঐতিকায়ন শব্দের দুই মাত্রা বিশিষ্ট একার মিলিত হইয়া, চারি
মাত্রা সম্পন্ন একার বিশিষ্ট খটৌতিকায়ন, ওপগব শব্দের দুই মাত্রা বিশিষ্ট
১৫ই চৈত্র, ১৩০৭।] উদোদন । [৪] ১৮৫

উকার মিলিত হইয়া, চারি মাত্রা সম্পন্ন ঔকার বিশিষ্ট, খট্টোপগব পদ সম্পন্ন হইবে। এই সকল স্থলে, আকারের সহিত ঐ, উ, এ, ঐ, ও, ঔ প্রভৃতি বর্ণ মিলিত হইয়া এ, ঐ, ও, ঐ প্রভৃতি একাদেশ হওয়াতে, সেই আদিষ্ট একাদেশি বর্ণ চারি মাত্রা বিশিষ্ট হয় বলিয়া, চারি মাত্রা বিশিষ্ট বর্ণ শাস্ত্রে ব্যবহার না থাকিতে, “এক আদেশে কারিতে হইলে, দুই মাত্রা বিশিষ্ট বর্ণই হইয়া থাকে”, এইরূপ দৃষ্টা কর্তব্য।

যদি এইরূপই করিতে হয়, তাহা হইলে পানিনি-কর্তৃক প্রদত্ত সূত্র অথবা কাশ্যায়ন দ্বত বাদিতেন, দীর্ঘ শব্দ বিধান করা কর্তব্য ?

তাহা কর্তব্য নহে। যেহেতু ইতি, উপরোক্ত সূত্রে যেরূপ বিভাগ করিয়াই প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে। যেমন, “অকঃ সর্বণে দীর্ঘঃ” ৬।১।১১। এই সূত্রে দুই ভাগ করিয়া এক ভাগে ‘অকঃ সর্বণে’, অপর ভাগে ‘দীর্ঘঃ’, এইরূপ করিতে হইবে। তাহা হইলে, এইরূপ অর্থ হইবে যে, ‘অকঃ সর্বণে’ অর্থাৎ অক্ প্রত্যাহার বিশিষ্ট বর্ণের (অ, ই, উ, ঋ, ৯) পরে, সর্বণ (১) অচ্ প্রত্যাহার-স্বর্গত বর্ণ থাকিলে কোনও একটা মাত্রা আদেশ হয়। অপর-শে দীর্ঘ এই শব্দ রাখিলে, ইহাই অর্থ হইবে যে, পূর্ণ শব্দ এবং পরশব্দের উভয় বর্ণ মিলিয়া একটা মাত্রা আদেশ, যেখানেই হইবে, সেখানে সেই আদেশ দীর্ঘই হইবে।

“অকঃ সর্বণে দীর্ঘঃ” এই সূত্রে যেরূপ বিভাগ করিয়া, যখন এইরূপ অর্থই হইল যে, পূর্ণ ও পরের স্থানে একটা মাত্রা বর্ণ আদেশ হইলে, সেই আদিষ্ট বর্ণটী দীর্ঘই হইবে, তখন খট্টা শব্দের আকারের সহিত ইজ্জ শব্দের ইকার, যখন আকার এবং ইকার মিলিত হইয়া, একাব রূপ এক আদেশই হইয়াছে, তখন সেই একাব রূপ ও দীর্ঘ অর্থায় দুই মাত্রা বিশিষ্ট না হইয়া, আকারের দুই মাত্রা ও ইকারের এক মাত্রা মিলিত হইয়াছে বলিয়া, তিন মাত্রাবিশিষ্ট একাব হইতে পারিবে না। এইরূপ খট্টোলকা, খট্টোপগব এই সকল শব্দও ঐকার এবং ঔকারও, কিছুতেই দুই মাত্রাবিশিষ্ট দীর্ঘ না হইয়া, চারি মাত্রা হইতে পারিবে না।

(১) যে সকল বর্ণের সমান সমান স্থান এবং সমান সমান প্রকৃত তাহাদের সর্বণ সংজ্ঞা হয়। সমান স্থান যেমন :—ককারের সহিত গ কারের বা হকারের, চকারের সহিত জকারের, অ কারের সহিত আকারের পরস্পর সমান স্থান বলিয়া ইহাদের সর্বণ সংজ্ঞা। সমান প্রকৃত বর্ণা :—ককারের আভ্যন্তর স্পৃষ্ট প্রকৃত (এবং বাহ্য মহাপ্রাণ)। একত্র ইহাও পরস্পর সর্বণ।

ভাষ্যমূল।—ইহাপি তর্হি প্রাপ্নোতি । পত্নং বিদ্ধং পচস্তীকি । নৈষ দোষঃ । ইহ তাৎপর্যমিতি অম্বোক ইন্দ্রিয়তা সিদ্ধং সৌগম্যেবং মিলে সতি যৎ পূর্ণগ্রহণং করোতি তন্ত্ৰৈতৎপ্রয়োজনং যথাজাতীয়কঃ পূর্বস্তথাভাজাতীয়ক উভয়োর্থায়াদিতি ।

বঙ্গানুবাদ।—যদি পূর্বপদের স্থানে একটী মাত্র আদেশ হইলে, সেই আদেশটী দীর্ঘই হয় ; তবে পশুং, বিদ্ধং, পচস্তি, এই সকল স্থলেও পূর্বপদের স্থানে এক আদেশ হওয়াতে, সেই আদেশটী 'দীর্ঘ' হইবে । যেমন গণুং (১) ইত্যাদি । এখানে পশু শব্দের দ্বিতীয়ার এক বচনে পশুম্ এইরূপ হওয়া অসংগত ।

ই স্থলে দোষ হইতে পারে না । কেননা পশু শব্দে স্থলে 'অমি' এইরূপ স্থর করিলেই, পূর্বপর্তী স্থত্রাতুর হইতে, 'পূদ' এই শব্দের অন্তরুক্তি আনিয়া, এইরূপ অর্থ হইবে যে, 'অম্' দিকৃতি পরে থাকিলে, পূর্বরূপ এক আদেশ হয় ; সুতরাং এইরূপেই যখন 'পশুম্' এই পদ সিদ্ধ হয়, তখন যে 'অমি পূর্নঃ' এই স্থত্রে পুনরায় 'পূর্ন' গ্রহণ করা হইয়াছে, 'ত'ভাব ইত্যই উদ্দেশ্য যে, পূর্বপর্তী শব্দ হ্রস্ব বা দীর্ঘ যেই জাতীয়ই হউক না কেন, উভয় শব্দ মিলিয়া সেই জাতীয়ই পূর্বরূপ এক আদেশ হইবে । এই উদ্দেশ্যেই যখন 'অমি পূর্ন' এই স্থত্রে পূর্নগ্রহণ করা হইয়াছে, তখন এই স্থলে পূর্বশব্দের বিশেষ বিধান হেতু, একা-
দেণ কালে কেবল মাত্র দীর্ঘই আদেশ হইবে না । সুতরাং পশুম্ পক্ষে উকার হইয়া যাব যে, পশুম্ এইরূপ অন্তরুক্ত প্রয়োগ হইবে বলিয়া ভয় ছিল, তাহাও থাকিবে না এবং কোনও দোষও ঘটবে না ।

ভাষ্যমূল।—বিধমিতি । পূর্বইত্যেবানুবর্ততে । অথবা আচার্য্য প্রবৃতি-
জ্ঞাপয়তি নানেন সংপ্রসারণত্ব দীর্ঘত্বং শান্তি ।

বঙ্গানুবাদ।—বিদ্ধম্ এই স্থত্রে পূর্বশব্দের অন্তরুক্তি করতে হইবে ।

তাৎপর্যার্থঃ—গ্রহিৎসাবয়বি বাধি বষ্টি বিজতি বৃশ্চতি পুচ্ছতি ভৃঞ্জয়ীনাং
কিঙ্গিচি ৬ । ১ । ১৬ । (এই সকল ধাতুর পরে ককার ইং এবং নকার ইং
প্রত্যয় হইলে সংপ্রসারণ হয়), সুতরাং 'ব্যাধ্' ধাতুর উত্তর ৬ প্রত্যয় করিলে,

(১) অমি পূর্নঃ । ৬ । ১ । ১১ অক্ প্রত্যাহাৎ বর্বেব পরে, অম্ লগ্ন্যকি অচ্ অর্থাৎ
অরবর্গ থাকিলে, পূর্বরূপ এক আদেশ হয় । যেমন :—'রাম' শব্দের দ্বিতীয়া বিভক্তিতে
অম্ প্রত্যয় যোগ করিলে, রামশব্দের অকার এবং অম্ প্রত্যয়ের অকার উভয়ে মিলিত হইয়া
পূর্বরূপ এক আদেশ হইলে, রামম্ হইয়া থাকে ।

১৫ই চৈত্র, ১৩০৭ ।]

উদ্বোধন ।

১৮৭

‘বা’এর যকারের স্থানে সংপ্রসারণ হইয়া, ক্রস্ব ইকার আদেশ হইল। অতএব বিক্রম্ এই পদ সিদ্ধ হইবে। কিন্তু এস্থলে ইহাও বলা কর্তব্য যে, বাধু ধাতুর যকারের স্থানে সংপ্রসারণ হইয়া ইকার হইলে, সেই ইকার বাহ্যতে পূর্ব বর্ণই হয়; এই জন্য ‘পুন’ এই শব্দের অনুবৃত্তি করিতে হইবে। নতুবা বিক্রম্ এই শব্দেতে ক্রস্ব ইকার হইবে না। যেহেতু উভয় বর্ণ মিলিত হইয়া একাদেশ হইলে, সেই এক আদেশ দীর্ঘই হইয়া থাকে, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে।

অথবা ইহাতে আচাৰ্য্য পাণিনিরই অভিপ্রায় জানা যাইতেছে যে, এই স্থলে ‘সংপ্রসারণত্’ ৬। ৩। ১০৯। (সংপ্রসারণের দীর্ঘ হয়, শেষ পদ হইলে); এই সূত্রাভিপ্রায়ানুসারে দীর্ঘ হইবে না। যদি সংপ্রসারণের সর্বত্রই দীর্ঘ প্রাপ্তি হইত; তবে আর ‘হলঃ’ ৬। ৪। ১। (হলের পর যে সংপ্রসারণ, তাহার দীর্ঘ হয়) এই সূত্রদ্বারা দীর্ঘ বিধান কবিবাব প্রয়োজন ছিল না। পাণিনিও আচাৰ্য্য ‘সংপ্রসারণত্’ সূত্রে দ্বারায় সংপ্রসারণের দীর্ঘ বিধান করিয়াও পুনরায় ‘হলঃ’ সূত্রে দ্বারায়, হলের অর্থাৎ বাজনের পরবর্তী সংপ্রসারণের দীর্ঘবিধান করিয়াছেন; তখন এতদ্বারা ইহাই জানা যাইতেছে পূর্ববর্তী সূত্র সর্বত্র গ্রহণীয় নহে।

ভাষ্যমূল।—পচতীয়াতোগুণে পরিতীততাসিদ্ধং সোমমেবং সিন্ধে সতি যজ্ঞং গ্রহণং কৰোতি তন্ত্ৰৈতৎ প্রয়োজনম্ যথা জাতীয়কং পরস্য রূপং তথা জাতীয়কমুভয়ার্যগাসাদিতি।

বঙ্গমুদাদ।—পচস্তি এইস্থলে, ‘পচ্’ ধাতুর পরে, ‘কি’ স্থানে আদেশ করিয়া ‘অতোগুণে’ ৬। ১। ১৭। (পদান্তে ভিন্ন অকারের পরে গুণ বিশিষ্ট বর্ণ অর্থাৎ একার ওকারাদি থাকিলে, পর বর্ণের স্বরূপ একাদেশ হয়), এই সূত্রানুসারে পচস্তি এই পদ সিদ্ধ হইল। এই স্থলে, “গুণ পরে থাকিলে একাদেশ হয়”, এই রূপ বলিলেই যখন প্রয়োগ সিদ্ধ হয়, তখন যে আবার পর রূপ একাদেশ হয়, এইরূপ বলা হইয়াছে, তাহার ইহাই প্রয়োজন যে, পরস্থিতবর্ণ যে জাতীয় রূপ বিশিষ্ট হইয়াছে, পূর্বাপর উভয় বর্ণই সেই জাতীয় রূপ বিশিষ্ট বাহ্যতে হইতে পারে।

ভাষ্যমূল।—ইহ তহি খট্শ্যো মালশ্য ইতি দীর্ঘবচনাদকারো ন। অনাস্তর্যাদেবাকৌকারো ন। তত্র কো দোষঃ। বিগৃহীতস্য শ্রবণং প্রযজ্যেত। ন ক্রামা বরং যত্র ক্রিয়মাণে দোষঃ তত্র কর্তব্যমিতি কিং তর্হি। যত্র ক্রিয়মাণে ন দোষঃ তত্র কর্তব্যমিতি।

বঙ্গানুবাদ ।—যদি পূর্বাণর স্থানে একাদেশ হইলে, তাহা দীর্ঘই হয় ; তবে খট্টা + ঋশ, মালা + ঋশ এ স্থলে ঋকারের গুণ অর্ হইলে, খট্টা শব্দের দীর্ঘ আকারের পরে, অর্শ্য শব্দের হ্রস্ব অকার থাকিতে, পূর্বাণর স্থানে ‘অ’কার রূপ একাদেশ হইবে না । সুতরাং খট্টার্শ্য মাণর্শ্য প্রভৃতি পদও সিদ্ধ হইবে না । যদি বল যে, অকার না হইয়া একার অপবা ওকার হইবে, তাহাও হইবে না । যেহেতু আকারের সহিত একার বা ওকারের স্থান বা প্রবন্ধের কোনও রূপ অন্তর্য্যাত্ত (সাম্য) নাই । খট্টা বা মালা শব্দের আকারের পরে, অর্শ্য শব্দের অকার থাকিলে কোনও রূপ সিদ্ধি নাই বা হইল, তাহাতে কি দোষ হইবে ?

যাহা শাস্ত্রে কখনও গ্রহণ করা হয় না, তাহাই শুনা যাইবে । অর্থাৎ খট্টার্শ্য প্রভৃতি অশাস্ত্রীয় শব্দ ব্যবহৃত হইবে ।

তাহা হইবে না । যেহেতু আমরা ইহা বলিতেছি না যে, যেখানে পূর্বাণর স্থানে দীর্ঘরূপ একাদেশ করিলে, অসঙ্গত হইবে, সেখানেও দীর্ঘাদেশ করিতেই হইবে । তবে কি না, আমরা ইহাই মাত্র বলিতেছি যে, যেখানে পূর্বাণর স্থানে দীর্ঘ গ্রহণ করিলে দোষ হইবে না, সেখানেই দীর্ঘগ্রহণ করিতে হইবে ।

ভাষামূল ।—ক চ ক্রিয়মাণে ন দোষঃ । সংজ্ঞাবিধৌ । বৃদ্ধিরাদৈজ্ দীর্ঘঃ, অদেঙ্ গুণো দীর্ঘইতি । তত্ত্বি দীর্ঘগ্রহণং কৰ্ত্তব্যম্ । ন কৰ্ত্তব্যম্ । কস্মাদেবান্তর্ষ স্ত্রিমাত্রচতুর্মাত্রানাং স্থানিনাং ত্রিমাত্রাচতুর্মাত্রা আদেশা ন ভবতি । ত পরে গুণবৃদ্ধী । নহু চঃ পরো যস্মাৎ দোষ্যতপরঃ । ক্লদারবিভীতৈব ত্রাৎ । যবঃ স্তবঃ । কস্তর্হি দকারঃ । কিং দকারে প্রয়োজনম্ । অথ কিং ত কারে । বহুসন্দেহার্থন্তকারঃ দকারোপি । অথ মুখহুখার্থন্তকারঃ দকারোপীতি ।

বঙ্গানুবাদ ।—পূর্বাণর স্থানে একাদেশ করিলে, কোথায় দোষ হইবে না ? সংজ্ঞা বিধানে দোষ হইবে না । যেমন, ‘বৃদ্ধিরাদৈজ্’ ১।১।১ । এই সূত্রে দীর্ঘ গ্রহণ করা কৰ্ত্তব্য । তাহা হইলে আকার ঐকার এবং ওকার এই সকল বৃদ্ধি সংজ্ঞক বর্ণ সমূহ দুই মাত্রাবিশিষ্ট দীর্ঘ বর্ণই হইবে । তিন মাত্রা অথবা চারি মাত্রা হইবে না । এইরূপ গুণসংজ্ঞা বিধানেও দীর্ঘ গ্রহণ করা কৰ্ত্তব্য । যেমন:—‘অদেঙ্ গুণঃ’ ১।১।২ । এই সূত্রে দীর্ঘগ্রহণ করিতে হইবে । তাহা হইলে যেখানেই গুণ সংজ্ঞা প্রাপ্তি হইবে, সেখানেই পূর্বাণরের স্থানে দীর্ঘরূপ একাদেশ হইবে । তাহা হইলেই একার এবং ওকারে দুই মাত্রা বিশিষ্ট দীর্ঘ বর্ণ তিন তিন মাত্রা কি চারি মাত্রা বিশিষ্ট বর্ণ হইবে না ।

যদি এইরূপই হয় ; তবে বুদ্ধিরাদৈচ্ প্রভৃতি সংজ্ঞাবিধায়ক শব্দে দীর্ঘ শব্দ প্রয়োগ করা কর্তব্য ? তাহা হইলেও 'দীর্ঘ' নামক এত বৃহৎ একটী শব্দ, যত্ন প্রদেয় করাইতে হইবে বলিয়া, যত্ন বৃহৎ হওয়াতে দোষও হইবে ?

সংজ্ঞা বিধানে দীর্ঘশব্দ প্রয়োগের প্রয়োজন নাই। যদি দীর্ঘ শব্দ প্রয়োগই করা না হয়, তাহা হইলে কেনই বা 'খটা উদক' প্রভৃতি শব্দের দুই মাত্রা বিশিষ্ট আকার ও এক মাত্রা বিশিষ্ট ইকার প্রভৃতি মিলিত হইয়া, তিন মাত্রা চারি মাত্রা বিশিষ্ট বর্ণের স্থানে তিন মাত্রা চারি মাত্রা বিশিষ্ট একাক্ষর ওকার প্রভৃতি আদেশ হইবে না ?

তাহা হইবে না। কেন না, 'তপরন্তংকালত্' (১) এই শব্দে যে কেবল ঙ্কার পরে আছে যাহার তাহার সমকাল বিশিষ্ট বর্ণেরই সংজ্ঞা হইবে, এরূপ নহে। বরং ত কার পরে আছে যাহার, তাহারও সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে। তাহা হইলেই 'বুদ্ধিরাদৈচ্' শব্দে, দুই মাত্রা বিশিষ্ট আকারের পরে যে ত কার, তাহার পরে ঐচ্ গ্রহণ হওয়াতে, ঐকার ঔকারেরও দুই মাত্রাই হইবে। কেন না আত্ ঐচ্ এই স্থলে ত কারের পরে যখন ঐচ্ গ্রহণ হইয়াছে এবং ত কারের পূর্বে যখন দুই মাত্রাবিশিষ্ট আকার রহিয়াছে, তখন ত কারের পরে ঐকার ঔকার থাকিতে, তাহাদেরও আকারের সম কাল বিশিষ্ট দুই মাত্রা সম্পন্ন বর্ণই হইবে। সুতরাং সংজ্ঞা বিধানে দীর্ঘশব্দ উল্লেখ না করিলেও স্বতঃসিদ্ধই দীর্ঘ হইবে।

যদি তকারের পরস্থিত বর্ণেরও ত কার প্রযুক্ত কার্যই হয়, তবে 'স্বাদোরপ্' ৩.৩.৭। (স্ব বর্ণ অন্তে আছে এবং উবর্ণ অন্তে আছে যে ধাতুর, তাহার উত্তর অপ্ প্রত্যয় হয়) এই শব্দেও স্বঃ, উ (২) এই স্থলে 'উ' ত কারের পরে আছে বলিয়া ক্রস্ব উকারেরই মাত্র গ্রহণ হইবে। তাহা হইলে যু ধাতু এবং স্ত ধাতু এই ক্রস্বস্ত ধাতুর উত্তর অপ্ প্রত্যয় করিয়া যদিও যবঃ স্তবঃ প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে বটে ; কিন্তু লু ধাতু এবং পু ধাতু, এই দীর্ঘাস্ত ধাতুর উত্তর, 'অপ্' প্রত্যয় করিয়া লবঃ পবঃ পদ সিদ্ধ হইবে না।

এইরূপ প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে। যেহেতু 'স্বাদোরপ্', এই শব্দে স্বঃ উ অপ্

(১) এই শব্দের ব্যাখ্যা পূর্বে দ্রষ্টব্য।

(২) স্বঃ+উ স্বঃ। বজীর দ্বি বচনে ওস্ প্রত্যয় করিয়া স্বদোঃ পদ সিদ্ধ হইয়াছে। স্বদোঃ অপ্ স্বদোরপ্।

এইরূপ ত কার বিশিষ্ট স্বাকার নহে । এই স্থানে ঋদ্ উঃ অপ্ এইরূপ সন্ধি বিচ্ছেদ করিতে হইবে । সুতরাং ত কারের পরে উ কার না হওয়াতে, উকারের সমকাল বিশিষ্ট কেবল মাত্র হ্রস্ব উকারেরই গ্রহণ হইবে না । বরং উকারের সর্গ হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত প্রভৃতি সকল প্রকার উকারেরই গ্রহণ হইবে । তাহা হইলেই, দীর্ঘ উকার বিশিষ্ট লৃ ঋতু এবং প্লৃ ঋতুর উত্তর অপ্ প্রত্যয় বরিয়া, ‘লবঃ’ ‘পবঃ’ প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে । এইরূপ প্রয়োগ সিদ্ধ করিবার জন্ত, ইহাই বলিতে হইবে যে, ‘ঋণোরপ্’ স্থত্রে ‘ত’কার নাই ।

তবে কি ? ‘দ’কার ।

দ কারের প্রয়োজন কি ?

দকারের প্রয়োজন না থাকিলে, তোমার ‘ত’কার করিবারই বা প্রয়োজন কি ?

যদি ‘ঋণোরপ্’ স্থত্রে ঋকারের পরে তকার না করা যায়, তাহা হইলে ঋকারে উকারে মিলিত বগী বিভক্তিতে ওঃ হইলে ‘রোরপ্’ এইরূপ হুত্র হইবে । তখন সন্দেহ হইবে যে ঋকারের সহিত উকার মিলিত না হইয়া, র কারের সহিতও উকার মিলিত হইতে পারে । এই সন্দেহ নিবারণের জন্তই ঋকারের অন্তে ত কার পাঠ করা হইয়াছে ।

যদি সন্দেহ নিবারণের জন্তই তকার পাঠ হইয়া থাকে, তবে আমার দ কারও সন্দেহ নিবারণের জন্তই পাঠ হইয়াছে ।

যদি বল, যে তোমার মুখের সুখের জন্ত, ত কার পাঠ করিয়াছ ; তবে আমিও বলিব যে, আমার মুখের সুখের জন্ত আমি দকার পাঠ করিয়াছি ।

ভাষ্যমূল।—ইদং বিচার্যতে । য এতেষু বর্ণেষু বর্ধৈকদেশা বর্ণান্তর-সন্মানাক্রতর এতেষামায়বগ্রহণেন গ্রহণং স্যাচ্চা ন বেতি । কৃতঃ পুনরিয়ং বিচারণা । ইহ হি সমুদায়্য অপ্যাদিশ্রুন্তে অবয়বা অপি । অভ্যন্তরশ্চ সমু-দ্বায়ে অঙ্গদঃ । তদ্ যথা । বৃক্ষপ্রচলন্ সহাবয়বৈঃ প্রচলতি । তত্র সমুদায়-সুত্রাবয়বভাবয়বগ্রহণেন গ্রহণং স্যাচ্চা ন বেতি জায়তে বিচারণা ।

বঙ্গানুবাদ।—এক্ষণে এই বিচার করা যাইতেছে যে, (আ ঋ ২ এ ঐ ও ঔ) বর্ণগণের একদেশে যে বর্ণান্তরের তুল্য আকৃতি সমূহ আছে, তাহা বর্ণগ্রহণে গৃহীত হইবে কি না ? যেমন ;—ঐকার, এই বর্ণে অকার এবং ইকার মিলিত হইয়া রহিয়াছে । সুতরাং এক্ষণে ইহাই বিচার্য যে, কেবল মাত্র ‘ঐ’ এই বর্ণটি গ্রহণ করিলে, তাহার একাদেশ (একাংশ) অকার এবং ইকার গ্রহণ হইবে কি না ? কেনই বা এইরূপ বিচার করা যাইতেছে ?

একরূপ বিচারের প্রয়োজন এই যে, এই স্থলে কি (অ ঙ্গ ঐ ইত্যাদি) বর্ণের সর্বাংশই একত্রে উপদেশ করা হইয়াছে; না অবয়ব সমূহ ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ করা হইয়াছে ?

সমুদায় বর্ণেরই অভ্যন্তরে অবয়বও অবস্থান করিতেছে, যথা :—আকারে অ+অ এই ছইটী অকার। ঞ্কারে এক অংশ স্বর বর্ণ, অপরাংশ র্ বৎ ব্যঞ্জন বর্ণ। ঞ কারে একাংশ স্বরবর্ণ, অপরাংশ 'ল্'বৎ ব্যঞ্জন বর্ণ। একারে অ+ই, ওকারে অ+উ, ঐকারে অ+ঈ, ঔকারে অ+উ প্রভৃতি প্রযত্ন ভেদে অবস্থান করিতেছে। এই সকল বর্ণে, অত্র বর্ণের তুল্য বর্ণাংশ সমূহ ধর্তমান থাকিলেও সেই অংশ সমূহ, যখন মূল বর্ণ সমূহেরই অবয়ব বিশেষ; তখন মূল আকারাক্রম বর্ণ গ্রহণ করিলে তদংশ রূপে বর্তমান হ্রস্ব অকারাদিও গ্রহণ হইবে। যেমন, বৃক্ষ কাম্পিত হইলে তাহার শাখা প্রশাখাদি অবয়ব সমূহের সহিওই কাম্পিত হইয়া থাকে, সেইরূপ এই স্থানেও বর্ণের সমুদায় অঙ্গ স্থিত যে পৃথক পৃথক অবয়ব, তাহাদেরও বর্ণের সর্বাভাব্য গ্রহণে গহীত হইবে কি না, অথবা গ্রহণ করা হইবে না, এই স্থলে ইহাই বিচার করা বাইতেছে।

ভাষামূল।—কণ্ঠাত্ত বিশেষঃ। বট্টকদেশা বর্ণগ্রহণেন চেৎসক্যাক্ষরে সমানাক্ষরাবধিত্রিষেধঃ*। বট্টকদেশা বর্ণগ্রহণেন চেৎসক্যাক্ষরে সমানাক্ষরাশ্রয়ো বিধিঃ প্রাপ্নোতি সপ্রতিষেধঃ। অগ্নে ইন্দ্র। বায়ো উদকম্। “অকঃ সর্বণে দাব্য” ইতি দীর্ঘত্বং প্রাপ্নোতি।

বঙ্গানুবাদ।—এইরূপ বিচারের দ্বারা এমন বিশেষ কি ফল লাভ হইবে ?

বর্ণের একদেশও যদি বর্ণ গ্রহণে গৃহীত হয়, তবে মিলিতাক্ষরে তুল্যাক্ষর নিমিত্ত যে বিধি, তাহার নিষেধ প্রাপ্ত হইবে।*।

বর্ণের একাংশও যদি বর্ণগ্রহণেই গ্রহণীয় হয়, তাহা হইলে (এ ঙ্গ ঐ ঔ প্রভৃতি) সংযুক্তাক্ষরে, তুল্যাক্ষর নিমিত্ত যে বিধি প্রাপ্ত হওয়া উচিত, তাহার নিষেধ করা বক্তব্য হইবে।

তাৎপর্য্যার্থঃ—অ কারের পরে অ কার, ইকারের পরে ইকার প্রভৃতি সমান সমান বর্ণ পরে থাকিলে উভয়ে মিলিয়া দীর্ঘ হয়, যেমনঃ—লক্ষ্মী+ঈশ = লক্ষ্মীশ, হরি+ঈশ = হরীশ ইত্যাদি। এইরূপ সন্ধি অক্ষরে একার বা ওকারের পরে, ঙ্গ কার বা ঔ কার থাকিলেও উভয়ে মিলিয়া দাব্য একাদেশ হইবে। যেহেতু একারের শেষাংশে ই কার রহিয়াছে এবং ওকারের শেষাংশে উ কার রহিয়াছে। সুতরাং উভয় ই কার এবং উভয় উকার একত্র মিলিত হইয়া

১৩৬৩

১লা বৈশাখ, ১৩০৮ সাল; ৭ম সংখ্যা।

প্রাচ্য ও মধ্যপ্রাচ্য।

স্বামী বিবেকানন্দ।] ৫ JUN. ১৯ [১৩৬ পৃষ্ঠার পর।

বর্তমান কালে যতদূর দক্ষিণে যায়, জম্বুদ্বীপের মধ্যভাগ ও আরবের মরুভূমি অশুরদের প্রধান আড্ডা। এই স্থান হতে একদল ইন্দ্র, পশুপাল, মৃগয়াজীবী, অমরকুল, সভ্য দেবতাদের তাড়া দিখে, উনিয়াময় ছড়িয়ে দিয়েছে।

ইয়ুরোপ খণ্ডের আদিম নিবাসী এক প্রাচ্য অবস্থা ছিল। তারা পক্ষত-গম্ভবে বাস করতো; যারা ওব মধ্যে একটু বুদ্ধিমান, তারা অল্প গভীর তলাওয়ের জলে খোঁটা পুতে, মাচান বেঁধে, সেই মাচানের উপর ঘর দোর নির্মাণ করে বাস করতো। চক্ৰমকি পাথরের তীর, বর্ষার ফলা, চক্ৰমকির ছুরি ও পর ৩ দিবে সমস্ত কাজ চালাত।

ক্রমে জম্বুদ্বীপের নরস্রোত ইউরোপের উপর পড়তে লাগলো। কোথাও কোথাও অপেক্ষাকৃত সভ্য জাতিও অতীত হলে; ক্রম-দেখাভাগত কোনও জাতির ভাষা, ভারতের দক্ষিণি ভাষা অল্পপ।

কিন্তু এ সকল জাত বর্ষর, অতি বর্ষর অস্থায়ী রইল। এসিয়া মিনর হতে একদল সূসভা মানুষ মগিকট দ্বীপপুঞ্জে উদয় হল, ইউরোপের মগিকট স্থান অধিকার করলে, নিজেদের বুদ্ধি আর প্রাচীন মিসরের সাহায্যে এক অপূর্ব সভ্যতা সৃষ্টি করলে; তাদের আমরা বলি ববন, ইয়ুরোপীয়রা বলে গ্রীক।

পরে ইতালিতে রোমক নামক অল্প এক বর্ষর জাতি, ইট্রুস্কান নামক এক সভ্য জাতিকে পরাভূত করে, তাদের বুদ্ধি বিদ্যা সংগ্রহ করে নিজেরা সভ্য হলো। ক্রমে রোমকেরা চারিদিক অধিকার করলে; ইয়ুরোপ খণ্ডের দক্ষিণ পশ্চিম ভাগের যাবতীয় অসভ্য মানুষ তাদের প্রজা হলো। কেবল উত্তর-ভাগে বন জঙ্গলে বর্ষর জাতির স্বাধীন রইল। কাল বেশে রোম ঐশ্বর্য-বিলাস-পরতায় লুপ্ত হতে লাগলো; সেই সময় আবার জম্বুদ্বীপ অশুরগাহিনী ইউরোপের উপর নিষ্ফেপ করলে। অশুর তাড়নায় উত্তর-ইউরোপী বর্ষর রোম-সাম্রাজ্যের উপর পড়লো। রোম উৎসন্ন হয়ে গেল। জম্বুদ্বীপের তাড়ান, ইউরোপের বর্ষর আর ইউরোপের ধ্বংসাবশিষ্ট রোমক, গ্রীক মিলে এক অতিনব জাতির সৃষ্টি হলো; এ সময় যাহুদীজাতি রোমের দ্বারা বিজিত ও বিভাজিত হয়ে, ইয়ুরোপময় ছড়িয়ে পড়লো, সঙ্গে সঙ্গে তাদের নূতন ধর্ম ক্রিস্চানীও ছড়িয়ে পড়লো। এই সব বিভিন্ন জাত, মত, পথ, নানা প্রকারের

অশ্ব কুল, মহামারীর মুচিতে, দিবারাত্র যুদ্ধ, মারকাটের আড়নে, মৈল মিশিতে লাগলো ; তা হতেই এই ইউরোপী জাতির সৃষ্টি ।

হিহর কাল রক্ত থেকে, উত্তরে হৃদের মত সাদা রক্ত, কাল কটা লাল বা লাল চুল, কাল চোখ, কটা চোখ, নীল চোখ, দিবা হিহর মত নাক মুখ চোখ, বা ঝাঁতা মুখ চীনে রান, এই সকল আকৃতি বিশিষ্ট এক বর্ষর, অতি বর্ষর ইউরোপী জাতির সৃষ্টি হয়ে গেল । কিছু কাল তারা আপনা আপনি মার কাটি করতে লাগলো ; উত্তরের গুলো বেষ্টে রপে বাগে পেলেই অপেক্ষাকৃত সভ্যতার উৎসাদন করতে লাগলো । মাঝখান থেকে, কৃষ্ণান ধর্মের হুই গুরু, ইতালীর শোপ্ (ফরাসী, ইতালী ভাষায় বলে পাপ,) আর পশ্চিমে কনষ্টান্টিনোপলসের পাটিমার্ক, এরা এই জন্ত প্রায় বর্ষরবাহিনীর উপর, তাদের রাজা রাণী সকলের উপর কর্তৃত্ব চালাতে লাগলো ।

এদিকে আরব মক্কাতে মুসলমানি ধর্মের উদয় হলো, বহুপন্থপ্রায় আরব এক মহাপুরুষের প্রেরণাবলে অদম্য ভেজে, অনাহত বলে, পৃথিবীর উপর আঘাত করলে । পশ্চিম পূর্ব দু প্রান্ত হতে সে তরঙ্গ ইউরোপে প্রবেশ করলে । সে শ্রোত-মুখে ভারত ও প্রাচীন গ্রীসের বিস্তারিত ইউরোপে প্রবেশ করতে লাগলো ।

জব্বুরীপের মাঝখান হতে সেনসুল তাতার নামক অশ্বর জাতি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে, আসিয়া মাইনর প্রভৃতি স্থান দখল করে কেললে । আরাবরা ভারতবর্ষ জয়ের অনেক চেষ্টা করেও সফল হয় নাই । মুসলমান অভ্যুদয় সমস্ত পৃথিবী দিক্রয় করেও ভারতবর্ষের কাছে কুণ্ঠিত হয়ে গেল । সিদ্ধুদেশ একবার আক্রমণ করেছিল মাত্র, কিন্তু রাখেতে পারেনি ; তার পর থেকে আর উত্তম করে নাই ।

কয়েক শতাব্দির পর যখন তুর্ক প্রভৃতি তাতার জাতি বৌদ্ধধর্ম ছেড়ে মুসলমান হলো, তখন এই তুর্কিরা সমভাবে হিন্দু, পার্শী, আরাব, সকলকে দাস করে কেললে । ভারতবর্ষের সমস্ত মুসলমান বিজৈতার মধ্যে একদলও আরবি বা পার্শী নয়, সব তুর্কাদি তাতার । রাজপুতানার সমস্ত আগন্তুক মুসলমানের নাম তুর্ক—তাই সভ্য, ঐতিহাসিক । রাজপুতানার চারণ যে গাইলেন, “তুর্ক-পন্থো বচি জোর”, তাই ঠিক । তুর্ক-উদ্দীন হতে মোগল বাদশাই পর্যন্ত, ও সব তাতার ; যে জাত তুর্কী, সেই জাত ; কেবল হয়েছেন মুসলমান, আর হিহরপায়ণী যে করে বদলেছেন, চাকানুখ । ও এই প্রাচীন অশ্বর বংশ । আজও

কাবুল, পারস্ত, আরব্য, কন্টাস্টিনোপল সিংহাসনে বসে রাজত্ব কর্ছেন, সেই অমর তাতার। গাকারি, কারগী, আরাব সেই তুরকের গোলামী কর্ছেন। ব্রিট্‌টীন সাম্রাজ্যও সেই তাতার মাকুর পদতলে, তবে সে মাকু নিজের ধর্ম ছাড়ে নি, মুসলমান হয়নি, মহালামার চেলা। এ অমর জাত কসিন্ কালে বিজ্ঞাবুদ্ধির চর্চা করে না, জানে মাত্র লড়াই। ও রক্ত না মিস্লে, যুদ্ধবীৰ্য্য বড় হয় না। উত্তর ইয়ুরোপ, বিশেষ রুশের এবল যুদ্ধবীৰ্য্যে সেই তাতার। রুশ তিন হস্তে তাতার রক্ত। দেবাস্বরের লড়াই এখনও চলবে অনেক কাল। দেবতা অমর কত্যা বে করে, অমর দেবকন্তা ছিনিয়ে নেয়,—এই রকম করে এবল খিচুড়ী জাতের সৃষ্টি হয়।

তাতাররা আরবি বলিফার সিংহাসন কেড়ে নিলে, ক্রুশচানদের মহাতীর্থ জিরুগালম্ প্রভৃতি স্থান দখল করে ক্রুশচানদের তীর্থযাত্রা বন্ধ করে দিলে, অনেক ক্রুশচান্ মেরে ফেল্‌ল। ক্রুশচান্ ধর্ম্মের গুরুত্ব কেপে উঠলো; ইউরোপময় তাদের সব বর্কির চেলা; রাজা প্রজাকে কেপিয়ে তুল্‌ল,—পালে পালে ইউরোপী বর্কির জিরুগালম্ উদ্ধারের জন্ত আসিয়া মাইনরে চল্‌লো। কতক নিজেরাই কাটাঁকাটি করে মলো, কতক রোগে মলো, বাকি মুসলমানে মাস্তে লাগ্‌লো। সে যোর বর্কির কেপে উঠেছে,—মুসলমানেরা বত মারে, তত আসে। সে বুনের গৌ। আশ্বিনাদের দলকেই লুঠেছে, খাবার না পেলে মুসলমান ধরেই খেয়ে ফেল্‌লে। ইংরেজ রাজা রিচার্ড মুসলমান মাংসে বিশেষ খুশি ছিলেন, প্রসিদ্ধি আছে।

বুনে মাহুৰ, আর সভ্য মাহুৰের লড়ায়ে যা হয়, তাই হল,—জিরুগালম্ প্রভৃতি অধিকার করা হলো না। কিন্তু ইউরোপ সভ্য হতে লাগলো। সে চামড়া পরা, আস মাংস খেঁকো বুনা, ইংরেজ, ফরাসী, জর্মান্ প্রভৃতি এসিয়ার সভ্যতা শিখ্‌তে লাগ্‌লো, ইতালি প্রভৃতি স্থানের নাগা ফৌজ দার্শনিক মত শিখ্‌তে লাগ্‌লো; একদল ক্রুশচান্ নাগা (Knights templars) যোর অশ্বত বেদান্তী হয়ে উঠ্‌লো, শেষ তারা ক্রুশচানীকে ঠাট্টা কর্‌তে লাগ্‌লো; এবং তাদের ধনও অনেক সংগৃহীত হয়েছিল; তখন পোপের হুকুমে, ধর্ম্ম রক্ষার জ্ঞানে, ইউরোপী রাজারা তাদের নিপাত করে ধন লুটে নিলে।

এদিকে মুর নামক মুসলমান জাতি স্পান দেশে অতি সুসভ্য রাজ্য স্থাপন কর্‌লে, নানাবিভার চর্চা কর্‌লে, ইউরোপে প্রথম ইউনিভার্সিটি হলো; টভালি, ফ্রান্স, স্পেন ইংলণ্ড হতে বিদ্যার্থী বিদ্যা শিখ্‌তে এলো; রাজা রাজড়ার ছেলেরা

যুদ্ধবিজ্ঞা, আচার, কায়দা, সভ্যতা শিখিতে এলো। বাড়ি ঘর দোর মন্দির সব নূতন চক্ষে বসতে লাগলো।

কিন্তু সমগ্র ইউরোপ হয়ে দাঁড়াল এক মহা সেনা-নিবাস—সে ভাব এখনও। মুসলমানেরা এ-টা দেশ জয় করে, রাজা আপনার এক বড় টুকরা রেখে, বাকি সেনাপতিদের বেঁটে দিতেন। তারা খাজনা দিত না, কিন্তু রাজার আবশ্যক হলেই এত গুলি সৈন্ত দিতে হত। এই বকমে সদা প্রস্তুত ফৌজের অনেক হাস্যামা না রেখে, আবশ্যক কালে হাজির প্রবল ফৌজ প্রস্তুত রইল। আজও রাজপুতানায় সে ভাব কতক আছে ;—এটা মুসলমানেরা এদেশে আনে। ইউরোপীরা মুসলমানের এ ভাব নিলে। কিন্তু মুসলমানদের ছিল রাজা, সামন্ত-চক্র ফৌজ ও বাকি প্রজা। ইউরোপে রাজা সামন্তচক্র আর বাকি সব প্রজাকে করে ফেললে একরকম গোলাম। প্রত্যেক মানুষ কোনও সামন্তের অধিকৃত মানুষ হয়ে, তবে জীপিত রইল—ছকুম মায়েই প্রস্তুত হয়ে সুদূর যাত্রায় হাজির হতে হত।

ইউরোপে সভ্যতা নামক বস্তুর এই সব হলো উপকরণ। এর তাঁত হচ্ছে—এক নাতিশীতোষ্ণ পাহাড়ি সমুদ্রতটময় প্রদেশ ; এর ভুলো হচ্ছে—সর্বদা যুদ্ধপ্রিয়, বলিষ্ঠ, নানাজাতের মিশ্রণে এক মহা পিচ্ছুড়ী জাত। এর টানা হচ্ছে—যুদ্ধ। আত্মরক্ষার জন্য, ধর্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ ; যে তলওয়ার চালাতে পারে, সে হয় বড় ; যে তলওয়ার না ধরতে পারে, সে স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে, কোনও বীরের তলওয়ারের ছায়ায় বাস করে, জীবন ধারণ করে। এর পোড়েন—নাগিজ্য। এ সভ্যতার উপায় তলবার, মহা বীরত্ব, উদ্বেগ ইহ পারলৌকিক ভোগ।

আমাদের কথাটা কি ? আখ্যায়ী শাস্তিপ্রিয়, চাস বাস করে, শত্রুদি উৎপন্ন করে, শাস্তিতে জ্ঞা পরিবার পালন কর্তে পেলেই খুসী। তাতে হাঁপ ছাড়বার অবকাশ যথেষ্ট ; কাজেই চিন্তাশীলতার, সভ্য হবার অবকাশ অধিক। আমাদের জনক রাজা স্বহস্তে লাঙ্গল চালাচ্ছেন এবং সে কালের সর্বশ্রেষ্ঠ আত্ম-বিশ্বাসী তিনি। ঋষি, মুনি, যোগীর অভ্যাস—গোড়া থেকে ; তাঁরা প্রথম হতেই স্নেহেছেন, যে সংসারটা বোকা, লড়াই কর, আর লুটাই কর ; ভোগ বলে যা খুঁজছ, তা আছে শাস্তিতে, শাস্তি আছে শারীরিক ভোগ বিসর্জনে ; ভোগ আছে মনঃশীলতার, বুদ্ধিচর্চায়, শরীরচর্চায় নাই। জঙ্গল আবাদ করা তাঁদের কাজ।

তার পর, প্রথমে সে পরিস্কৃত ভূমিতে নির্মিত হল যজ্ঞবেদী, উঠলো সে নির্মূল আকাশে যজ্ঞের ধূম, সে বায়ুতে বেদমন্ত্র প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো, গবাদি পশু নিঃশব্দে চরতে লাগলো । বিদ্যা, ধর্ম্মের, পায়ের নীচে, তলওয়ার রইল । তার একমাত্র কাজ ধর্ম্ম রক্ষা করা, মানুষ ও গবাদি পশুর পরিদ্রাণ করা, বীরের নাম আপভাত্রা, ক্ষত্রিয় ।

লাঙ্গল, তলওয়ার, সকলের অধিপতি রক্ষক রইলেন ধর্ম্ম । তিনি রাজার রাজা, জগৎ নিদ্রিত হলেও তিনি সदा জাগরক । ধর্ম্মের আশ্রয়ে সকলে রইল স্বাধীন ।

ঐ যে ইয়ুনোপী পাণ্ডিত বলছেন যে, অর্ঘ্যেরা কোথা হতে উড়ে এসে ভারতের বুনোদের মেয়ে কেটে জনী ছিনিয়ে নিয়ে বাস করলেন, ও সব আহাম্মকের কথা । আমাদের পণ্ডিতরাও দেখছি সে গোয়ে গো—আবার ঐ সব বিরূপ মিথ্যা ছেলে পুন্দের শিখান হচ্ছে, এ অতি অত্যাচার ।

আমি মূর্খ মানুষ, যা বুঝি তাই নিয়েই পারিস সভায় বিশেষ প্রতিবাদ করেছি । বিদেশী এবং স্বদেশী পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করছি । সময় পেলে আরও সংশয় ওঠবার আশা আছে । এ কথা তোমাদেরও বলি—তোমরা পণ্ডিত মনিষ্য, পুঁথি পাতড়া খুঁজে দেখ ।

ইউরোপীরা যে দেশে বাগ পান, আদিম মানুষকে নাশ করে নিজেরা স্থখে বাস করেন, অতএব অর্ঘ্যরাও তাই করেছে !! ওরা হা-ঘরে, হা অন্ন হা অন্ন করে, কাকে লুণ্ঠবে মারবে বলে ঘুরে বেড়ায়—অর্ঘ্যরাও তাই করেছে !! বলি এর প্রমাণটা কোথায়—আন্দাজ ? বরং তোমার আন্দাজ রাখগে ।

কোন্ বেদে, কোন্ সূক্তে, কোথায় দেখ্‌চো যে অর্ঘ্যেরা কোন্ বিদেশ থেকে এ দেশে এসেছে ? কোথায় পাচ্ছ যে তাঁরা বুনোদের মেয়ে কেটে ফেলেছেন ? খামকা আহাম্মকির দরকারটা কি ? আর রামায়ণ পড়া ত হয় নি, —খামকা এক বৃহৎ গল্প রামায়ণের উপর কেন বানান্ন ?

রামায়ণ কি না অর্ঘ্যদের দক্ষিণি বুনো বিজয় !! বটে—রামচন্দ্র অর্ঘ্য রাজা সূসত্য, লড়ছেন কার সঙ্গে ? লঙ্কার রাবণ রাজার সঙ্গে । সে রাবণ, রামায়ণ পড়ে দেখ, ছিলেন রামচন্দ্রের দেশের চেয়ে সভ্যতায় বড় বই কম নয় । লঙ্কার সভ্যতা অযোধ্যার চেয়ে বেশী ছিল বরং, কম ত নয়ই । তার পর বানরাদি দক্ষিণি লোক বিজিত হলো কোথায় ? তারা হলো সব শ্রীরামচন্দ্রের বন্ধু মিত্র । কোন্ শুভকেষর, কোন্ বাণির রাজ্য, রামচন্দ্র ছিনিয়ে নিলেন—তা বল না ?

হতে পারে । এক ব্যয়গায় আর্থ্য আর বুনোদের যুদ্ধ হয়েছে, হতে পারে হু একটা ধূর্ত মুনি রাক্ষসদের জঙ্গলের মধ্যে ধুনি জালিয়ে বসেছিল । মটকা মেরে চোখ বুজিয়ে বসেছে, কখন রাক্ষসে ঢিল ঢেগা হাড় গোড় ছোঁড়ে । যেমন হাড়গোড় ফেলা, অমনি নাকি কারা ধরে রাজাদের বাছে গমন । রাজা লোহার জামা পরা, লোহার অস্ত্র-স্ত্র নিয়ে ঘোঁড়া চড়ে এলেন । বুনো হাড় পাথর ঠেঙ্গা নিয়ে কতক্ষণ লড়বে ? রাজারা মেরে ধরে চলে গেল । এ হতে পারে ; কিন্তু এতেও বুনোদের জঙ্গল কেড়ে নিচ্ছে, কোথায় পাচ্ছ ?

অতি বিশাল নদ নদী পূর্ণ, উষ্ণ প্রধান, সমতল ক্ষেত্র—আর্য্যাসভ্যতার তাঁত । আর্য্যপ্রধান, নানাপ্রকার সুসভা, অরুণসভ্য, অসভা মানুষ—এ বস্তুর তুলো ; এর টানা হচ্ছে—বর্ণাশ্রমচার । এর পোড়েন—প্রাকৃতিক দ্রব, সংঘর্ষ নিবারণ ।

ভূমি ইউরোপী, কোন্ দেশকে ববে ভাল কবেছ ? অপেক্ষাকৃত অন্ত জাতিকে ভোগবার তোমার শক্তি কোথায় ? যেখানে দুর্দল জাতি পেয়েছ, তাদের সমূল উৎসাদন কবেছ ; তাদের ভূমিতে তোমরা বাস করছ, তারা একেবারে বিনষ্ট হয়ে গেছে । তোমাদের আয়ের কত ইতিহাস কি ? তোমাদের অট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, পাসিফিক দ্বীপপুঞ্জ, তোমাদের আফ্রিকা ?

কোথায় সে সকল বুনো জাত আজ ? একেবারে নিপাত, বস্ত্র পণ্ডবৎ তাদের তোমরা মেরে ফেলেছ ;—যেখানে তোমাদের শক্তি নাট, সেখা মাত্র অল্প জাত জীবিত ।

আর ভারতবর্ষ তা কস্মিন্ কালেও করেন নাই । আর্য্যরা অতি দয়াল ছিলেন, তাঁদের অখণ্ড সমুদ্রবৎ বিশাল হৃদয়ে, অমানব-প্রতিভা-সম্পন্ন মাথায়, ও সব অপাততঃ রমণীয় পালবপ্রণালী কোনও কালেও স্থান পায় নাই । স্বদেশী আহ্বানক ! যদি আর্য্যরা বুনোদের মেরে ধরে বাস করত, তা হলে এ বর্ণাশ্রমের সৃষ্টি কি হত ?

ইউরোপের উদ্দেশ্য—সকলকে নাশ করে, আগুনা বেঁচে থাকবো । আর্য্যদের উদ্দেশ্য—সকলকে আমাদের সমান করবো, আমাদের চেয়ে বড় করবো । ইউরোপের সভ্যতার উপায়—ভলগয়ার ; আর্য্যের উপায়—বর্ণ বিভাগ । শিক্ষা, সভ্যতার ভারতমো, সভ্যতা শিখবার সোপান, বর্ণবিভাগ । ইউরোপে বলবানের জয়, দুর্জনের মূহ্য ; ভারতবর্ষের প্রত্যেক সামাজিক নিয়ম দুর্জলকে করবার জন্ত ।

দেরাদুন ।

(শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, বি, এ ।)

হিন্দুরা বলেন, হিমালয় দেবগণের লীলাভূমি ; বৈজ্ঞানিক বলেন, প্রকৃতির সুসজ্জিত রঙ্গভূমি ; অধ্যাত্মবাদী বলেন, যোগীগণের যোগভূমি ; এবং ভূবিজ্ঞা ■ উদ্ভিদবিজ্ঞাবিৎ পণ্ডিতগণ ইহাকে অনন্তরত্নাধার, অনন্ত ফলফুল প্রসী সুরমা উদ্যান বলিয়া নির্দেশ করেন । ফলতঃ ইহাদের বিভিন্ন উদ্ভিদগুলির কোনটাই অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয় না । কত কত মহাকাবি ইহার শোভা বর্ণনে পরাস্ত মানিয়াছেন । কুমারসম্ভবের সেই “হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ” প্রকৃতির বর্ণনা পড়িয়া আর “গমিষাম্যুপহাস্ততাম্” হইবার ইচ্ছা হয় না । তবে উদ্বোধন সম্পাদক মহাশয়ের আদেশানুসারে হিমাচলের বিস্তৃত ও সুরমা দেবাদুন উপত্যকার বিষয় তিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করিতেছি । পাঠকবর্গের তৃপ্তি হইবে কি না বলিতে পারি না ।

হিমাচলের উপত্যকাগুলির মধ্যে দেবাদুন একটি প্রধান উপত্যকা । ইহার নৈসর্গিক শোভা ও ঐতিহাসিক ইতিবৃত্ত অনেক চিন্তাশীলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে । এই উপত্যকার উত্তর-পশ্চিম দিকে যমুনা এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ভাগিরথী প্রবাহিতা হইতেছেন । ইহার উত্তর-পূর্ব দিকে হিমাচল (মৈমণ্ডী), দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে শিবালীক পর্বতমালা শোভা পাইতেছে । এই উপত্যকার দৈর্ঘ্য প্রায় ৫৫ ও প্রস্থ ১৫ মাইল হইবে । সমুদ্র সমতল হইতে এ স্থান ২৩২৩ ফিট উচ্চ । দেবাদুন ৫ মাইল দক্ষিণ পূর্বে আর একটি পর্বত আছে ; তাহার নাম নৌয়াবা ; ইহা শিবালীক পর্বতেরই অংশ । চতুর্দিকে পর্বতবৃহৎ পরিবেষ্টিত দেবাদুনকে প্রকৃতির হৃৎকৃত্ত হুর্গ বলিলেও অত্যাক্তি হয় না । পূর্বে সমতল প্রদেশ হইতে দেবাদুনে আসিবার দুইটী গিরিশৃঙ্গটি ছিল । যমুনা নদীর ৭ মাইল পূর্বে টিম্‌লোপাশ ৩ পঙ্গাবমুনার অন্তর্গত ভূভাগের ষ্টিক মধ্যফলে খীরি বা মোহনপাশ । অধুনা হরিদ্বার হইতে দেবা পর্য্যন্ত রেলওয়ে লাইন বসিয়াছে ; সুতরাং এক্ষণে সকলে সেই পথেই এখানে বাতায়ত কর । পশ্চিম দেবোতে বেশী জঙ্গল বা জলাভূমি নাই, কিন্তু পূর্ব দেবোতে অনেক জলাভূমি ও জঙ্গল আছে ; ■ দিকে ঘোগীবালা ঝিল ভিন্ন আরও ৫ । ৬টা ঝিল আছে । সকলগুলিই নন্দবনে পরিপূর্ণ এবং ম্যালেরিয়া বিধের জন্মভূমি ।

মোহনপাশের মধ্য দিয়া রাজপুর (দেরা হইতে ৭ মাইল উত্তর-পূর্ব ; মৈশুরী পাহাড়ে চড়িবার রাস্তা) পর্য্যন্ত একটা পাকা রাস্তা সমতল প্রদেশ হইতে দেবার মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে । দেরা হইতে ২৩ মাইল দূরত্ব যমুনা তীরবর্তী রাজবাটি পর্য্যন্ত আর একটা কাঁচা রাস্তা গিয়াছে ; ইহাকে চক্রাদা রোড বলে ; কারণ যমুনার অপর পার্শ্বস্থ শৈলনিবাস চক্রাদা এই রাস্তায় যাওয়া যায় । দেবার পূর্বদিকে দেরা হইতে হরিদ্বার পর্য্যন্ত আর একটা রাস্তা আছে ; ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩১ মাইল । অধুনা ঐ রাস্তায় প্রায় লোক চলে না । রেলওয়ে হইয়া সাধারণের চলা ফিরা করিবার সুবিধা হইয়াছে । হরিদ্বার হইতে দেরা পর্য্যন্ত ৩২ মাইল রেলওয়ে বসিয়াছে ।

দেরাদুনের জল হাওয়া অতিশয় স্বাস্থ্যকর । উপত্যকায় প্রবেশ করিলে বোঁদ হয় যেন বঙ্গদেশে প্রবেশ করিলাম । স্থানে স্থানে ধাতুক্ষেত্র, ইস্পক্ষেত্র ও কদলীর বাগান ইহার অপূর্ণ উন্নয়নশক্তির পরিচয় দিতেছে । বর্ষা ভিন্ন অত্র সময় ইহার জল হাওয়া অতিশয় পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর হয় । শীতকালে সময় সময় এখানেও বরফ পড়ে । গড়পড়তা তাপের পরিমাণ ৩৭° হইতে ১০.১° ডিগ্রি । এখানে শাল, তুন্ (পেরো), শিশু ও পাইনগাছ বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয় । নেশপাতি, ঝিবেরী, জাম, আম, চা, রিয়্যা ও নানাবিধ সুগন্ধি ধাত্তের চাষ হয় । নিকটবর্তী শিবালীক পর্বতে হস্তী, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, হায়না, চিতাহারণ, চতুঃশৃঙ্গহরিণ, বহুবুক্কর ও শব্দকারী একপ্রকারের হরিণ (Barking Deer) পাওয়া যায় । দেরাদুনে ইংরেজের মিলিটারী কন্টিনেন্ট হওয়া অবধি উহাদের বংশ লংপ্রায় হইয়াছে । এখানে মহাগের মাছ পাওয়া যায় ; প্রায় কই মাছের মত, খেতে খুব সুস্বাদু ।

এ স্থান হইতে মৈশুরীর দৃশ্য অতীব মনোহর । মৈশুরীর সাদা সাদা বাড়ীগুলি মনভূমি ইত্যন্ত তঃক্ষিপ্ত অস্থিখণ্ডের দ্বারা প্রত্যয়মান হয় । অনেক সময় মৈশুরী পাহাড়ের শিখরদেশ মেঘে ঢাকিয়া থাকে ; কিন্তু উপরে হিমশ্রব্দ দোষাবলি যেন দেবলোকের চিত্র উপস্থিত করে । মৈশুরী সমুদ্র সমতল হইতে প্রায় ৭০০০ ফুট উচ্চ ; দেরাদুন হইতে ১২ মাইল দূরে । প্রবল বর্ষারন্ত বিধায়ে আমি মৈশুরী উত্তিতে পারি নাই ; সুতরাং তথাকার বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিতে পারিলাম না । তবে শুনিতে পাইলাম, বায়ুনগল মেঘশূন্য থাকিলে মৈশুরীর হাইলেণ্ড হইতে হিমালয়ের চি নীহারাবৃত গরিষ্ঠশেখর ও কেদারনাথ দর্শন করা যায় ।

দেৱাদূনে দেখিবার দুটা সুন্দর দৃশ্য আছে। একটা সহস্রধারা—ইহা রাজ-পুৱেৰ পূৰ্বদিকে অবস্থিত। একটা গিৰিপৃষ্ঠ বহিয়া যেন অজস্র বৃষ্টিপাত হই-তেছে; জল কোথা হইতে আগে, সহস্রধাৱাৰ নিম্নে গেলে তাহা বুঝা যায় না। উপৰেৰ কোন ৰূপা অন্তঃসলিলা হইয়া বোধ হয় সহস্র ধাৱাৰ আশিয়া বিন্দু বিন্দু বৃষ্টিৰূপে পৰিণত হইয়াছে। সহস্রধাৱাৰ নিকটে, অনেক গাছ পাতা কিক্ৰুপে পাথৰে পৰিণত হয়, তাহা দেখা যায়। অনেক পৰ্য্যটক এখানে প্ৰস্তৰীভূত (Petrified) গাছ পাতা সংগ্ৰহ কৰিয়া থাকেন। দেৱাদূনেৰ উত্তৰপশ্চিমে প্ৰায় ৮ মাইল দূৰে টপ্‌কেখৰ নামক একটা গিৰিগুহা আছে। সেখানে একটা শিৱলিঙ্গ স্থাপিত আছেন। টপ্‌ টপ্‌ শব্দে পূৰ্বে ঐ শিৱেৰ মাথায় জল (কেহ কেহ বৰেন ছক্‌) পড়িত বলিয়া উহাৰ নাম টপ্‌কেখৰ হইয়াছে—এৰূপ জনশ্ৰুতি। কলিকাতাৰ দানলীল জমিদাৰ শ্ৰীযুক্ত বাবু কালীকৃষ্ণ ঠাকুৰ মহোদয় (যিনি দেৱাতে ৰাজাদাহেব বলিয়া পৰিচিত) বহু অৰ্থব্যয় কৰিয়া যাত্ৰিগণেৰ যাতায়াতেৰ ৰাস্তা বাঁকাইয়া দিয়াছেন। এ স্থানটো বোণীদিগেৰ তপস্যাৰ উৎকৃষ্ট স্থান বলিয়া মনে হয়।

দেৱাদূনেৰ পূৰ্বাংগৰ ইতিবৃত্ত বড়ই অদূত। ইহা কেদাৰ খণ্ডেৰ মধ্যে অবস্থিত। শিৱালীক পৰ্বত শিৱালয় নামেৰেই অপভ্ৰংশ হইবে। এ স্থান ভূতভাবন ভূতনাথেৰ আদি লীলাভূমি বলিয়া হিন্দুৱা নিৰ্দ্দেশ কৰিয়া থাকেন। কেহ বলেন এ স্থানেই দেৱাসুৰ যুদ্ধ হয়; গত শতাব্দীতে সমতলনিবাসী ও পাৰ্বত্যবাসীদেৰ মধ্যে বে সৰল যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, অতি প্ৰাচীন সময়ে বে সৰূপ বা তদপেক্ষা ভীষণতৰ যুদ্ধ না হইয়াছিল, কে জানে? সে সৰল যুদ্ধ-বিগ্ৰহই সুদূৰ দেশবাসিগণেৰ নিবট দেৱাসুৰ যুদ্ধ বলিয়া পৰিচিত কি না বলা যায় না। দ্ৰোণাচাৰ্য্য এ স্থানে তপস্যাৰ ক্ৰান্ত আশিয়াছিলেন; একটা গুহা এখনও “দ্ৰোণাশ্ৰম” বলিয়া অভিহিত হয়। দেৱাদূনেৰ নাম দ্ৰোণাচাৰ্য্যেৰ নামেৰে সহিত সংশ্লিষ্ট কিনা, বিবেচনাৰ বিষয়। কথিত আছে পঞ্চপাণ্ডবগণ এই উপত্যকা পথেই মহাপ্ৰস্থানে গিয়াছিলেন। ৰালখিল্লা মুনিগণেৰ দ্বিতীয় ইল্ল স্তম্ভৰ সংকল্প, এই স্থানেই উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া জনশ্ৰুতি আছে। খৰ্ব্বাকৃতি গুৰুখাগণ ৰালখিল্যামুনিগণেৰেই ৰূপান্তৰিত বংশধৰ কিনা সুখাগণ বিবেচনা কৰুন।

প্ৰায় ৭০০৮০০ বৎসৰ পূৰ্বে দেৱাদূন গৰোয়াল ৰাজ্যৰ অধীন ছিল। অৱসংখ্যক লেঙ্কাৱা আশিয়া এখানে প্ৰথম উপনিবেশ স্থাপন কৰে। সময়ে

সময়ে মুসলমানেরা এস্থান অধিকার করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ১০৭৯ খ্রীষ্টাব্দে মুলতান ইব্রাহিম ৩ মাস অবরোধের পর দেৱা দখল করেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সাহারণপুরের গবর্ণর নাজীবুদ্দৌলা পুনরায় এ স্থান অধিকার করেন। শিক সেনাপতি ভাগল সিং ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে এ স্থান অধিকার করিয়া লুঠন করিয়াছিলেন। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মোহিলাধিনায়ক গোলাম কাদের এ দেশ জয় করিয়া ভয়ানক অত্যাচার করেন। এইরূপ সাময়িক আক্রমণের অধীন হইলেও, বিজেতার কেহই এখানে অবস্থান করেন নাই। লুঠ পাট করিয়া চলিয়া যাইতেন। অথবা কাহাকেও রাজপ্রতিনিধি পদে স্থাপন করিয়া রাখিতেন। কিন্তু গবর্ণরের সৰ্কাই গরোয়ালের প্রাংস্ত ও বখ্তা অধাধিক স্বীকার করিত। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে নেপাল হইতে রণবীর সিংহের নির্কাসনের পর গুরুধা সর্দার ওমর সিং ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে দেৱাদুন অধিকার করেন। তদবধি ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহা নেপালের অধীন ছিল। লর্ড ময়রার শাসন-কালে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজের সহিত নেপালীদের যে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধের সন্ধিসূত্রে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে দেৱাদুন ইংরেজের অধীনে আসিয়াছে।

যে যুদ্ধে দেৱাদুন ইংরেজদিগের হস্তগত হয়, সে যুদ্ধের বৃত্তান্ত অধাধিক সকলেই বিদিত আছেন। কিন্তু তাহার হ্রস্বকটী ঘটনা এখানে লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজনীয় মনে করিতেছি। গুরুধা সৈন্য ইংরেজদিগের ২টী পোলিস্ স্টেশন আক্রমণ করিয়া সমস্ত আফিসারদিগকে বধ করেন। লর্ড ময়রা নেপাল-দরবারে এ বিষয় জানাইলে নেপাল গবর্ণমেন্ট তাহাতে কর্ণশাস্ত না করিয়া বরং ভৎসনা-সূচক উত্তর প্রদান করেন। সুতরাং যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠে। দেৱাদুনের ৩৭ মাইল উত্তরপূর্বে কালেশা নামক গুরুধাদেব একটি জীর্ণ দুর্গ ছিল। ইংরেজ জেনারল জিলিস্‌পি ৩৫০০ সৈন্য লইয়া ঐ দুর্গ আক্রমণ করেন। ওমরসিংহের ভ্রাতৃপুত্র মহাবীর বলভদ্র সিং অত্যন্তসংখ্যক (৩০০। ৪০০) সৈন্য লইয়া তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। ইংরেজেরা ১ম বার হারিয়া দেৱাদুনে আসেন। অনেক সৈন্য ও জিলিস্‌পি হত হন। ১ মাস পরে পুনরায় বহু সৈন্য সমাবেশ করিয়া ইংরেজেরা বলভদ্রসিংকে আক্রমণ করেন; সেবারেও ইংরেজের বহু সৈন্য হত আহত হয়। বলভদ্র সিং অবশেষে দুর্গ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। যখন বলভদ্র বাহির হইলেন, তখন দেখা গেল, মাত্র ৭০ জন সৈন্য তাহার সঙ্গে আছে। এই ৭০ জন সৈন্য অগণ্য ইংরেজ সৈন্যবৃহৎ ভেদ করিয়া “কুস্তগরে” নির্কিয়ে ফিরে গিয়াছিলেন। মেজর সাড্‌লো ৪০০ সৈন্য লইয়া

তাহার পশ্চাৎকাবন করিয়াও কিছু করিতে পারেন নাই। তৎপর কালেঙ্গা দুর্গ ইংরেজ ভূমিস্বাং করিয়া ফেণেন। বলভদ্র সিংএর বীরত্ব কাহিনী হিমাচলের গভীর গহ্বরে এখনও প্রতিধ্বনিত হয়। কালেঙ্গার নাম এখন “নালা-পানী”। বীরের মর্যাদাকারী সঙ্কল্প ইংরেজগণ কালেঙ্গা ফোর্টের সম্মুখে দুইটি মনুমেন্ট নির্মাণ করিয়াছেন। একটি জেনারেল জিলিস্‌পি ও ২য়টি বলভদ্র সিংহের। বলভদ্র সিংএর মনুমেন্টের গায় এরূপ লিখিত আছে। “This is inscribed as a tribute of respect for our Gallant Adversary Bulbudder, commander of the Fort and his brave Goorkhas, who were afterwards while in the Service of Ranjit Singh shot down in their ranks to the last man by Afghan Artillery”.

দেবদীনের প্রধান কীর্তি গুরুদ্বারের শিখ মন্দির। ইহার ইতিহাস দেবদীনের ইতিহাসের সহিত সম্মিলিত। গুরু নানকের বংশোদ্ভব হরগোবিন্দ রায়ের পৌত্র, হররায়ের পুত্র গুরু রাম রায় ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে দেবদীনে আগমন করেন। দারা শকোকে হর রায় সাহায্য করায়, তিনি দীর্ঘ পুত্র গুরু রাম রায়কে আরাঞ্জীর নিকটে প্রতিভূষক্ৰমে রাখিতে বাধ্য হন। এই গুরু রাম রায়ের জন্ম সপ্তকে সন্দেহ থাকায়, হরগোবিন্দের ২য় পুত্র তেগ বাহাদুর শিখদিগের ২য় গুরু হন। এই গুরু রাম রায়কেই তেগ বাহাদুরের প্রাণদণ্ডের কারণ বলিয়া অনেক অনুমান করেন। তেগ বাহাদুরের মৃত্যুর পর অমিততেজা গুরু গোবিন্দের প্রতি-প্রতিবন্ধিতার হতাশ হইয়া গুরু রাম রায় আরাঞ্জীর সাহায্যে গরোয়ালের অধিপতি ফতেসাহার নিকট আগমন করত দেবদীনে বাস ও মন্দির তুলিবীর আদেশ পান। ফতেসাহা ঐ মন্দিরের ও গুরু রাম রায়ের সন্ততিদিগের ভরণ পোষণার্থ অনেকগুলি গ্রাম দেন। এক্ষণে গুরুদ্বারের মহান্ত মহারাজের বিস্তর আয় বড় ভরদ্বার বলিয়া পরিচিত। উক্ত গুরুরামরায়ের সপ্তকে অনেক অদ্ভুত গল্প প্রচলিত আছে। তিনি নাকি ইচ্ছায় মরিতে ও বাঁচিতে পারিতেন। তিন দিন ব্যাপী সমাধির পর তাহার দেহপাত হয়; মৃত্যুকালে জী সন্মুখে ছিলেন। গুরুরামের গদি ও বিছানা এখনও মন্দির মধ্যে সযত্ন রক্ষিত আছে। চেলাদিগের মধ্যে হইতে একজন করিয়া মহান্ত নির্দিষ্ট হয়। গুরুদ্বারে একটি মনোহর পুষ্করিনী আছে। তাহাতে হাজার হাজার লাল মাছ খেলিয়া বেড়ায়। প্রতি বৎসরের ১লা চৈত্র গুরুদ্বারে সঙ্গত (মেলা) হয়। ১০ দিন পর্য্যন্ত থাকে। সে সময় পঞ্জাব হইতে বিস্তর সাধুর সমাগম হয়। ৬ই জ্যৈ এক প্রকাণ্ড নিশান

উঠান হয়। এবং বহু সাধু সন্ন্যাসীকে ভাঙারা দেওয়া হয়। দেবাদুনে এইটি দেখিবার স্থান বটে।

দেবাদুনে উত্তরপশ্চিম প্রদেশের লেফটেনেন্ট গবর্নরের অধীন। এখানে হইতে গজাবের সীমান্তদেশ নিকটবর্তী। গবর্নমেন্টের স্কুল ভিন্ন আমেরিকা মিশনের একটী স্কুল বালিকাবিদ্যালয় ও অনাথাশ্রম আছে। অধিবাসী মাত্রই হিন্দু ও শৈব। মুসলমান প্রায় নাই; ৩৫টি মস্জিদ মাত্র আছে। ব্রাহ্মণরা এখানে ছ একবার ধর্মপ্রচারে আসিয়াছিলেন; কিন্তু বিশেষ ফল হয় নাই। ইহা হিন্দু ধর্ম প্রচারের স্থল বটে। গুরুদ্বারের উদ্যোগ নানকপন্থী।

দেবাদুনের মিলিটারী কন্টিনেন্ট হিনাচলের উত্তর পশ্চিম রক্ষার অন্যতর প্রধান সেনানিবাস। ইহাতে সবসময়ই গুর্খা সৈন্য। একটা সৈন্যকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, তারা ৭ হইতে ১৫ নাহিয়ানা পর্ষান্ত গাইরা থাকে। বন্দুক ও মজিন ভিন্ন সকলের সঙ্গেই কাজী (a kind of dagger) থাকে। ইহারা বড়ই কষ্ট সহিষ্ণু; পার্শ্বাধ্যক্ষে অসীমশক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। এখানে কুপ হয় না; মিংসোর্ ১১০০০ হাজার টাকা খরচ করিয়া কাছারীর নিকট ২২৫ ফিট্ গভীর একটি কূপ খনন করা হইয়া ছিলেন। হিমালয়ের উপরে ররগার জল কেনা করিয়া দেবাদুনে আনা হইয়াছে। তদ্বারা সবলের স্নান-হার নির্বাহিত হয়।

কাবুলের ভূতপূর্ব আমীর ইয়াকুব খাঁ এখানেই ইংরাজের নজরবন্দী হইয়া কাল কাটাইতেছেন। ইংরেজেরা ইহাকে উৎকৃষ্ট বাড়ী বাগান দিয়াছেন। একদিন বেড়াইবার কালে আমি সেই তেজঃপুঞ্জবৃত্তি আমাকে দেখিয়াছিলাম। বড়লাট সাহেবের ‘বডিগার্ড’ এখানেই থাকে।

উদ্বোধন সম্পাদক মহাশয়ের আদেশ মত পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত দেবাদুনের ইতিহাস কথঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করিলাম। জি, আর, সি, উইলিয়মের ইতিহাসে দেবাদুনের বিস্তৃত ইতিবৃত্ত লিখিত আছে। ইতি—

মস্তিষ্ক ও শিক্ষা ।

(স্বামী শুক্লানন্দ)

আমেরিকায় আজকাল সকল বিষয়েরই উন্নতি দেখা যাইতেছে। এক্ষণে আমেরিকায় অন্তর্গত কলম্বিয়া ডিস্ট্রিক্টে মানুষের মস্তিষ্কের ক্রমবিকাশ ও শিক্ষার

সহিত উহার সম্বন্ধ লইয়া আলোচনা হইতেছে। ডাক্তার জনষ্টোন সাহেব ছেলেদের মস্তিষ্কের উন্নতি সম্বন্ধে বিশেষ পরীক্ষা করিয়া কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তিনি বলেন, আট বৎসর বয়সে মস্তিষ্ক উহার পূর্ণ ওজন প্রাপ্ত হয়। জন্মের সময় মস্তিষ্কের ওজন থাকে—আনুমানিক আধ সের। প্রথম বর্ষ খুব দ্রুতগতিতে বাড়িতে থাকে—এক বছরের শেষে ওজনে প্রায় ৯ পোয়া হয়। চারি বৎসরে ওজন হয় প্রায় দেড় সের। ঐ সময় হইতেই উহার বাড় খুব অল্প হয়। আট বৎসরে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া বার বছরের পর আর বাড়ে না। ২৪ বৎসরের পর আবার ধীরে ধীরে ওজনে কমিতে থাকে।

ডাক্তার জনষ্টোন বলেন, মনের উন্নতির সঙ্গে মস্তিষ্কের উন্নতির বিশেষ সম্বন্ধ থাকার দরুন, আট বৎসর বয়সের বমে লেখা পড়া আরম্ভ করা ঠিক নহে। আর পড়া শুনা প্রথম আরম্ভের সময় বেশী পীড়াপীড়ি করা ভাল নয়। ছেলে ‘এঁচড়ে পাকা’ হইলে খারাপই হয়, ভাল হয় না।

বেটা ছেলের মস্তিষ্ক জন্মের সময় মেয়ের মস্তিষ্কের চেয়ে বেশী ভারী হয়। আর পূর্ণ বয়স্ক লোকের অপেক্ষা বালকের মস্তিষ্কে জল বেশী থাকে। জন্মের সময় ছেলের মস্তিষ্কে শতকরা ৮৯ ভাগ জল থাকে, আর পূর্ণবয়স্ক লোকের ৭১ ভাগ জল থাকে। মস্তিষ্কের মধ্যস্থ cell গুলি ক্রমশঃ ৪৫০ গুণ, কোন কোনটা আবার ১০০০০ গুণ বাড়িয়া যায়; আবার cell গুলি যে, শুধু পরিমাণে বাড়ে, তাহা নয়, তাহাদের সংখ্যাও বাড়িতে থাকে।

ডাক্তার জনষ্টোন এখনও ঠিক করিয়া বলিতে পারেন নাই বটে যে, কয় ঘণ্টা ছেলেদের পড়া দেওয়া উচিত, প্রতিবন্ধিতা তাহাদের উন্নতির অথবা অবনতির সাধক; কিন্তু ইহা নিশ্চয় হইয়াছে যে, সচরাচর ঘেরূপ স্কুলে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে ছেলেদের যতটা মস্তিষ্ক চালনা আবশ্যিক, তাহার অধিক হইয়া থাকে।

অনুসন্ধান দ্বারা বিশেষরূপে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, অনেক ছাত্রেরই এইরূপ অনিয়মিত শিক্ষা করিতে গিয়া শরীরটা একেবারে মাটি হইয়াছে। ডাক্তার জনষ্টোন বলেন, চক্ষু ও শ্রাব্যবোগই স্কুলের ছেলেদের বিশেষ ব্যায়াম। আর অনিদ্রা, বুক ধড় ফড় করা এবং অশ্রান্ত শ্রাব্যীয় যোগও স্কুল হইতে উৎপন্ন হয়। যত পড়িবার ঘণ্টা বাড়ান হয়, আর ছেলেরা যত ক্লাসে উঠে, ততই এই সব বেশী আরম্ভ হয়। সুইডেনে এই সম্বন্ধে একবার অনুসন্ধান হয়।

তাহাতে স্থির হয় যে, নীচু ক্লাসে শতকরা ২২ জন চোখে কম দেখে, আর উঁচু ক্লাসে শতকরা ৩৭ জনের চোখের দৃষ্টি কম।

পরীক্ষা করিয়া আরো দেখা গিয়াছে, অনিদ্ৰা, ঘুমের সময় বকা এবং নিদ্ৰাবস্তায় বেড়ান, স্কুলের ছেলেদের মধ্যে যত দেখা যায়, অল্প স্থলে তত দেখা যায় না। লণ্ডনের প্রাথমিক বিদ্যালয় সকলে এই বিষয়ের অনুসন্ধান হয়। তাহাতে স্থির হয়, তথাকার শতকরা ৩৮ জন ছেলের রাত্রে ঘুম হয় না। বালিকাদের অপেক্ষা বালকদের আবার বেশী। একটি স্কুলে ৩৮১ জন বাগক ছিল। তার মধ্যে ১১৯ জন ঘুমের সময় বকে, আর ২৮ জন ঘুমন্ত অবস্থায় বেড়াইয়া বেড়ায়। শিক্ষকেরা বলেন, ছেলেদের বাপ প্রায়ই অভিযোগ করেন যে, তাঁহাদের ছেলেরা রাত্রে পড়ার সময় বকে, আর অকতাই বেশী গোল বাঁধায়। প্রসিয়াতে ১৮৮৩ হইতে ১৮৮৮ পর্য্যন্ত পাঁচ বছরের ভিতর প্রায় কমবেশ ২৮৯ জন লোক আত্মহত্যা করিয়াছিল; ইহার মধ্যে ১২১ জন পরীক্ষার ভয়, ক্লাসে উঠিতে না পারা, শাস্তির ভয় ■ অত্যন্ত কারণে।

ডাক্তার জনস্টোন বলেন, বেশী বুদ্ধিমান ছেলের শরীর সচরাচর খাপ খাইয়া থাকে। ইহারা রোগাক্রান্ত হইলে প্রায় বাঁচে না। অস্বাভাবিক বুদ্ধি দেখিলে বাপ মায়ের খুব আনন্দ হয় বটে, কিন্তু উহা স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির অস্বাভাবিক অবস্থার চিহ্ন মাত্র। তাহাব প্রমাণস্বরূপ তিনি বলিতেছেন, নিম্নো বালক সাহেব-বালককে প্রথম অবস্থায় খুব জাড়াইয়া যায়। শেষে কিন্তু আর মোটেই উন্নতি করিতে পারে না। শরীর যতই ভাল হয়, ততই উত্তর উন্নতি ধীরে ধীরে হয়, ইটাই জীব সৃষ্টির একটা নিয়ম।

মস্তিষ্কের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের খুলিও ঠিক পরিমাণে অল্পস্বারে বাড়িতে থাকে। যদি নবজাত শিশুর খুলি ধবা যায় ১০, তবে ২২শ মাসে উহা হয় ১৫, আর ১৪ বৎসরে হয় ২০। আধা বয়স হইলে খুলির হুলতা ত্রমশঃ করিতে থাকে। বুড়ো লোকের মাথার খুলি খুব পাতলা ও ভঙ্গপ্রবণ।

ছেলেদের মস্তিষ্ক ও শিক্ষা সম্বন্ধে খুব আধুনিক উন্নত মত প্রকাশ করা গেল। এক্ষণে আমাদের দেশের প্রাচীন মত ও বর্তমান কালের শিক্ষাসম্বন্ধে দুই কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। এই বিষয় যোগ্য ব্যক্তিগণের রীতিমত আলোচনার বিষয়, কারণ Child is the father of the man.

আমরা প্রাচীন স্মৃতিতে দেখিতে পাই, গভাউসে ব্রাহ্মণের উপনয়নের সর্বপ্রথম কাল। উপনয়ন ব্যতীত দ্বিজের পাঠ আরম্ভ হইত না। স্মরণ

দেখা যাইতেছে, সাত বৎসরের বমে শিক্ষা কিছুতেই আরম্ভ হইত না। ক্ষত্রিয়ের, বৈশ্যের আরো বিলম্ব। আর এক কথা বলি। তখন ব্রহ্মচর্যের উপর একটা বিশেষ ঝোঁক ছিল। তাহাই ছিল শরীর ভাণ থাকিবার এক প্রধান কারণ। এখন সেই দিকে দৃষ্টি ও সেই বিষয়ের শিক্ষা একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। ছেলেকে কতকগুলি জিনিষ গিলানকে যদি শিক্ষা বলে, এখন হইতেছে তাহাই। ধর্ম আর শরীরের দিকে ত দৃষ্টিই নাই। আমরা যেমন, আমাদের ছেলেরাও তদ্রূপ হইতেছে। এখন চেষ্টা কেবল কোন মতে ২৫ টাকা উপার্জন করিয়া অন্নসংস্থান করা। কাষে কাষেই তাহার উপায়স্বরূপ লেখা পড়া না শিখিলে হইবে কি? আমরা বলি, পুস্তক পড়া কমাইয়া Kindergarten system ক্রমশঃ ক্রমশঃ প্রবেশ করাইলে ভাল হয় নাকি? বইয়ের কীট কতকগুলি সৃজন করিয়া লাভ কি? বই একটা উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত। সেই উদ্দেশ্য হইতেছে—শরীর মন ও ধর্মের উন্নত একটা সর্বোৎকৃষ্ট জীব হওয়া। তা কই হইতেছে? এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। আলোচনাও যথেষ্ট হইতেছে। কিন্তু অধিক পরিমাণে কার্যো পরিণত হইতেছে না কেন? তাহার প্রধান কারণ বোধ হয় অন্নচিন্তা। এই ‘অন্ন’ সমস্তা যদি কেহ পূরণ করিতে পারেন, তবেই বোধ হয়, ‘শিক্ষা’ সমস্তাও একদিন পূর্ণ হইবে।

নূতন বৎসর।

(শ্রীহরিদাস দত্ত ।)

সংসার নাটক গেহে নববেশ ধরি,

আইল হে নববর্ষ প্রফুল্ল অন্তরে ;—

নব সূখ ভোগ আশে আশা মরি মরি,

সবার মানস যেন আনন্দে বিহরে।

কি এনেছ, হে বৎসর, আমাদের তরে ?

তোমার রাজ্যে বল কি ভূজাবে নরে ?

পাইবে রাজত্ব তুমি নিখিল জগতে ;

অসংখ্য অসংখ্য প্রজা তোমার অধীন ;

সাবধান, হে রাজন, যেন তোমা হতে,
দীন প্রজাদের মুখ না হয় মলিন ।

বসন্তের সুশীতল মলয় পবন,
সুশোভনা প্রকৃতির ভূষণ সুন্দর,
চাহি না আমরা, তাতে কিবা প্রয়োজন ?
শোভুক সরসে পদ্ম, গগনে ডাক্তর,
শরতের শশী পানে চাহিব না আর,
হবে না উহাতে মোদের আশার সুসার ।

চাহি না এ সবে মোরা, নাহি চাহি ধনে,—
আশায় উন্নত হয়ে কিবা প্রয়োজন ?
কিবা কাজ তায়, যার তরে অকারণে
অবিরল হইতেছে শোণিত বর্ষণ ।
বর্ষে বর্ষে হইতেছি মোরা জর জর,
তোমার উপর এবে করিমু নির্ভর ।

ধরিয়া সুন্দর বেশ এস শুভক্ষণে,
জগতের সিংহাসনে কর আরোহণ ;
ধরি শাস্তিদণ্ড সবে রাখহ শাসনে,
আর যেন নাহি সহে এ ক্ষুদ্র জীবন
সংসার অস্থখ জালা অশান্তি যাতনা ।
“শাস্তির রাজত্ব” তুমি করাও ঘোষণা ।

হে নব বৎসর, তোমা করি এ মিনতি,
আছি বড় আশা করে, তোমার শাসনে
পাইব হে শান্তিস্থখ, যাবে এ দুর্গতি,
বিজয় পতাকা তব শোভিবে গগনে,
হাসিবে সংসার তব শাসনের গুণে,—
আর না দিহিব মোরা অস্থখ আগুনে ।

অবিরোধী। এই জগৎই এই প্রেমের উত্তর ■ পর্যাপ্ত হয় নাই ; কারণ, যদি ইহার উত্তর হয়, তাহা হইলে তিনি অসীম রহিলেন না ; ঈশ্বর 'জ্ঞাত' হইলে তাঁহার আর ঈশ্বর থাকে না—তিনি আমাদেরই মত একজন—এই চেয়ারখানার মত একটা জিনিষ হইয়া গেলেন। তাঁহাকে জানা যায় না, তিনি সর্বদাই অজ্ঞেয়। তবে অবৈতন্যদী বলেন, তিনি শুধু 'জ্ঞেয়' হইতেও আরো কিছু বেশী। এই কথাটা আবার বুঝিতে হইবে। তোমরা যেন অজ্ঞেয়বাদীদের মত ঈশ্বর অজ্ঞেয় মনে করিয়া বাড়ীতে বাইও না। মনে কর এই চেয়ারখানি রহিয়াছে, উহাকে আমি জানিতেছি। আবার আকাশের বহির্দেশে কি আছে, সেখানে কোন লোকের ব্যতি অছে কি না, এ বিষয় হস্ত একেবারে অজ্ঞেয়। কিন্তু ঈশ্বর পূর্ণোক্ত পদার্থগুলির ছায়া জ্ঞাতও নন, অজ্ঞেয়ও নন। ঈশ্বর বরং যাহাকে 'জ্ঞাত' বলা হইতেছে, তাহা হইতেও আরো কিছু বেশী—ঈশ্বর অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বলিলে ইহাই বুঝায়, কিন্তু যে কর্ত্তে কেহ কেহ কোন কোন প্রসঙ্গে অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় বলেন, সে অর্থ নহে। ঈশ্বর জ্ঞাত হইতে আরো কিছু অধিক। এই চেয়ার আখ্যদের জ্ঞাত ; বাস্তবিক উহা সেই পূর্ণ জ্ঞানের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ মাত্র। কিন্তু ঈশ্বর তাহা হইতেও আমাদের অধিক জ্ঞাত, কারণ তাঁহাকে অগ্রে জানিয়া—তাঁহারই ভিতর দিয়া—তবে আমাদেরিগকে চেয়ারের জ্ঞানগত করিতে হয়। তিনি সাক্ষিস্বরূপ, সকল জ্ঞানের তিনি অনন্ত সাক্ষিস্বরূপ। যাহা কিছু আমরা জানি, সবই অগ্রে তাঁহাকে জানিয়া—তাঁহারই ভিতর দিয়া—তবে জানিতে হয়। তিনিই আমাদের আত্মার সারসত্তা স্বরূপ। তিনিই প্রকৃত আমি--সেই 'আমি' আমাদের এই 'জানি'র সারসত্তা স্বরূপ ; আমরা সেই 'জানি'র ভিতর দিয়া বাতীত কিছুই জানিতে পারি না, সুতরাং সমুদয়ই আমাদেরিগকে ব্রহ্মের ভিতর দিয়া জানিতে হইবে। অতএব এই চেয়ারখানিকে জানিতে হইলে চাহাকে ব্রহ্মের মধ্য দিয়া তবে জানিতে হইবে। অতএব ব্রহ্ম, চেয়ার অপেক্ষা আমাদের নিকটবর্ত্তী হইলেন, কিন্তু তথাপি তিনি আমাদের হইতে অনেক উচ্চ রহিলেন। জ্ঞাতও নহেন, অজ্ঞাতও নহেন, কিন্তু উত্তর হইতেই অনন্তত্ত্বে উচ্চ। তিনি তোমার আত্মস্বরূপ। কে এ জগতে এক মুহূর্ত্তও জীবন ধারণ করিতে পারিত, কে ■ জগতে এক মুহূর্ত্তও শ্বাসপ্রশ্বাসকার্য্য নির্বাহ করিতে পারিত, যদি সেই আনন্দস্বরূপ ইহার প্রতি পরমাণুতে বিরাজমান না থাকিতেন ? কারণ, তাঁহারই শক্তিতে আমরা শ্বাসপ্রশ্বাসকার্য্য নির্বাহ করিতেছি এবং তাঁহারই অস্তিত্বে

আমাদেরও অস্তিত্ব। তিনি যে এক জায়গায় দাঁড়াইয়া আমার রক্তসঞ্চালন করিতেছেন, তাহা নহে। তাৎপর্য্য এই যে, তিনিই সমুদয়ের সত্ত্বাস্বরূপ—তিনিই আমার আত্মার আত্মা। তুমি কোনরূপেই বলিতে পার না যে, তুমি তাঁহাকে জান—উহাতে তাঁহাকে অত্যন্ত নামাইয়া ফেলা হয়। তুমি শাকাইয়া নিজের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিতে পার না, সূত্রাং তুমি তাঁহাকে জানিতেও পার না। জ্ঞান বলিতে ‘বিষয়ীকরণ’—(Objectification) জিনিষকে বাহিরে আনিয়া বিষয়ের নায় (জেয় বস্তুর ছায়) প্রত্যক্ষীকরণ—বুঝায়। উদাহরণস্বরূপ দেখ, স্ববর্ণকার্য্যে ভোগরা অনেক জিনিষকে ‘বিষয়ীকৃত’ করিতেছে—যেন তোমাদের নিজেদের স্বরূপ হইতে বাহিরে প্রক্ষেপ করিতেছে। সমুদয় সৃষ্টি—যাহা কিছু আমি দেখিয়াছি এবং যাহা কিছু আমি জানি, সবই আমার মনে অবস্থিত। ঐ সকল বস্তুর ছাপ বা ছবি যেন আমার অন্তরে রহিয়াছে। যখনই আমি উহাদের বিষয় চিন্তা করিতে ইচ্ছা করি, উহাদিগকে জানিতে যাই, তখন প্রথমেই ঐ গুলিকে যেন বাহিরে প্রক্ষেপ করিতে হয়। ঈশ্বরসম্বন্ধে একপ করা অসম্ভব ; কারণ, তিনি আমাদের আত্মার আত্মা স্বরূপ, আমরা তাঁহাকে বাহিরে প্রক্ষেপ করিতে পারি না। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে,

‘স য এষোহগ্নির্মৈতদাত্ম্যামিদং সর্ব্বং তংসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো’ ইহার অর্থ এই, ‘সেই স্বাক্ষরূপ জগৎকারণ জগতস্থ সকল বস্তুব আত্মা, তিনিই সত্যস্বরূপ, হে শ্বেতকেতা, তুমিই তাহাটী।’ এই ‘তত্ত্বমসি’ বাক্য বেদান্তের মধ্যে অতিশয় পবিত্রতম বাক্য—মহাবাক্য—বলিয়া কথিত হয়, আর ঐ পূর্ব্বোক্ত বাক্যাংশ দ্বারা ‘তত্ত্বমসি’র প্রকৃত অর্থ কি, তাহাও বুঝা গেল। ‘তুমিই সেই’—ঈশ্বরকে এতদ্ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় তুমি বর্ণনা করিতে পার না। ভগবানকে পিতা মাতা ভ্রাতা বা প্রিয় বন্ধু বলিলে তাঁহাকে ‘বিষয়ীকৃত’ করিতে হয়—তাঁহাকে বাহিরে আনিয়া দেখিতে হয়—তাহা ত কখন হইতে পারে না। তিনিই সকল বিষয়ের অনন্ত বিষয়ী। যেমন আমি চেয়ারখানি দেখিতেছি, আমি চেয়ারখানির দ্রষ্টা—আমি উহার বিষয়ী। তজ্জপ, ঈশ্বর আমার আত্মার নিত্যদ্রষ্টা—নিত্যজ্ঞাতা—নিত্য বিষয়ী। কিরূপে তুমি তাঁহাকে তোমার আত্মার অন্তরাত্মাকে—সকল বস্তুর সারসত্তাকে ‘বিষয়ীকৃত’ করিবে—বাহিরে আনিয়া দেখিবে? অতএব আমি তোমাদের নিকট পুনরায় বলিতেছি, ঈশ্বর জেয়ও নহেন, অজেয়ও নহেন, তিনি জেয় অজেয় হইতে

অনন্তগুণ উচ্চে—তিনি আমাদের সহিত অভেদ, আর যাঁহা আমার সহিত এক, তাঁহা কখন আমার জ্ঞেয় বা অজ্ঞেয় হইতে পারে না, যেমন তোমার আত্মা, আমার আত্মা জ্ঞেয়ও নহে, অজ্ঞেয়ও নহে। তুমি তোমার আত্মাকে জানিতে পার না, তুমি উহাকে নাড়িতে লাড়িতে পার না, অথবা উহাকে ‘বিষয়’ করিয়া উহাকে দৃষ্টিগোচর করিতে পার না, কারণ তুমি নিজেই তাঁহাই, তুমি তোমাকে উহা হইতে পৃথক্ করিতে পার না। আবার উহাকে অজ্ঞেয়ও বলিতে পার না কারণ অজ্ঞেয় বলিতে গেলে অগ্রে উহাকে ‘বিষয়ী-করিতে হইবে—তাঁহা ত করা যায় না। আর তুমি নিজে যেমন তোমার নিকট পরিচিত—জ্ঞাত, আর কোন্ বস্তু তদপেক্ষা তোমার অধিক জ্ঞাত ? যে অর্থে ঈশ্বর জ্ঞাতও নছেন, অজ্ঞেয়ও নছেন, তদপেক্ষা অনন্তগুণে উচ্চ; তজ্জন্য আমাদের আত্মাও আমাদের জ্ঞানের কেন্দ্রস্বরূপ।

অতএব আমরা দেখিতেছি, প্রথম, এই প্রশ্নই স্ববিরোধী, আর দ্বিতীয়তঃ, আমরা দেখিতে পাই, অদ্বৈতবাদে ঈশ্বরের ধারণা এই—একত্ব—সুতরাং আমরা তাঁহাকে ‘বিষয়ীকৃত’ করিতে পারি না, কারণ, জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক, আমরা সর্বদাই তাঁহাতে নজীবিত এবং তাঁহাতেই থাকিয়া সমুদয় কার্যকলাপ করিতেছি। আমরা যাঁহা কিছু করিতেছি সবই সর্বদাই তাঁহারই মধ্য দিয়া করিতেছি। এক্ষণে প্রশ্ন এই, দেশকালনিমিত্ত কি ? অদ্বৈতবাদের অর্থই এই, একটা মাত্র বস্তু আছে, দুইটা নাই। এক্ষণে আবার এই এক মত বলা হইল যে, সেই অনন্ত ব্রহ্ম দেশকালনিমিত্তের আবরণের দ্বারা নানারূপে প্রকাশ পাইতেছেন। অতএব এক্ষণে বোধ হইতেছে, দুইটা বস্তু আছে,—সেই অনন্ত ব্রহ্ম একটা বস্তু, আর মায়া অর্থাৎ দেশকালনিমিত্তের সমষ্টি আর এক বস্তু। আপাততঃ দুইটা বস্তু আছে, ইহাই যেন হিরন্ময়ী বস্তু বলিয়া বোধ হয়। অদ্বৈতবাদী ইহার উত্তরে বলেন, বাস্তবিক ইহাতে দুই হয় না। দুইটা বস্তু থাকিতে হইলে ব্রহ্মের ত্রায়—গাহার উপর কোন নিমিত্ত কাৰ্য্য করিতে পারে না,—এরূপ দুইটা স্বতন্ত্র বস্তু থাকা আবশ্যক। প্রথমতঃ, দেশকালনিমিত্তের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, বলা যাইতে পারে না। কাল আমাদের মনের প্রতি পরিবর্তনের সহিত পরিবর্তিত হইতেছে, সুতরাং উহা একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নহে। কখন কখন স্বপ্নে দেখা যায়, আমি যেন অনেক বৎসর জীবন ধারণ করিয়াছি—কখন কখন আবার এক মুহূর্তের মধ্যে লোকে কয়েক মাস অতীত হইল, বোধ করিয়াছে। অতএব দেখা গেল, কাল তোমার মনের ১লা বৈশাখ, ১৩০৮।] উদ্বোধন। ২১১

অবস্থার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, কালের জ্ঞান সময়ে সময়ে একেবারে উড়িয়া যায়, আবার অপর সময়ে আদিয়া থাকে। দেশ সম্বন্ধেও এইরূপ। আমরা দেশের স্বরূপ জানিতে পারি না। তথাপি উহার নির্দিষ্ট লক্ষণ করা অসম্ভব হইলও, উহা রহিয়াছে, উহা আবার কোন পদার্থ হইতে পৃথক হইয়া থাকিতে পারে না। নিমিত্ত বা কার্য্যকারণভাব সম্বন্ধেও এইরূপ। এই দেশকালনিমিত্তের ভিত্তর এই একটি বিশেষত্ব দেখিতেছি যে, উহারা অন্ত্যন্ত বস্তু হইতে পৃথক্ ভাবে অবস্থান করিতে পারে না। হোমরা ‘শুদ্ধ দেশের’ বিষয় ভাবিতে চেষ্টা কর, যাহাতে কোন বর্ণ নাই, যাহার সীমা নাই, চতুর্দিকস্থ কোন বস্তুর সহিত যাহার কোন সংশ্লব নাই। তুমি উহার বিষয় চিন্তা করিতেই পারিবে না। হোমাকে দেশের বিষয় চিন্তা করিতে হইলে দুইটি সীমার মধ্যস্থিত অথবা তিনটি বস্তুর মধ্যে অবস্থিত দেশের বিষয় চিন্তা করিতে হইবে। তবেই দেশের অস্তিত্ব অন্ত বস্তুর উপর নির্ভর করিতেছে। কাল সম্বন্ধেও তদ্রূপ; শুদ্ধ ‘দেশ’ সম্বন্ধে তুমি কোন ধারণা করিতে পার না; দেশের ধারণা করিতে হইলে হোমাকে একটি পূর্ববর্তী আর একটি পরবর্তী ঘটনা লইতে হইবে এবং কালের ধারণা দ্বারা ঐ দুইটিকে যোগ করিতে হইবে। যেমন দেশ বহিঃস্থ দুইটি বস্তু উপর নির্ভর করিতেছে, তদ্রূপ কালও দুইটি ঘটনার উপর নির্ভর করিতেছে। আর এই ‘নিমিত্ত’ বা ‘কার্য্যকারণ ভাবের’ ধারণা এই দেশ কাল এবং আর যাহা কিছু, সমূহের উপর নির্ভর করিতেছে। এই ‘দেশকালনিমিত্ত’ সকল গুলিরই ভিত্তর বিশেষত্ব এই যে, উহাদের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। এই চোরাকানা বা ঐ দেয়ালটার বৈরূপ অস্তিত্ব আছে, উহাদের তাহাও নাই। এ যেন সকল বস্তুরই পশ্চাদেশস্থ ছায়াস্বরূপ, তুমি কোন মতে উহাকে ধরিতে পার না। উহাদের ত কোন সত্তা নাই—আমরা দেখিলাম, উহাদের বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। খুব জোর না হস্তাচ্ছায়া কিন্তু উহা যে কিছুই নয়, তাহাও বলিতে পারা যায় না; কারণ, উহারই ভিত্তর দিয়া জগতের প্রকাশ হইতেছে—এ যেন তিনগুণের এক স্বাভাবিক নিঃশব্দস্বরূপ—নানারূপ প্রসব করিতেছে। অতএব আমরা দেখিলাম এই দেশকালনিমিত্তের সমষ্টির অস্তিত্বও নাই এবং উহারা একেবারে অসং ও (অস্তিত্বশূন্য) নহে। এ যেন ছায়ার দ্বারা সকল বস্তুকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, উহারা আবার এক সময়ে একেবারে অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ সমুদ্রের তরঙ্গ সম্বন্ধে চিন্তা কর। তরঙ্গ অবশ্যই সমুদ্রের সহিত

অভেদ, তথাপি আমরা উহাকে তরঙ্গ বলিয়া সমুদ্র হইতে পৃথক্ক্রমে জানিতেছি। এই বিভিন্নতার কারণ কি?—নামরূপ। নাম অর্থাৎ সেই বস্তুসম্বন্ধে আমাদের মনে যে একটা ধারণা বহিয়াছে; আর, রূপ অর্থাৎ আকার। আবার তরঙ্গকে সমুদ্র হইতে পৃথক্ক্রমে কি আমরা চিন্তা করিতে পারি? কখনই না। উহা সকল সময়েই ঐ সমুদ্রের ধারণাব উপর নির্ভর করিতেছে। যদি ঐ তরঙ্গ চলিয়া যায়, তবে রূপও অসংস্থিত হইল, কিন্তু ঐ রূপটা যে একেবারে ভ্রমাত্মক ছিল, তাহা নহে। যতদিন ঐ তরঙ্গ ছিল, তত দিন ঐ রূপটা ছিল এবং তোমাকে বাহ্য চোখে ঐ রূপ দেখিতে হইত। ইহাই মারা। অতএব এই সমুদ্র জগৎ যেন সেই ব্রহ্মের এক বিশেষ রূপ। ব্রহ্মই সেই সমুদ্র এবং তুমি আমি সূর্য্য তারা সবই সেই সমুদ্রে ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গমাত্র। তরঙ্গগুলিকে সমুদ্র হইতে পৃথক্ করে কে?—ঐ রূপ। আর, ঐ রূপ—কেবল দেশকালনিমিত্ত ঐ দেশকালনিমিত্ত আবার সম্পূর্ণরূপে ঐ তরঙ্গের উপর নির্ভর করিতেছে। তরঙ্গও যাই চলিয়া যায়, অগনি তাহারও অসংস্থিত হয়। জীবাত্মা যখনই এই মারা পরিত্যাগ করে, তখন তাহার পক্ষে উহা অসংস্থিত হইয়া যায়, সে মুক্ত হইয়া যায়। আমাদের সমুদ্র চোখাই এই দেশকালনিমিত্তের উপর নির্ভর হইতে আপনাকে রক্ষা করা। উহারা সর্বদাই আমাদের পক্ষে বাধা দিতেছে, আর আমরা সর্বদাই উহাদের কবল হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছি। পণ্ডিতেরা ‘ক্রমবিকাশবাদ’ (Theory of Evolution) কাহাকে বলেন? উহার ভিতর দুইটা ব্যাপার আছে। একটা এই যে, এক ভগ্নানক অন্তর্নিহিত গুণশক্তি আপনাকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে, আর বহিঃস্থ অনেক ঘটনাবলি উহাতে বাধা দিতেছে—চতুর্দিকস্থ অবস্থাপুঞ্জ উহাকে প্রকাশিত হইতে দিবে না। সুতরাং এই অবস্থাপুঞ্জের সহিত সংগ্রামের জন্ত ঐ শক্তি নব নব কলের ধারণ করিতেছেন। একটা ক্ষুদ্রতম কীটপুং, এই উন্নত হইবার চেষ্টার আর একটা শরীর ধারণ করে এবং কতকগুলি বাধাকে জয় করিয়া থাকে, এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন শরীর ধারণ করিয়া অবশেষে মহাব্যাক্রমে পরিণত হয়। এক্ষণে যদি এই তত্ত্বটিকে উহার স্বাভাবিক চরম সিদ্ধান্তে লইয়া যাওয়া যায়, তবে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, এমন সময় আসিবে, যখন, যে শক্তি কীটপুংর ভিতরে ক্রীড়া করিতেছিল এবং যাহা অবশেষে মহাব্যাক্রমে পরিণত হইয়াছিল, তাহা সমস্ত বাধা অতিক্রম করিবে, বহিঃস্থ ঘটনাপুঞ্জ আর উহাকে কোন বাধা দিতে পারিবে না। এই তত্ত্বটী দার্শনিক ভাষায় প্রকাশিত

হইলে এইরূপ বলিতে হইবে :—প্রত্যেক কার্যের দুইটি করিয়া অংশ আছে, একটা বিষয়ী, অপরটা বিষয়। একজন আমাকে তিরস্কার করিল, আমি আপনাকে অন্তর্ভুক্তি বোধ করিলাম—এখানেও এই দুইটি ব্যাপার রহিয়াছে। আর আমার সারাজীবনের চেষ্টা কি? না, নিজের মনকে এতদূর সবেল করা, যাহাতে বাহিরের অবস্থাগুলির উপর আমি আধিপত্য করিতে পারিব, অর্থাৎ সে আমাকে তিরস্কার করিলেও আমি কিছু কষ্ট অনুভব করিব না। এই-রূপেই আমরা প্রকৃতিকে জয় করিবার চেষ্টা করিতেছি। নীতির অর্থ কি? ‘নিজে’কে দূঢ় করা—উহাকে ক্রমশঃ সর্বপ্রকার অবস্থা সহ্যইয়া লওয়া, যেমন তোমাদের বিজ্ঞান বলেন যে, মনুষ্যশরীর কালে সর্বাবস্থাসহনক্ষম হয়, আর যদি বিজ্ঞানের একথা সত্য হয়, তবে আমাদের দর্শনের ‘এই সিদ্ধান্ত, (অর্থাৎ এমন এক সময় আসিবে, যখন আমরা সর্বপ্রকার অবস্থা জয় করিতে পারিব), অকাটা যুক্তির উপর স্থাপিত হইল, বলিতে হইবে; কারণ, প্রকৃতি সসীম।

এই একটা কথা আবার বুঝিতে হইবে—প্রকৃতি সসীম। ‘প্রকৃতি সসীম’ কি করিয়া জানিলে? দর্শনের দ্বারা উহা জানা যায়। প্রকৃতি সেই অনন্তেরই সীমাবদ্ধভাবমাত্র, অতএব উহা সসীম। অতএব এমন এক সময় আসিবে, যখন আমরা বাহিরের অবস্থাগুলিকে জয় করিতে পারিব। উহা-দিগকে জয় করিবার উপায় কি? আমরা বাস্তবিক পক্ষে বাহিরের বিষয়গুলিতে কোন পরিবর্তন উৎপাদন করিয়া উহাদিগকে জয় করিতে পারি না। ক্ষুদ্রকায় মংগুটা তাহার জলস্থ শত্রুগণ হইতে আত্মরক্ষায় ইচ্ছুক। সে কি করিয়া উহা সাধন করে? আকাশে উড়িয়া—পক্ষী হইয়া। মংগুটা জল বা বায়ুতে কোন পরিবর্তন সাধন করিল না—পরিবর্তন যাহা কিছু হইল, তাহা তাহার নিজের ভিতরে। পরিবর্তন সর্বদাই ‘নিজের ভিতরেই হইয়া থাকে। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই, সমুদয় ক্রমবিকাশ ব্যাপারটীতে পরিবর্তন ‘নিজে’র ভিতর হইয়া হইয়া প্রকৃতির জয় হইতেছে। এই তত্ত্বটি ধর্ম এবং নীতিতে প্রয়োগ কর—দেখিবে, এখানেও ‘অন্ততঃ’ ‘নিজে’র ভিতরে পরিবর্তনের দ্বারাই সাধিত হইতেছে। সবই নিজের উপর নির্ভর করে, এই ‘নিজে’র উপর ঐক্য দেওয়াই অধৈতবাদের প্রকৃত দৃঢ় ভূমি। ‘অন্ততঃ’ এ সকল কথা বলাই ভুল, কারণ বহির্জগতে উহাদের কোন অস্তিত্ব নাই। ক্রোধের কারণসমূহ পুনঃ পুনঃ ঘটিলেও ঐ সকল ঘটনায় স্থিরভাবে থাকা যদি আমার অভ্যাস হইয়া যায়, তাহা হইলেই আমার কখনই ক্রোধের উদ্বেগ হইবে

না। এইরূপে লোকে আমাকে যতই ঘৃণা করুক, যদি সে সকল আমি গায়ে না মাখি, তাহা হইলে আমারও তাহার প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হইবে না। এইরূপেই ‘অশুভজয়’ করিতে হয়—‘নিজে’র উন্নতিসাধন করিয়া। অতএব তোমরা দেখিতেছ, অদ্বৈতবাদই একমাত্র ধর্ম, যাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্তসমূহের সহিত ভৌতিক ও আবাসিক উভয় দিকেই শুধু মেলে, তাহা নয়, বরং ঐ সকল সিদ্ধান্ত হইতেও উচ্চতর সিদ্ধান্ত সমূহ স্থাপন করে, আর এই জন্যই আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের প্রাণে ইহা খুব লাগিতেছে। তাঁহারা দেখিতেছেন, প্রাচীন দ্বৈতবাদাত্মক ধর্মসমূহ তাঁহাদের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে, উহাতে তাঁহাদের জ্ঞানের ক্ষুধা মিটিতেছে না। কিন্তু এই অদ্বৈতবাদে তাঁহাদের জ্ঞানের ক্ষুধা মিটিতেছে। শুধু প্রাণের বিশ্বাস থাকিলে মানুষের চণ্ডিবে না, এমন বিশ্বাসও থাকা চাই, যাহাতে তাহার জ্ঞানবৃত্তি চরিতার্থ হয়। যদি মানুষকে যাহা দেখিবে, তাহাই বিশ্বাস করিতে বলা হয়, তবে সে শীঘ্রই বাতুলালয়ে যাইবে। * * *। এইরূপ অন্ধবিশ্বাস শুধু আমেরিকাতে নহে, সকল দেশেই আছে, আমাদের দেশে এই অন্ধবিশ্বাসের প্রবল রাজত্ব। অদ্বৈতবাদ কখন সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচারিত হইতে দেওয়া হয় নাই। সন্ন্যাসীরাই অরণ্যে উহার সাধনা করিতেন, সেই ভগ্নই বেদান্তের এক নাম হইয়াছিল ‘আরণ্যক’। অবশেষে ভগবৎ রূপায় বুদ্ধদেব আসিয়া আপামর সাধারণের ভিতর উহা প্রচার করিলেন, তখন সমস্ত জাতি বৌদ্ধধর্মে জাগিয়া উঠিল। অনেক দিন পরে আবার যখন নাস্তিকেরা সমুদয় জাতিকে একেবারে ধ্বংশ করিয়া ফেলিল, তখন জ্ঞানীরা একমাত্র এই ধর্মকেই ভারতের এই নাস্তিকতাকার মোচনের একমাত্র উপায় দেখিলেন। হুইবার উহা ভারতকে নাস্তিকতা হইতে রক্ষা করিয়াছিল। প্রথম বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের ঠিক পূর্বে নাস্তিকতা অতি প্রবল হইয়াছিল—ইয়ুরোপ আমেরিকার পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে এখন যেরূপ নাস্তিকতা, সেরূপ নাস্তিকতা নহে; উহা হইতে অনেক জঘন্য নাস্তিকতা। আমি এক প্রকারের নাস্তিক, কারণ, আমার বিশ্বাস—একমাত্র পদার্থেরই অস্তিত্ব আছে। আধুনিক ঐজ্ঞানিক নাস্তিকও তাই বলেন, তবে তিনি উহাকে ‘জড়’ আখ্যা প্রদান করেন, আমি উহাকে ‘ব্রহ্ম’ বলি। এই ‘জড়বাদী’ নাস্তিক বলেন, এই ‘জড়’ হইতেই মানুষের আশা ভরসা ধর্ম সবই আসিয়াছে। আমি বলি, ব্রহ্ম হইতে সমুদায় হইয়াছে। আমি এরূপ নাস্তিকতার কথা বলিতেছি না, আমি চার্মাকের মতের কথা বলিতেছি—খাও দাও মজা উড়াও; ঈশ্বর আয়া ১লা বৈশাখ, ১৩০৭।] উদ্বোধন। ২১৫

বা স্বর্গ কিছুই নাই; ধর্ম কতকগুলি ধূর্ত হই পুরোহিতের কল্পনানাত্র—‘ধাবজী-
বেং সুখং জীবং ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।’ এইরূপ নাস্তিকতা বুদ্ধদেবের
আবির্ভাবের পূর্বে এত বিস্তৃত হইয়াছিল যে, উহার এক নাম ‘লোকায়ত
দর্শন’। এইরূপ অবস্থার বুদ্ধদেব আগিয়া সাধারণের মধ্যে বেদান্ত প্রচার
করিয়া ভারতবর্ষকে রক্ষা করিলেন। বুদ্ধদেবের তিরোভাবের সপ্ত বর্ষ পরে
আবার ঠিক এইরূপ ব্যাপার ঘটিল। আচণ্ডালে বৌদ্ধ হইতে লাগিল। নানা-
বিধ বিভিন্ন জাতি বৌদ্ধ হইতে লাগিল। অনেকে অতি নীচ জাতি হইলেও
বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া বেশ সদাচারপরায়ণ হইল। ইহাদের কিন্তু নানা প্রকার
কুসংস্কার ছিল—নানা প্রকার ছিটা, কোঁটা, মন্ত্র তন্ত্র ভূতদেবতার বিশ্বাস
ছিল। বৌদ্ধধর্ম প্রভাবে ঐ গুলি দিনকতক চাপা থাকিল বটে, কিন্তু সেগুলি
আবার প্রকাশ হইয়া পড়িল। অবশেষে ভারতে বৌদ্ধধর্ম নানা প্রকার
বিষয়ের খিচুড়ি হইয়া দাঁড়াইল। তখন আবার নাস্তিকতার মেঘে ভারতগগন
আচ্ছন্ন হইল—সম্রাট লোকে যথেষ্টাচারী ও সাধারণ লোকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন
হইল। এমন সময়ে শঙ্করাচার্য্য উঠিয়া বেদান্তের পুনরুদ্ধাপন করিলেন। তিনি
উহাকে একটা যুক্তিসঙ্গত বিচারপূর্ণ দর্শনরূপে প্রচার করিলেন। উপনিষদে
বিচারভাগ বড় অক্ষুট। বুদ্ধদেব উপনিষদের নীতিভাগের দিকে খুব ঝোঁক
দিয়াছিলেন, শঙ্করাচার্য্য ইহার জ্ঞানভাগের দিকে বেশী ঝোঁক দিলেন।
তাহারা উপনিষদের সিদ্ধান্তগুলি যুক্তিবিচারের দ্বারা প্রমাণিত। প্রাণাণীবদ্ধ রূপে
লোক সমক্ষে স্থাপিত হইয়াছে। ইউরোপেও আজকাল ঠিক সেই অবস্থা
উপস্থিত। এই নাস্তিকগণের মুক্তির জন্ত—তাহারা যাহাতে বিশ্বাস করে
তজ্জন্য ভোমরা অগৎ জুড়িয়া প্রার্থনা করিতে পার, কিন্তু তাহারা বিশ্বাস করিবে
না। তাহারা যুক্তি চায়। সুতরাং ইউরোপের মুক্তি এক্ষণে এই বিচারপূত ধর্ম—
অদ্বৈতবাদের উপর নির্ভর করিতেছে; আর একমাত্র এই অদ্বৈতবাদ, এই নিগূণ
ব্রহ্মের ভাবই পণ্ডিতদিগের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ। যখনই ধর্ম
লুপ্ত হইবার উপক্রম হয়, এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই ইহা আসিয়া
থাকে। এই জন্তই ইউরোপ আমেরিকায় ইহা প্রবেশ লাভ করিয়া দৃঢ়মূল
হইতেছে। প্রাচীন উপনিষদগুলি অতি উচ্চ কবিত্বপূর্ণ; এই সকল উপনি-
ষদ্বক্তা ঋষিগণ কবি ছিলেন। তাহারা প্রচারও করিতেন না, অথবা দার্শনিক
বিচারও করিতেন না, অথবা লিখিতেনও না। তাঁহাদের স্বয়ং-উৎস হইতে
সদ্বীতের কোয়ারা বহিত। তার পর বুদ্ধদেবে আমরা দেখি—স্বয়ং, অনন্ত

অন্যত্রই দীর্ঘ দ্বিকার ৩ দীর্ঘ উকার হইবে। কিন্তু ইহা শাস্ত্রে অব্যবহার্য বলিয়া পুনরায় তাহার নিষেধ বিধান করিতে হইবে। নতুবা “গঙ্গ ইন্দ্র”, “বায়ো উদকম্” এই সকল স্থলে একারের শেষাংশে ইকার এবং ওকারেব শেষাংশে উকার থাকিতে “অকঃ সর্বণে দীর্ঘঃ” ৬১১০১। (অক্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ অর্থাৎ অ ই উ ঋ ঌ ইহাদের পরে, সমান অচ্ অর্থাৎ অ ই উ ঋ ঌ থাকিলে, উভয়ে মিলিয়া দীর্ঘ একাদেশ হয়) এই সূত্রানুসারে, দীর্ঘত্ব প্রাপ্তি হইবে। অর্থাৎ গঙ্গ-ইন্দ্র, এইস্থলে “গঙ্গ ইন্দ্র” এইরূপ সঙ্গত প্রয়োগ না হইয়া, “গংগেন্দ্র” এইরূপ অসঙ্গত প্রয়োগ হইতে থাকিবে।

ভাষামূল।—হ্রস্ববিধিপ্রতিষেধঃ*। দীর্ঘে হ্রস্বাশ্রয়ো বিধিঃ প্রাপ্পোতি স প্রতিষেধঃ। আলুয়। প্রলুয়। হ্রস্বত্র পিতি কৃতি ভুগ্ভবতীতি তুক্ প্রাপ্পোতি। নৈষ দোষঃ। আচার্য্যপ্রবৃত্তির্জ্ঞাপয়তি ন দীর্ঘে হ্রস্বাশ্রয়ো বিধিভবতি। যদয়ং দীর্ঘাচ্ছে একং শাস্তি। নৈতদস্তু জ্ঞাপকম্। অস্তি হ্রস্বদেতত্ত্ব বচনে শ্রয়োজনম্। কিম্। পদান্তাদেতি বিভাষাং বক্ষ্যামোতি।

বঙ্গানুবাদ।—একণে ইহাতে অত্র দোষও দেখান হইতেছে। দীর্ঘ কার্য্যে হ্রস্ব বিধি নিষিদ্ধ হইবে।*।

দীর্ঘ কার্য্য কৰ্ত্তব্য হইলে, যে সকল স্থানে হ্রস্ব নিমিত্ত বিধি প্রাপ্ত হয়, সেই সকল বিধি নিষেধ করিতে হইবে। যথা :—আ+লু+ক্যপ্=আলুয়। অ+লু+ক্যপ্=প্রলুয়। যদি দীর্ঘাদেশ কালে হ্রস্ব নিমিত্ত বিধি নিষেধ করা না হইত; তবে এখানেও “হ্রস্বত্র পিতি কৃতি তুক্” ৬১১০১। (পকার ইং প্রত্যয় ও ককার ইং প্রত্যয় পরে থাকিলে, হ্রস্বের পরে তুক্ আগম হয়) এই সূত্রানুসারে এই স্থলেও তুক্ আগম হইত। তাহা হইলে বিসৃদ্ধ ‘আলুয়’ ‘প্রলুয়’ প্রয়োগ না হইয়া, ‘আলুতা’ ‘প্রলুতা’ প্রভৃতি অশুদ্ধ প্রয়োগ হইতে থাকিত।

তাৎপর্যার্থঃ—যদি দীর্ঘ উকার গ্রহণে, তদংশবত্তী হ্রস্ব উকারেরও উ+উ=উ হওয়াতে, উর শেষাংশও উ হওয়াতে) গ্রহণ হইত, তবে লু ধাতুর উকারে, হ্রস্ব উ থাকিতে, হ্রস্ব উকারান্ত ধাতুর উত্তর যেরূপ তুক্ আগম হইয়া থাকে, সেরূপ দীর্ঘ উকারান্ত ধাতুর উত্তরও তুক্ আগম হইয়া, অসঙ্গত প্রয়োগ হইবে।

এই স্থলে দোষ হইবে না। কেন না এক্ষণে অতিপ্রায় আচার্য্য পাণিনিই জানাইয়াছেন যে, দীর্ঘ নিমিত্তক কার্য্য কৰ্ত্তব্য হইলে, হ্রস্ব নিমিত্তক বিধি প্রাপ্তি ১লা বৈশাখ, ১৩০৮।] উদ্বোধন। [■] ২১৭

হয় না। যেহেতু তিনি “দীর্ঘাং” ৬।১।৭৫: (দীর্ঘেব পবে ছ থাকিলে, তুক্ আগম হয়) এই সূত্রে ‘দীর্ঘের পরে ছ থাকিলে, তুক্ আগম হয়,’ এইরূপ বিধান করিয়াছেন। যদি হ্রস্বগ্রহণে দীর্ঘেরও গ্রহণ হইত, তবে “হ্রস্বা পিতি কিত্তি তুক্” এই সূত্রের দ্বারায় সর্বত্র তুক্ আদেশ প্রাপ্ত হইত। “দীর্ঘাং” এই সূত্রের দ্বারায় আর দীর্ঘের পরে ছ থাকিলে, তুক্ আদেশ বহিবার প্রয়োজন হইত না।

এ স্থলে ইহা স্পষ্ট হইতে পারে না। কেননা এ স্থলে ছে চ ৬।১।৭৩। (ইন্দ্রে পরে ■ থাকিলে তুক্ আগম হয়) এই সূত্রে অমুভুতি আসিয়াই কার্য্য নির্বাহ হইবে। সূত্ররাংই পুনঃ ‘দীর্ঘাং’ এই সূত্র কবিবাব অত্র প্রয়োজন আছে।

কিসেই প্রয়োজন?

পদান্তাধা ৬।১।৭৬। (পদান্ত দীর্ঘাংপবে পবে ছ থাকিলে, বিকল্পে তুক্ আগম হয়) এই সূত্রানুসারে “পদান্ত দীর্ঘের পবে ■ থাকিলে, বিকল্পে তুক্ আগম হয়,” এইরূপ বলা হইবে। এবং সেই ভুলই এখানে ‘দীর্ঘাং’ এই স্থাব করা হইয়াছে।

ভাষ্যমূ।—বর্ত্তি যোগবিভাগং করোতি উত্তরাং হি দীর্ঘাংপদান্তাদেত্যেব ক্রবাং। ইহ তর্হি ষট্‌পাতিঃ মালাভিঃ। অতো ভিম্‌ত্রৈমিত্তাসভাঃ প্রাপ্নোতি। তপরকরণসামর্থ্যায় ভবিষ্যতি। ইহ তর্হি ষাণ্‌পাতি অতো লোব। আর্দ্ধ-ধাতুকে ইত্যাকারলোপঃ প্রাপ্নোতি। নহু চাত্রাপি তপরকরণ সামর্থ্যাদেব ন ভবিষ্যতি। অস্তিহন্ততপরকরণে প্রয়োজনম্। কিম্। সন্মত্যা লোপো মা ভূদিত্তি। অথ ক্রিসমাণেহপি তপরে পরন্ত লোপে কৃতে পূর্বন্ত কল্পায় ভবতি। পরলোপন্ত স্থানিবস্তাদমিদ্ধস্তাক।

বঙ্গানুবাদ।—তবে যদি এই সূত্রে যোগ বিভাগ করা যায়, তাহা হইলে কি দোষ হইবে?

তাহা হইলে, অত্র প্রকার অর্থ হইবে। “দীর্ঘাং পদান্তাধা” (দীর্ঘের পরে তুক্ আগম হইবেই, পদান্ত দীর্ঘের পরেও বিকল্পে তুক্ আগম হইবে।) ভাগ হইলে সিদ্ধান্তস্বরূপে এইরূপ অর্থ হইবে যে, “দীর্ঘ বর্ণের পরে নিম্নত তুক্ আগম হয় এবং পদান্ত দীর্ঘের পরে বিকল্পে তুক্ আগম হইবে” এইরূপ বলিতে হইবে।

এখানেও তবে, ষট্‌পা ■ মালা শব্দের উত্তর, তৃতীয়ার বহুবচনে ভিম্‌ প্রত্যয় উদ্যোজন। [৩য়—৭ম সংখ্যা ;

করিয়া অকারান্ত শব্দের উত্তর “অতোভিসঐন্” ৭:১১২। (অকারান্ত অঙ্গের পরস্থিত ভিস্মানে ঐন্ আদেশ হয়) এই সূত্রানুসারে ঐন্ আদেশ প্রাপ্ত হইবে। কেননা, খট্টা শব্দের আকারের অন্তর্বর্তী দুই অকার থাকাতে, অকার প্রযুক্ত যে কার্য্য হইয়া থাকে, আকার প্রযুক্তও সেই কার্য্য হইবে। অতএব ‘খট্টাভিঃ’ এইরূপ সঙ্গত প্রয়োগ না হইয়া খট্টেঃ এইরূপ অসঙ্গত প্রয়োগ হইবে।

এরূপ অসঙ্গত প্রয়োগ হইবে না। যেহেতু “অতোভিসঐন্” এই সূত্রে ত কার পরে আছে এমন যে অকার, তৎপরস্থিত ভিস্মানে ঐন্ আদেশ হয়। সুতরাং কেবলমাত্র দুই অকারের পবেই ঐন্ হইবে, দীর্ঘ আকারের পরে ঐন্ হইবে না। তাহা হইলেই খট্টা শব্দের পবে ঐন্ হইয়া যে অশুদ্ধ প্রয়োগ হওয়ার সম্ভাব ছিল, তাহা হইবে না।

এই স্থানে দোষ না হইলেও যাতা বাতা এইস্থলে “অতোলোপ আর্দ্ধধাতুকে” ৬:৪৪৬। (আর্দ্ধধাতুক উপদেশ) কালে যে অকারান্ত শব্দ, তাহার অকারের লোপ হয়, আর্দ্ধধাতুক (১) পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে আকারের লোপ হইবে।

যদি বল যে, এইস্থলেও ‘অতোলোপ’ হয়, অকারের পবে ত বাবা থাকাতে, কেবলমাত্র দুই অকারেরই লোপ হইবে, আকারের লোপ হইবে না; কিন্তু তাহা ঠিক নহে, কেননা এ স্থলে তকারান্ত শব্দ প্রয়োগ করিবার অত্র উদ্দেশ্য আছে।

কি সেই উদ্দেশ্য?

সর্বাংশের লোপ থাকিতে না হয় অর্থাৎ যাতা বাতা এই শব্দদ্বয়ের এক একটা অকারের মতো যে দুই দুইটা অকার আছে, সেই অকারের লোপ না হইয়া কেবলমাত্র, অস্তিত্ব হিত একটা অকারেরই বাহাতে লোপ হয়, ইহাই উদ্দেশ্য। অতএব, এস্থানে তকার পরে, থাকিলেও পবের অকারের লোপ করিয়া, পূর্ক অকার মাত্রেরই কেন লোপ হয় না?

পরের অকার লোপ হইলেও “ভানিবদ্ভাব” (যে বর্ণের স্থানে যে বর্ণ আদেশ হয়, সেই বর্ণ তাহার স্থানির (১) ধর্ম প্রাপ্ত হয়) প্রযুক্ত পুনরায়

(১) ভিপ্ ভম্ ঙ্গি ঞ্জিতি ভিত্তি ভিত্তি প্রত্যয় সমূহ এবং শকার ইং বিশিষ্ট প্রত্যয় সমূহকে সার্বধাতুক বলে। ভক্তি অজ্ঞান প্রত্যয়সমূহকে আর্দ্ধধাতুক মাত্র বলে।

অকারের ধর্ম্যই প্রাপ্ত হইবে। অথবা “অসিদ্ধবহুভাভাং ৬৪.২২। (যষ্ঠ অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে এই দ্বাবিংশতি স্বত্র হইতে আরম্ভ করিয়া এই অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত, সমান আশ্রয় প্রযুক্ত কোনও কার্য্য প্রাপ্তি হইলে, তাহা পর-স্বত্রে দৃষ্টিতে পূর্ব্ব স্বত্র অসিদ্ধ হয়) সূত্রাং পূর্ব্বের প্রতি পর স্বত্র অসিদ্ধ হয় বলিয়া, এই স্থলেও লোপ বিধায়ক শাস্ত্র পদে বিধান করাতে লোপ হইবে না।

ভাষ্যমূল।—এং তর্হ্যাচার্য্য প্রবৃত্তিজ্ঞাপয়তি ন আকারহস্তাকারস্থ লোপো ভব-
তীতি যদয়মাতোহুপগে ক ইতি ককারমনুবন্ধং করোতি কথং কৃদ্ভা জ্ঞাপকম্।
কিংকরণে এতৎ প্রয়োজনং। কিতীত্যাকাবলোপো যথা স্মাদিতি। যজ্ঞা-
কারহাকারস্থ লোপঃ স্মাৎ কিংকরণমনর্থকং স্মাৎ। পরস্ত অকারস্তা-
লোপে কৃতে ঘমোরকারয়োঃ পররূপে হি সিদ্ধং রূপং স্মাদ্ গোদঃ কঞ্চলদ
ইতি।

বঙ্গানুবাদ।—এই প্রকারে আচার্য্য পানিনির অভিপ্রায়ই জানা যাইতেছে যে, আকারস্থিত অকারের লোপ হয় না। যেহেতু তিনি “আতোহুপসর্গে কঃ” ৩২.৩। (উপসর্গ ভিন্ন কন্ম উপপদে থাকিলে, আবারোও ধাতুর ক প্রত্যয়ই হয়, অনু প্রত্যয় হয় না।) এই স্বত্রে যে অ প্রত্যয় না করিয়া ক কার লোপ বিশিষ্ট প্রত্যয় করিয়াছেন, তাহা কেবল আবারস্থিত অকারের লোপ হয় না, ইহাই জানাটবার জ্ঞ।

ইহাতে কি প্রকারে আচার্য্যের এইরূপ অভিপ্রায় জ্ঞাপিত হইতেছে ?

এই স্থলে তা প্রত্যয়ের দ্বারায় কন্মসিদ্ধি হইলেও যখন পুনরায় ক কার ইং (লোপ) বিশিষ্ট প্রত্যয় করা হইয়াছে, তখন তাহাতে ইহাই জানা যাইতেছে যে, “আতোলাপ ইং চ” ৬৪.৬৪। (পরদর্শনাদিতে আছে এমন যে, আর্দ্ধবাহুক সংস্কৃত গকার ইং ককার ইং ওকার ইং ধাতু তাহাদের এবং ইট্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্গসমূহের পরে যে আকার, তাহার লোপ হয়) এই স্বত্রে, ক কাব লোপবিশিষ্ট প্রত্যয় করিবার ইহাই প্রয়োজন যে, যেন আকারের লোপ হইতে পারে। যদি আকারান্তস্থিত অ কারের লোপই হইত, তাহা হইলে এই স্বত্রে ককার ইংবিশিষ্ট প্রত্যয় করা অনর্থক হইত। কেনই বা স্বত্রে ককার ইংবিশিষ্ট প্রত্যয় করা বার্থ হইবে? আকারের শেষ অংশ অকারের লোপ করিলেও ত পদ সিদ্ধ হইবেই। যেমন—“গাং দদাতি ইতি গোদঃ কঞ্চলং দদাতি ইতি কঞ্চলদ”, এই স্থলে, দা ধাতুর আকারের শেষাংশ-স্থিত অকার, ক প্রত্যয় করিয়া লোপ করিলে, যে দকার থাকিবে, তাহার ২২০

অকারের সহিত, ক প্রত্যয়ের অকারের পররূপ (১) করিয়া, গোদঃ কষলদঃ রূপ সিদ্ধ হইবে ।

পুনঃ যদি ফলে সেই হইল, তবেও ত সূত্রে ককার ইংবিশিষ্ট প্রত্যয় করা নিষ্ফল হইল ?

ভাষ্যমূল।—পশুতিহাচার্য্যো নাকারমুজ্জাকারস্ত লোপঃ স্ফাদিত্তি । অতঃ ককারমনুবন্ধনং করোতি । নৈতদন্তিষ্টিজ্ঞাপকম্ । উত্তরার্থমেতৎ স্ফাৎ তুল-শোকয়োঃ পরিমৃজাপনুদোতি । যত্ৰহি গাপোষ্টগিত্যনুত্ৰার্থং ককারমনুবন্ধং করোতি ।

বঙ্গানুবাদ।—গাগিনি ইহা দেখিয়াছিলেন এবং এই জন্তই আকারহিত অকারের বাহাতে লোপ না হয়, তন্নিমিত্ত এই সূত্রে ককার অনুবন্ধ (লোপ) বিশিষ্ট প্রত্যয় করিয়াছেন ।

ইহা কখনও ককার অনুবন্ধের জ্ঞাপক হইতে পারে না । এই স্থলে ককার অনুবন্ধ বিশিষ্ট প্রত্যয় করিবার অত্র প্রয়োজন আছে । বাহাতে পরবর্তী “তুলশোকয়োঃ পরিমৃজাপনুদো” ত্যাগে । [তুল এবং শোক এই দুই কৰ্ম্মপদ উপপদে (পূৰ্ব্বপদে) আছে যাহার; এমন যে পরিপূৰ্ব্বক যজ্, ধাতু, এবং অপ্ পূৰ্ব্বক তদ্ ধাতু ইহাদের উত্তর ক প্রত্যয় হয়] এই সূত্রে ককার ইং প্রযুক্ত অকারের লোপ হইয়া থাকে ; এই ফল দেখাইবার জন্তই পূৰ্ব্ব সূত্রে ককারানুবন্ধ বিশিষ্ট প্রত্যয় করা প্রয়োজন ; অতথা “পরিমৃজ” এইরূপ প্রয়োগ না হইয়া, “পরিমার্জ” এইরূপ প্রয়োগ হইত ।

এই সকল এইরূপ হইলেও “গাপোষ্টক্” ত্যাগ (উপসর্গ পূর্ব্বে না থাকিলে, অথচ কৰ্ম্মপদ পূর্ব্বে না থাকিলে, অথচ কৰ্ম্মপদ পূর্ব্বে থাকিলে, গা ধাতু এবং পা ধাতুর উত্তর টক্ প্রত্যয় হয় । যথা সামং গায়তি ইতি সামগঃ) এই সূত্রে ককার অনুবন্ধবিশিষ্ট প্রত্যয় করিবার, আকার লোপ ভিন্ন অত্র কোনও উদ্দেশ্য নাই ; সুতরাং এই অনলোপায় স্থলে অত্র অর্থ না হয়, এই জন্তই ককার অনুবন্ধবিশিষ্ট প্রত্যয় করিয়াছেন । এবং ইহাতেই আচার্য্যের অভিপ্রায়ও এইরূপ জানা যাইতেছে ।

ভাষ্যমূল।—একবর্ণবচ্চ = । একবর্ণবচ্চ দীর্ঘো ভবতীতি বক্তব্যম্ । কিং

(১) পূৰ্ব্ব এবং পরের স্থানে যে একটীমাত্র আদেশ, তাহাকে পররূপ বলে । অভিধান ৩১৯৭ । (পদান্ত ভিন্ন অকারের পবে ঙ্গবিশিষ্ট কোনও বর্ণ থাকিলে অর্থাৎ অ, এ, ও থাকিলে, পররূপ একাদেশ অর্থাৎ পূর্বাঙ্গের স্থানে অ, এ অথবা ও হইয়া থাকে ।

প্রয়োজনম্ । বাচা ভবতীতি দ্ব্যজ্জলক্ষণঃ ঠম্মা ভূদিত্তি । ইহ চ বাচো নিমিত্তং তত্র নিমিত্তং সংযোগোৎপাতাবিত্যবৃত্তমানে গো দ্ব্যচ ইতি দ্ব্যজ্জলক্ষণো যথা ভূদিত্তি । অত্রাপি গোবোগ্রহণং প্রাপকং দীর্ঘাদ্ দ্ব্যজ্জলক্ষণো বিধিন্ ভবতীতি । অয়ং তু সর্বেষামেৱ পরিহারঃ ।

বঙ্গানুবাদ ।—দীর্ঘশব্দ একবর্ণ বিশিষ্ট হইবে । *

“দীর্ঘ বর্ণ সমুহ একবর্ণ বিশিষ্ট হয়” এইরূপ বলিতে হইবে ।

কেন একরূপ বলিতে হইবে ? ভাবার্থঃ—অ+অ এই দুই বর্ণ মিলিয়াই যখন দীর্ঘ আ এবং ই+ই এই দুই বর্ণ মিলিয়া যখন দার্ব ঐ প্রভৃতি বর্ণ হইয়াছে, তখন দীর্ঘ বর্ণকে এৱটী বর্ণ কেন বলিতে হইবে ?

যদি দীর্ঘ বর্ণও দুইটা স্বরবর্ণ বলিয়া গ্রহণ ; তবে “বাচা তরতি” (বাক্য প্রয়োগ দ্বারা পার হইতেছে) এই স্থলে বাক্ শব্দের উত্তর ‘ঠন্’ প্রত্যয় হইবে না । যেহেতু “নৌদ্ব্যচঠন” ৪.৪৭ (নৌশব্দের উত্তর এবং দুই স্বরবর্ণ বিশিষ্ট শব্দের উত্তর ‘ঠন্’ প্রত্যয় হয়, যথা বাহুভাঃ তরতি ইতি বাহুক) এই সূত্রানুসারে, বাক্শব্দের আকারে দুই স্বরবর্ণ থাকিতে, বাক্শব্দে উত্তরও ‘ঠন্’ প্রত্যয় হইবে । এইরূপ অসঙ্গত প্রয়োগ না হয়, এই জগৎ দীর্ঘ বর্ণকে দুই বা ততোধিক বর্ণ না বলিয়া এৱস্বর বিশিষ্ট বর্ণই বলিতে হইবে ।

অথবা “গোদ্ব্যচোৎসংখ্যা পরিমাণান্বদেগ্যং” ৫.১.৩৯ (গো শব্দের উত্তর সংখ্যা ও পরিমাণ ভিন্ন দুই স্বরবর্ণবিশিষ্ট শব্দের উত্তর, অখাদিগণের উত্তর ; নিমিত্ত, সংযোগ বা উপ, অবগম্যমান হইলে, ‘যং’ প্রত্যয় হয় । যথা :—গব্যঃ যশস্ত ইত্যাদি) এই সূত্রানুসারে, ‘বাক্’ এই শব্দের স্থানে, ও বাক্যের যে নিমিত্ত এবং তন্নিমিত্ত যে সংযোগ, উৎপাত, পশ্চাৎ বর্তমান থাকিলে, ‘বাক্’ শব্দের আকারে দুই স্বরবর্ণ লক্ষণ মানিয়া যং প্রত্যয় হইবে । আর এই সূত্রদ্বয়ে, গো শব্দ এবং নৌ শব্দ গ্রহণ করিতে, ইহাও বিজ্ঞাপিত হইতেছে যে, দীর্ঘ বর্ণে দুই স্বরবর্ণ লক্ষণ নিমিত্ত বিধি হয় না । যদি দীর্ঘ গ্রহণে, দুই স্বরবর্ণেরই গ্রহণ হইত ; তবে পূর্নোক্ত সূত্রদ্বয়ে, দুই স্বরবর্ণেরই গ্রহণ হইত, তবে পূর্নোক্ত সূত্রদ্বয়ে, দুই স্বরবর্ণের উত্তর ‘ঠন্’ ও ‘যং’ প্রত্যয় করাতেই, গো শব্দের দীর্ঘবর্ণ ওকারে এবং নৌশব্দের দীর্ঘ বর্ণ ওকারে দুই স্বরবর্ণ থাকতেই প্রয়োগ সিদ্ধি হইত । সূত্রদ্বয়ে গো এবং নৌ শব্দ প্রয়োগ করিবার কোনও প্রয়োজন হইত না । অতএব সূত্রেতে যখন কেবল দুই স্বরবর্ণবিশিষ্ট শব্দের উত্তর ঠন্ ও যং প্রত্যয় না করিয়া, গো এবং নৌশব্দ গ্রহণ

করা হইয়াছে, তখন তাহাতে ইহাই জানা যাইতেছে যে, দীর্ঘ বর্ণে দুই স্বরবর্ণ বিশিষ্ট বিধি প্রাপ্ত হয় না। এবং এই প্রকারে সকল প্রকার শব্দারই পরিহার হইতেছে।

ভাষ্যমূল।—নাব্যপবুত্সাবরবস্ত তদ্বিবিধ্যা দ্রব্যোমু* । নাব্যপবুত্সা-
বয়বাস্রো বিধি ভবতি যথা দ্রব্যোমু । তত্থথা । দ্রব্যোমু সপ্তদশ সামিধেনো
ভবন্তীতি ন সপ্তদশারত্নমাত্রং কাষ্ঠমগ্নাবভ্যাধীয়তে ।

বঙ্গানুবাদ।—অভিন্ন অবয়বের ভিন্ন বুদ্ধি হয় না, যেমন দ্রবাদিতে* ।
যেমন কোনও ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য সমূহে একই বুদ্ধি হয় না, সেইরূপ একটী মাত্র
অভিন্ন অবয়ব বিশিষ্ট বর্ণে, ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব প্রযুক্ত বিধি প্রাপ্ত হইবে না ।
তাহার দৃষ্টান্ত এই যে, যজ্ঞের ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য সকলের মধ্যে ১৭টী সামধেনীর (১)
প্রয়োজন হয়। সেই স্থলে এক এক অল্প বিশিষ্ট মতেরটী সামধেনী
প্রয়োগ না করিয়া একেবারে সত্তর অল্পবিশিষ্ট একটী সামধেনী বদাপি
অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয় না ।

ভাষ্যমূল।—বিষম উপাস্যঃ । প্রহাচ্যং চৈব হি তৎকশ্য চোত্ততে ।
অসংভবশ্চাগ্নৌ বেদ্যং চ । যথা তর্হি সপ্তদশ প্রাদেশমাত্রীরাশ্বথাঃ সমিধো-
ভাদধীতেতি ন সপ্তদশ প্রাদেশমাত্রং কাষ্ঠমগ্নাবভ্যাধীয়তে । অত্রাপি প্রাতি-
প্রণবং শৈতৎকশ্য চোত্ততে । তুল্যাসংভবেহগ্নৌ বেদ্যং চ ।

বঙ্গানুবাদ।—এই দৃষ্টান্ত এই স্থলে অভূতাক্রমে প্রয়োগ করা হইতেছে ।
এখানে ইহা কদাপি তুল্য দৃষ্টান্ত হইতে পারে না । যেহেতু যজ্ঞকশ্মে যে
সপ্তদশ সামধেনীর দ্বারা আহুতির ব্যবস্থা বেদে আছে, সেই স্থলে এহরূপও
বিধান আছে যে, এক একটী মন্ত্র পাঠ পূরক এক একটী সামধেনী অগ্নিতে
প্ররোগ করিতে হইবে । যদি একেবারে সপ্তদশ অল্পপারমিত সামধেনী
অগ্নিতে আহুতি দেওয়া যায়, তাহা হইলে বেদেতে যে প্রাতি মন্ত্র পাড়িয়া এক
এক অল্পপারমিত প্রত্যেকটী সামধেনী প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে, সেই ব্যবস্থা
রক্ষিত হয় না । বিশেষতঃ আহুত প্রদানের যোগ্য ক্ষুদ্র অবয়ব বিশিষ্ট অগ্নি-
কুণ্ডে এবং বেদেতে মতের হাত বিশিষ্ট এক খান কাষ্ঠ আহুতি দেওয়াও একান্ত
অসম্ভব ।

ভাল, তবে সপ্তদশ অল্পবিশিষ্ট একটী কাষ্ঠ একেবারে অগ্নিতে প্রয়োগ
করা অসম্ভব বলিয়া, এই দৃষ্টান্ত না হয় অসঙ্গ হই হইল ; কিন্তু যে স্থানে “সত্তর
প্রাদেশমাত্র অশ্বখ শাখা দ্বারা সমিধ আধান (আহুতি প্রদান) করিবে” এইরূপ
২২৩ উদ্বোধন । [৩য়—৭ম সংখ্যা ;

বেদে বিধান আছে, এই স্থলে ত আহুতি প্রদান ক্ষুদ্র কাষ্ঠ বলিয়া আহুতি প্রদান অসম্ভব না হইলেও সম্পদশ প্রাদেশপরিমিত একখানি কাষ্ঠ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করে না ।

ইহাও তুলা দৃষ্টান্ত হইল না । এই স্থলেও এক একটী প্রণব উচ্চারণ করিয়া, এক এক প্রাদেশ পরিমিত এক একটী অখণ্ড শাখা আহুতি প্রদানের ব্যবস্থা আছে । সুতরাং একবারে সম্পদশ প্রাদেশ বিশিষ্ট একটী অখণ্ড শাখা আহুতি প্রদান করিলে, বেদের সেই ব্যবস্থাও সুরক্ষিত হইবে না । আর এই স্থলে কাষ্ঠ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইলেও অতি ক্ষুদ্রাবয়ব বিশিষ্ট অগ্নিকুণ্ডে বা বেদীতে, সতের প্রাদেশপরিমিত একটী কাষ্ঠ আহুতি প্রদান করা, পুরোক্ত মানব অবজ্ঞিৎ স্যাম, তুলা অসম্ভবই হইবে । কিন্তু বর্ণসমূহে ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব প্রযুক্ত কাৰ্য্য করা সেরূপ অসম্ভব নহে । এই জন্যই এই দৃষ্টান্ত তুলা হইতে পারে না ।

ভাষ্যমূল ।—যথা তর্হি তৈলং ন বিক্রেতব্যং মাংসং ন বিক্রেতব্যমিতি বাপবৃক্তং চ ন ক্রীয়তে । অপবৃক্তং গাবঃ সর্ষপাশ্চ বিক্রীয়ন্তে । তথা লোমনখং স্পষ্টাশৌচং কর্তব্যমিতি বাপবৃক্তং স্পষ্টা নিগোগতঃ কর্তব্যম্ । অব্যপবৃক্তে কামচারঃ যজ্ঞ তর্হি বাপবর্গোত্তি । ক চ ব্যপবর্গোত্তি । সক্ষ্যক্ষরেষু । সক্ষ্যক্ষরেষু বিবৃত্ত্বাং ১ । যদব্রাবণং বিবৃত্ততরং তদব্রাবণবর্ণাশ্চৈবর্ণোবর্ণে বিবৃত্ততরে তে অগ্ন্যভ্যমিবর্ণোবর্ণাভ্যাম্ ।

বঙ্গানুবাদ :—এখানে অসঙ্গত হইলেও, দৃষ্টান্তান্তর গ্রহণ করা যাইতেছে । যেমন “ব্রাহ্মণের তৈল বিক্রয় করা কর্তব্য নহে, মাংস বিক্রয় করা কর্তব্য নহে” শাস্ত্রে যেখানে এইরূপ ব্যবস্থা আছে, সেখানে ইহাই জানিতে হইবে যে, তিলের সারাংশ এবং মাংসের যে খণ্ডসমূহ, তাহাই বিক্রয় করিতে নিষেধ করা হইয়াছে ; কিন্তু অখণ্ড গো বা অপিষ্ট সর্ষপ বিক্রয় করিয়াই থাকে । অথবা যেমন, যেখানে লোম নখ স্পর্শ করিলে, হস্তাদি প্রক্ষালন ব্যবস্থা আছে, সেখানে ছিন্ন গোম, খণ্ড নখ স্পর্শ করিলে, হস্তাদি প্রক্ষালন করা, শাস্ত্রের বিধান অমুসারেই কর্তব্য ; কিন্তু অভিন্ন লোম অখণ্ড নখ স্পর্শ করিয়া হস্ত প্রক্ষালন করা না করা নিজের ইচ্ছাধীন । সুতরাং ইহাতে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, বর্ণগ্রহণে বর্ণের একদেশ গ্রহণ হইতে পারে না ।

আ ঙৈ উ প্রভৃতি স্থলে না হয়, বর্ণের একদেশ গ্রহণ নাই হইল, যেখানে স্পষ্টরূপে বর্ণের শ্রবণ, হয়, সেখানে কি হইবে ?

একত্ব ও বহুত্ব।

(শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী।)

মানবজীবনের মধ্যে একত্ব অনুভব করাই জ্ঞানের উৎকর্ষ অবস্থা। এ জ্ঞান বলিতে বিচার দ্বারা জ্ঞান বৃদ্ধিতে হইবে। যেমন এক খণ্ড মূর্তিকা বিচার করিয়া মূর্তিকানির্মিত ঘটনাবাদিকে মূর্তিকা হইতে অভেদ মনে করা। ঘটনাবাদি নানাহে চক্রপ একত্ব জ্ঞান বিচারসিদ্ধ জ্ঞান। এই বিচারসিদ্ধ জ্ঞানে আমরাদিককে আপাতবিরুদ্ধ বস্তুবৈষম্যের মধ্যে সাম্যভাবের ছায়া আনিয়া দেয়। বিচারপ্রণালীতে এইরূপ একত্ব জ্ঞানলাভ পরোক্ষ জ্ঞান। প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ জ্ঞানে মূর্তিকার অন্তস্থ ভিন্ন মৃৎ বা ঘটনাবাদি বলিয়া গণ্যক কোন জ্ঞান থাকে না।

জাগতিক জ্ঞান মাত্রই দৈতমঃস্বাতোৎপন্ন বা বহুত্ব-সাপেক্ষী। তুলনা ভিন্ন বাহ্যিক বা আন্তরিক জগতের বস্তুজ্ঞান কল্পিতে পারেনা। যেখানে তুলনা সেখানেই দৈতকল্পনা। নহুবা তুলনা কবিবে কাহার সহিত? অতএব যেখানে বাহ্যিক বা আন্তরিক ভাব (Ideas), সেখানেই দৈতভাব। আলো আছে, তাই অঁধান জ্ঞান। সুখ আছে তাই ক্রোধ জ্ঞান। অথবা অঁধান আছে তাই আলো জ্ঞান; ক্রোধ আছে তাই সুখজ্ঞান। এষ্ট দ্বন্দ্বভাব নীজদ্বুর ভ্রাত্রে অনাদিকার প্রবহমান। দ্বন্দ্বভাব যদি অনাদিসিদ্ধ হয়, তবে বেদান্তযেজ্ঞ একত্বজ্ঞান কিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে? ইহাই এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

পূর্বকথিত মূর্তিকা ও ঘটাদি দৃষ্টান্ত অংশই বলিতে হইবে যে, নামরূপাদি উপাধিবিশতঃ মূর্তিকা ও ঘটাদি বিভিন্ন হইলেও প্রকৃতপক্ষে উভয়ই এক পদার্থ। ঘটনাবাদি ভাঙ্গিয়া সুপাঁকার কর; দেখিবে “মূর্তিকেত্যেব সত্যম্”। এইরূপ বাহাকে তুমি দ্বন্দ্বভাবাপন্ন মনে করিতেছ সুদূর বিচারে তাহা একেরই বিভিন্ন পরিণাম মাত্র প্রতীত হইবে। সুদৃষ্টিতে আলো অঁধাবে নিত্যন্ত বিবদ্ধ প্রতীকম্বন হইলেও বিচারসিদ্ধ জ্ঞানে তাহা একই পদার্থ। এক স্থলে আলো-অঁধারের পরিপন্থিতা; অতএব পূর্ণপরিপন্থন। তীব্র আলো কপোলে দৃষ্টিপাত করিয়া অন্ধকার দেখিতে পাঠিবে; অন্ধকারে অন্ধকারজ্ঞান ত স্বতঃসিদ্ধ। ফলে এই টাড়াইতেছে। কারণ লাবিমা দেখে “ভাবরাজ্যে নিঃশব্দে সত্য ও অসত্য একই পদার্থ”। সুখ থাকে মনে কর তা

অবস্থা এই আবেশিক হৃৎথের তুলনায় । সে স্বথ পদার্থকে বুদ্ধির অনুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করিয়া দেখ, তাহাতে অনন্ত হৃৎথের কীটাদি দেখিতে পাইবে । হৃৎথও সেইরূপ অনন্ত স্বথকীটাদি দৃষ্ট হইবে । সুতরাং ফল যখন একই হইয়াছে, তখন স্বথ হৃৎথকে আর বিভিন্ন বলিয়া মনে কর কেন ? উপকারের সঙ্গে সঙ্গেই অপকারের বীজ অঙ্কুরিত ; আবার অপকারের সঙ্গে সঙ্গেই পরোপকারের অযুত উৎস উন্মুক্ত হইতেছে । তাহাতে মন্দেও বীজ মন্দে ভালর বীজ সমপরিমাণে উৎকৃষ্ট হইতেছে । সুতরাং ভাল মন্দ বা স্বথ হৃৎথের নির্দোষ সংজ্ঞা হইতে পারে কি ? সরল রেখাকে বাড়াইয়া দেও ; ক্রমে বক্র হইয়া আসিবে ; বক্র রেখাতে আবার অনন্ত সরল রেখার সমষ্টি দেখিতে পাইবে । তবে আর সরল ও বক্র রেখার ভিন্নতা কোথায় ? ভালবাসা ও বিরহে সমস্ত ; একথা ভুলভোগী প্রেমিক ও বিরহীর অভিজ্ঞত । স্বর্গে নরক কীতি, নরকে আবার স্বর্গলাভের সম্ভাবনা মনের শক্তি নিশ্চয় কবিত্তেছে । অতি নিম্ন ও অত্যুচ্চ দেশ বিভিন্ন দিক্ হইতে এক পদার্থ নয় কি ? পূর্ণ শক্তির বিকাশে নিম্পন্দতা আনয়ন করে । আবার নিম্পন্দনাত্মক পূর্ণশক্তির বিকাশভূমি । শ্রীরামকৃষ্ণদেও বলিতেন, এক মাগেরই চল ও অচলভাব মনোশক্তি ও ব্রহ্মের ভাব প্রকাশ করে । পূর্ণ আত্মতা মৌনভাবের পরিচায়ক ; পক্ষাত্তরে মৌন ভাব বাচনিত্য উন্মেষক । জড়পদার্থ (matter) এবং মন (mind) একেবই স্থূল ও সূক্ষ্মবস্থা বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে । এদটী পদার্থের মাত্র প্রান্তদ্বয় দেখিয়া তাহাকে ছই মনে করা ত অজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া মাত্র । তড়িদ্রু-প্রাণিত কোন লৌহদণ্ডের ছই প্রান্তে পজিটিভ্ (positive) এবং নেগেটিভ্ (negative) তড়িচ্চুক্তি দেখিয়া লৌহদণ্ডকে ছই মনে করা নিবুদ্ধিতার চিহ্ন । পণ্ডিত বলিতেছেন, একেই এক মহাশক্তি দ্বিধা ক্ষুরিত হইয়া positive negative আখ্যা প্রাপ্ত হইতেছে ।

এইরূপ জগতের যে কোন দৃশ্যভাব কেন বিশ্লেষণ করিয়া দেখনা, দেখিতে পাইবে, একই সত্তা বিভিন্নরূপে ক্ষুরিত হইতেছে । শৈত্য ও উষ্ণতার নিঃশেষ-ক্ষুরণ একই অবস্থার পরিচায়ক । অত্যন্ত শৈত্য এবং অত্যন্ত তাপে জল ফুটিয়া উঠে ; ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ ও বিজ্ঞাননিষ্পাদিত তত্ত্ব । অত্যন্তাভাব পূর্ণ-ভাবের উদ্ভাবক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, আপাতসত্য জীবজগদাদি জ্ঞানীর চক্ষে ইন্দ্রজালবৎ অলীক ; জ্ঞানীর জগদ্বিজ্ঞান জ্ঞান অজ্ঞের উপভাস্যাপদ বিষয় । কাহারো মতে ~~হয়~~ কাহারও মতে যত্ন ভাবী স্বথসোপান বলিয়া

বর্ণিত দৃষ্ট হয়। কেহ ক্রমোন্নতি (Evolution) কেহ বা ক্রমাবনতি (Involution) মতে এক ঘূর্ণিত চক্রেই অবস্থান করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দিকের বর্ণনা করিতেছে মাত্র। অত্যন্ত তাপ ভাবী জলধারা বর্ষণের এবং অত্যন্ত বর্ষণ ভাবী তীক্ষ্ণতাপছোতক প্রতিপন্ন হইতেছে। স্তিমিত বায়ুগুণে প্রবল ঝড়ের পূর্বাভাস এবং প্রবল ঝড়ে বায়ুগুণের ভাবী নিশ্চিন্দতা হুচিত হয়। অত্যন্ত হুংখুর্দশা ভাবী সুখসুখ্যোদয়ের এবং অত্যন্ত সুখলাভ ভাবী হুংখুর্দশার স্পষ্ট পরিচায়ক। বৃক্ষ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া বীজে, এবং বীজ আবার বৃক্ষে পরিণত। জমো মৃত্যু এবং মৃত্যুতে ভাবী জন্মনীজ প্রোথিত রহিয়াছে। পূর্ণস্বাস্থ্যবান্ মৃত্যুপথে অগ্রসর; চিররোগী পূর্ণস্বাস্থ্য লাভে পুনর্জীবিত। জ্ঞানী মানবকে মহা অজ্ঞতার চিহ্ন এবং অজ্ঞানী পশুপক্ষী কীট পতঙ্গকে অনন্ত জ্ঞানের প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। কখনো বা ধর্ম্মে অধর্ম্মের, অধর্ম্মে আবার ধর্ম্মের ভাবী বীজ নিহিত দৃষ্ট হইতেছে। বর্তমান উন্নতি ও দিগোস্ত্রাসী সভ্যতালোকে মৃত্যুর ছায়া এবং অমৃতত অসভ্য অন্ধকারে ভাবী জীবনী চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে। বৈজ্ঞানিক কল-যন্ত্রাদি সৃষ্টি করিয়া জগতের সুখ সুবিধা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অবশুস্তাবী বিপদাশঙ্কার সহস্রকণা বিস্তার করিতেছেন; পক্ষান্তরে বিপদাশঙ্কা দূরীকরণমানসে মানব নানা পন্থা আবিষ্কার করিতেছে। হুর্ভিক্ষে সুভিক্ষা এবং সুভিক্ষে হুর্ভিক্ষ হুচনা করিতেছে। দেশ বিশেষে কতিপয় ক্রোড়পতির অভ্যুত্থান স্বদেশবাসী অপব সাধারণের দীনদরিদ্রতা হুচনা করিতেছে; আবার ইতর সাধারণের নৈরুৎসাহ ও দৈন্ত্য ভাবী ক্রোড়পতির অভ্যুত্থান প্রকাশ করিতেছে। ধর্ম্মগানি ধর্ম্মসংস্থাপক মহাপুরুষগণের আগমন বিজ্ঞাপক। পক্ষান্তরে দেশবিশেষে মহাপুরুষ সংস্কারকগণের আগমন ধর্ম্মনামধারী তত্তদেগবাসিগণের উচ্ছেদসাধক। রাজকার্য্যে উদাসীন বিলাসপরতন্ত্র নরপতি প্রজাবিরোহানলে নিজ শোণিত দানে কর্তব্য অপালনরূপ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন; প্রজাতন্ত্রমতের বিজয় হুন্দুভি ঘোষণা আবার রাজার অকর্ম্মণ্যতা ও অপায়গতা হুচনা করিতেছে। সর্ব্বদেশে নোবল সৈন্তবৃদ্ধি ভাবী কুরুক্ষেত্রের যবনিকা উত্তোলন করিতেছে। আবার মহাযুদ্ধের আয়োজনে নোবল ও সৈন্তবল বৃদ্ধি হইতেছে। রাজার রাজ্য-বহুদেশকে একত্রিত করিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্ষুদ্ররাজ্যের ভাবী সংস্থাপনা হুচনা করিতেছে; আবার বহুখাবিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যাদি ভাবী সাম্রাজ্য সংস্থাপক দিগ্বিজয়ী রাজ্য পিপাসা বলবতী করিতেছে। অত্যন্ত অবসাদ অতি উদ্দী-

পনার কারণ হইয়া দাঁড়াইতেছে। অত্যন্ত কামকাঞ্চনাসক্তির অবশেষে বিব্রমঙ্গলকে ধ্বংস লাভ করিতে দেখা যাইতেছে ; আবার সৃষ্টিস্থিতিরূপে সিদ্ধ-কল্প বিশ্বামিত্রকে মেনকার স্রমণোন্মত্ত হইয়া আশ্রয়বিস্তৃত দৃষ্ট হইতেছে। তরঙ্গের প্রবলোচ্ছ্বাস গভীর পতনের এবং গভীর পতন আবার ভাবী অভ্যু-থানের সূচনা করিতেছে। কখনো বা বৈরাগ্য ভূমণী ভোগ্যসক্তির ও বহুভোগ্যসক্তি বৈরাগ্যের সূচনা করিতেছে। এইরূপ একভাবেই ছইরূপে ক্ষুরিত হইয়া জগতের বিচিত্রতা উৎপাদন করিয়াছে।

একই বস্তু বা ভাব দর্শনে বিভিন্ন মানব আবার বিভিন্ন ভাবে অনুপ্রাণিত। একই স্ত্রীকে কেহ জননী কেহ প্রণয়িনী কেহ আগার নিরয়রূপিনী দর্শন করিতেছে। এক মানবই সম্বন্ধ বিশেষে কখন পিতা কখন পুত্র, কখন ভ্রাতা কখন বা মাতুলরূপে অভিহিত হইতেছে। ঘোর পুষ্টিগন্ধ পরিপূর্ণ মহাশ্মশানে কেহ কালের বিকট বাাদান দর্শন করিয়া তাহা মহাচূর্ণিরীক্ষ্য ও অপরিজ্ঞ মনে কণ্ডিতেছে ; কেহ আবার সর্বদমনপরিভ্যক্তাবস্থায় এক মাত্র আশ্রয়দাতা জীবন্তবৈবাগ্যভূমি শ্মশানকে মহাপবিত্র মনে করিতেছে। একই শক্তিতে কাহারো শুক্তিজ্ঞান কাহারো বা রজতভ্রম উপস্থিত হইতেছে। একই জল বারি, পাণি, ওয়াটার নাম ধারণ করিয়াছে। একই কাল জন্ম মৃত্যুরূপে অবস্থান করিতেছে। একই ভাবপ্রবণতা প্রেম প্রীতি, মোহাদি ভক্তি, ঘেব, ঈর্ষাক্রমে ক্ষুরিত হইতেছে। একই দেব ও কোটী দেবতারূপে, একই বায়ু পানাপানাদিরূপে, একই তেজ অগ্নি বিদ্যুৎ সূর্য্যাদি রূপে ক্ষুরিত হইয়া জগতের বিচিত্রতা উৎপাদন করিতেছে। একই দেব সর্বভূতে গৃঢ় অবস্থান করিতেছেন। একই গতি (motion) শব্দ, আলো, বিদ্যুৎ ও আকর্ষণ শক্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছে। এই সকলের ভিত্তিভূমি একই আত্মা এইরূপে বহুধা বর্ণিত হইতেছেন।

এই জগতের যে কোন বিষয় কেন পরিক্ষা করিয়া দেখ না, দেখিবে একই পদার্থ ক্রিয়ার পর প্রতিক্রিয়াতে, এবং প্রতিক্রিয়ার পর পুনঃ ক্রিয়াতে পরিণত হইয়া দ্বৈতাভাসে জীবকে প্রভারিত করিতেছে। মূলে একপদার্থই যেন দ্বৈত ও বহুত্বে পরিণত হইয়া জীবভ্রান্তি উৎপাদন করিতেছে, কিন্তু ঐশ্বর্য এই বহুত্বের মধ্য দিয়া একাত্মাত্মভব করিয়া বলিতেছেন “নেহ নানান্তি কিঞ্চন”। যখনই অলীক নানাত্বে জীবকে বিক্ষিপ্তচিহ্ন করিতেছে আৰ্য্য ঋষি তখনই বলিতেছেন “নেহনানান্তি কিঞ্চন”। এই একমাত্র প্রথমতঃ বিচার প্রণালীতে

বুদ্ধিস্ব কবিত্তে হইবে। পরে আত্মানুভব করিয়া পরমজ্ঞান পরমআনন্দে পরিণম্য হইবে। এই একহামুভূতিই জ্ঞান ও তপস্যার চরম ফল। এই একদেই অনুভব করিলেই জীব বলিতে পারে,—

“প্রত্যগেকরসং পূৰ্ণননন্তং সৰ্ব্বতোমুখম্ ।

একনেবাঘয়ং ব্রহ্ম নেহ ন নাস্তিকিকম ॥”

স্বামী বিবেকানন্দ

ঢাকা)

উদ্বোধনের পাঠকগণ শুনিয়া স্তম্ভী হইবেন যে, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার কয়েকজন সন্ন্যাসী শিষ্য সমভিব্যাহারে বিগত ১৮ই মার্চ ঢাকা যাত্রা করিয়া তৎপরদিন তথায় পৌঁছিয়াছিলেন। নারায়ণগঞ্জে গোয়ালন্দের ষ্টীমার পেঁ ছিলামাত্র ঢাকানিবাসী কতকগুলি ভদ্রলোক আসিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। ঢাকায় অপরারে ট্রেন পৌঁছিয়ামাত্র স্থানীয় বিখ্যাত উকীল বাবু জৈশ্বরচন্দ্র ঘোষ ও গগনচন্দ্র ঘোষ মহাশয়দ্বয় সমগ্র ঢাকাবাসীর নামে স্বামীজিকে অভ্যর্থনা করিয়া ভূতপূৰ্ব্ব জমিদার মোহিনীমোহন দাস মহাশয়ের বাড়ীতে লইয়া গেলেন। ট্রেনে অনেক ভদ্রলোক ও ছাত্রাদি আগিয়াছিলেন। তাঁহার সকলে আনন্দে ‘জয় রামকৃষ্ণদেবকী জয়’ ধ্বনিতে গগন পরিপূরিত করিতে লাগিলেন। ছাত্রগণ স্বামীজির গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইয়া বাইতে লাগিলেন। মোহিনী বাবুর বাড়ীতে অনেক ভদ্রলোক সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বামীজির সন্দর্শনে আপনাদিগকে কৃতার্থস্বন্দ্য বোধ করিতে লাগিলেন।

স্বামীজির নিবট, সদা সৰ্বদাই ভদ্রলোকগণ তাঁহার উপদেশানুসৃত পান করিতে আসিতে লাগিলেন। অপরারে তিন দিন প্রায় দুই তিন ঘণ্টা ধরিয়৷ জ্ঞান, তত্ত্ব, বিশ্বাস, ত্যাগ, বিবেক, বৈরাগ্য কস্ম প্রভৃতি নানাবিধ আধ্যাত্মিক বিষয়ে আলোচনা হয়। প্রায় শতাবধি লোকের সমাগন হইত। সকলেই তাঁহার বিশ্বাসভক্তি ও তেজঃপূর্ণ উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া বিশেষ তৃপ্ত হইয়া- ছিলেন। গত বুধাষ্টমী উপলক্ষে ব্রহ্মপুত্রস্রোতের মানসে স্বামীজি সশিষ্যে নৌকাযোগে লাজলবধে নামক স্থানে যাত্রা করেন। নারায়ণগঞ্জের নিকট শীতলাক্ষ নদীর দৃশ্য বড় যনোহর। তথা হইতে ধলেশ্বরীতে পড়িয়া পরে ব্রহ্মপুত্রে প্রবেশ করিতে হয়। এই স্থানে ব্রহ্মপুত্র খুব সর। তথা যার নাকি ভগবান্

পরশুরাম এই তীর্থে স্নান করিয়া মাতৃহত্যা পাপ হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন । তাই দলেদলে এখানে আবালবৃদ্ধবনিতা পাপক্ষয়ের জন্ত আগমন করিয়া থাকে । এই মেলায় খুব জনতা হইয়াছিল । যাত্রিগণের নৌকা হইতে অবিরাম আনন্দ-স্বচক হুলুধ্বনি উঠিত হইতেছে—কোণাও হরিনামের মধুরধ্বনি কর্ণকুহর পবিত্র করিতেছে । নানাস্তে স্বামীজি ব্রহ্মপুত্র হইতে ধলেশ্বরী—তথা হইতে বড়ি গঙ্গায় প্রবেশ করিয়া ঢাকানগরে পুনঃ প্রবেশ করিলেন । ঢাকাবাসিগণের অত্যন্ত অনুরোধে স্বামীজি গত কল্যা এখানকার জগদাণকলেজগৃহে প্রায় দুই সহস্র শ্রোতার সমক্ষে ‘আমি কি শিখিগাছি ?’ এই সম্বন্ধে ইংরাজি ভাষায় প্রায় এক ঘণ্টাকাল বক্তৃতা প্রদান করেন । এখানকার বিখ্যাত উকীল রমাকান্ত নন্দী মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন । বক্তৃতার সাব মর্ন্ত এই—

আমি নানা দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়াছি—কিন্তু আমি কখন নিজের জন্মভূমি বাঙ্গালাদেশের সবিশেষ দর্শন করি নাই । জানিতাম না, দেশের জলে স্থলে সর্বত্র এত সৌন্দর্য্য । কিন্তু নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া আমার এই লাভ হইয়াছে যে, আমি ইহার সৌন্দর্য্য বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি । এইরূপই, আমি প্রথমে ধর্ম্মের জন্ত নানা সম্প্রদায়—বৈদেশিক-ভাববহুল বহুবিধ সম্প্রদায়ে ভ্রমণ করিতেছিলাম, অপরের দ্বারে শিক্ষা করিতে ছিলাম—জানিতাম না যে, আমার দেশের ধর্ম্মে, আমার জাতীয় ধর্ম্মে এত সৌন্দর্য্য আছে । আজকাল একদল আছেন, তাঁহারা ধর্ম্মের ভিতর বৈদেশিক ভাব ঢালাইবার বিশেষ পক্ষপাতী—ইঁহারা ‘পৌত্তলিকতা’ বলিয়া একটা কথা রচনা করিয়াছেন, ইঁহারা বলেন, হিন্দুধর্ম্ম নৃত্য নয়, বারগ উহা পৌত্তলিক । পৌত্তলিকতা কি, উহা ভাল কি মন্দ, তাহা কেহ অনুসন্ধান করেন না, কেবল ঐ শব্দেরই প্রভাবে তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মকে ভুল বলিতে সাহস করেন । আর এক দল আছেন, তাঁহারা হাঁচি টিকটিকির পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বাহির করেন । তাঁহারা কোন্ দিন ভগবানকেই তড়িতের পরিণামবিশেষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিবেন ! যাহা উটক, মা ইঁহাদিগকেও আশীর্বাদ করুন । তিনিই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির দ্বারা আপন কার্য সাধন করিয়া লইতেছেন । ইহাদের অতিরিক্ত দল—প্রাচীন সম্প্রদায়—বাঁহারা বলেন—আমি তোমার অত শত বুদ্ধি না—বুদ্ধিতে চাহিওনা, আমি চাই জগৎকে আমি চাই আত্মাকে—চাই জগৎকে ছাড়িয়া সুখ দুঃখকে ছাড়িয়া ইহার অতীত প্রদেশে বাইতে—বাঁহারা বলেন—বিশ্বাস সহকারে গঙ্গাস্নানে মুক্তি হয়—বাঁহারা বলেন, শিব রাম প্রভৃতি বাঁহার

প্রতিই হউক না কেন, ঈশ্বর বুদ্ধি করিয়া উপাসনা করিলে মুক্তি হইয়া থাকে। আমি এই প্রাচীন সম্প্রদায়ভুক্ত। আজকালকার এক সম্প্রদায় বলেন, ঈশ্বর ও সংসার এক সঙ্গে কর। ইহাদের—মনমুখ এক নহে। যাহা রাম তাঁহা কাম নহি, যাহা কাম তাঁহা নহি রাম, রব্ রজনী কবি দোনা নহি এক ঠাম। যেখানে ভগবান্ সেখানে কখন সংসার থাকিতে পারে না। অন্ধকার ও আলোক কি কখন এক সঙ্গে থাকিতে পারে? এই জন্ত ইহাঁরা বলেন, যদি ভগবান্ পাইতে চাও, কামকাঞ্চন ত্যাগ করিতে হইবে। এই সংসারগত ভূদা, শূন্য কিছুই—নয়—উপেক্ষ না ছাড়িলে কিছুতেই তাঁহাকে পাইবে না। যদি তাহা না পার, তবে স্বীকার কর যে, আমি হুর্দল, কিন্তু তা বলিয়া আদর্শকে নিম্ন করিও না। মড়াতে মোনার পাত মুড়িয়া ঢাকিও না। এই জন্ত ইহাঁদের মতে এই ধর্ম লাভ করিতে হইবে, ঈশ্বর লাভ করিতে হইলে ভাবের ঘরে চুরী প্রথম ছাড়িতে হইবে। আমি কি শিখিয়াছি? এই প্রাচীন সম্প্রদায়ের নিকট আমি কি শিখিয়াছি? শিখিয়াছি—হুঁতং ত্রয়মেবৈবতং দেবায়ুগ্রহ-হেতুং মহাষাঃ মুমুক্শুঃ মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ। প্রথম চাই—মহাষাঃ—মাতৃস জন্ম—ইহাতেই মুক্তিলাভের বিশেষ সুবিধা—তার পর চাই—মুমুক্শুতা—আমাদের সম্প্রদায় ও ব্যক্তি ভেদে সাধন প্রণালী তিন ভিন্ন ভিন্ন—অধিকার বিহীন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন—কিছু মোটামুটি এই বলা বাইতে পারে যে, মুমুক্শুতা ব্যতীত ঈশ্বরের—উপলব্ধি অসম্ভব। মুমুক্শুতা কি? মোক্ষের জন্ত—এই সুখ দুঃখ হইতে বাহির হইবার জন্ত প্রবল আগ্রহ—এই সংসারে প্রবল ঘণা—যখন ভগবানের জন্ত এই তীব্র ব্যাকুলতা হইবে, তখনই জানিবে, তুমি ঈশ্বর-লাভের অধিকারী হইয়াছ। তার পর চাই মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ—গুরুগত্বে পরাক্রমে যে শক্তি আসিয়াছে, তাহারই সহিত আপনার সংযোগ সংস্থাপন। তদাতীত মুমুক্শুতা থাকিলেও কিছু হইবে না অর্থাৎ তেমার গুরু-করণ আবশ্যক। কাহাকে গুরু করিব? শ্রোত্রীষোহবুজিনোহকামহতো যো ব্রহ্মবিতমঃ। যিনি শাস্ত্রের স্মরণহস্ত জানেন—‘পুঁথি পড়্কে তুতি ভয়ো পণ্ডিত ন ভ্রম্যে কোই—এক অক্ষর প্রেমসে পড়ে ওই পণ্ডিত হোই।’ শুধু পণ্ডিত হইলে চলিবে না। আজকাল যে সে গুরু হইতে চাহে। ভিক্ষুকও লক্ষ্য হুঁদা দান করিতে চায়। ‘বুজিনঃ’—যিনি নিম্পাপ—‘অকামহত’—যাহার ঈর্ষ্যবল জীবের হিত ব্যতীত আর কোন অভিমুখি নাই—যিনি অহেতুক-

দ্যাসিক্স, যিনি কোন লাভের উদ্দেশে অথবা নাম বা বশের জন্ত উপদেশ না দেন—আর যিনি ব্রহ্মকে বিশেষ করিয়া জানেন—যিনি তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—যিনি করতলামলকণ্য করিয়াছেন। তিনিই গুরু—তাঁহারই সহিত আধ্যাত্মিক যোগ স্থাপিত হইলে তবে ঈশ্বর লাভ—ঈশ্বর প্রত্যক্ষ সূক্ষ্ম হইবে। তার পর চাট অভ্যাস। ব্যাকুলই হও, আর গুরুই লাভ কর, অভ্যাস না করিলে, সাধন না করিলে কখন উপলব্ধি হইতে পারে না। এট কয়টা যখন দৃঢ় হইবে, তখনই প্রত্যক্ষ হইবে। তাই বলি, হে হিন্দুগণ—হে আর্যসন্তানগণ—তোমরা এই আদর্শ কখন বিস্মৃত হইও না যে, হিন্দুর লক্ষ্য ঐই সংসারের বাহিরের যাওয়া—শুধু এই জগৎকে ত্যাগ করিতে হইবে, তাহা নয়, স্বর্গকেও ত্যাগ করিতে হইবে, মন্দক্যাপ করিতে হইবে, শুধু তাহা নয়, ভালকেও ত্যাগ করিতে হইবে—এই সকলেব অতীত প্রদেশে যাইতে হইবে।

৩১শে মার্চ স্বামীজি পোকস কলেজের নিম্নত গোলা ময়দানে প্রায় তিন সহস্র শ্রোতার সমক্ষে ‘আমরা যে ধর্ম্মে জন্মিয়াছি’ (The Religion we are born in) সম্বন্ধে প্রায় দুই ঘণ্টা কালব্যাপী এক বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতাও ইংরাজী ভাষায়ই হইয়াছিল। শ্রোতৃগণ মন্ত্রমুগ্ধের আশ্রয় নিতক ছিলেন। ইহারও সার মর্ম্ম নিম্নে সংকলিত হইল।

প্রাচীনকালে আমাদের দেশে আধ্যাত্মিক ভাবের অতিশয় উন্নতি হইয়াছিল। আমাদের কাছে সেই প্রাচীন কাম্বিনী স্মরণ করিতে হইবে। প্রাচীনকালের গৌরবের চিত্তার এক বিপদাশঙ্কা এই যে, আমরা আর নূতন কিছু করিতে চাই না—কেবল সেই প্রাচীন গৌরব স্মরণে ও কীৰ্ত্তনে কালাতিপাত করি। প্রাচীনকালে অনেক ঋষি মহর্ষি ছিলেন—তাঁহারা সত্যের সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রাচীনকাল অরণে প্রকৃত উপকার লাভ করিতে হইলে আপনাদিগকেও ঋষি করিতে হইবে—শুধু তাহাই নহে—আমার বিশ্বাস, আমরা আরও উচ্চতর ঋষি হইব। অতীতকালে আমাদের খুব উন্নতি হইয়াছিল—আমি তাহা স্মরণ করিয়া গমিত। বর্ত্তমানকালের অবনত অবস্থা দেখিয়াও আমি আনন্দিত, আর ভবিষ্যতে যাহা হইবে, তাহা ভাবিয়াও আমি আশাবিত। কারণ আমি জানি, বীজের বোজস্তাব নষ্ট হইয়া তবে বৃক্ষ হয়। সেইরূপ বর্ত্তমান অবস্থার অবনত ভাবের ভিতর ভবিষ্যৎ মহত্ত্বাব নিহিত রহিয়াছে।

আমরা যে ধর্ম্মে জন্মিয়াছি, তাহার ভিতরে সাধারণ ভাব কি কি? আপা-

ততঃ দেখিতে পাই, নানা বিরোধ । মতসম্বন্ধে কেহ অদ্বৈতবাদী, কেহ বিশিষ্টা-
দ্বৈতবাদী, কেহ বা দ্বৈতবাদী । কেহ অবতার মানেন, মুক্তিপূজা মানেন, কেহ
বা নিরাকারবাদী । আবার আচার সম্বন্ধে ত নানা বিভিন্নতা দেখিতে পাই ।
জাটেরা, মুসলমান বা খ্রীষ্টান পর্য্যন্ত বিবাহ করিলেও, জাতিচ্যুত হয় না ।
তাহারা অবাধে সকল দেবমন্দিরে প্রবেশ করিতে পারে । পঞ্জাবের অনেক গ্রামে
যে হিন্দু, শূকরভক্ষণ না করে, সে মুসলমান বলিয়া বিবেচিত হয় । নেপালে
ব্রাহ্মণ, চারিবর্ষেই বিবাহ করিতে পারেন, আবার বাঙ্গালা দেশে ব্রাহ্মণের
অবাস্তব বিভাগের ভিতরও বিবাহ হইবার যো নাই । এইরূপ নানা বিভিন্নতা
দেখিতে পাই । কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে এই একটা বিষয়ে একত্ব দেখিতে পাই
যে, কোন হিন্দু গোমাংস ভক্ষণ করে না ।

এইরূপ আমাদের ধর্মের ভিতরেও এক মহান সামঞ্জস্য আছে । প্রথমতঃ—
শাস্ত্রের কথা লইয়া একটু আলোচনা করা যাক । যে সকল ধর্ম এতদূর উন্নত
হইয়াছিল যে তাহাদের ভিতর একখানি বা বহু শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছিল,
সেই সকল ধর্ম নানাবিধ অত্যাচার সম্বন্ধে এতদিন টিকিয়া রহিয়াছে । গ্রীক
ধর্মে নানাবিধ গৌণত্ব থাকিলেও শাস্ত্র অভাবে উহা লোপ পাইয়া গেল
কিন্তু মালদ্বীপ ও লুইসিয়ানা দ্বীপের বনে এখনও অক্ষুর প্রতাপ । হিন্দুধর্ম ও তন্ত্র ।
উহার শাস্ত্র ‘বেদ’ জগতের সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ । উহার দুইটা ভাগ—কর্মকাণ্ড ও
জ্ঞানকাণ্ড । ভারতের সৌভাগ্যই হউক দুভাগই হউক, কর্মকাণ্ড এখন
লোপ পাইয়াছে । দাক্ষিণাত্যে কতকগুলি ব্রাহ্মণ মধ্যে মধ্যে ছাগবধ করিয়া
যজ্ঞ করিয়া থাকে, আর বিবাহ শ্রাদ্ধাদির সময়ে মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায় ।
এখন আর উহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার উপায় নাই । কুমারিল ভট্ট
একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে অকৃতকার্য হন ।
তার পর বেদের জ্ঞানকাণ্ড—যাহার নাম উপনিষদ্—বেদান্ত । উহাকেই
স্মৃতিশির বলিয়া থাকে । আচার্য্যগণ ঋতি উদ্ধৃত যেখানে করিতেছেন,
সেই খানেই এই উপনিষদ্ উদ্ধৃত করিতেছেন । এই বেদান্তের ধর্মই এক্ষণে
ভারতের ধর্ম । কোন সম্প্রদায় নিজের গৌরব স্থাপন করিতে হইলে তাঁহা-
দিগকে বেদান্তের দোহাই দিতে হয় । কি—দ্বৈতবাদী, কি অদ্বৈতবাদী
সকলকেই—ইহার দোহাই দিতে হয় । বৈষ্ণবও আপন মত প্রমাণ করিতে
পোপালতাপনী উপনিষদ্ উদ্ধৃত করিয়া থাকেন । নিজের স্নানোন্নত বচনাবলী
না পাইলে কেহ কেহ—উপনিষদ্ রচনা পর্য্যন্ত করিয়া লন । এক্ষণে বেদ-

সমক্ষে হিন্দুদিগের মত এই যে, উহা কোন পুস্তক বিশেষ বা কাহার রচনা নহে । উহা ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানরাশি—কখন ব্যক্ত হয়, কখন বা অব্যক্ত থাকে সারমাচার্য্য এক স্থলে বলিয়াছেন ‘যো বেদেতোহখিলং জগৎ নির্ঝমে’—যিনি বেদজ্ঞানের প্রভাবে সমুদ্র জগৎ সৃষ্টি করেন । বেদের রচয়িতা কেহ কখন দেখেন নাই সুতরাং উহা কল্পনা করাও অসম্ভব । ঋষিগণ কেবল ঐ সকল প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন—ঋষি শ্রীর্ষ্যং দ্রষ্টা, মঃ দ্রষ্টা । তাঁহারা—অনাদিকাল হইতে স্থিত বেদ সাধনা করিয়াছিলেন নাহি । এই ঋষিগণ কে ? বাৎস্তাদ্বয় বলেন,—যিনি যথাবিহিত সাধনাক্রমে—যিনি তেহ হইলেও ঋষি হইতে পারেন । তাই প্রাচীন কালে বেতাপুত্র বাণর্ষ, ধাবর চন্দ্র বাস, দাদীপুত্র নারদ প্রভৃতি সকলেই ঋষিগণ ও পু হইয়াছিলেন । প্রকৃত উৎপাদে এই ধর্ম্মের সামান্যকার ভাত হইলে আর কোন ভেদ থাকে না । পূর্বোক্ত ব্যক্তিগণ যদি ঋষি হইয়া থাকেন—তবে আধুনিক কালের কুলীন ব্রাহ্মণগণ—তোমরা আরও কত উচ্চ ঋষি হইতে পার । সেই ঋষিহীনতার চেষ্টা কর—জগৎ তোমার নিকট আপনা আপনিই নত হইবে । এই বেনই আমাদের এক মাত্র প্রমাণ—আর ইহাতে সকলেই অধিকার । যথেষ্ট বাচন কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ । ব্রহ্মরাজভোভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চারণায় ॥—শুল্কযজুর্বেদ, মাধ্যন্দিনীয়া শাখা, ২৬ অধ্যায়, ২ মন্ত্র । এই বেদ হইতে এমন কোন প্রমাণ দেখাইতে পার যে, ইহাতে সকলের অধিকার নাই ? পুরাণ বলিতেছে, বেদের অমুক শাখায় অমুক জাতির অধিকার অমুক অংশ সত্য অমুক অংশ কলিযুগের অশ্রু । কিন্তু বেদ ত এ কথা বলিতেছেন না । ভূত কি কখন প্রভুকে আচ্ছা করিতে পারে ; স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র এ সকলগুলিই ততটুকু গ্রাহ্য, বতটুকু বেদের সহিত মিলে । না মিলিলে—অগ্রাহ্য ; কিন্তু এখন আমরা পুরাণকে বেদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আশ্রয় দিরাছি । বেদের চর্চাত বাঙ্গালা দেশ হইতে লোপই পাঠরাছে । আমি সেই দিন শীঘ্র দেখিতে চাই যখন প্রত্যেক বাড়ীতে শালগ্রাম শিলায় সহিত বেদও পূজিত হইবে । আবালবৃদ্ধবনিতা বেদের পূজা করিবে । বেদসম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে আমার কোন আস্থা নাই । তাঁহারা বেদের কাল আজ এই নির্ণয় করিতেছেন, কাল আবার উহা বদলাইয়া সহস্রবর্ষ পিছাইয়া বাইতেছে । বাহা হউক, এক্ষণে পুরাণের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পুরাণের বতটুকু বেদের সহিত মিলে, ততটুকুই গ্রাহ্য । পুরাণের অনেক কথা দেখিতে পাই, বাহা বেদের সহিত মিলে না, যথা পুরাণে

লিখিত আছে, কেহ দশ সহস্র কেহ বা বিশ সহস্র বর্ষ জীবিত রহিয়াছেন, কিন্তু বেদে দেখিতে পাই—শতাব্দেবৈ পুরুষঃ—এখানে বেদের কথাই গ্রাহ্য। তাহা হইলেও পুরাণে অনেক সুন্দর সুন্দর যোগ ভক্তি জ্ঞান কর্মের কথা দেখিতে পাই, সে গুলি অবশ্য লইতে হইবে। তার পর তন্ত্র। তন্ত্র শব্দের প্রকৃত অর্থ শাস্ত্র, যেমন কাশিল তন্ত্র। কিন্তু এখানে তন্ত্র শব্দ সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যহৃত। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী রাজগণের শাসনে বৈদিক যাগযজ্ঞ সব লোপ পাইলে কেহ আর রাজভরে হিংসা করিতে পারিল না। কিন্তু অবশেষে বৌদ্ধদেরই ভিতরে এই যাগযজ্ঞের ভাল ভাল অংশগুলি গোপনে অমুদ্রিত হইতে লাগিল—তাহা হইতেই তন্ত্রের উৎপত্তি। তন্ত্রে বামাচার প্রকৃতি কতকগুলি খারাপ জিনিষ থাকিলেও লোকে উহা যতদূর খারাপ ভাবে তাহা নহে। বাস্তবিক বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগই সমস্ত একটু পরিবর্তিত হইয়া তন্ত্রের মধ্যে বর্তমান। আশ্চর্য্যকর সমুদায় উপাসনা পূজাপদ্ধতি কর্মকাণ্ড তন্ত্রমতেই অমুদ্রিত হইয়া থাকে। এখানে ধর্ম্মমত সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাউক।

ধর্ম্মমতেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিরোধ সম্বন্ধে কতকগুলি ঐক্য আছে। প্রথমতঃ—তিনটি বিষয়—তিনটি অস্তিত্ব—প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। ঈশ্বর, আত্মা ও জগৎ। ঈশ্বর অর্থাৎ যিনি জগৎকে অনন্তকাল সৃজন পালন করিতেছেন। সাংখ্যগণ ব্যতীত আর সকলেই ইহা স্বীকার করেন। আত্মা,—অসংখ্য জীবাশ্মাগণ বারবার শরীর পরিগ্রহ করিয়া জন্মমৃত্যুচক্রে ভ্রাম্যমান; ইহাকে সংসারবাদ বলে—চলিত কথায় পুনর্জন্মবাদ। আর, এই অনাদি অনন্ত জগৎ। এই তিনকে কেহ কেহ এক, কেহ বা পৃথক প্রভৃতি নানাক্রমে মানিলেও এই তিনটি সকলেই বিশ্বাস করেন। এখানে একটু বক্তব্য এই যে, আত্মাকে হিন্দুগণ চিরকাল মন হইতে পৃথক বলিয়া জানিতেন। পাশ্চাত্যেরা কিন্তু মনের উপর আর উঠিতে পারেন নাই। পাশ্চাত্যগণ প্রগতিকে আনন্দপূর্ণ সন্তোষ করিবার জিনিষ বলিয়া জানেন—আর প্রাচ্যগণের ভ্রম হইতে ধারণা—সংসার দুঃখপূর্ণ—উহা কিছুই নয়। এইজন্য পাশ্চাত্যেরা—প্রাণালীবদ্ধ ধর্ম্মে বিশেষ পটু, প্রাচ্যেরা তদ্রূপ অন্তর্জগতের ক্রমেষণে অতিশয় সাহসী। যাহা হউক—এখানে হিন্দুধর্ম্মের আর দু একটা কথা লইয়া আলোচনা করা যাক। হিন্দুদের মধ্যে অবতারবাদ প্রচলিত। বেদে আমরা কেবল মন্ত্র-অবতারের কথা দেখিতে পাই। যাহা হউক এই অবতারবাদের তাৎপর্য্য—মহুষ্যপূজা—মহুষ্যের ভিতর ঈশ্বর সাক্ষ্যই প্রকৃতই ঈশ্বর সাক্ষ্য। হিন্দুগণ প্রকৃতি হইতে

প্রকৃতির ঈশ্বরে যান না—মহুযা হইতে মহুযোর ঈশ্বরে গমন করিয়া থাকেন । তারপর মূর্ত্তিপূজা—শাস্ত্রোক্ত পঞ্চ উপাশ্রদেবতা ব্যতীত সকল দেবতাই এক একটা পদের নাম মাত্র—কিন্তু এই পঞ্চ উপাশ্রদেবতা কেবল সেই এক ভগবানের নাম মাত্র । এই মূর্ত্তিপূজা আমাদের সকল শাস্ত্রেই অধমাদম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে—কিন্তু তা বলিয়া অস্ত্রের নহে । এই মূর্ত্তিপূজার ভিত্তরে নানাবিধ কুংসিং ভাব প্রবেশ করিয়া থাকিলেও আমি নিন্দা করি না । যদি সেই মূর্ত্তিপূজক ব্রাহ্মণের পদখুলি আমি না পাইতাম, তবে আমি কোথায় থাকিতাম ! যে সকল সংস্কারক মূর্ত্তিপূজার নিন্দা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে আমি বলি, ভাই, তুমি যদি নিরাকার উপাসনার যোগ্য হইয়া থাক, তাহা কর, কিন্তু অপরকে গালি দাও কেন ? সংস্কার কেবল গুণাতন বাঁচিবার জীবনসংসার নাত্র । জীব সংস্কার হইয়া গেলে আব উহার প্রয়োজন কি ? কিন্তু সংস্কারক-দল এক স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গঠন করিতে চান । তাঁহারা মহৎ কার্য্য করিয়াছেন । তাঁহাদের মন্তকে ভগবানের আশীর্বাদ পতিত হউক । কিন্তু তোমরা আপনাদিগকে পৃথক করিতে চাও কেন ? হিন্দু নাম লষ্টতে লজ্জিত হও কেন ? আমাদের জাতীয় অর্ণবখানে আমরা সকলে আরোহণ করিয়াছি—হয়ত উহাতে একটু ছিদ্র হইয়াছে । আইস সকলে মিলিয়া উহা বন্ধ করিতে চেষ্টা করি, না পারি—একসঙ্গে ডুবিয়া মরি । আর ব্রাহ্মণগণকেও বলি, তোমরা বৃথা অভিমান আর রাগিও না—শাস্ত্রমতে তোমাদের ব্রাহ্মণত্ব আর নাই—কারণ তোমরা এতবাল স্নেহ বাঞ্ছ্য বাস করিতেছে । যদি তোমরা নিজেদের কথায় নিজেরা বিপ্লব কর, তবে সেই প্রাচীন কুমারিঘটট যিনি বৌদ্ধগণকে সংহার করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমে বৌদ্ধের শিষ্য হইয়াছিলেন, শেষে তাহাদিগকে হত্যা করার প্রায়শ্চিত্ত জগু ভূষাণলে প্রবেশ করেন, সেইরূপ তোমরা সকলে মিলিয়া ভূষাণলে প্রবেশ কর ; তাহা না পার, আপনাদের দুর্ব্বলতাই স্বীকরণ করিয়া সর্বসাধারণকে তাহাদের প্রকৃত অধিকার দাও ।

অর্থ ।

(শ্রীহরিদাস দত্ত ।)



হুঃখের জীবন, করিতে বহন,
করি আগমন হেথায় হার ।
সম্পদবিহীন, হরে যাপি দিন,
পরের অধীন নাহিক উপার ॥

বাল্য করি জয়, কৈশোর উদয়,
পরে পূর্ণপ্রায় যৌবন এই ।
কোথা বাল্য কাল, সুখদ মুগাল,
স্বভাবনির্মল সময় সেই ॥

মনের বেদন, না ছিল বখন,
এখন যেমন ভয়েছে হার ।
না ছিল বিশাল, সংসারের জাল,
গিয়েছিল কাল অনিল প্রার ॥

যবে চিন্তানল, হয়নি প্রবল,
করেনি বিকল মনের দ্বার ।
আহা সেই কালে, ক্রীড়া কুতূহলে,
পরেছি গলে সুখের হার ॥

সে সুখ সময়, অরিলে জ্বর,
বিদারিত হয় হুঃখের জোরে ।
কালের কবলে, গিয়েছে সে চলে,
যৌবন অনলে ফেলিয়ে মোরে !

যৌবন সময়, সুখপ্রদ কর,
 নম বিষময় হইল কেন ?
 সকলি আকাশ, হয়েছে প্রকাশ,
 মরীচিকা বাস পরেছি যেন !!

যাতনা অশেষ, ধরি ভীম বেশ,
 স্বদেশ বিদেশ যেখানে যাই ।
 সেইখানে হার, ঘেরেরে আসায়,
 কি বিষম দায় উপায় নাই !!

এত অভিমান, করেছি নির্মাণ,
 রাখিবার স্থান নাহিক আর ।
 হতাশ অনলে, লদা মন জলে,
 পরিয়াছি গলে লাগের হার ॥

স্বপ্না অপমান, যেন খরশান,
 করিছে নিশান হৃদয়োপরি ।
 ভাবিয়া না পাই, কাহারে সুধাই,
 কোনখানে যাই কিরূপ করি ॥

নাহি হেন জন, মমের বেদন,
 বলে করি মন কতক খালি ।
 হইরাছে তারি, বহির্বাণে নারি,
 যাই বলিহারি হুংখের ডালি ॥

অনর্থ আশার, ধন পিপাসার,
 অমিতেছি হায় কতই স্থান ।
 বিহীন সঞ্চল, নাহি অস্থূল,
 একাকী কেবল আছে প্রাণ ॥

গর-অন্নগর, করিয়া নির্ভর,
আশাবাস্য সহ বেড়িয়ে হায় ।
সজ্জুচিত মন, হায় অহুঙ্কণ,
থাকিতে জীবন মরার প্রায় ॥

হায় কত জনে, পরুর বচনে,
ব্যথা দেয় মনে সহিতে নারি ।
কেহ পরিহাস, করে পরকাশ,
যাই ধীর পাশ বদন তারি ॥

কমতা বিহীন, বাপিতেছে দিন,
আমাতে নিপিন উচিত হয় ।
সংসারে আমার, কিবা অধিকার,
সদাই বিকার-বাতাস বয় ॥

ওহে বৃথা ধন, তোমার কারণ,
এত জ্বালাতন হইয়ে মরি ।
তোমারই তরে, সবে সৃণা করে,
অভিমান তরে রোদন করি ॥

তোমারই তরে, বচন না গরে,
বিষম অন্তরে কাটাই দিন ।
তোমারই তরে, সদা চিন্তা ধরে,
দেহ করে দাহ মানস অধীন ॥

তোমারই তরে, সহাস্ত অধরে,
আলাপ না করে আত্মীয় মোর ।
তোমারই তরে, ভ্রমি দেশান্তরে,
আপনার ঘরে আপনি চোর ॥

তোমার কারণ, মলিন বদন,
হয়েছে হে ধন নিশ্চয় মম ।

তোমার কারণ, হায় ছন্নয়ন,
করে বন্নিষণ বন্নিষা মম ॥

তোমার কারণ, বিজন গহন,
চাহে মম মন বাসিতে ভাল ।

তোমার কারণ, বহু বিলোকন,
করিয়ে এমন কাটাই কাল ॥

তোমার জালায়, করি হায় হায়,
সদাই অপার ভাবি হে মনে ।

তোমার জালায়, সব শূন্য প্রায়,
সহবাস হায় চিস্তার সনে ॥

হয় অহুমান, থাকিতে এ প্রাণ,

তোমার সন্ধান নাহি পাইব ।

অতএব ধন, শুনহে বচন,

করিলাম পণ নাহি সেবিব ॥

আর মম মন, তোমার স্মরণ,

লবে না হে ধন পণ করিল ।

তব প্রিয়তম, নহে এ অধম,

তোমা হ'তে বহু দূরে রহিল ॥

মহত্ত্ব—তিনি ধর্মকে সর্বসাধারণের উপযোগী করিয়া প্রচার করিলেন । শঙ্করাচার্য উহাকে জ্ঞানের প্রথম আলোকে উদ্ভাসিত করিলেন—তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তি । আমরা এক্ষণে চাই—এই প্রথম জ্ঞানস্বর্গের সহিত বুদ্ধদেবের এই অদ্বিতীয় হৃদয়—এই অদ্বিতীয় প্রেম ও দয়া সম্মিলিত হউক । খুব উচ্চ দার্শনিক ভাবও উঠাতে থাকুক, খুব বুদ্ধিপূর্ণ হউক, আমার সঙ্গে যেন উঠাতে উচ্চ হৃদয়—প্রবল প্রেম ও দয়ার যোগ থাকে । তবেই নশিকামন্যোগ হইবে, তবেই বিজ্ঞান ■ ধর্ম পরস্পরে কোলাহুলি করিবে । ইহাই ভবিষ্যতের ধর্ম হইবে, আর যদি আমরা উহা ঠিক করিয়া তুলিতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয় বলা যাইতে পারে, উহা সকল সময় এবং সর্বপ্রকার অবস্থার উপযোগী হইবে । বাদ আপনাদি বাড়ী গিয়া মনে কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া দেখেন, তবে দেখিবেন, সকল বিজ্ঞানেরই কিছু না কিছু ত্রুটি আছে । কিন্তু আপনাদি নিশ্চয় জানিবেন, এই আধুনিক বিজ্ঞানকে এত এক পথেই আসিতে হইবে—হঠাৎ কি—এখনই প্রায় উহাতে আগিয়া পড়িয়াছে । যখন কোন প্রধান বিজ্ঞানীচর্য্য বলেন, সাই সেই এক শক্তির বিকাশ, তখন কি আপনাদের মনে হয় না যে, তিনি সেই উপনিষৎক ব্রহ্মেরই মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন ?

‘অগ্নির্গঠৈকো ভূবনম্ প্রবিষ্টোরণম্ রূপম্ প্রতিরূপো বভূব ।

একস্তথা সর্বভূতাস্তরায়া রূপম্ রূপম্ প্রতিরূপো বহিষ্ঠ ।’

‘যেমন এক অগ্নি জগতে প্রবিষ্ট হইয়া নানারূপে প্রকাশিত হইতেছেন, তদ্রূপ সেই এক ব্রহ্ম সর্বভূতের অস্তরায়া নানারূপে প্রকাশিত হইতেছেন, আবার তিনি জগতের বাহিরেও আছেন ।’ বিজ্ঞানের পতি কি আপনাদি বুঝিতেছেন না ? হিন্দুজাতি মনস্তত্ত্বের আলোচনা করিতে করিতে মর্শনের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন । ইউরোপীয় জাতি বাহ্য প্রকৃতির আলোচনা করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন । এক্ষণে তাঁহার এক স্থানে পৌঁছিতেছেন । মনস্তত্ত্বের ভিতর দিয়া আমরা সেই এক অনন্ত সামন্তভৌমিক সত্য পৌঁছিতেছি—যিনি সপল বস্তুর অস্তরায়া স্বরূপ, যিনি সকলের সার ■ সকল বস্তুর সত্যস্বরূপ, যিনি নিত্যযুক্ত, নিত্যানন্দময় ও নিত্যসত্যস্বরূপ । বাহ্যবিজ্ঞানের দ্বারাও আমরা এই এক তত্ত্ব পৌঁছিতেছি । এই জগৎপ্রপঞ্চ সেই একেরই বিকাশ—জগতে বাহ্য কিছু আছে, উহা সেই সকলের সমষ্টিস্বরূপ ।

আর সমুদয় মনুষ্যজাতির গতি বন্ধনের দিকে নয়, মুক্তির দিকে । মানুষ নীতি-
পরায়ণ হইবে কেন ? কারণ, নীতিই মুক্তির এবং জ্ঞানীতি বন্ধনের পথ ।

অদ্বৈতবাদেব আর একটী বিশেষত্ব এই যে, গোড়া হইতেও উহা অপর
ধর্মের বা অপর মতের উপর আঘাত করে না, প্রত্যুত উহাদিগকে আপন
আদর্শে পুঁহুছিবার পথস্বরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে । ইহা অদ্বৈতবাদের আর
এক মহত্ব—ইহা প্রচার করা মহা সাহসের কার্য্য যে,

‘ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানং কর্ম্মগণিনাং

যোজয়েৎ সর্বকর্ম্মাণি দিদ্ধানু যুক্তঃ সমাচরন্ ।’

‘জ্ঞানী, অজ্ঞ অতএব কর্ম্মে আসক্ত ব্যক্তিদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না ;
বিদ্বান্ ব্যক্তি নিজে যুক্ত থাকিয়া তাহাদিগকে সকল প্রকার কর্ম্মে নিয়োগ
করিবেন ।’

অদ্বৈতবাদ ইহাই বলেন—কাহারও মতি বিচলিত করিও না, কিন্তু সকলকেই
উচ্চ হইতে উচ্চতর পথে বাইতে সাহায্য কর । অদ্বৈতবাদ যে ঈশ্বর প্রচার
করেন, তিনি সকল জগতের সমষ্টিস্বরূপ ; এই মত যদি সত্য হয়, তবে উহা
অবশ্যই সকল মতকে উহার বিশাল উদরে গ্রহণ করিবে । সর্বসাধারণের
উপযোগী সার্বভৌমিক ধর্ম্মকে কেবল খণ্ডভাবে গ্রহণ করিলে চলিবে না, উহার
সর্বভাবেব সমষ্টি হওয়া আবশ্যক । অত্ৰ কোন মতে এই সমষ্টির ভাব তত
স্পষ্টরূপে নাই । তাহা হইলেও, তাহারা সকলেই সেই সমষ্টিকে প্রাপ্ত হইবার
জন্ত চেষ্টা করিতেছে । খণ্ডের অস্তিত্ব কেবল এই জন্ত যে, উহা সর্বদাই
সমষ্টি হইবার জন্ত চেষ্টা করিতেছে । অদ্বৈতবাদের সহিত এই জন্তই ভারতের
বিভিন্ন সম্প্রদায়েব প্রথম হইতে কোন বিরোধ ছিল না । ভারতে আজকাল
অনেক দ্বৈতবাদী রহিয়াছেন—তাহাদের সংখ্যাও অত্যধিক ; ইহার কারণ,
অশিক্ষিত লোকের মনে স্বভাবতই দ্বৈতবাদের উদয় হয় । দ্বৈতবাদীরা
বলিয়া থাকেন, ইহা জগতের খুব স্বাভাবিক ব্যাপ্য—কিন্তু এই দ্বৈতবাদিদিগের
সহিত অদ্বৈতবাদীর কোন বিবাদ নাই । দ্বৈতবাদী বলেন, ঈশ্বর জগতের
বাহিরে কোথাও স্বর্গে বা অপর কোন স্থানে অবস্থিত—অদ্বৈতবাদী বলেন,
জগতের ঈশ্বর তাহার নিজেরেই অন্তরাঙ্গাস্বরূপ, তাহাকে দূরবর্তী বলা কেবল
তাঁহার নিন্দা করা মাত্র । তাঁহাকে স্বর্গে বা অপর কোন দূরবর্তী স্থানে অব-
স্থিত কি করিয়া বল ? তাঁহা হইতে পৃথগ্ভাব—ইহা মনে করাও যে ভয়ানক !
আমরাই আমাদের নিজের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী । ‘তুমিই তিনি’, এই

কথা ব্যতীত আর কিরূপে কোন্ ভাষায় এই সন্নিহিত্ত্ব প্রকাশ করা যাইতে পারে ? যেমন দ্বৈতবাদী অদ্বৈতবাদীর কথায় ভয় পান ও উহাকে ভগবদ্ভিন্দা বণেন, অদ্বৈতবাদীও তজ্জন দ্বৈতবাদীর কথায় ভয় পাইয়া থাকেন । মানুষ কি করিয়া তাঁহাকে নিজের জেয় বস্তুর ন্যায় জ্ঞান করিতে সাহস করে ? তাহা হইলেও তিনি জানেন, ধর্মজগতে উহাও স্থান কোথায়—তিনি জানেন, তাঁহার দিক্ হইতে তিনি ঠিক দেখিতেছেন, সূত্রাৎ দ্বৈতবাদীর সহিত তাঁহার কোন বিবাদ নাই । যখন তিনি সমষ্টিভাবে না দেখিয়া ব্যষ্টিভাবে দেখিতেছেন, তখন তাঁহাকে অবশ্যই এছ দেখিতে হইবে । ব্যষ্টিভাবে দিক্ হইতে দেখিতে গেলে তাঁহাকে অবশ্যই ভগবানকে বাহিরে দেখিতে হইবে । তাহা না হইয়া যাইতেই পারে না । তাঁহাদিগকে তাঁহাদের মতে থাকিতে দাও । তাহা হইলেও অদ্বৈতবাদী জানেন, দ্বৈতবাদীদের মতে অসম্পূর্ণতা সাহাই থাকুক না কেন, তাঁহারা সকলেই সেই এক চরম লক্ষ্যে চণিয়াছেন । এখানে দ্বৈতবাদীর সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ প্রভেদ । পৃথিবীর সকল দ্বৈতবাদীই স্বভাবতঃই এমন একজন স্বপ্নে ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, যিনি একজন উচ্চশক্তি সম্পন্ন মনুষ্য মাত্র, আর যেমন মানুষের কতকগুলি প্রিয়পাত্র থাকে, কতকগুলি অপ্রিয় থাকে, দ্বৈতবাদীর ঈশ্বরেরও তাহা আছে । তিনি কোন কারণ ব্যতিরেকেই বাহারও প্রতি সন্তুষ্ট, আবার কাহারও প্রতি বা বিরক্ত । আপনারা দেখিবেন, সকল জাতিতেই এমন কতকগুলি লোক আছেন, যাহারা বলেন, আমরা ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ প্রিয়পাত্র, আর কেহ নহেন ; যদি অমৃতপ্ত হৃদয়ে আমাদের শরণাগত হও, তবেই আমাদের ঈশ্বর তোমার কৃপা করিবেন । আবার কতকগুলি দ্বৈতবাদী আছেন, তাঁহাদের মত আরো ভয়ানক । তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর যাহাদের প্রতি সদয়, যাহারা তাঁহার অন্তরঙ্গ তাঁহারা পূর্ব হইতেই নির্দিষ্ট আছেন—আর কেহ যদি মাথা কুটিয়া মবে, তথাপি উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না । আপনারা দ্বৈতবাদীরা এমন কোন ধর্ম দেখান, যাহার ভিত্তর এই সঙ্কীর্ণতা নাই । এই জগৎ এই সকল ধর্ম চিরকালই পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিবে, করিতেছেও । আবার এই দ্বৈতবাদের ধর্ম সকল সময়েই লোকপ্রিয় হয়, তাহার কারণ, অশিক্ষিতদিগের ভাব সকল সময়েই লোকপ্রিয় হইয়া থাকে । দ্বৈতবাদী ভাবেন, একজন দণ্ডধারী ঈশ্বর না থাকিলে কোন প্রকার নীতিই দাঁড়াইতে পারে না । মনে কর একটা ঘোড়া—ছেকড়া গাড়ীর ঘোড়া বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিল । সে বলিবে, লগুনের লোক বড় খারাপ, কারণ, প্রতাহ ১৫ই বৈশাখ, ১৩০৮ ।]

তাহাদিগকে চরম মারা হয় না। সে নিজে চারুক খাইতে
হইয়াছে। সে ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি বুঝিবে? বাস্তবিক কিন্তু
চারুকে লোককে আরোও খাপ খাপ করিয়া তোলে। গাঢ় চিন্তায় অল্পম
সাধারণ লোক সকল সকল দেশেই দ্বৈতবাদী হইয়া থাকে। গরীব বেচারারা
চিরকাল অত্যাচারিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং তাহাদের মুক্তির ধারণা—
শাস্তি হইতে অব্যাহতি পাওয়া। অপর পক্ষে, আনরা ইহাও জানি, সকল
দেশেরই চিন্তাশীল মহাপুরুষগণ এই নিঃশব্দ স্রোতের ভাব লইয়া কার্য্য করিয়াছেন।
এই ভাবেই অমুপ্রাণিত হইয়াই ঈশা বলিয়াছেন, ‘আমি ■ আমার পিতা
এক।’ এইরূপ ব্যক্তিই লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির ভিতরে শক্তিসম্পন্ন সমর্থ।
এই শক্তি সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া মানবগণের আগে শুভ পরিভ্রাণপ্রদ শক্তি-
সঞ্চার করিয়া থাকে। আমরা আবার ইহাও জানি, সেই মহাপুরুষই অদ্বৈত-
বাদী ছিলেন বলিয়া অপরের প্রতিও দয়ালু ছিলেন। তিনি সাধারণকে
‘আমাদের স্বর্গ পিতা’ এ কথাও শিক্ষা দিয়াছেন। সাধারণ লোকে, বাহারা
সংগ ঈশ্বর হইতে আর কোন উচ্চতর ভাব ধারণা করিতে পারে না, তাহা-
দিগকে তিনি তাহাদের স্বর্গ পিতার নিকট প্রার্থনা করিতে শিখাইলেন; কিন্তু
ইহাও বলিলেন, যখন সময় আসিবে, তখন তোমরা জানিবে, ‘আমি তোমা-
দিগেতে, তোমরা আমাতে, বাহাতে তোমরা সকলেই সেই পিতার সহিত
একীভূত হইতে পার, কারণ, আমি ও আমার পিতা অভেদ’। বুদ্ধদেব দেবতা
ঈশ্বর প্রভৃতি বড় গ্রাহ্য করিতেন না। সাধারণ লোকে তাঁহাকে নাস্তিক
আখ্যা দিয়াছিল, কিন্তু তিনি একটী সামান্য ছাগের জন্ত প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ
করিতে প্রস্তুত ছিলেন। এই বুদ্ধদেব মহাশয় জাতির পক্ষে মর্কোচ্চ যে নীতি
প্রদর্শন হইতে পারে, তাহা প্রচার করিয়াছিলেন। যেখানেই কোন প্রকার
নীতিবিধান দেখিবে, সেখানেই দেখিবে, তাঁহার প্রভাব, তাঁহার আলোক।
জগতের এই সকল উচ্চহৃদয় ব্যক্তিগণকে হুমি সঙ্গীর্ণ গভীর ভিতরে আবদ্ধ
করিয়া রাখিতে পার না, বিশেষতঃ এক্ষণে নম্রযাজ্ঞাতির ইতিহাসে এমন
এক সময় আসিয়াছে—শতবর্ষ পূর্বে যাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই,
এমন সকল জ্ঞানের উন্নতি হইয়াছে, এমন কি পঞ্চাশ পূর্বে যাহা কেহ
স্বপ্নেও ভাবে নাই, এমন সকল বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের স্রোত প্রবাহিত
হইয়াছে। এ সময়ে কি আর লোককে এরূপ সঙ্গীর্ণ ভাবে আবদ্ধ
করিয়া রাখা যায়? লোকে পশুতুল্য চিন্তাধীন জড়পদার্থে পরিণত না হইলে

ইহা অনন্তব । এখন আনন্দক, উচ্চতম জ্ঞানের সহিত উচ্চতম হৃদয়—অনন্ত জ্ঞানের সহিত অনন্ত প্রেমের যোগ । বেদান্তবাদী, স্মৃতরাং, বলেন, সেই অনন্ত সস্তার সহিত একীভূত হওয়াই একমাত্র ধর্ম ; আর তিনি ভগবানের গুণ কেবল এই কয়েকটী বলেন,—অনন্ত সস্তা, অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত আনন্দ, আর তিনি বলেন, এই তিনই এক । জ্ঞান ও আনন্দ ব্যতীত সস্তা কখন থাকিতে পারে না । জ্ঞানও আনন্দ বা প্রেম ব্যতীত এবং আনন্দও কখনও জ্ঞান ব্যতীত থাকিতে পারে না । আমরা চাই এই সন্মিলন—এই অনন্ত সত্য, জ্ঞান ও আনন্দের মিলন । আমরা চাই সর্বাদীন উন্নতি—সত্য, জ্ঞান ও আনন্দের চরমোন্নতি—একদেশী উন্নতি নহে । আমরা চাই সকল বিষয়ের সমভাবে উন্নতি । বুদ্ধদেবের আর মতানু হৃদয়ের সহিত মহা জ্ঞানের যোগ হওয়া সম্ভব । আশা করি, আমরা সকলেই সেই এক লক্ষ্যে পৌঁছিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিব ।

জগৎ ।

বহির্জগৎ ।

সুন্দর কুসুমরাশি চতুর্দিকে সুবাস বিতরিতেছে, প্রভাতরূপ অতি সুন্দর লোহিতবর্ণ ধরিয়া উঠিতেছে । প্রকৃতি নানা সুন্দর বর্ণ ধরিয়া শোভিতেছে । জগৎ জাগ্রত সুন্দর, মাদ্রুম পৃথিবীতে আসিয়া অবধি এই সৌন্দর্য্য ভুঞ্জিতেছে । শৈলমালা গভীরভাবব্যঞ্জক ও ভয়োদ্দীপক, প্রবল ধরবাহিনী সমুদ্রাভিমুখ-গামিনী প্রোতস্নিগ্ধ, পদচিহ্নহীন মরুদেশ, অনন্ত অসীম সাগর, তারকারাজি-মণ্ডিত গগন—এ সকলই গভীরভাবপূর্ণ ও ভয়োদ্দীপক । প্রকৃতিশব্দব্যঞ্জিত সমুদ্র অস্তিত্ব সমাধি স্মৃতিপথাগত সময় হইতেই মানবমনের উপর কার্য্য করিতেছে । উহা মানবচরিত্র উপর ক্রমাগত প্রভাব বিস্তারিতেছে, আর ঐ প্রভাবের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ক্রমাগত ঐ প্রস্ন উঠিতেছে, উহা কি এবং কোথা হইতে ? অতি প্রাচীন মানবরচনা বেদের প্রাচীন ভাগেও এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত দেখিতে পাই । কোথা হইতে ইহা আসিল ? যখন অস্তি নাস্তি কিছুই ছিল না, তখন তখন আবৃত ছিল, তখন কে এই জগৎ সৃজিল ? কেমন করিয়াই বা এই বৈশাখ, ১৩০৮ ।] উদ্বোধন । ২৪৫

স্বজ্ঞান ? কে এই রহস্য জানেন ? বর্তমান সময় পর্য্যন্ত এই প্রশ্ন চলিয়া আসিয়াছে । লক্ষ লক্ষ বার ইহার উত্তরের চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু আবার লক্ষ লক্ষ বার উহার উত্তর দিতে হইবে । ঐ প্রত্যেক উত্তরই যে ভ্রমপূর্ণ, তাহা নহে । প্রত্যেক উত্তরেই কিছু না কিছু সত্য আছে—কালের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সত্যও ক্রমশঃ বল সংগ্রহ করিবে । আমি ভারতের প্রাচীন দার্শনিকগণের নিকট ঐ প্রশ্নের যে উত্তর সংগ্রহ করিয়াছি, বর্তমান মানব জ্ঞানের সহিত মিলাইয়া তাহা আপনাদের সমক্ষে স্থাপনে চেষ্টা করিব ।

আমরা দেখিতে পাই, এই প্রাচীনতম প্রশ্নের কতকগুলি বিষয় পূৰ্ণ হইতেই জাত ছিল । প্রথম এই,—যখন অস্তি নাস্তি কিছুই ছিল না, তখন এই জগৎ ছিল না—এই গ্রহ জ্যোতিষ্কগণ, আমাদের জননী ধরণী, সাগর, মহাসাগর, নদী, শৈলমালা, নগর, গ্রাম, মানবজাতি, ইতরপ্রাণী, উদ্ভিদ, বিহঙ্গম, এই অনন্ত বহুতা সৃষ্টি, এমন এক সময়ে ছিল, যখন ইহা ছিল না । আমরা কি এ বিষয়ে নিঃসন্দ্বিগ্ন ? কি কারণে এই সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হওয়া গেল, তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব । মানুষ আপন চতুর্দিকে দেখে কি ? একটী ক্ষুদ্র উদ্ভিদ লও । মানুষ দেখে, উদ্ভিদটী ধীরে ধীরে মাটা ঠোলিয়া উঠিতে থাকে, শেষে বাড়িতে বাড়িতে অবশেষে হরত একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষ হইয়া দাঁড়ায়, আবার মরিয়া যায়—রাখিয়া যায় কেবল বীজ । উহা ঘুরিয়া একটী বৃন্ত সম্পূর্ণ করে । বীজ হইতে উহা আইসে, বৃক্ষ হইয়া দাঁড়ায়, অবশেষে বীজে উহার পুনঃ পরিণাম । একটী পাখীকে দেখ, কেমন উহা ডিঙ্গ হইতে জন্মায়, জন্মের পক্ষিরূপ ধরে, কিছুদিন বাচিয়া থাকে, পরে আবার মরিয়া যায়, রাখিয়া যায় কেবল অপর কতকগুলি ডিম্ব—ভবিষ্যৎ পক্ষিকুলের বীজ । ত্রিযাগজাতি সম্বন্ধেও এইরূপ, মানুষ সম্বন্ধেও তাহাই । প্রত্যেক পদার্থেরই যেন, কতকগুলি বীজ, কতকগুলি মূল উপাদান, কতকগুলি স্বল্প আকার হইতে আরম্ভ, উহার স্থলাৎস্থলতর হইতে থাকে, কিছুকালের জন্ত ঐরূপে চলে, পুনরায় ঐ স্বল্প-রূপে চলিয়া গিয়া উহাদের লয় । বৃষ্টির ফোঁটাটি, যাহার ভিতরে একগুণে জন্মের স্বর্ষাকিরণ খেলিতেছে, বাতাসে অনেক দূর চলিয়া গিয়া পাখাড়ে পৌঁছে, সেখানে উহা বরফে পরিণত হয়, আবার জল হয়, আবার শত শত মাইল ঘুরিয়া উহার উৎপত্তিস্থান সমুদ্রে পহঁছে । আমাদের চতুর্দিকস্থ প্রকৃতির সকল বস্তু লক্ষ্যেই এইরূপ ; আর আমরা জানি, বর্তমানকালে হিমশিলা ও নদীসমূহ, বড় বড় পর্বতসমূহের উপর কার্য্য করিতেছে ; উহারা ধীরে ২৪৬

উদ্যোখন ।

[৩য়—৮ম সংখ্যা ;

অণু নিশ্চিত তাহাদিগকে গুঁড়াইতেছে, গুঁড়াইয়া বালি করিতেছে, সেই বালি আবার সমুদ্রে বহিয়া চলিতেছে—সমুদ্রতলে স্তরে স্তরে জমিতেছে, পরিশেষে আবার পাহাড়ের স্থায় শক্তি হইতেছে, ভবিষ্যতে আবার ফাঁপিয়া উঠিয়া ভবিষ্যৎ-বংশীয়দের পর্বত হইবে বলিয়া । আবার উহা পিষ্ট হইয়া গুঁড়া হইবে—এইরূপ চলিবে । বালি হতে উঠে এই পর্বতগুলি বালিতে গিয়া আবার মিশায় । বড় বড় জ্যোতিষ্কগণ সম্বন্ধে তাহাই ; আমাদের এই পৃথিবী নীহারনয় পদার্থ বিশেষ হইতে আসিয়াছে—ক্রমশঃ শীতল হইতে শীতলতর হইয়াছে, পরে এই আমাদের নিদানভূমিরূপা এই বিশেষাকৃতিবিশিষ্টা ধরণী রচিত্যছে । ভবিষ্যতে উহা, আবার শীতল হইতে শীতলতর হইয়া নষ্ট হইবে, খণ্ড খণ্ড হইবে, গুঁড়াইবে, শেষে সেই মূল নীহারনয় স্বরূপে যাইবে । প্রতিদিন আমাদের সম্মুখে ইহা ঘটিতেছে । স্মরণাতীত সময় হইতেই ইহা হইতেছে । ইহাই মানবের সমগ্র ইতিহাস, ইহাই প্রকৃতির সমগ্র ইতিহাস, ইহাই জীবনের সমগ্র ইতিহাস ।

যদি ইহা সত্য হয় যে, প্রকৃতি তাঁহার সবল কার্যেই সমপ্রণালীক (Uniform), যদি ইহা সত্য হয়, এবং এ পর্য্যন্ত কোন মনুষ্যজানই ইহা খণ্ডন করে নাই যে, একটা ক্ষুদ্র বালুকণা যে প্রণালী ও যে নিয়মে সৃষ্ট, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সূর্য, তারা, এমন কি, সমুদ্র জগদ্রূপাও সৃষ্টিতেও সেই একই প্রণালী, একই নিয়ম, যদি ইহা সত্য হয় যে, একটা পরমাণু যে কোশলে নিষ্কৃত, সমুদ্র জগৎও সেই কোশলে নিষ্কৃত, যদি ইহা সত্য হয় যে, একই নিয়ম সমুদ্র জগতে প্রতিষ্ঠিত, তবে, যেমন বেদে আগে হইতেই বলা হইয়াছে—“একখণ্ড মৃত্তিকাকে জানিয়া আমরা জগদ্রূপাও সমুদ্র মৃত্তিকা সম্বন্ধেই জানিতে পারি ।” একটা ক্ষুদ্র উদ্ভিদ লইয়া উহার জীবনচরিত্র অলোচনা করিলে আমরা জগদ্রূপাওঁর স্বরূপ জানিতে পারি । একটা বালুকণার গতি পর্য্যবেক্ষণে, সমুদ্র জগতের রহস্য জানিতে পারা যাইবে । এক্ষণে এই তত্ত্ব এই জগদ্রূপাওঁ খাটাইয়া দেখিতেছি, প্রথমতঃ যে, সকলই আদি ও অন্তে প্রায় সদৃশ । পর্বত উঠে বালি হইতে, যার আবার বালিতে ; নদী হয় বাষ্প হইতে, যার আবার বাষ্প ; উদ্ভিদজীবন আসে বীজ হইতে, যার আবার বীজে ; মানবজীবন আসে মনুষ্য-জীবন হইতে, যার আবার জীবন । নক্ষত্রপুঞ্জ, নদী, গ্রহ, উপগ্রহ নীহারনয় অবস্থা হইতে আসিয়াছে, যার আবার সেই নীহারনয় অবস্থায় । ইহাতে আমরা শিখি কি ? শিখি এই যে, ব্যক্ত অর্থাৎ স্থল অবস্থা—কার্য, ১৫ই বৈশাখ, ১৩০৮ ।]

স্বস্ত্যভাব—উহার কারণ । সর্বদর্শনজনক স্বরূপ মহর্ষি কপিল অনেক দিন প্রমাণ করিয়াছেন, ‘নাশঃ কারণলয়ঃ ।’

যদি এই টেবিলটীর নাশ হয়, উহা কেবল কারণ রূপে যাইবে—সেই স্বাস্থ্য-রূপ ও পরমাণুতে যাইবে, বাহারা মিলিয়া এই টেবিলনামক পদার্থটী করিয়াছিল । মানুষ যখন মরে, তখন যে সকল ভূতে তাহার দেহ নির্মিত, তাহাতে তাহার পুনরারূপ্তি । এই পৃথিবীর ধ্বংস হইলে, যে ভূতসমষ্টি উহাকে এই আকার দিয়াছিল, তাহাতে পুনরাবর্তন কারবে । ইহাকেই নাশ বলে—কারণলয় । অতরাং আমরা শিখিলাম, কার্য্য কারণের সহিত অভেদ, ভিন্ন নহে, উহা কেবল আর এক রূপধারিমাাত্র । যে উপাদানগুলিতে ঐ টেবিলের উৎপত্তি, তাহার কারণ, আর টেবিলটী কার্য্য, আর ঐ সকল কারণগুলিই এখানে বর্তমান । এই গেলাসটী একটী কার্য্য—উহার কতকগুলি কারণ ছিল, সেই কারণগুলি এই কার্য্যেতে এখনই বর্তমান দেখিতেছি । গেলাস নামক কতকটা জিনিষ আর তৎসঙ্গে গঠনকারীর হস্তস্থ শক্তি—এই দুইটাই কারণ, নিমিত্ত ও উপাদান । এই দুইটী কারণ মিলিয়া গেলাস নামক এই আকারটী হইয়াছে । ঐ দুই কারণই বর্তমান । যে শক্তিটী কোন যন্ত্রের চাকার ছিল, তাহা সংহতিশক্তিরূপে বর্তমান—তাহা না থাকিলে গেলাসের ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডগুলি সব খসিয়া পড়িবে এবং ঐ গেলাসরূপ উপাদানটীও বর্তমান । গেলাসটী কেবল ঐ স্বল্প কারণ-গুলির আর এক রূপে পরিণতি এবং যদি এই গেলাসটী ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়, তবে যে শক্তিটী সংহতিরূপে উহাতে বর্তমান ছিল, তাহা ফিরিয়া পুনঃ নিজ উপাদানে নিশিনে, আর গেলাসের ক্ষুদ্র খণ্ডগুলি আবার পূর্বরূপ ধরিবে ও সেইরূপেই থাকিবে, যতদিন না পুনরায় নব রূপ ধরে ।

অতএব আমরা পাইলাম, কার্য্য কখন কারণ হইতে ভিন্ন নহে । উহা সেই কারণের পুনরাবির্ভাব মাত্র । তারপর আমরা শিখিলাম, এই ক্ষুদ্র বিশেষ বিশেষ রূপ সকল, বাহাদিগকে আমরা উদ্ভিদ বা তিথ্যগুচ্ছাতি, বা মানব বলি, তাহা অনন্তকাল ধরিয়া উঠিয়া পড়িয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে । বীজ বৃক্ষ প্রসবিল । বৃক্ষ আবার বীজ হয়, আবার উহা আর এক বৃক্ষ হয়—আবার অল্প বীজ হয়, আবার আর এক বৃক্ষ হয়—এইরূপ চলিতেছে, ইহার শেষ নাই । জলবিন্দু পাহাড়ের গা পড়াইয়া সমুদ্রে পায়, আবার বাষ্প হইয়া উঠে—পাহাড়ে পায়, আবার নদীতে ফিরিয়া আসে । উঠিতেছে, পড়িতেছে—যুগচক্র চলিতেছে । সমুদ্র জীবন সম্বন্ধেই এইরূপ—সমুদ্র জন্তি

সংযত করিয়া সর্বদা ইচ্ছা ভয় ■ ক্রোধ পরিভ্যাগ করিতে পারিবে সেই মুনি মুক্ত হইয়াই আছে (ইহা জানিবে) ॥ ২৭—২৮ ॥

ভাষ্য।—সমাগ্‌দর্শননিষ্ঠানাং সংশ্রাসিনাং সত্ত্বোন্মুক্তিকর্ত্তা কৰ্ম্মযোগে শ্রেষ্ঠ-
রাপিত সৰ্ব্বভাবেন ঈশ্বরে ব্রহ্মণি আশ্রয় ক্রিয়মাণঃ সমুত্তমজ্ঞানপ্রাপ্তি সৰ্ব্ব-
কৰ্ম্মসংশ্রাসক্রমেণ মোক্ষায়েতি ভগবান্ পাদ পদেহব্রবীদ্ বধ্যতি চ অথেনাদীং
ধ্যানযোগং সমাগ্‌দর্শনত্যাগরতঃ বিস্তরেন বক্ষ্যানীতি তত্ত্ব সূত্রস্থানীয়ান্
শ্লোকানুপদিশতি অ। স্পর্শান শব্দাদীন কৃত্বা বহির্বাহ্যান শ্রোত্রাদিধারেন
অন্তর্বুদ্ধৌ প্রবেশিতাঃ শব্দাদয়োবিষয়ান্তানচিস্তয়তো বাহ্য বহিরেব কৃত্বা
ভবন্তি। তানেনং বহিঃকৃত্বা চক্ষুর্দৃশ্যে অন্তরে ক্রবঃ কৃত্বোন্মুখজাতো। তথা
প্রাণাপাণৌ নাসাভ্যন্তরচারিণৌ সন্মৌ কৃত্বা ॥ ২৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—সমাগ্‌দর্শননিষ্ঠ সংশ্রাসীগণের সত্ত্ব মুক্তি উক্ত হইয়াছে,
ঈশ্বর ব্রহ্মে সর্বভাবে (ফল) সমর্পণ সহকারে ক্রিয়মাণ কৰ্ম্মযোগ, ক্রমে সমুত্তম
জ্ঞানপ্রাপ্তি ও সৰ্ব্ব কৰ্ম্ম সংশ্রাস দ্বারা মোক্ষের কারণ হয়, এই কথা ভগবান্ পদে
পদে বলিয়াছেন ও বলিবেন। অনন্তর এইক্ষেণে সমাগ্‌দর্শনের অন্তরঙ্গসাধন
ধ্যানযোগ, বিস্তরতঃ বলিব এই ভাবিবা ভগবান্ ধ্যানযোগের সূত্রস্থানীয়
কতকগুলি শ্লোকের উপদেশ করিতেছেন।

স্পর্শ (অর্থাৎ) শব্দাদি বাহ্য বিষয়কে বাহিরে করিয়া (ইহার তাৎপর্য্য
এই যে) শ্রোত্রপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা বুদ্ধির মধ্যে বাহ্যশব্দাদি বিষয় প্রবেশিত
হইলেও ঐ সকল বিষয়ের চিন্তা না করাই বাহ্যশব্দাদি বিষয়কে বাহিরে করা
হয়) সেই শব্দাদি বিষয়কে বাহিরে রাখিয়া ও চক্ষুঃ দৃশ্যের মধ্যে সন্নিবেশিত
করিয়া (এখানে কৃত্বা এই পদটির অনুবঙ্গ করিতে হইবে) এবং প্রাণ ও অপান
নামক বায়ুদ্বয়কে নাসাভ্যন্তরচারী ও সমান করিয়া ॥ ২৭ ॥

ভাষ্য।—যতেজিয় ইতি যতেজিয়মনোবুদ্ধির্দ্বিতানি সংযতানি ইন্দ্রিয়ানি
মনোবুদ্ধিঃ যন্ত স যতেজিয় মনোবুদ্ধির্মনান্যানিঃ সংশ্রাসী মোক্ষপরাধঃ এবং
দেহসংস্থানো মোক্ষপরাধো মোক্ষএব পরময়নং পরাগতির্ষন্ত মোহয়ং মোক্ষ-
পরাধো মুনির্ভবেৎ বিগতেচ্ছাত্তয়ক্রোধ ইচ্ছা চ ভয়ং চ ক্রোধঃ ইচ্ছাভয়
ক্রোধা বিগতা যস্মাৎ স বিগতেচ্ছাত্তয়ক্রোধঃ। যএবং বর্ত্ততে সদা সংশ্রাসী
মুক্ত এব স ন তত্ত্ব মোক্ষেহন্তঃ কার্য্যঃ অস্তি ॥ ২৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—যতেজিয় ইতি (শ্লোকের অর্থ) “যতেজিয় মনোবুদ্ধি”
ইন্দ্রিয়, মন, ও বুদ্ধি যাহার যত (অর্থাৎ) সংযত সেই যতেজিয়মনোবুদ্ধি
১৫ই বৈশাখ, ১৩০৮।] উত্তোধন। [৪] ২৪৯

“মুনি” (আত্মার) মনন করা নিবন্ধন সংগ্রাসীই মুনি (শব্দের দ্বারা অভিহিত হয়) “মোক্ষপরায়ণ” বাহার দেহের স্থিতি এই প্রকার এবং মোক্ষই বাহার পরম অয়ন (অর্থাৎ) পরাগতি সেই মোক্ষপরায়ণ মুনি হইবে । বিগতেচ্ছাভয়-ক্রোধ” ইচ্ছা ভয় এবং ক্রোধ এই তিনটি বাহার অপগত হইয়াছে সেই বিগ-তেচ্ছাভয়ক্রোধ যে সংগ্রাসী সর্বদা এই প্রকারে অবস্থান করিতে পারে, সেই ব্যক্তি মুক্তই হইয়া আছে (জানিবে) তাহার পক্ষে অত্র মোক্ষ কর্তব্য (বলিয়া উপদিষ্ট) হইতে পারে না ॥ ২৮ ॥

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।

সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমুচ্ছতি ॥ ২৯ ॥

অর্থঃ ।—যজ্ঞতপসাং ভোক্তারং সর্বভূতানাং সুহৃদং সর্বলোকমহেশ্বরং মাং জ্ঞাত্বা (স সংগ্রাসী) শান্তিমুচ্ছতি ॥ ২৯ ॥

মূলানুবাদ ।—আমি, যজ্ঞ ও তপস্যা সমূহের ভোক্তা সকল ভূতের সুহৃদ এবং সর্বলোকের মহেশ্বর আমাকে জানিয়াই (পূর্বোক্ত সংগ্রাসী) শান্তি লাভ করিয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

ভাষ্য ।—এবং সমাহিতচিত্তেন কিং বিজ্ঞেয় মিড়াচাতে ভোক্তারং যজ্ঞানাং তপসাঞ্চ কর্তৃরূপেণ দেবতারূপেণ চ সর্বলোকমহেশ্বরং সর্বেষাং লোকানাং মহাত্মমীশ্বরং সর্বলোকমহেশ্বরং সুহৃদং সর্বভূতানাং সর্বপ্রাণিনাং প্রভূতাপকার নিবপেক্ষতয়োপকারিণং সর্বভূতানাং হৃদয়েশ্বরং সর্বকল্মকলাধাফং সর্বপ্রত্যয়-সাক্ষিণং মাং নারায়ণং জ্ঞাত্বা শান্তিং সর্বসংসারোপরতিং ঋচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥২৮॥

ইতি শ্রীশ্রীতাশাক্ষর ভাষ্যে প্রকৃতিগর্ভোনাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

ভাষ্যানুবাদ ।—এই প্রকার সমাহিত চিত্ত হইয়া কি জানিতে হইবে তাহাই বলা যাইতেছে যে, ‘যজ্ঞ এবং তপোনিচয়ের কর্তা ও দেবতারূপে ভোক্তা’ “সর্বলোকমহেশ্বর” অর্থাৎ সকল লোকের মহান ঈশ্বর, এবং সর্বভূতের (অর্থাৎ) সকল প্রাণীর সুহৃদ (অর্থাৎ) প্রভূতাপকারের অপেক্ষা নাই অথচ সর্বদা উপকারনিবত, সকল প্রাণীর হৃদয়েশ্বর সকলের বুদ্ধির সাগী ও সকল কর্মকলের অধ্যক্ষ নারায়ণস্বরূপ আমাকে জানিয়া শান্তি (অর্থাৎ) সকল প্রকার সংসারের নিবৃত্তি (মোক্ষ) প্রাপ্ত হয় ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীশ্রীতাশাক্ষরভাষ্যানুবাদে প্রকৃতিগর্ভোনামক পঞ্চম অধ্যায়ঃ ।

অথ ষষ্ঠোধ্যায়ঃ ।



শ্রীভগবানুবাচ । অনাপ্রিতঃ কৰ্মফলং কাৰ্য্যং কৰ্ম কৰোতি যঃ ।

স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরয়িন্চাক্রিয়ঃ ॥ ১ ॥

অর্থঃ ।—যঃ কৰ্মফলমনাপ্রিতঃ (সন্) কাৰ্য্যং কৰ্ম কৰোতি স সন্ন্যাসী চ যোগী চ (বিজ্ঞেয়ঃ) ন নিরয়িঃ ন (বা) অক্রিয়ঃ (এব সন্ন্যাসী যোগী ব ভবতি) ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ ।—কৰ্মফলের বাসনা পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান করে সে সন্ন্যাসী ও যোগী (বলিয়া উক্ত হয়) যে ব্যক্তি অগ্নি পরিত্যাগ করিয়াছে বা ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে সেই যে সন্ন্যাসী বা যোগী হইবে তাহা নহে ॥ ১ ॥

ভাষ্য ।—অতীতানন্তরাধ্যায়ান্তে ধ্যানযোগস্ত সম্যগ্‌দর্শনং প্রত্যন্তরঙ্গস্ত হৃতভূতাঃ শ্লোকাঃ-স্পর্শান্ কৃদ্ধা বহিরিত্যাদয় উপদিষ্টাঃ তেষাং বৃত্তিস্থানীয়োহয়ং ষষ্ঠোহধ্যায় আরভ্যতে । তত্র ধ্যানযোগস্ত বহিরঙ্গং কৰ্ম ইতি যাবদ্ব্যানযোগা-রোহণাগমর্থঃ তাবৎগৃহ্যেহন অধিকৃতেন কর্তব্যং কর্মেত্যত স্তংজ্যোতি ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—অব্যবহিত অতীত অধ্যায়ের শেষে “স্পর্শান্ কৃদ্ধা বহিঃ” ইত্যাদি ধোক উপদিষ্ট হইয়াছে, “ধ্যানযোগ, আন্তরতত্ত্বজ্ঞানের অন্তরঙ্গ উপায়” এই বিষয়ের উপদেশে ঐ কয়টি শ্লোক হৃতস্থানীয় (অর্থাৎ ধ্যানযোগের বিষয়ে যাহা কিছু সারভূত তাহা অতি সংক্ষেপে এই কয়টি শ্লোকে বলা হইয়াছে) সেই কয়টি শ্লোকেরই বিশদ ব্যাখ্যার জন্তই এই ষষ্ঠ অধ্যায়ের আরম্ভ করা হইতেছে । সেই প্রসঙ্গে (ইহাও দেখিতে হইবে যে) কর্ম ধ্যানযোগের বহিরঙ্গ সাধন, এই কারণ অধিকারী গৃহস্থ যে পর্য্যন্ত ধ্যানযোগে আরোহণ করিতে অগমর্থ হইবে, সে পর্য্যন্ত তাহার কর্মই কর্তব্য এই নিমিত্ত (এক্ষণে) (ভগবান্) কর্মের প্রশংসা করিতেছেন ॥ ১ ॥

ভাষ্য ।—নহু কিমর্থং ধ্যানযোগারোহণসীমাকরণং যাবতা অন্তর্ভেদ মেব বিহিতং কর্ম যাবজ্জীবং ? ন আকরুক্কোমূর্নেৰ্যোগং কর্ম কারণ মুচ্যতে ইতি বিশেষণং আকরুচু চ শমেনৈব সংবন্ধকংণাং । আকরুক্কোঃ আকরুচু চ শমঃ কর্ম চোভয়ং কর্তব্যত্বেনাভিপ্রতং চেৎ শ্রুতং তদা আকরুক্কো রারুচুস্তেতি শম কর্ম বিষয়ভেদেন বিশেষণং বিভাগকরণং চানর্থকং শ্রুতং ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—এই প্রকার শঙ্কা হইতে পারে যে, ধ্যানযোগে আরোহণই কর্মানুষ্ঠানের সীমা, এই প্রকার নির্দেশ করা নিরর্থক, কারণ ব্যক্তিমাত্রেরই যাবজ্জীবন বিহিত কর্ম করিতেই হইবে । এপ্রকার শঙ্কা ঠিক নহে, কারণ ধ্যানযোগে আরোহণ করিতে অভিলାষী সাধকের পক্ষে, বিহিত কর্মই ধ্যানযোগ প্রাপ্তির উপায় এই প্রকার বাক্যের দ্বারা ধ্যানযোগে আরোহণেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষেই বিশেষভাবে কন্মের সম্বন্ধ প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং ধ্যানযোগারম্ভ ব্যক্তির পক্ষে শম (অর্থাৎ কর্মনিবৃত্তি)র সম্বন্ধ প্রদর্শিত হইয়াছে । যদি যোগারোহণেচ্ছু ও যোগারম্ভ এই উভয়েরই অবিশেষে কর্ম ও সন্ন্যাস এই দুইটি উপায়ই কর্তব্যরূপে অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে, কর্ম ও সন্ন্যাসরূপ বিষয় ভেদে যোগারোহণেচ্ছু ও যোগারম্ভ এই শব্দের দ্বারা দুই প্রকার সাধকের বিশেষণ ও বিভাগ করা অনর্থক হইত ॥ ১ ॥

ভাষ্য ।—তদ্বাশ্রমিণাং কশ্চিত্তোগ মারুক্ষ্মুর্ভবত্যাঙ্কচ্চ কশ্চিদন্তো নাক্ষ-
রুক্ষবো ন চাক্ষুর্ভা নাপেক্ষ্য আকুক্ষো রাঙ্কচ্চ চেতি বিশেষণং বিভাগকরণং
চ উপপত্ততে এবৈতি চেৎ ন তত্শিব ইতি বচনাৎ পুনর্ব্যোগগ্রহণাচ্চ যোগারম্ভ-
ত্বেনি য আদীং পূর্বাং যোগমারুক্ষ্মুস্তত্শিবাক্ষু শমএব কর্তব্যং কারণং
যোগফলং প্রত্যাচ্যতে । অতো ন যাবজ্জীং কর্তব্যপ্রাপ্তিঃ কত্চিদপি
কর্মণঃ, যোগবিভ্রষ্টবচনাচ্চ । গৃহস্থঃ চেৎ কশ্মিণো যোগো বিহিতঃ যত্বেহধ্যায়ো
স যোগবিভ্রষ্টোহপি কর্মগতিং কর্মফলং প্রাপ্নোতি ইতি তন্ত ন্যাশাশঙ্কানুপপন্না
স্তাৎ অবশ্যং হি কৃতং কর্ম বামাং নিত্যং বা মোক্ষস্ত নিত্যস্বাদনারভ্যন্তে স্বং
ফলং আরভ্তএব ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—এই ব্যবহার ক্ষেত্রে আশ্রমধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে কেহ
যোগারোহণে অভিলাষী হয়, কেহ বা যোগারম্ভ হয়, আবার অনেক এমনও
আছে ; যাহারা যোগারোহণ করিতে চাহে না এবং যোগারম্ভও নহে,
এই প্রকার যে সকল আশ্রমী তাহাদিগকে পৃথক করিবার জন্তই
যোগারোহণেচ্ছু এবং যোগারম্ভ এই বিশেষণ দুয় ও বিভাগকরণ উপপন্ন
হইতে পারে, এই প্রকার কল্পনা করাও উচিত নহে, কারণ ঐ শ্লোকে
“তত্শিব” (অর্থাৎ তাহারই) এই প্রকার নির্দেশ হইয়াছে এবং “যোগারম্ভ”
এই বিশেষণের মধ্যে পুনর্বার যোগ এই শব্দটার গ্রহণ করাও হইয়াছে (ইহা
দ্বারা ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে, আকুক্ষো মূর্নেযোগমিত্যাদি শ্লোকের দ্বারা
ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে) যে ব্যক্তি পূর্বে যোগারোহণাভিলাষী হয়,

সেই ব্যক্তিই যোগাক্রম হইলে তাহার পক্ষে শম (সন্ন্যাসই) যোগফল (মোক্ষ) লাভের প্রতি কর্তব্য কারণ বলিয়া উক্ত হইতেছে । এই কারণে কোন কৰ্ম্মেরই যাবজ্জীবন কর্তব্যত্ব শাস্ত্রের দ্বারা প্রাপ্ত হইতে পারে না ; যোগভ্রষ্ট বিষয়ে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, তাহা দ্বারাও এই সিদ্ধান্তই দৃঢ়ীকৃত হয়, কারণ (পূৰ্ব্বপক্ষী-দিগের মতানুসারে) যদি ষষ্ঠ অব্যাহত গৃহস্থ অথচ কৰ্ম্মীর পক্ষে ধ্যানযোগ বিহিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই কৰ্ম্মী গৃহস্থ ধ্যানযোগ হইতে ভ্রষ্ট হইলেও নিজ গৃহস্থশ্রম বিহিত বর্ষের গতি (অর্থাৎ) ফল নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইবে, সুতরাং তাহার নাস্তির আশঙ্কা একেবারে অনুপপন্ন হইয়া পড়ে, কারণ মোক্ষরূপ ফল নিত্য এইজন্ত কৰ্ম্মের দ্বারা আরম্ভ না হইলেও কাম্য বা নিত্য কৰ্ম্ম সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইলে তাহার নিম্ন নিজ বিহিত ফল (সময়ে) অবশ্যই প্রদান করিবে (সুতরাং তোমাদের মতে নিত্যকৰ্ম্মনিরত ব্যক্তি যোগাক্রম হইয়া, পরে যোগভ্রষ্ট হইলে তাহার একেবারে বিনাশের আশঙ্কা কি প্রকারে হইতে পারে ?) ॥ ১ ॥

ভাষ্য।—নিত্যত্ব চ কৰ্ম্মণো বেদাদবুদ্ধত্বাৎ ফলেন ভবিষ্যদিত্যবোচাম অত্রথা বেদস্তানর্থকাপ্রসঙ্গাদিত্যি ন চ কৰ্ম্মণি সতি উভয়বিভ্রষ্টবচনমর্থবৎ বিভ্রংশকারণানুপপত্তেঃ । কৰ্ম্মকৃতমীশ্বরেসংযুক্তত্বাৎ কৰ্ত্তরি কৰ্ম্মফলং নারভত ইতি চেন ঈশ্বরে সন্ন্যাসস্তাধিকতরফলহেতুত্বোপপত্তেঃ । মোক্ষাট্টৈবেতি চেৎ স্বকৰ্ম্মণাং কৃতানা মীশ্বরে ত্রাসো মোক্ষাট্টৈব ন ফলাস্তরায় যোগসহিতো যোগাচ্চ বিভ্রষ্ট ইত্যতস্তৎ প্রতিনাশাশঙ্কায়ুক্তৈ বেতি চেন একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ একচারিততে স্থিত ইতি কৰ্ম্মসংগ্রাম বিধানাৎ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—নিত্যকৰ্ম্ম, বেদরূপ প্রমাণের দ্বারা বোধিত হইয়াছে, এই কারণ তাহার ফল অবশ্যই হইবে ইহা আমরা বলিয়াছি তাহা না হইলে বেদ নিরর্থক হইয়া পড়ে । কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান হইতেছে এইরূপ অবস্থায় উভয় (কৰ্ম্ম ও ধ্যানযোগ) হইতে বিভ্রষ্ট হইবার কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না । যদি বল ঈশ্বরে ফল অর্পণ করিয়া অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া, কৰ্ম্ম অনুষ্ঠাতার ফল উৎপাদন করিতে পারে না, তাহাও ঠিক নাহে, কারণ ঈশ্বরে ফল অর্পণ করিয়া কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে ঐ কৰ্ম্মের অধিকতর ফলই হইয়া থাকে । যদি বলা যায়, ঈশ্বরে কৰ্ম্মসন্ন্যাস মোক্ষেরই কারণ (অর্থাৎ) ধ্যানযোগের সহিত ঈশ্বরে কৰ্ম্ম সন্ন্যাস কেবল মোক্ষেরই কারণ হয়, তাহা অত্র কোন ফলের উৎপাদক হয় না, এরূপ হইলে ঐ ধ্যান যোগাক্রম ব্যক্তি (কোন কারণে) যদি যোগভ্রষ্ট হয়, তাহা হইলে ১৫৫ বৈশাখ ১৩০৮ ।] উদ্বোধন । ২৫৩

বিনষ্ট হইবার আশঙ্কা যুক্তিসিদ্ধ হইয়া পড়ে (কারণ যোগব্রতী হওয়ায় তাহার মোক্ষ হইল না এবং যোগ সহকৃত কর্ম মোক্ষব্যতিরিক্ত অন্য কোন ফলেরও জনক হইতে পারিল না । এই জন্য সে কর্মফলও পাইল না, মোক্ষও পাইল না এই ভাবিয়াই অগ্রে অর্জুন তাহার বিনাশ শঙ্কা করিয়াছেন এই প্রকার করনা করিলে সকলেই যাবজ্জীবন বিহিত কর্ম করিতে হইবে এই সিদ্ধান্তটাই যুক্তি-যুক্ত হইতে পারে) তাহাও ঠিক নহে “একাকী যতবিতায়া নিরাশীরপরিগ্রহঃ” ও “ব্রহ্মচর্য্যত্রতেস্থিতঃ” ইত্যাদি শ্লোকে যোগারত ব্যক্তির পক্ষে বিহিত কর্মেরও সম্যাস বিহিত হইয়াছে ॥ ১ ॥

ভাষ্য ।—ন চাত্রধ্যানকালে জীসহায়আশঙ্কা যেন একাকিৎসং বিদীয়তে নচ গৃহস্থস্ত নিরাশীরপরিগ্রহ ইত্যাদি বচনমমুকুলং । উভয়বিভক্ট প্রসঙ্গোপপত্তে-
শ্চ । অনাশ্রিত ইত্যেনে ন কশ্মিৎএবসম্যাসাদিৎ চোক্তং প্রতিষিদ্ধং চ নিরঞ্য়েরক্রিয়স্ত
চ সম্যাসিত্বং যোগিক্রোধেতি চেৎ ন ধ্যানযোগং প্রতি বহিরঙ্গস্ত সতঃ কর্মণঃ
ফলাকাজ্জা সম্যাসস্ততিপরতাং । ন কেবলং নিরঞ্জিরক্রিয়এব সম্যাসী যোগীচ
কিঞ্চিৎ । কর্মী অপি কর্মফলাসঙ্গঃসম্যস্ত কর্মযোগমমুকুলং সঙ্গুৎক্যর্থং স
সম্যাসী ॥ যোগী চ ভবতীতি স্মরতে । ন চৈকেন বাক্যেন কর্মফলাসঙ্গঃসম্যাস
স্ততিচতুর্থীশ্রমপ্রতিষেধশ্চ উপপত্ততে । নচপ্রসিদ্ধং নিরঞ্য়েরক্রিয়স্ত পরমার্থ-
সম্যাসিনঃ প্রতিষ্তিতপুর্নাণেতিহাসযোগশাস্ত্রেষু প্রসিদ্ধং সম্যাসিৎসং যোগিস্বত্ব
প্রতিষেধতি ভগবান্ । স্ববচনবিরোধাত্ ১ ।

ভাষ্যানুবাদ ।—এইপ্রকার সিদ্ধান্ত সাধু নহে (কারণ ঐ বচনে যে একাকি-
ত্বের বিধান করা হইয়াছে, তাহা গৃহস্থের পক্ষে বিহিত হইতে পারে না) ধ্যান-
যোগ কালে গৃহস্থের জীসহায়মসন্তাননা প্রসক্ত নহে সুঃরাং তাহার নিরাকরণ
করিবার জন্য যে ঐ বাক্যে গৃহস্থের একাকিত্ব বিধান হইবার সম্ভাবনা কি ?
নিরাশীঃ অপরিগ্রহ এই দুইটী বিশেষণও গৃহস্থের পক্ষে অমুকুল হইতেছে না ।
এবং তাহার পক্ষে উভয় বিভক্টের শঙ্কাও উক্তরূপে উপপন্ন হইতে পারেনা
কারণ ধ্যান যোগসহকৃত বিহিতকর্মের অনুষ্ঠান মোক্ষব্যতিরিক্ত অন্য কোন
ফলের কারণ হয় না, এইপ্রকার করনার অমুকুল কোন প্রমাণ দেখিতে পাওয়া
যায় না, যদি বল অনাশ্রিত ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা কর্মপরায়ণ গৃহস্থেরই সম্যাসিত্ব
যোগিস্ব উক্ত হইয়াছে এবং নিরঞ্জি এবং শাস্ত্রানুসারে কর্মসম্যাসকারীর
সম্যাসিত্ব ও যোগিস্ব, প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহাও ঠিক নহে কারণ ঐ বচনটির দ্বারা
ধ্যানযোগের বহিরঙ্গ সাধন কর্মের ফলাকাজ্জা পরিত্যাগই প্রশংসিত হইয়াছে,
২৫৪ উদ্বোধন । [৩ম-৮ম সংখ্যা ;

কেবল নিরগ্নি ও অক্রিয়ই যে সন্ন্যাসী ও যোগী তাহা নহে, কিন্তু কর্মফলের আসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্বক সমস্তক্লির জনাই যে ব্যক্তি কর্মানুষ্ঠান করে, তাহাকেও সন্ন্যাসী ও যোগী বলিয়া জানিতে হইবে, এই প্রকার প্রতিপাদন করিয়া তাদৃশ কর্মী ও গৃহস্থের স্তুতিই বরা হইয়াছে। একটা বাক্য একবার প্রযুক্ত হইয়া, কর্মফলাসঙ্গ পরিত্যাগের স্তুতি ও সন্ন্যাসাশ্রম পরিগ্রহের নিষেধ এই দ্বিবিধ অর্থ, যুগপৎ প্রতিপাদন করিতে পারে না। ভগবান্, নিরগ্নি এবং অক্রিয় পরমার্থসন্ন্যাসীর, ঐতিহ্য স্তুতি পুরাণ ও ইতিহাসে বিহিত এবং সর্বলোকে প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসিদ্ যোগিস্থের প্রতিষেধ, করিতেছেন ইহা সম্ভবপর নহে এই প্রকার নিষেধ করিলে তাহা তাঁহার নিজের বচনের সহিতই বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে ॥ ১ ॥

ভাষ্য ।—সর্বকর্মাণি মনসা সংযত্ব নৈব কুর্স্ব ন কারয়ন্নাস্তে মৌনী সন্তুষ্টো
গেন কেন চিদনিকেষতঃ স্থিরমতি বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংস্চরতি নিস্পৃহঃ
সর্বীরস্তপরিভ্যাগীতি চ তত্র তত্র স্ববচনানি দর্শিতানি তৈবিরুদ্ধোত চতুর্থাশ্রম
প্রতিষেধঃ । তস্মান্মনুে। যোগমারুক্ষোঃ প্রতিপন্নমাহঁহাস্ত অগ্নিহোত্রাদি,
ফলনিরপেক্ষ মস্তীধমানং ধ্যানযোগা রোহণ সাধনত্বং সম্বত্ত্বিধারেণ প্রতি-
পত্ততে ইতি স সন্ন্যাসী যোগীচেতি স্ত্যতে । ১ ।

ভাষ্যানুবাদ ।—“সর্বকর্মাণি মনসা সংযত্ব নৈব কুর্স্ব ন কারয়ন্নাস্তে”
সকল কর্মেরই মনের দ্বারা সংন্যাস করিয়াও নিজে কোন প্রকার কর্মের আরম্ভ
না করিয়া বা কাহার দ্বারা না করাইয়া অবস্থান করিবে ; “মৌনীসন্তুষ্টো যেন
কেনচিৎ” (মৌনীও যে কোন বস্তুতেই সন্তুষ্ট) “অনিকেষতঃ স্থিরমতিঃ” আবাদ-
হীন ও স্থিরমতি “বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংস্চরতি নিস্পৃহঃ” (যে পুরুষ
সকল কাম পরিত্যাগ পূর্বক নিস্পৃহ হইয়া বিচরণ করে) সর্বীরস্তপরিভ্যাগী
(সকলপ্রকার আরম্ভের পরিত্যাগকারী) ইত্যাদি প্রকারের যে সকল বচন
ভগবান্ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহার সহিত সংন্যাস আশ্রমের প্রতিষেধ বিরুদ্ধ
হইয়া পড়ে এইজন্য সর্বকর্মসন্ন্যাস গীতার প্রতিপত্ত নহে এই কথা বলা
যাইতে পারেনা) সেই কারণে (ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে) যে ব্যক্তি
গৃহস্থাশ্রম স্বীকার করিয়াছে, অথচ ধ্যানযোগে আরোহণ করিতে অভিলাষী
মমননশীল তাহার পক্ষে ফলাকাঙ্ক্ষা পরিহার পূর্বক অগ্নিহোত্রাদি, কর্মের
অনুষ্ঠান চিন্তাভক্তি দ্বারা ধ্যান যোগারোহণের সাধন হইয়া থাকে, এই কারণে
তাহাকেই সন্ন্যাসী ও যোগী এই শব্দ দুইটি দ্বারা স্তুতি করা হইতেছে । ১ ।

ভাষ্য ।—অনাশ্রিতঃ ন আশ্রিতঃ অনাশ্রিতঃ কিং ? কর্মফলং কর্মণঃ ফলং
১৫৫ বৈশাখ, ১৩০৮ ।] উদ্বোধন । ২৫৫

যতং অনাশ্রিতঃ কৰ্মফলতৃষ্ণাবিরহিত ইত্যর্থঃ। যোহি কৰ্মফল তৃষ্ণা-
বান্ স কৰ্মফল মাশ্রিতো ভবতি অয়ং তু তদ্বিপরীতোহতোহনাশ্রিতঃ কৰ্মফলম্
এবমুক্তঃ সন্ কাৰ্য্যং কৰ্ত্তব্যং নিত্যং কামাবিপরীতমগ্নিহোত্রাদিকং কৰোতি
নির্কল্লভ্যতিথঃ কশ্চিদদৃশঃ কৰ্ম্মী স কৰ্ম্মাস্তরেভ্যো বিশিষ্যতে ইত্যোদমর্থমাহ
ন সংন্যাসী চ যোগী চেতি । সন্ন্যাসঃ পরিত্যাগঃ স যত্নাস্তি স সন্ন্যাসী চ
যোগী চ যোগশ্চিন্তনসমাধানং স যত্নাস্তি স যোগী চ ইত্যোৎপাদ্যসন্ন্যাসঃ
মন্তব্যো ন কেবলং নিরগ্নিচক্রিয় এব সংন্যাসী যোগীচ ইতি মন্তব্যঃ । নির্গতা
অগ্নয়ঃ কৰ্ম্মাণ্ডভূতা যস্মাৎ সঃ নিরগ্নিচক্রিয়শ্চ অনগ্নি সাধনা অপ্যবিদ্যমানঃ
ক্রিয়াস্তপোদানাদিকা যন্ত অসৌ অক্রিয়ঃ । ১ ।

ভাষ্যানুবাদ ।—“অনাশ্রিত” (যে আশ্রয় করেনা) সেই অনাশ্রিত, কি ?
(আশ্রয় করেনা তাহাট বলা হইতেছে যে) কৰ্মফল (অর্থঃ) কৰ্ম্মের
বাহা ফল তাহা যে ব্যক্তি আশ্রয় না করে সেই অনাশ্রিত (শব্দের দ্বারা
প্রতিপাদিত হইতেছে) কৰ্মফল তৃষ্ণাশূন্য ইহাই অর্থ । বাহার কৰ্মফলে তৃষ্ণা
আছে সেই কৰ্মফলকে আশ্রয় করিয়া থাকে এই ব্যক্তি তাহা হইতে বিভিন্ন
এই জন্যই কৰ্মফলকে আশ্রয় করেনা এইপ্রকার হইয়া, কাৰ্য্য অর্থঃ কৰ্ত্তব্য
নিত্য অর্থঃ কাম্য বিপরীত অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্ম করিয়া থাকে । যে
কৰ্ম্মপরায়ণ অধিকারী এতাদৃশস্বভাবসম্পন্ন সে অন্যান্য কৰ্ম্মী হইতে বিশিষ্ট
ইহাই বলা হইতেছে যে, সেই সন্ন্যাসী-ও যোগী সন্ন্যাস শব্দের অর্থ পরিত্যাগ
তাহা বাহার আছে সে সন্ন্যাসী “যোগী” যোগশব্দের অর্থ চিন্তনসমাধান তাহা
বাহার আছে সে যোগী এইপ্রকার গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকেও সন্ন্যাসী ও যোগী
বলিয়া জানিবে কেবল নিরগ্নি ও অক্রিয় ব্যক্তিই যে যথাক্রমে সন্ন্যাসী
ও যোগী হইয়া থাকে তাহা নহে । কৰ্ম্মের সাধন অগ্নিত্রয় বাহার নিকট হইতে
নির্গত হইয়াছে, তাহাকে নিরগ্নি কহা যায়, অগ্নি দ্বারা বাহাদের সাধন না হয়,
এই প্রকার তপঃ দান প্রভৃতি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান যে ব্যক্তি না করে, তাহাকে
অক্রিয় বলা যায় । ১ ।

যংসন্ন্যাসমিতিপ্রাচ্ যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব ।

নহসংস্রস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২ ॥

অর্থঃ ।—হে পাণ্ডব যংসন্ন্যাস মিতীপ্রাচ্ তং যোগং বিদ্ধি হি যস্মাৎ)
‘অসন্ন্যাস্তসকল্প কশ্চন যোগী ন ভবতি ॥ ২ ॥

৭/১৭২২.
৫

[স্বামী সচ্চিদানন্দ ।]

মানুষের ভিতর অনন্ত ভাব বিদ্যমান; তার মধ্যে কতকগুলো প্রকাশ
ভাবে, আর অবশিষ্টগুলো অপ্রকাশভাবে। পুনর্জন্মবাদ এই ভাব সমূহের
এক একটীর বিকাশমাত্র। গাছ, পালা, পোকা, জানোয়ার, অসামু, সাধু,
দেব, দানব, ইত্যাদি ইত্যাদি যত রকমের অবস্থা আছে, সে সমুদায় মানুষের
ভিতর আছে। এক এক সময়ে এক একটা ভাবের বিকাশ হ'য়ে গেছে;
অবিষ্যতে আবার এক এক সময়ে এক একটা ভাবের বিকাশ হবে। গাছ যে
ভাবসমূহের সমষ্টি, যে জন্মে সেই ভাবসমূহ প্রকাশ ছিল, সে জন্মে মানুষ ছিল
গাছ। যে ভাব সকল থাকলে পশু হয়, যে জন্মে সেই ভাব সকল প্রকাশ
ছিল, সে জন্মে মানুষ ছিল পশু। বর্তমান জন্মে অগ্র সকল ভাব চাপা রয়েছে;
কেবল যে ভাবসমষ্টি থাকলে মানুষ হয়, সেই ভাব সমূহ প্রকাশ রয়েছে; তাই
আমরা মানুষকণে রইছি। আবার যখন মানুষ হবার ভাবসমূহ চাপা পড়ে
গিয়ে, যে ভাব সকল থাকলে দেবতা হয়, সেই সব ভাব জেগে উঠবে, তখন
এই মানুষ হবে দেবতা। যদি কোন মানুষ অত্যন্ত কুৎসিত ভাবাপন্ন হয়,
এত কুৎসিত যে সে ভাবের সহিত পশুভাবের কোনও পার্থক্য না থাকে,
তা হলে এই মানুষ পরজন্মে পশু হবে। বা'র থেকে কিছুই আনতে হয় না;
সমস্তই মানুষের ভিতর আছে; কেবল সে গুলোকে জাগাতে হয়, এই মাত্র।
ধর্মভাব, ভগবদ্ভাব, মুক্তি, জ্ঞান, বিবেক, বৈরাগ্য প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ ভাব
মানুষের, প্রত্যেক মানুষের ভিতর আছে। 'ধর্ম' অর্থ—এই উচ্চ উচ্চ ভিতরের
ভাবগুলোকে জাগান।

কুখু মানুষ কেন? প্রত্যেক জীবাত্মা অনন্ত ভাবের আধার; আজ, না হয়
কাল, সে অনন্ত ভাব বিকাশ হবে। অতি ক্ষুদ্র পোকাটীর ভিতরেও এত শক্তি
গুপ্তভাবে চাপা রয়েছে, যে শক্তি, বিকাশ হলে, সমস্ত ছনিয়া কাঁপিয়ে দিতে
পারে।—হবেও সে শক্তির বিকাশ এক কালে; সমস্ত বাঁধা বিহীন অতিক্রম
ক'রে, ঐ লগ্ন্য পিম্বলিকা একদিন ঝাঁড়াবে নিজের পায় উপর, যখন তার
মহাশক্তির সাহায্যে সর্বাগ্রহোপগ্রহনক্ষত্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মহাসমুদ্রে বুদ্ধদের
কুঁড়ি বোধ হবে। তবে, শব্দদের মধ্যে সে মহাশক্তি আছে সত্য, কিন্তু বিকাশের

তারও বেশি। অমূল্য অবস্থা হলে, সে শক্তি জেগে উঠে ; প্রতিকূল অবস্থার জেগে যায় ।

অবস্থার আমূল্য শক্তিবিকাশের মূল সহায় । গান গাইবারি তার সকল-কার ভিতরেই আছে, কিন্তু গায়কের কাছে না থাকলে সে ভাবের বিকাশ হয় না । লেখা পড়া শিখে বিদ্বান্ হবার তার সকলকার ভিতরেই আছে ; ইচ্ছা করলেই সকলেই বিদ্বান্ হতে পারেন, কিন্তু তার জন্য পণ্ডিতের আবশ্যক । চোরের সঙ্গে বেশী দিন থাকলে চোর হতে হয়, মাতালের সঙ্গে বেশী মিশলে মাতাল হতে হয় ; সতের সঙ্গে সং, অসতের সঙ্গে অসং হওয়ার কথাও সর্বসাধারণ-বিদিত । ধর্ম্মভাব সম্বন্ধেও ঐ এক কথা । ধর্ম্মভাব সকলের ভিতর থাকলে কি হয়,—অবস্থার আমূল্য ছাড়া তাহার বিকাশ অসম্ভব । যে মান-বের কাছে থাকলে, অশুনিহিত ভগবদ্ভাবের উদ্দীপন হয়, তিনিই গুরুপদবাচ্য ।

ধর্ম্মভাব-উদ্দীপনার আর একটু বিশেষত্ব আছে । যিনি লেখা পড়া, গান বাজনা, বা অন্য কোনও ঐ রকম ভাবের উদ্দীপন করতে চান, তাহার তৎ তৎ ভাবের শিক্ষকের কাছ থেকে উপদেশ নিয়ে কাজ করলেই ইষ্টশক্তি হতে পারে । কিন্তু ধর্ম্মভাব জাগাতে হলে, যার তার কাছ থেকে ধর্ম্মভাব উদ্দীপনের সাধন পদ্ধতি জেনে নিয়ে নিজে নিজে সাধন করলে, সে ভাব প্রস্ফুটিত হয় না । এই রকম করে ধ্যান করতে হয়, এই রকম করে এই মন্ত্র জপ করতে হয়, এই রকম করে আসন, প্রাণায়ামাদি করতে হয়, ইত্যাদি বহুবিধ ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া তত কঠিন নয় ; ঐ সমস্ত উপদেশ অনুসারে কাজ করাও সহজ । কিন্তু তাহাতে ভিতরের ভগবদ্ভাবের বিকাশ হয় না । যে ব্যক্তি স্বয়ং ভগবদ্ভাব প্রত্যক্ষ অনুভব করেছেন, তাহার নিকট হ'তে সাফল্য সম্বন্ধে শক্তি সঞ্চারের আবশ্যক । জমিতে নানান্ রকমের আগাছা থাকে ; সে সব আগাছা পরিকার ক'রে, জমিতে সার দিয়ে জমি ঠিক করতে হয় ; কিন্তু বতদিন না শস্তের বীজ সে জমিতে পড়ে, ততদিন শস্ত হয় না । সেইরূপ শক্তিসঞ্চার-কারী গুরুলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত, বত সাধন ভজন করা যায়, তাহাতে কেবল জমি তৈয়ার, চিত্ত শুদ্ধি, হতে থাকে ; গুরুর নিকট হতে ধর্ম্মবাজ না আসলে ভগবদ্ভাবের বিকাশ হয় না । গুরু হ'তে শিষ্যে এই শক্তি সঞ্চারের নাম দীক্ষা ।

কোন কোন সম্প্রদায় বলেন, আন্তরিক ব্যাকুলতা থাকলে দীক্ষা ব্যতিরেকেও ভগবদ্ভাব সম্ভব । ভগবান্ অন্তর্ধানী রূপে সকলের ভিতর নিহতমান ; তাহাকে সরলভাবে ডাকলে, তিনিই তাহাকে পাবার পথ জানিয়ে দেন ।

দীক্ষার কোন বিশেষ নিয়ম নাই। কখন বা গুরু শিষ্যকে কোন বিশেষ মন্ত্র জপ করতে বলেন, সেই মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে শক্তি সঞ্চারিত হয়। কখন কেবল স্পর্শের দ্বারা, কখন “শক্তি সঞ্চার হউক” এই মাত্র গুরুর ইচ্ছা দ্বারা, কখন বা শক্তিমাত্র গুরুর সঙ্গ, ইত্যাদি নানা উপায়ে ঐ শক্তি গুরু থেকে শিষ্যে আসতে পারে।

গুরু পরম্পরা থেকে ঐ শক্তি আবহমান কাল চলে আসছে। এক গুরু হতে তাঁর শিষ্য, সেই শিষ্য হতে তাঁর প্রশিষ্য, সে প্রশিষ্য হতে তাঁর শিষ্য, এই রকম করে ধারাবাহিক ক্রমে এই শক্তি বহুপ্রাচীন কাল থেকে সঞ্চারিত হয়ে বর্তমান সময়ে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির মধ্য কাজ করেছে। তাঁহারা ধর্মপিপাসু শিষ্যের মধ্য উহার বীজ রোপণ করলে, শিষ্যের ধর্মভাব প্রকাশ হবে; নহিলে নয়। প্রতি বলেন, “তদ্বিত্ত্বানাং স গুরুমেবাতিগচ্চেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্”—ভগবানকে জানতে হলে ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। শূকেশী-ভারদ্বাজ-প্রমুখ ব্রহ্মচারিগণ ব্রহ্মজ্ঞানের জগৎ মহর্ষি পিঙ্গলাদের শরণাগত হলেন; মহর্ষি তাঁহাদিগকে ব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশ দিবার পর, তাঁহারা মহর্ষিকে অচ্চনা করে, “নমঃ পরমশ্বষিভ্যঃ, নমঃ পবম-শ্বষিভ্যঃ” এই বাক্যে পূর্ব পূর্ব গুরুপরম্পরাকে উদ্দেশ্যে প্রণাম করলেন— প্রতিতে ইহাও দেখা যায়।

■ গুরু পরম্পরার আদি গুরু কে ?

‘মুক্তি’ মানে দেশ কাল নিमित্তের পারে যাওয়া। যে মহামায়ার মহা-শক্তির প্রভাবে দৃষ্টমান জগৎ ছায়াবৎ, স্বপ্নবৎ অলীক হ’লেও সুদৃঢ় সত্যবৎ অচল অটল প্রতীতমান হয়, ‘মুক্তি’ মানে সেই প্রবন্ধনার পারে যাওয়া, জগৎকে দূর করে, ত্রিভুয়ে দিয়ে, নাশ করে, স্বয়ং ভেঙ্গে, নিরবচ্ছিন্ন সত্য রাজ্যে যাওয়া,—মহামায়ার শক্তির পারে যাওয়া। মহাশক্তির বিকাশ ভিন্ন এ কাজ অসম্ভব। সে আদি গুরু কে, যার হতে এ শক্তির প্রথম প্রবাহ ? কার উদ্দীপনায় মানুষ্যের মধ্যে গৃঢ় ভাবে স্থিত এই মহাশক্তি প্রথমে জেগে ওঠে ? অবশ্য, মানুষ্যের মধ্যে এই মহাশক্তি, মহামায়ার পারে যাবার শক্তি প্রচ্ছন্ন ভাবে আছে ; প্রত্যেক মানুষ, জীব, জানোয়ার, সকলের ভিতরেই আছে। কি অবস্থার আনুকূল্যে, কোন আঘাত প্রতিঘাতের ফলে, যে শক্তি প্রথমে জেগে উঠে গুরুপরম্পরাক্রমে অজস্র দর্শাত্ম চলে আসছে ?

“ইমং বিবস্ততে যোগং প্রোক্তবান্‌মব্যয়ম্ ।

দিবসান্‌ মনবে গাহ মনুরিক্ষাকদেহবীঃ ॥ ১ ॥

এবং পরম্পরাপ্রাণ্তমিমাং রাজর্ষয়ো বিহঃ ।

স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরস্তপ ॥ ২ ॥ গীতা । ৬র্থ অঃ ।

“আমি পূর্বে আদিত্যকে এই অবয়ব যোগ কহিয়াছিলাম ; তৎপরে, আদিত্য যমুকে ও মনু ইক্ষ্বাকুকে কহিয়াছিলেন : এইরূপ, বাজমিগল পরম্পরাগত এই যোগ বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন ; অনন্তর কাশ্যক্রমে উহা বিলুপ্ত হইয়াছিল।” নিম্নলিখিত বিধানিযুগ্ম অনন্তশক্তির আধার ভগবান্‌ই এই শক্তির আদি প্রবর্তক ।

মানবেতিহাসের অতি প্রাচীন কাল হতে, অতি অসভ্য বর্ষের অবস্থা থেকে, মানবের উপাসনার চেষ্টা, গাছ হ'ক, পাথর হ'ক, সাপ হ'ক, অস্ত্র কোন জন্তু জানোয়ার হ'ক, কাকের না কাকব উদ্দেশ্যে মন্তক অর্পণ ক'রবার চেষ্টা, মানবের সর্বকালেই দেখা যায়। বৃদ্ধির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, জন্মের ক্রমশঃ বিস্তৃতি সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু-সমাজের এমন এক অন্তঃ হইয়াছিল, যখন ভগবান্‌ বলে একটা তাবের চিন্তা অনেকেরই আলোচনার বিষয় হয়। যে জন্ম পূর্বে গাছ-পাথরাদির উপাসনা সম্বন্ধ থাকত, সে তখন অসীম অন্তের দিকে ধাবমান। উপযুক্ত সময় বুঝে, উপযুক্ত আধারে, স্বয়ং শক্তীধর এই মহাশক্তির উদ্দীপন করিয়ে দেন। সেই আপাত হতে শিষ্যশিষ্যক্রমে সে শক্তি কিছুকাল কাজ করে চলে আসে। আবার কাল ক্রমে তাঁহার প্রতাপের হ্রাস হয়। তখন আবার তাকে পুনঃ সঞ্জীবিত করতে হয় ; ফের, অবতারের দরকার হয়। ফের, “সৃজামাহম্” হয়, ফের, “সম্ভবামি যুগে যুগে” হয়।

অবতারই এই শক্তির মূল প্রসারণ। ধন্ত তাঁহার, ঐহাৱা অবতারদিগের পদস্পর্শ কর্তে সমর্থ হন। অবতার বিশেষ ঐহাদের গুরু, তাঁহাদের অত্যুচ্ছিত ভগবন্তাব সহজেই উদ্দীপিত হয়। সে সৌভাগ্য সকলের ভাগ্যে ঘটে না।

শক্তির তারতম্যভেদে, অবতার গুরু, জগেশ্বর গুরু, ও জীবমুক্ত গুরু, এই তিন প্রকারের গুরু। অবতার গুরুর অপর নাম নিত্যেশ্বর গুরু। ভগবান্‌ অনাদি কাল হতে চিরকাল নিয়মের নিয়ন্তা ; তিনি কখনই নিয়মের বদ্ধ হন না ; দেশকালনিমিত্ত নিত্য তাঁহার অধীন। তিনি চিরকাল কর্ত্ত্বের প্রভু ; কর্ত্ত্বের দ্বারা তিনি কখনও বদ্ধ হন নাই। সুতরাং তিনি যখন বেচ্ছার

মানুষরূপে অবতীর্ণ হন, তিনিই কেবল ইচ্ছা করলে বদ্ধ জীবের কর্ম, সাধন বাতিরেকে, কাটিয়ে দিতে পারেন। গুরু শিষ্যে হ'লে, দীক্ষার পর, নিজের সাধন করে কর্ম ক্ষয় করে মুক্তি পেতে হয়। অবতার গুরুর দয়া হ'লে নিজের সাধন ভজন না করলেও, কেবল তাঁহার ইচ্ছামাত্রেই সমস্ত কর্ম মুহূর্তেক মধ্যে নাশ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তিনি যে সকলকেই ঐরূপে দয়া করবেন, তারও কোনও বাধাবাধি নিয়ম নাই। অবতার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাঁহার উপর কোনও নিয়মই খাটে না। হয়ত এক শিষ্যকে ঐ রকমের দয়া করে রূপা-কটাক্ষে তার সমস্ত কর্ম নিমেষ মধ্যে কাটিয়ে দিলেন। আবার আর এক শিষ্যকে শক্তি সঞ্চার করলেন মাত্র; তার পর শিষ্যকে সাধন ভজন করে, নিজের খেটে খুটে, ক্রমে উন্নত হতে হতে, মুক্তি লাভ করতে হল। তবে তিনি ভগবান বলে, কখনও কর্মের দ্বারা বদ্ধ হন নাই বলে, চিরকাল কর্মে প্রভু বলে, বিনা সাধনে শিষ্যের কর্ম নাশ করে দেবার শক্তি থেবেল তাহাতেই সম্ভব, অত্ৰ কোনও গুরুতে নয়।

অবতার গুরুর কোনও লক্ষণ করা যায় না। এই রকম হলে, এই এই গুণ থাকলে, অবতাব হবে, নইলে নয়,—এই রূপ কোনও সংস্কার দ্বারা অবতার গুরুকে নির্দেশ করা যায় না। তিনি সমস্ত লক্ষণের অতীত; তাঁহার কার্য কলাপ সর্বদা হ্রস্বগম্য। তাঁহাকে ধরা ছোঁয়া অতি কঠিন। তিনি বাহার কাছে স্বরূপ প্রকাশ করেন, তিনিই কেবল তাঁকে বুঝতে পারেন; অত্ৰে নয়।

অবতার গুরুর পর জন্মের গুরু। ইহাদিগকে যোগশাস্ত্রে “প্রকৃতিগুরু” এবং বেদান্তে “আধিকারিক পুরুষ” কহে। ইহারা প্রথমে সাধারণ লোকের জ্ঞান বদ্ধ জীব চিহ্নেন; পরে সাধনার দ্বারা মুক্তি প্রাপ্ত করেছেন, অর্থাৎ ইহা ক'রলেই, মুক্ত হতে পারেন, কিন্তু সংসারের মগনের জন্ত, ইহারা মুক্তি গ্রহণ করেন না এবং কেবল পরহিত ত্রুতে, আত্মসংসর্গ করেন। অবতার গুরু হ'ই হাঁদের প্রভেদ এই যে, অবতার গুরু কখনও বদ্ধ হন নাই, কিন্তু জনোপ গুরু এক কালে বদ্ধ ছিলেন, এক্ষণ সাধনার দ্বারা মুক্ত হয়েছেন। ইহারা ইহা করলেই শিষ্যের কর্ম নাশ করতে পারেন না। ইহাঁদের কাছ থেকে সঞ্চার করে নিয়ে, নিজের সাধন করে, মুক্ত হ'তে হয়। জনোপ গুরু শ্রী কল্প নিজের অহংবুদ্ধি রেখে জগতের উপকারে ত্রতী থাকেন। কিন্তু কল্পাৎ বধন জগৎ অব্যক্ত সাম্যাবস্থার পুনরায় ক্রিয়ে যায়, সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহারা মুক্ত হয়ে যান।

অনোখর গুরুর নীচে জীবমুক্ত গুরু । যিনি প্রথমে কশ্মের দ্বারা বদ্ধ ছিলেন, পরে সাধনার দ্বারা মুক্ত হয়ে গেছেন, কেবল তাঁহার শরীর ও মন পূর্ণ সংস্কারের বেগে কাজ করছে না, তিনি জীবমুক্ত । মনে কর, দু'খানা চাকা মধ্যে একখানা লম্বা কাঠের দ্বারা পরস্পর যুক্ত, যেমন গাড়ির চাকা সাধারণতঃ হয়ে থাকে । এবং ঐ দু'খানা চাকা এক রাস্তার উপর দিয়ে সমবেগে চলে যাচ্ছে । সহসা একখানা চাকা হাত দিয়ে ধরে, যদি সংযোজক লম্বা কাঠখানাকে কেটে দেওয়া যায়, তা হলে যে চাকাখানা হাত দিয়ে ধরা হয়েছে, সেখানা স্থির হয়ে থাকে, আর অপরখানা কিছুক্ষণ গড়িয়ে চলে গিয়ে তবে পড়ে যায় । জীবমুক্ত পুরুষের অবস্থাও তদ্রূপ । তাঁহার অহংকাররূপ এক খানা চাকা একেবারে বন্ধ লীন হয়ে স্থির হয়ে গেছে, কর্মসংযোজক রূপ কাঠখণ্ড চিরকালের জন্য ছিন্ন হয়ে গেছে, কেবল শরীর ও মনরূপ অপর চাকা পূর্ণ কশ্মের বেগে এখনও কাজ করছে । ইহাদের কাছ থেকেও শক্তি সঞ্চার করে নিয়ে নিজে সাধন ভজন করে, মুক্ত হতে হয় । ইহারাও অবতারের মত ইচ্ছামাত্র দ্বারা শিষ্যের কর্মনাশ করতে পারেন না । শরীরত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের একেবারে নাশ হয়ে যায় । জন্মের এক কল্প পর্যন্ত নিজেদের অহংকার রেখে দেন । জীবমুক্ত গুরুর অহংকার ত আগেই নাশ হয়ে গেছে ; মৃত্যু পর্যন্ত পূর্ণ কশ্মের বেগে তাঁহার শরীর ও মন দ্বারা, অহংকারের দ্বারা নয়, যা কিছু কাজ হবার তা হয় ; মৃত্যুর পর তাঁহার সম্বন্ধে সব সূরিয়ে যায় ।

পূর্বে বলেছি, অবতার গুরুর কোন বিশেষ লক্ষণ বা সংজ্ঞা হতে পারে না । জন্মের ও জীবমুক্ত গুরুর সম্বন্ধেও তদ্রূপ, কেবল তাঁহারা পূর্বে বদ্ধ ছিলেন, এক্ষণ মুক্ত হয়েছেন, অবতার কখনও বদ্ধ হন নাই, এই মাত্র প্রভেদ । ইহারা সকলই নিয়মের পারে গেছেন । সাধারণ বদ্ধ জীবের পক্ষে, যাঁহা ভাল মন্দ, এঁদের কাছে সে সব অজ্ঞ প্রকারের । পাপ পুণ্য, ধর্ম অধর্ম, স্তব্য অস্তব্য, উচিত অসুচিত, এ সব কথাই এঁদের কাছে কোন অর্থই নাই । সংসারের চক্ষে এঁদের বিচার করা যায় না ।

এঁদের রূপাও অর্থেতুকী । কাকে দয়া করবেন, কাকে দয়া করবেন না, কিছুই ঠিক নাই । হয়ত এক জন সারা জীবন প্রার্থনা করলে, তার দিকে ফিরেও চাটলেন না । আব এক জন ধর্ম কথ্য চায় না, নাস্তিকভাবাপন্ন, তাকে দয়া করে নিজের সর্বস্ব দিয়ে দিলেন । এক মাঠে এক রাস্তার ধায়ে এক বাগলক বসে আছে, কতকগুলো মোহার কাপড়ে করে । রাস্তার ধার

দিয়ে কত লোক যাচ্ছে, মাথা কুটে মরছে, একটা মোহর পাবার জন্তে। বাল-
তার দিকে ফিরেও চাচ্ছে না। আবার এক জন বালকের দিকে না তাকি-
চলে যাচ্ছে; বালক নিজে উঠে গিয়ে তাকে হাতে ধরে সব মোহরগুলো
দিয়ে দিলে। গুরুর স্বভাবও ঐ বালকের মত।

এই দিন থাকের গুরু ছাড়া আর কারও গুরু হবার অধিকার নাই। যে
নিজে কর্মের পারে বাট নি, তার কি সাধ্য অপরকে সেখানে নিয়ে যার?
কেবল শক্তি পেয়েই, সাধনার চরমাবস্থায় না গিয়েই, শিষ্য ক'রবার লোভ
হলে, সে গুরু ও তাহার শিষ্য, উভয়েরই সর্বনাশ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-
দেব বলতেন, গুরু হ'লে শিষ্যের কর্মের ভার নিতে হয়, শিষ্যের পাপ গুরুতে
স্পর্শায়। যিনি শক্তিমান পুরুষ, তাঁহারই কেবল গুরু হওয়া সাজে। নহিলে
এক সের চালের ভাত রেঁধে লক্ষ লোক নিমন্ত্রণ করা কষে পড়ায়। নহিলে,
গুরু শিষ্য জড়াজড়ি করে উভয়ে অন্ধ-রূপে পড়ে যায়। মহাশয়ের শক্তির
পারে নিয়ে যেতে হবে,—এ ছেলে খেলা নয়। গুরু হওয়া নয় ত,—জা'ত
সাপ নিয়ে খেলা করা। দক্ষ সংপড়ে না ধলে, মরণ প্রব নিশ্চিত। শক্তি-সঞ্চায়
করবার শক্তি না থাকলে, গুরু হওয়া যায় না, এ কথা বলা বাহুল্য। গুরু
বিশেষ ভাব—স্বার্থত্যাগ। তিনি শিষ্যের কাছে এক কপর্দকেও আশ
রাখেন না।

ধর্মের একটা টান আছে, গুরুর একটা টান আছে। যেমন বেস্তানের
একটা টান আছে, মদের একটা টান আছে, যে টানে পড়ে লোক কষ্টব্য
ভুলে যায়, ভাল মন্দ ভুলে যায়, বাড়ি ঘর দোর আত্মীয় স্বজন ভুলে গিয়ে
বারবনিতার ঘরে পড়ে থাকে, তেমনি গুরুর একটা টান আছে। সে টানে
পড়লে, শিষ্যের সাধ্য কি স্থির থাকে। শত বিষ ঠেলে ফেলে, সমস্ত বন্ধন
কেটে ফেলে, উন্মত্তের ন্যায়, শিষ্য গুরুর কাছে যেতে থাকে। কোনই প্রতি-
বন্ধক তাকে বারণ করতে পারে না; নিজের ইচ্ছা না থাকলে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও
শিষ্য গুরুকে ছাড়তে পারে না। সে ভুলে গিয়ে গুরুর হয়ে যায়। তখনই
শক্তি সঞ্চায় হতে আরম্ভ হয়েছে; শিষ্যের ধার মার নাই।

যতই শিষ্য আগনার হতে থাকে, ততই গুরুর স্বরূপ তার কাছে প্রকাশ
হতে থাকে। আগে শিষ্য গুরুকে মানুষ বুদ্ধিতে দেখে। পরে দেখে, গুরু
আর ইট অভেদ, গুরু আর ভগবান্ অভেদ। মনে মনে নয়, প্রত্যক্ষ দেখতে
পায়, গুরুদ্বন্দ্বী ভগবান্ তার সামনে বিরাজমান। ইহার নাম অকলিত।

হদিন না গুরুতে পাকা ভগবদ্ভক্তি হয়, ততদিন ঠিক গুরুলাভ হয় নি। রুতে ভগবদ্ভক্তি হ'লে, সাধনার শেষ। তারপর সেবা। যতদিন না ভগবদ্ভক্তি হয়, ততদিন গুরুর শিষ্যকে দেবার জিনিষ থাকে, তাকে আন্তে আস্তে, বাপ যেমন ছোট ছেগেটিকে হাত ধরে তোলে, সে রকম করে ধর্ম্মরাজের মোপানের পর মোপানে তুলতে হয়। কিন্তু এবার ভগবদ্ভক্তি পাকা হয়ে গেলে, আর গুরুর শিষ্যকেও কিছু দিতে হয় না, শিষ্যকেও গুরুর কাছ থেকে আর কিছু পাবার অপেক্ষা থাকে না। এই অবস্থায় নিকাম গুরুভক্তি, ঠিক ঠিক, যথার্থ নিকাম গুরুসেবা শুরু হয়। এ সেবা মুক্ত পুরুষের সেবা।

শেষ কথা, এই রকম গুরুর আবির্ভাব জগতে সর্ব্বদা হয় না। আর এ রকম গুরু না হলেও নিস্তার নাই। তবে, তাই বলে, চূপ করে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। মুমুক্শু ব্যক্তি পারেনও না চূপ করে বসে থাকতে। যার যেকোন বিশ্বাস, তার সেই বিশ্বাসে দৃঢ় হ'য়ে, সরলতা বজায় রেখে, সাধন করে যেতে হবে। সময়ে সবই আসবে। “মহুৰ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ব্যক্তি সিক্তয়ে। যতামপি সিদ্ধানাং কশ্চিদ্ভ্যং বেত্তি তত্ত্বতঃ” ॥—এ কথা অতি সত্য; “ঘুড়ি লক্ষে কতু একটা কাটে,”—এ কথা অতি সত্য।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথাসুত ।

শ্রীম—কথিত ।]

[১২১ পৃষ্ঠার পর ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

[দক্ষিণেশ্বরে—ভক্তসঙ্গে]

আজ রবিবার, ২৬শে অক্টোবর, ১৮৮৪খ্রীষ্টাব্দ। হেমন্তকাল। কার্ত্তিকের গুলাসপ্তমী তিথি।

হুপুরবেলা। দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে ঠাকুরের সেই পূর্বপরিচিত ঘরে ভক্তেরা সমবেত হইয়াছেন। সে ঘরের পশ্চিম পায়ে অর্দ্ধচক্রাকার বারান্দা। বারান্দার পশ্চিমে উড়ানের পথ উত্তর দক্ষিণে বাইতেছে। পথের পশ্চিমে না

কালীর পুষ্পোদ্ভান, তাহার পরে পোস্তা, তৎপরে পবিত্রমলিনা দক্ষিণ-বাহিনী গঙ্গা।

ভক্তেরা অনেকেই উপস্থিত আছেন। আজ আনন্দের হাট। আনন্দময় ঠাকুর রামকৃষ্ণের ঈশ্বর-প্রেম ভক্ত-মুখদর্পণে মুকুরিত হইতেছিল। আশ্চর্য্য! আনন্দ কেবল ভক্ত-মুখদর্পণে কেন—বাহিরের উদ্ভানে, বৃক্ষে, নানাবিধ বে কুতুম ফুটিয়া রহিয়াছে তন্মধ্যে—বিশাল ভাগীরথী বক্ষে, রবিকর-প্রদীপ্ত নীল নভোমণ্ডলে, মুরারি চরণচ্যুত গঙ্গাবারি-কণবাহী শীতল সমীরণ মধ্যে—এই আনন্দ প্রতিভাসিত হইতেছিল। কি আশ্চর্য্য! সত্য সত্যই ‘মধুমংগাখিবং রজঃ’—উদ্ভানের ধূলি পর্য্যন্ত মধুময়! ইচ্ছা হয়, গোপনে বা ভক্তসঙ্গে এই ধূলির উপর গড়াগড়ি দিই। ইচ্ছা হয়, উদ্ভানের একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া সমস্ত দিন এই মনোহারী বারি দর্শন করি। ইচ্ছা হয়, এই উদ্ভানের তরুলতা-গুণপত্রপুষ্পশোভিত শিখোজ্জল বৃক্ষগুলিকে আত্মীয়জ্ঞানে সাদর সম্ভাষণ ও প্রেমলিঙ্গন দান করি। এষ্ট ধূলির উপর দিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণ কি পাদ চারণ করেন?—এই বৃক্ষ লতা গুণ্য নস্য দিয়া তিনি কি অহংরহ যাভায়াত করেন? ইচ্ছা করে, জ্যোতির্ময় গগনপানে অনন্তদৃষ্টি হইয়া তাকাইয়া থাকি, কেন না, দেখিতেছি, ভূলোক জ্যলোক সমস্তই প্রেম্যানন্দে ভাসিতেছে। ঠাকুবনাড়ীর পূজারি, দোবারিক, পরিচারক, কেন সকলকে পরমাত্মায় বোণ হইতেছে?—কেন ওহান, বহুদিনান্তে দৃষ্ট জন্মভূমির জায়, মধুর লাগিতেছিল? অকাশ, গঙ্গা, দেবমন্দির, উদ্ভানপথ, বৃক্ষ, লতা, গুণ্য, মেবকগণ, আসনে উপবিষ্ট ভক্ত-গণ, সকলে যেন এক জিনিসের তৈয়ারী বোধ হইতেছে। যে জিনিসের তৈয়ারী শ্রীরামকৃষ্ণ, এঁরাও বোধ হইতেছে, সেই জিনিসের হইবেন। যেন একটী মোমের বাগান, গাছপালা ফলপাতা, বাগানের পথ, বাগানের মালী, বাগানের নিবাসিগণ, বা বাগান-মধ্যস্থিত গৃহ—সমস্তই মোমের। এ ধানকার সমস্ত যেন আনন্দ দিয়ে গড়া।

শ্রীমনোমোহন, শ্রীযুক্ত মহিমাচরণ বা মাকীর উপস্থিত ছিলেন। ক্রমে ঈশান, হৃদয় ও হাজরা। এঁরা ছাড়া অনেক ভক্তেরা ছিলেন। বলরাম, রাখাল এঁরা শুধন শ্রীবৃন্দাবনধামে। এই সময়ে নূতন ভক্তেরা আসেন যান—নারায়ণ, শর্টু, ছোট নরেন, তেজচন্দ্র, বিনোদ, হরিপদ। বাবুরাম আসিয়া মাঝে মাঝে থাকেন। রাম, সুরেশ, কেদার দেবেন্দ্রাদি ভক্তগণ প্রায় আসেন—কেহ কেহ সপ্তাহান্তে, কেহ দুই সপ্তাহের পর। লাটু থাকেন। বোগীনের বাড়ী

নিকট ; তিনি প্রায় প্রত্যহ ব্যতীত করেন । নরেন্দ্র মাঝে মাঝে আসেন, এলেই আনন্দের হাট । নরেন্দ্র তাঁহার সেই দেবছল্লভ কর্তে ভগবানের নাম ও গুণ গান করিতেন, অখনি ঠাকুরের নানাবিধ ভাব সমাধি হইত । একটী যেন উৎসব পড়িয়া যাইত । ভাঙ্গি ইচ্ছা, ছেলেদের মধ্যে কেহ তাঁর কাছে সাতদিন থাকেন, কেননা, তারা সংসারে বিবাহাদি হুত্রে বা বিষয়-কর্মে আবদ্ধ হয় নাই । বাবুরামকে থাকিতে বলেন, তিনি মাঝে মাঝে থাকেন । ত্রিগুণ অধর সেন প্রায় আসেন ।

[THE DIFFERENTIATED]

ঘরের মধ্যে ভক্তেরা বসিয়া আছেন । ঠাকুর রামকৃষ্ণ বাগকের জায় দাঁড়িয়ে কি জ্ঞানছেন । ভক্তেরা চেয়ে আছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মনোমোহনের প্রতি) সব রাম দেখছি । তোমরা সব বসে আছ, দেখছি রামই সব এক একটা হয়েছেন ।

মনোমোহন । রামই সব হয়েছেন ; তবে আপনি যেমন বলেন—“আপো-নারায়ণ”, কিন্তু কোন জল খাওয়া যায়, কোন জলে মুখ ধোয়া চলে, কোন জলে বাসন মাজা—

শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ ; কিন্তু দেখছি তিনিই সব । জীব জগৎ তিনিই হয়েছেন । এই কথা বলিতে বলিতে ছোট খাট্টীতে বসিলেন ।

[সত্য কথা]

শ্রীরামকৃষ্ণ । (মহিমাচরণের প্রতি) হাঁগা, সত্য কথা কইতে হবে বলে কি—আমার শুচিবাই হলো নাকি ! যদি হঠাৎ বলে ফেলি খাবনা, তবে খিদে পেলোও আর খাবার যো নাই । যদি বলি, অমুক লোক ষাউতলায় আমার গাড়ু নিয়ে যাবে, তারেই নিয়ে যেতে হবে ; আর কেউ নিয়ে গেলে তাকে আবার ফিরে যেতে বলতে হবে । একি হণো বাপু ! এর কি কোন উল্লাস নাই ?

[সঞ্চয় ও সন্ন্যাসী]

“আবার সঞ্চে করে কিছু আনবার যো নাই । পান, খাবার, কোনও জিনিস সঞ্চে করে আনবার যো নাই । তা হলে সঞ্চয় হলো কি না । হাতে মাটী নিয়ে আসবার যো নাই !

এই সময়ে একটী লোক আদিয়া বলিল, মহাশয় জদয়ৎ বহু মল্লিকের

বাগানে এসেছে, ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে আছে, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । (ভক্তদের প্রতি) হৃদের সঙ্গে একবার দেখা করে আসি । তোমরা বোসো ।

এই বলে বাণীস করা চটা জুতাটা প'রে তিনি পূর্বদিকের ফটক-অভিমুখে চলিলেন । সঙ্গে কেবল মাষ্টার ।

লাল সুরকীর উত্তানপথ । সেই পথে ঠাকুর পূর্বদিক হইয়া যাইতেছেন । পথে খাজাখী দাঁড়িয়েছিলেন, ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন । দক্ষিণে উঠানের ফটক রহিল, সেখানে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট দৌবারিকগণ বসিয়াছিল । বামে কুঠী । তৎপরে পথের দুই দিকে কুসুমবৃক্ষ—অদূরে পথের ঠিক দক্ষিণ দিকে গাজীতলা ও না কালীর পুকুরী সোপানাবলীশোভিত ঘাট । ক্রমে—পূর্বদ্বার, বামদিকে দ্বারবানদের ঘর, ও দক্ষিণে তুলসী-মঞ্চ । উঠানের বাহিরে আসিয়া দেখেন, বহুমলিকের বাগানের ফটকের কাছে হৃদয় দণ্ডায়মান ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

[সেবক সন্নিকটে]

হৃদয় কৃতান্তগিপুটে দণ্ডায়মান । দর্শনমাত্র রাজপথের উপর দণ্ডের দ্বার নিপতিত হইলেন । ঠাকুর উঠিতে বলিলেন, হৃদয় আবার হাতজোড় করিয়া বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন ।

কি অশ্রুচর্যা ! ঠাকুর রামকৃষ্ণও কাঁদিতোছেন । চক্ষের কোণে কয়েক ফোঁটা জল দেখা দিল । তিনি অশ্রুবারি হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিলেন—যেন চক্ষে জল পড়ে নাই । যে হৃদয় তাঁকে কত যন্ত্রণা দিয়াছিল, তার জন্ত ছুটে এসেছেন । আর কাঁদছেন !

শ্রীরামকৃষ্ণ । এখন যে এলি ?

হৃদয় । (কাঁদিতে কাঁদিতে) তোমার সঙ্গে দেখা করিতে এলাম । আমার হুঃখ আর কার কাছে বলবো ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । (সংস্কার সহাস্যে) সংসারে এইরূপ হুঃখ আছে । সংসার

■ হৃদয় মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে ঠাকুরের ভাগিনের । ঠাকুরের জন্মভূমি ৮ কামারপুকুরের নিকট সিওড়ে বাড়ী । প্রায় পঞ্চাব্দি বংসর ঠাকুরের কাছে থাকিয়া দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে মা কালীর পূজা ও ঠাকুরের সেবা করিয়াছিলেন । তিনি বাগানের কর্তৃপক্ষীয়দের অনন্তোদযভাজন হওয়াতে, তাহার বাগানে প্রবেশ করিবার হুকুম ছিল না ।

করতে গেলেই হুথ হুথ আছে। (মাষ্টারকে দেখাইয়া) এঁরা এক একবার তই আসেন। এসে দীক্ষারী কথা ছুটে শুনলে মনে শান্তি হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তোর কিসের হুথ ?

হৃদয় । (কাঁদিতে কাঁদিতে) আপনার সঙ্গ ছাড়া, তাই হুথ ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । তুইতো বলেছিলি, ‘তোমার ভাব তোমাতে থাক্, আমার ভাব আমারে থাক্ !’

হৃদয় । হাঁ, তাতো বলেছিলাম—আমি কি জানি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । আজ এখন আর, আর একদিন তখন বসে কথা হকো। আজ রববার অনেক লোক এসেছে, তারা বসে রয়েছে। এবার দেশে ধান-টান কেমন হয়েছে ?

হৃদয় । হাঁ, তা এক রকম মন্দ হয় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আজ তবে আর, আবার একদিন আসিস্।

হৃদয় আবার মাষ্টার হইয়া প্রণাম করিল। ঠাকুর সেই পথ দিয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন। সঙ্গে মাষ্টার।

শ্রীরামকৃষ্ণ । (মাষ্টারের প্রতি) আমার সেবাও বত করেছে, যন্ত্রণাও তেমনি দিয়েছে। আমি যখন পেটের ব্যারামে ছুখানা হাড় হয়ে গেছি—কিছু খেতে পাত্তম না, তখন আপনি সেই সব জিনিস খেতে খেতে আমার বলে, “এই দেখ, আমি কেমন ধাই; তোমার মনের গুণে খেতে পাও না।” আপনার বলতো, “বোকা—আমি না থাকলে তোমার সাধুগিরি বেরিয়ে যেতো!” এক দিন এ রকম করে এত যন্ত্রণা দিলে, যে পোস্তার উপর দাঁড়িয়ে জোয়ারের জলে দেহত্যাগ করতে গিয়েছিলাম।

মাষ্টার শুনিয়া অবাক হইয়া রহিলেন। বোধ হয় ভাবিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য ! এমন লোকের জন্ত ইনি অশ্রুবাণি বিমর্জ্জন করিতেছিলেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । (মাষ্টারের প্রতি) “আচ্ছা অত সেবা কর্তো, তবে কেন ওর এমন হলো ? ছেলেকে যেমন মানুষ করে, সেই রকম আমাকে দেখেছে। আমি তো রাত দিন বেহঁস হয়ে থাকতুম, তার উপর আবার অনেক দিন ধরে ব্যাগোয় ভুগেছি। ও, যে রকম করে আমার রাখতো, সেই রকমই আমি থাকতুম।”

মাষ্টার কি বলিবেন, চুপ করিয়া রহিলেন। হয়ত ভাবিতেছিলেন যে, হৃদয় বুঝি নিজাম হইয়া ঠাকুরের সেবা করেন নাই।

কথা কহিতে কহিতে ঠাকুর নিজের ঘরে আসিয়া পঁহছিলেন। ভক্তেরা প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ঠাকুর আবার ছোট খাটটিতে উগবিষ্ট হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

ভক্তসঙ্গে—ঈশ্বরলাভোপায় তত্ত্ববিচারে ।

[ভাব, মহাভাবের গূঢ়তত্ত্ব]

শ্রীযুক্ত মহিমাচরণ ইত্যাদি ছাড়া কয়েকটী কোন্নগরের ভক্ত এসেছিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন ঠাকুর রামকৃষ্ণের সঙ্গে কিস্তকাল বিচার করেছিলেন। কোন্নগরের ভক্ত—(শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। মহাশয়! শুন্লাম যে, আপনার ভাব হয়, সমাধি হয়। কেন হয় আর কিরূপ হয়, আমাদের বুঝিয়ে দিন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীমতীর মহাভাব হতো, সমীরা কেব ছুঁতে গেলে সখা বলতো, ‘কৃষ্ণবিলাসের অঙ্গ ছুঁনি এঁর দেহমধ্যে এখন কৃষ্ণ বিলাস করছেন।’

‘ঈশ্বর অনুভব না হলে ভাব বা মহাভাব হয় না, গভীর জল থেকে মাছ এলে জলটা নড়ে—তেনন মাছ হলে জলটা তোলপাড় করে। তাই ভাবে ‘হাঁসে, কাঁদে, নাচে গায়।’

“অনেকক্ষণ ভাবে থাকা যায় না। আয়নার কাছে বসে কেবল মুখ দেখলে লোকে পাগল মনে করবে।”

কোন্নগরের ভক্ত। শুনেছি, মহাশয় ঈশ্বর দর্শন করে থাকেন; তাহলে আমাদের দেখিয়ে দিন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সবই ঈশ্বরাধীন—মাগুমে কি করবে? তাঁর নাম করতে করতে কখন ধরা পড়ে, কখন পড়ে না। তাঁর ধ্যান করতে করতে এক একদিন বেশ উদ্দীপন হয়—আবার একদিন কিছুই হলো না।

[কৰ্ম্মযোগ ও ঈশ্বর দর্শন]

শ্রীরামকৃষ্ণ। “কৰ্ম্ম চাই। তবে দর্শন হয়, একদিন ভাবে।” র-পুকুর * দেখলুম। দেখি একজন ছোটলোক পান-জল ঠেলে জল নিচে, আর জল হাতে তুলে এক একবার দেখছে। যেন দেখালে, পান না ঠেলে জল দেখা যায় না

* হুগলি জেলার অন্তঃপাতী কামারপুকুর গ্রামে ঠাকুর রামকৃষ্ণের বাড়ী। তাহার লক্ষ্যে হালদায় পুকুর—একটা দিঘী বিশেষ ৷

—কর্ম না করলে ভক্তি লাভ হয় না, ঈশ্বর দর্শন হয় না । শ্যাম জপ এই সব কর্ম, তাঁর নামগুণ কীর্তনও কর্ম । দান যন্ত্র এই সবও কর্ম ।

“মাথাম যদি চাও, তবে দুধকে দই পাতে হয় । তার পর নির্জনে রাখতে হয় । তার পর দই বসলে পরিশ্রম করে মছন করতে হয় । তবে মাখন তোলা হয় ।

মহিমাচরণ । আজ্ঞা হাঁ । কর্ম চাই বই কি ! অনেক খাটতে হয়, তবে ভাগ হয় । পড়তেই—কত হয় ! অনন্ত শাস্ত্র !

[আগে বিদ্যা (জ্ঞানবিচার) না আগে ঈশ্বরলাভ ?]

শ্রীরামকৃষ্ণ । (মহিমার প্রতি) শাস্ত্র কত পড়বে ? শুধু বিচার করলে কি হবে ? আগে তাঁকে লাভ কবার চেষ্টা করা । গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে, কিছু কর্ম কর । গুরু না থাকেন, তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর, তিনি কেমন—তিনিই জানিয়ে দেবেন ।

“বই পড়ে কি জানবে ? যতক্ষণ না হাতে পঁহুঁছন যায়, ততক্ষণ দূর হ’তে কেবল গো হো শব্দ । হাতে পঁহুঁছিলে আর এতরকম । স্পষ্ট দেখতে পান, শুভে পাবে । ‘আলু নাও’ ‘পয়সা দাও’ স্পষ্ট শুভে পাবে ।

“সূত্র দূর হ’তে হো হো শব্দ করছে । কাছে গেলে কত জাহাজ যাচ্ছে, পাখী উড়ছে, ঢেউ হলে দেখতে পাবে ।

“বই পড়ে ঠিক অনুভব হয় না । অনেক তর্কান্বিত । তাঁকে দর্শনের পদ—বই, শাস্ত্র, সায়েন্স (science) সব খড কুটে বোধ হয় ।

“বড় বাবুর সঙ্গে আলাপ দরকার । তাঁর ক’খানা বাড়ী, ক’টা বাগান, কত কোম্পানির কাগজ, এ—আগে জানবার জ্ঞান অত বাস্তব কেন ? চাকরদের কাছে গেলে তারা দাঁড়াতেই দেয় না—কোম্পানির কাগজের খবর কি দেবে !

“কিন্তু যো সো করে বড় বাবুর সঙ্গে একবার আলাপ কর, তা থাকি খেগেই হোক, আর বেড়া ডিসিগেই হোক,—তখন কত বাড়ী, কত বাগান, কত কোম্পানির কাগজ, তিনিই বলে দেবেন । বাবুর সঙ্গে আলাপ হলে আবার চাকর, দাঁড়ান সব সেলাম করবে । (সকলের হাস্য) ।

[কর্মযোগ ও ঈশ্বরলাভ]

একজন ভক্ত । এখন বড় বাবুর ~~কি~~ আলাপ কিসে হয় ? (সকলের হাস্য) ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাই কর্ম চাই। ঈশ্বর আছেন বলে বসে থাকলে হবে না। যো সো ধরে তাঁর কাছে যেতে হবে। নির্জনে তাঁকে ডাকো, প্রার্থনা কর, ‘দেখা দাও’ বলে ব্যাকুল হয়ে কাদো। কামিনী-কাঞ্চনের জন্ত পাগল হয়ে বেড়াতে পার, তবে তাঁর জন্ত একটু পাগল হও। লোকে বলুক, যে ঈশ্বরের জন্ত অমুক পাগল হয়ে গেছে। দিন কতক না হয় সব ভাগ করে তাঁকে একলা ডাকো।

“গুধু ‘তিনি আছেন’ বলে বসে থাকলে কি হবে? হালধার পুকুরে বড় মাছ আছে। পুকুরের পাড়ে গুধু বসে থাকলে কি মাছ পাওয়া যায়? চারো করো, চার ফেলে। ক্রমে গভীর জল থেকে মাছ আসবে, আর জল নড়বে। তখন আনন্দ হবে। হয় তো মাছটার খানিকটা একবার দেখা গেল মাছটা ধপালু করে উঠলো। যখন দেখা গেল, তখন আবার আনন্দ।

“ছধকে দই পেতে মহন করলে তবে তো মাখম পাবে।

(মহিম চরণের প্রতি) এ—তো ভাল বালাই হলো। ঈশ্বরকে দেখিয়ে দাও, আর উনি চুপ করে বসে থাকবেন। মাখম ভুলে মুখের কাছে ধর! (সকলের হাস্য)।

“ভাল বালাই—মাছ ধ’রে হাতে দাও।

“এক জন রাজাকে দেখতে চায়। রাজা আছেন সাত দেউড়ীর পরে। প্রথম দেউড়া পার না হতে হতে বসে, ‘রাজা কই?’ যেমন আছে, এক একটা দেউড়া তো পার হতে হবে!

(ঈশ্বরলাভের উপায়—ব্যাকুলতা)

মহিমচরণ। কি কর্ণের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যেতে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। এই কর্ণের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যাবে, আরও কর্ণের দ্বারা পাওয়া যাবে না, তা নয়। তাঁর কৃপার উপর সব নির্ভর। তবে ব্যাকুল হয়ে কিছু কর্ম করে যেতে হয়। ব্যাকুলতা থাকলে হয়ে যায়। ব্যাকুলতা থাকলে তাঁর কৃপা হয়।

“একটা সুযোগ হওয়া চাই। সাধুসঙ্গ, বিবেক, সদগুরু লাভ। হয় তো একজন বড় ভাই সংসারের ভার নিলে; হয় তো স্ত্রীটা ত্যাগ করি, বড় ধার্মিক। কি বিবাহ আদর্শেই হ’ল না, সংসারে বদ্ধ হতে হ’ল না—এই এই সব যোগ্য যোগ হলে হয়ে যায়।

“একজনেয় :বাড়ীতে তারি অস্থখ—যায় যায়। কেউ বলে, অমুক নক্ষত্রে বৃষ্টি পড়বে, সেই বৃষ্টির জল মড়ার মাথার খুলিতে থাকবে, আর একটা সাপ ব্যাঙকে তেড়ে যাবে, ব্যাঙকে ছোবল মারার সময় ব্যাঙটা যেই লাফ দিয়া পাগানে, অমনি সেই সাপের বিষ মড়ার মাথার খুলিতে পড়ে যাবে ; সেই বিষের ঔষধ তৈয়ার করে যদি খাওয়াতে পাব, তবে বাঁচে। এখন যার বাড়ীতে অস্থখ, সেই লোক দিন ফণ নক্ষত্র দেখে বাড়ী থেকে বেরুলো, আর ব্যাকুল হয়ে ঐ সব খুঁজতে লাগল। মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকছে, ‘ঠাকুর! তুমি যদি জোট্ পাট্ করে দাও তবেই হয়।’ এইরূপে যেতে যেতে সত্য সত্যই দেখতে পেল, একটা মড়ার মাথার খুলি পড়ে রয়েছে। দেখতে দেখতে এক পসলা বৃষ্টি হল। তখন সে ব্যক্তি বলতে হে গুরুদেব! মড়ার মাথার খুলিও পেলুম, আবার সেই নক্ষত্রেও বৃষ্টিও হলো। সেই বৃষ্টির জলও ঐ খুলিতে পড়েছে, এখন কৃপা করে আর কয়টার যোগাযোগ করে দাও? ব্যাকুল হয়ে ভাবছে এমন সময়ে দেখে, একটা বিষধর সর্প। তখন সে লোকটার তারি আহ্লাদ হলো ; আর এতো ব্যাকুল হলো যে, বুক ছুড় ছুড় করতে লাগলো ; আর সে বলতে লাগলো, ‘হে গুরুদেব! এবা সাপও এসেছে, অনেকগুলির যোগাযোগও হল।’ কৃপা করে এখন আর গুলি বাকী আছে, সে গুলি করিয়ে দাও! বলতে বলতে ব্যাঙ এলো, সাপ সাপ ব্যাঙ ভাড়া করে যেতে লাগলো, মড়ার মাথার খুলির কাছে এসে যাই ছোবল দিতে যাবে, অমনি ব্যাঙটা লাফিয়ে ওদিকে গিয়ে পড়লো, আর বিষ অমনি খুলির ভিতর পড়ে গেল। তখন লোকটা হাত তালি দিয়ে নাচতে লাগলো।

“তাই বলাই, ব্যাকুলতা থাকলে সব হয়ে যায়।”

[ঈশ্বরলাভ ও ত্যাগ ; ঠিক সন্ন্যাসী কে?]

শ্রীরামকৃষ্ণ । মন থেকে সব ত্যাগ না হলে ঈশ্বরলাভ হয় না। যে লোক সাধু, সে সঞ্চয় করতে পারে না। সঞ্চয় “না করে পঙ্কী আউর দরবেশ।” পার্থী আর সাধু সঞ্চয় করে না।

“এখানকার ভাব—হাতে মাটি দেবার জন্ত মাটি নিয়ে যেতে পারে না। বেটুরাটা করে পান আনবার যো নাই। হৃদে যখন বড় যন্ত্রণা দিচ্ছে, তখন এখান থেকে কাশী চলে যাব মংলব হল। ভাবলুম, ‘কাপড় লব কিন্তু টাকা কেমন করে লব?’ আর কাশী যাওয়া হল না।

যাহা কিছু দেখিতে, ভাবিতে শুনিতে বা কল্পিতে পারি । যাহা কিছু আমাদের জ্ঞানের সীমার মধ্যে, তাহাই এইরূপেই চলিতেছে—ঠিক যেমন মনুষ্যদেহে নিশ্বাস প্রশ্বাস । সমুদয় সৃষ্টিই, স্রুতরাং, এইরূপে চলিয়াছে, একটী তরঙ্গ উঠিতেছে, একটী পড়িতেছে, আবার উঠিয়া আবার পড়িতেছে । প্রত্যেক তরঙ্গেরই সঙ্গে সঙ্গে একটা করিয়া অবনতি, প্রত্যেক অবনতির সঙ্গে সঙ্গে একটা করিয়া তরঙ্গ । সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডেই, উহার মতপ্রণালীকল্পিত হেতু একই নিয়ম ঘটিবে । অতএব আমরা দেখিতেছি যে, সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডেই যেন উহার কারণে লয় ; সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা, পৃথিবী, মন, শরীর, যাহা কিছু এই ব্রহ্মাণ্ডে আছে, সকলেই উহাদের স্বয়ং কারণে লয়, তিরোভাব, আপাত দৃষ্টিতে যেন নাশ । বাস্তবিক কিন্তু উহার উহাদের কারণে স্বরূপে থাকিবে । উহাতে আবার তাহার বাহিরিবে, আবার পৃথিবী, চন্দ্র সূর্য্য তারা প্রসবিবে ।

এই উপান পতন সম্বন্ধে আর একটা বিষয় জানিবার আছে । বীজ বৃক্ষ হইতে ইসে । উহা অন্ননি তৎকালং বৃক্ষ ইয় না । উহার কতকটা বিশ্রামের বা অতি অবাক্ত কার্যের সময়ের আবশ্যক । বীজকে খানিকক্ষণ মাটিতে নীচে থাকিয়া দি করিতে হয় । উহাকে আপনাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কেপিতে হয়, যেন আপনাকে খানিকটা অবনত করিতে হয়, আর ঐ অবনতি হইতে উহার পুনরুন্নতি ঘা থাকে । অতএব এই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডকেই কিছু সময় অদৃশ্য অবাক্তভাবে একপে কাণ্য করিতে হয়, যাহাকে প্রলয় বা সৃষ্টির পূর্বাঙ্গতা বলে, তাহার পর আবার পুনঃসৃষ্টি হয় । এই ভগবৎপ্রবাহের একটা প্রকাশকে—অর্থাৎ স্বাক্তভাবে পরিণতি, কিছুকাল তদবস্থায় অবস্থান, আবার পুনরাবির্ভাব—ইহা বৈ কল্প বলে । সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডই এইরূপে করে করে চলিয়াছে—প্রকাণ্ডতম ব্রহ্মাণ্ড হইতে উহার অন্তর্কর্ত্তী প্রত্যেক পরমাণু পর্য্যন্ত । সব জিনিষই এই তরঙ্গাকারে চলিয়াছে । এক্ষণে আবার এটী গুরুতর প্রশ্ন আসিল—বিশেষতঃ বর্ত্তমান কালের পক্ষে । আমরা দেখিতেছি, স্বাক্তরূপে গুলি ধীরে ধীরে ব্যক্ত হইতেছে, ক্রমশঃ সূত্রাং সূত্রতর হইতেছে । আমরা দেখিয়াছি যে, কারণ ও কার্য্য অভেদ—কার্য্য কেবল কারণের রূপান্তরমাত্র । অতএব এই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড শূন্য হইতে প্রসূত হইতে পারে না । কিছুই কারণ ব্যতীত আসিতে পারে না, শুধু তাহাই নহে, কারণটী কার্য্য স্বাক্তরূপে বর্ত্তমান ।

তবে এই ব্রহ্মাণ্ড কোন বস্তু হইতে প্রসূত হইয়াছে ? পূর্ব্ববর্ত্তী স্বাক্ত ব্রহ্মাণ্ড হইতে । মানুষ কোন বস্তু হইতে প্রসূত ? পূর্ব্ববর্ত্তী স্বাক্তরূপ হইতে ।

জানিয়ে।

বৃক্ষ কাহা হইতে হইল ? বীজ হইতে। বৃক্ষটী সমুদয়, বাজে বর্তমান ছিল। উহা ব্যক্ত হয় মাত্র। অতএব এই জগদ্বৃক্ষাণ্ড এই জগতেরই স্বরূপবস্থা হইতে প্রসূত হইয়াছে। এক্ষণে উহা ব্যক্ত হইয়াছে মাত্র। উহা পুনশ্চ ঐ স্বরূপে যাইবে, আবার ব্যক্ত হইবে। এক্ষণে আমরা দেখিলাম, স্বরূপকণ্ডী ব্যক্ত হইয়া স্থলাং স্থলতর হয়, যতদিন না উহার উহাদেব চরমসীমায় পৌঁছে; চরমে পৌঁছিলে, তাহার আবার পাণটিয়া স্থাং স্বরূপতর হয়। স্বরূপ হইতে ক্রমশঃ স্থল হইতে স্থলতররূপে পরিণতি, কেবল যেন উহাদের অংশগুলির অবস্থান পরিবর্তন, তাহাকেই বর্তমান কালে ‘ক্রমবিকাশ’ বাদ বলে। ইহা অতি সত্য, সম্পূর্ণরূপে সত্য; আমরা আমাদের জীবনে উহা দেখিতেছি; বিচারবশতঃ বান্ধিও এই ‘ক্রমবিকাশ’ বাদীদের সহিত বিবাদের সম্ভাবনা নাই। আমাদেরিগকে আরো একটি বিষয় জানিতে হইবে—তাহা এই যে, প্রাচীন ক্রমবিকাশ, একটি ক্রমসঙ্কোচের দ্বারা পূরবর্তিত। বীজ বৃক্ষের জনক বস্তু অপর এক বৃক্ষটী আবার ঐ বীজের জনক। বীজই সেই স্বরূপ, হইতে বৃহৎ বৃক্ষটী আসিয়াছে, আবার আর একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষ ঐ বীজ ক্রমসঙ্কুচিত হইয়াছে। সমুদয় বৃক্ষটীই ঐ বীজে বর্তমান। শূন্য হইতে বৃক্ষ জন্মিতে পারে না, কিন্তু আমরা দেখিতেছি, বৃক্ষ বীজ হইতে আর কতকগুলি বীজ কতকগুলি বৃক্ষই জন্মায়, অপর বৃক্ষ নহে। ইহা দেখাইতেছে যে, সেই বৃক্ষের কারণ ঐ বীজ—কেবল সেই বীজমাত্র; আর ঐ বীজে সমুদয় বৃক্ষটীই রহিয়াছে। সমুদয় বৃক্ষাণ্ড ঐ এক জীবাত্মা ভিতরে, উহা আবার ধীরে ধীরে ব্যক্ত হয়। সমুদয় বৃক্ষাণ্ড—স্বরূপ বৃক্ষাণ্ডে রহিয়াছে সর্ব কারণে, উহার স্বরূপে রহিয়াছে। অতএব ‘ক্রমবিকাশ’ বাদ,—স্থলাং স্থলতররূপে ক্রমবিকাশ—এই মত অতি সত্য। উহা সম্পূর্ণরূপেই সত্য; তবে প্রত্যেক ঘটনাটীই একটি ক্রমসঙ্কোচের দ্বারা পূরবর্তিত। অতএব যে ক্ষুদ্র অণুটী পরে মহাপুরুষ হইল, তিনি সেই ক্রমসঙ্কুচিত মহাপুরুষই ছিলেন, তিনি আবার মহাপুরুষরূপে ক্রমবিকাশ প্রাপ্ত হইবেন। যদি ইহাই সত্য হয়, তবে আমাদের ক্রমবিকাশবাদীদের সহিত কোন বিবাদ নাই, কারণ আমরা ক্রমশঃ দেখিব, যদি তাঁহারা এই ক্রমসঙ্কোচ প্রক্রিয়াটির স্বীকার করেন, তবে তাঁহারা ধর্মের বিনাশকর্তা না হইয়া উহার প্রাণ সহায় হইবেন।

এতদূর আমরা দেখিলাম, শূন্য হইতে কিছুই উৎপত্তি হইল, এই হিসাবে সৃষ্টি হইতেই পারে না। সকল জিনিষই অনন্তকাল ধরিয়া রহিয়াছে এবং

অনন্ত কাল ধরিয়া থাকিবে। কেবল ক্রমবর্তী তরঙ্গ ও অবনতি ক্রমে উহাদের গতি হয়। সুসভাবে একবার গতি, আবার ভুলভাবে আগমন। সমুদয় প্রকৃতিতেই এই ক্রমসঙ্কোচ ও ক্রমবিবাহ প্রক্রিয়া চলিতেছে। সুতরাং সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশের পূর্বে অনন্তই ক্রমসঙ্কুচিত হইয়াছিল, আবার উহা এই সকল বিভিন্নরূপে আপনাকে ব্যক্ত করিবে—আবার আর এবার ক্রমসঙ্কুচিত হইবার জ্ঞাত। উদাহরণ স্বরূপ একটা ক্ষুদ্র উদ্ভিদের জীবন ধর। আমরা দেখিতেছি, দুইটা জিনিষ ঐ উদ্ভিদ রূপেই একত্রে প্রদান করিতেছে, উহার উৎপত্তি ■ বিকাশ আর উহার ক্ষয় ও বিনাশ। এই দুইটা মিলিয়াই একটা একত্রে বিধান করিতেছে—উদ্ভিদ জীবন। অতএব ঐ উদ্ভিদ জীবনকে প্রাণ শৃঙ্খলের একটা অংশমাত্র ধরি। আমরা সমুদয় বস্তুরাশিকেই এক প্রাণ বলিয়া ধরিতে পাবি— জীবগু হইতে উহার আরম্ভ এক পূর্ণমানবে উহার সমাপ্তি। মানুষ ঐ শৃঙ্খলের একটা অংশ; আর যেনন ক্রমবিকাশবাদীরা বলেন, নানাকপ বানর তার পর আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী এবং উদ্ভিদগণ অল্প শৃঙ্খলাংশ। এক্ষণে যে ক্ষুদ্রতম খণ্ড হইতে আমরা আরম্ভ করিয়াছিলাম, তথা হইতে এই সমুদয়কে এক প্রাণ বলিয়া ধর; আর আমরা এই মাত্র যে নিয়ম পাইলাম, তাহা প্রয়োগ করিয়া দেখি যে, প্রত্যেক ক্রম বিকাশই পূর্ববর্তী কিছু ক্রমসঙ্কোচ আর অতি নিয়তম জন্ত হইতে সর্বোচ্চ পূর্ণতম মানুষ পর্যন্ত সমুদয় শ্রেণীই অবশ্যই অপর কিছু ক্রমসঙ্কোচ হইবে। কিসে ক্রমসঙ্কোচভাব? ইহাই প্রশ্ন। কোন্ পদার্থ ক্রমসঙ্কুচিত হইয়াছিল? ক্রমবিকাশবাদী তোমাদিগকে বলিবেন, তোমার ঈশ্বর-ধারণা ভুল। কারণ, তোমরা বল, চৈতন্যই জগতের স্রষ্টা, কিন্তু আমরা প্রতিদিন দেখিতেছি যে, চৈতন্য অনেক পরে আসে। মানুষ ও উচ্চতর জন্তুতেই কেবল আমরা চৈতন্য দেখিতে পাই, কিন্তু এই চৈতন্য জন্মিবার পূর্বে এই জগতে লক্ষ লক্ষ বর্ষ অতীত হইয়াছে। ভয় পাইও না, তোমার নিজ মত খাটো। বৃক্ষ বীজ হইতে আসে, আবার বীজে ষায়—আরম্ভ ও পরিণাম সমান। পৃথিবী তাহার কারণ হইতে আসে আবার কারণে ষায়। এই সমুদয় শৃঙ্খলের শেষ কি? আমরা জানি, আরম্ভ জানিতে পারিলে আমরা পরিণামও জানিতে পারিব। এইরূপ, অন্ত জানিতে পারিলেও আদি জানিতে পারিব। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে এই সমুদয় ‘ক্রমবিকাশ’বাদ-সঙ্গত শ্রেণী লও, উহার এক প্রান্তে জীবগু, অপর প্রান্তে পূর্ণ মানব। এই সমুদয় শ্রেণীটা এক প্রাণস্বরূপ। অস্তে পূর্ণ মানবকে দেখিতেছি, সুতরাং আদিতেও ১লা আষাঢ়, ১৩০৮।] উদ্বোধন।

ঐ হইবে। অতএব ঐ জীবাণু অবশ্যই উচ্চতম চৈতন্তের ক্রমসঙ্কুচিত অবস্থা। তোমরা ইহা দেখিতে না পার, কিন্তু সেই ক্রমসঙ্কুচিত চৈতন্তই আপনাকে ব্যক্ত করিতেছে, যতদিন না উহা সম্পূর্ণতম মানবরূপে প্রকাশিত হয়। ইহা সম্পূর্ণরূপে গণিতমতে প্রমাণ করা যাইতে পারে। যদি শক্তির অবিনশ্বরত্বের নিয়ম (Law of Conservation of Energy) সত্য হয়, তবে তুমি কোন যন্ত্র হইতে কিছু পাইতে পার না, যদি তুমি পূর্বে উহাতে তাহা না দিয়া থাক। এতদিন হইতে তুমি যতটুকু কার্য্য পাও, তাহা তুমি উহাতে জল করণারূপে যাহা দিয়াছিলে, ঠিক ততটুকু—এক চুল বেশীও নয় কমও নয়। আমি এক্ষণে যে কার্য্য করিতেছি, তাহা আমি আনন্দ ভিতরে বায়ু, ঋতু ও অজ্ঞাত পদার্থ-রূপে যাহা দিয়াছি, ঠিক ততটুকু। কেবল সেগুলি আর একরূপে পরিণত এই মাত্র। এই বিশ্বপ্রকৃতিতে এক বিন্দু জড় বা এতটুকুও শক্তি বাড়াইতে অথবা কমাইতে পারা যায় না। যদি তাই হয়, তবে এই চৈতন্ত কি? যদি উহা জীবাণুতে বর্তমান না থাকে, তবে উহা অশক্তি আশ্রিত বলিতে হইবে—অন্য (কিছু না), হইতে সত্তের (কিছু) উৎপত্তি হইল—বাহ্যী অসম্ভব। তাহা হইলে ইহা একবারে নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, যেমন অল্প অল্প বিষয়ে দেখি, যেখানে আরম্ভ, সেখানেই শেষ, তবে কখন অন্ত্য, কখন বা ব্যক্ত। এই শৃঙ্খলার এক প্রাপ্ত পূর্ণমানব মুক্তপুরুষ, দেবমানব, যিনি প্রকৃতির নিয়মেব বাহিরে গিয়াছেন, যিনি সমুদয় অতিক্রম করিয়াছেন। তাঁহাকে এই জন্মমৃত্যুশ্রবণের ভিতর দিয়া যাইতে হয় না। সেই মানব যাহাকে খ্রীষ্টীয়ানরা খ্রীষ্টমানব বলেন, বৌদ্ধগণ বুদ্ধমানব বলেন, যোগীরা মুক্ত বলেন, সেই পূর্ণমানব এই শৃঙ্খলার এক প্রাপ্ত, আর সেই শরীরের ক্রমসঙ্কুচিত হইয়া এই জীবাণুতেও বর্তমান।

এক্ষণে এই প্রকৃতি সম্বন্ধে কি হইল? এই জগতের শেষ উৎপত্তি কি? চৈতন্ত—তাই নয় কি? জগতে সব শেষে হয় চৈতন্ত। আর যখন ঐ চৈতন্ত ক্রমবিকাশবাদীদের মতে, সৃষ্টির শেষ বস্তু হইল, তাহা হইলে চৈতন্তই আবার সৃষ্টির প্রভু—সৃষ্টির কারণ হইবেন। মানুষের জগৎসম্বন্ধে শেষ কি, ধারণা করিতে পারে? মানুষ এই ধারণা করিতে পারে যে, জগতের এক অংশ অপর অংশের সহিত সম্বন্ধ—জগতের প্রত্যেক বস্তুতেই জ্ঞানের ক্রিয়া প্রকাশ—সেই প্রাচীন ‘অভিপ্রায়বাদী’ (Design theory) আমরা জড়বাদীদের সহিত মানিয়া লইতেছি যে, চৈতন্তই জগতের শেষ বস্তু—সৃষ্টিক্রমের ইহাই শেষবস্তু। বেশ

কথা, কিন্তু মানুষ জন্মবার লক্ষ লক্ষ বর্ষ পূর্বে জ্ঞান ছিল না, অর্থাৎ প্রকাশিত জ্ঞান ছিল না কিন্তু অব্যক্ত চৈতন্য ছিল—আর সৃষ্টিব শেষ চৈতন্য—মানুষ । তবে আদি কি হইল ? আদিও চৈতন্য । আদিতে সেই চৈতন্য ক্রমসঙ্কুচিত হয়, আবার পরিণামে উহাই ক্রমবিকশিত হয় । অতএব এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় জ্ঞানসমষ্টি অবশ্যই সেই ক্রমসঙ্কুচিত সর্বব্যাপী সমষ্টি চৈতন্য । উহা ধীরে ধীরে আপনাকে ব্যক্ত করিতেছে । এই সর্বব্যাপী বিশ্বজনীন চৈতন্যের নাম ঈশ্বর । উহাকে অল্প যে কোন নাম দাও না কেন, উহা হির যে, আদিতে সেই অনন্ত বিশ্বব্যাপী চৈতন্য ছিলেন । সেই বিশ্বজনীন চৈতন্য ক্রমসঙ্কুচিত হইয়া সূক্ষ্ম হইলেন, আবার সেই চৈতন্যই আপনাকে ক্রমশঃ ব্যক্ত করিতেছেন—যতদিন না তিনি পূর্ণ মানব, শ্রীষ্টমানব, বুদ্ধমানবে পরিণত হন । তখন তিনি নিজস্থানে ফিরিয়া আসেন । এই কল্পই সকল শাস্ত্রই বলেন, “আমরা তাঁহাতে জীবিত, তাঁহাতেই থাকিয়া চলিতেছি, তাঁহাতেই আমাদের সত্য ।” এই জগৎই সকলশাস্ত্রই বলেন, আমরা ঈশ্বর হইতে আসিয়াছি এবং তাঁহাতেই ফিরিয়া যাইব । শব্দে ভয় পাইও না, শব্দে যদি ভয় পাইও, তবে তোমরা দার্শনিক হইবার যোগ্য নও । এই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যকেই ব্রহ্মবাদীরা ঈশ্বর বলিয়া থাকেন ।

আমাকে অনেকে অনেক বার জিজ্ঞাসিয়াছেন, আপনি পুরাতন ‘ঈশ্বর’ শব্দটী ব্যবহার করেন কেন ? কারণ, যত কথা বান্ধিত হইতে পারে, তন্মধ্যে ইহাই সর্বোত্তম । তাহার কারণ,—মানুষের সকল আশা ভরসা সকল সূখ ঐ এক শব্দের উপর কেন্দ্রীভূত । এখন ঐ শব্দ পরিবর্তন করা অসম্ভব । যখন বড় বড় সাধু মহাত্মারা ঐকপশব্দ গড়েন, তখন তাঁহারা উহাদের অর্থ খুব ভালরূপেই বুঝিতেন । ক্রমে সমাজে যখন ঐ শব্দগুলি প্রচারিত হইয়া পড়িল, তখন অজ্ঞলোকে ঐ শব্দগুলি ব্যবহার করিতে লাগিল । তাহার ফল এই হইল যে, শব্দগুলির মহিমা হ্রাস হইল । ‘ঈশ্বর’ শব্দটী স্মরণাতীত কাল হইতে আসিয়াছে আর যাহা কিছু মহৎ ও পবিত্র আর এই সর্বব্যাপী চৈতন্যের ভাব, ঐ শব্দের ভিতর রহিয়াছে । কোন নিকোঁধ ঐ শব্দ ব্যবহারে আপত্তি করিলেই কি উহা তাজিতে বল ? আর একজন আসিবে, বলিবে আমার এই শব্দটী লও, অপরে আবার তাহার শব্দ লইতে বলিবে । এরূপ হইলে ■ এইরূপ ব্যঙ্গ শব্দের কিছু অন্ত থাকিবে না । তাই বলি, সেই প্রাচীন শব্দটীই ব্যবহার কর, কিন্তু উহাকে আরো ভালভাবে ব্যবহার কর, মন হইতে কুসংস্কার তাড়া-
[১শা আযাট, ১৮০৮ ।]

ইয়া দাঁও, আর সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি কর, যে, এই মহৎ প্রাচীন শব্দের অর্থ কি ? যদি তোমরা 'ভাবযোগবিধান' (Law of Association of ideas) কাহাকে বলে বুঝ, তবে জানিবে, এই শব্দগুলির সহিত নানাপ্রকার মহৎ মহৎ শক্তির ভাব যুক্ত আছে, লক্ষ লক্ষ মানব উহা ব্যবহার করিয়াছে। লক্ষ লক্ষ লোক ঐ শব্দগুলির পূজা করিয়াছে, আর উহাদের সহিত যাহা কিছু সর্পোচ্চ ও সুন্দরতম, যাহা কিছু যুক্তিযুক্ত, যাহা কিছু প্রেমাস্পদ, মনুষ্যস্বভাবে যাহা কিছু মহৎ ও সুন্দর, তাহাই যোগ করিয়াছে। অতএব এই শব্দগুলি ঐ সমস্ত ভাবের উদ্দীপক কারণস্বরূপ হয়, সুতরাং উহাদিগকে তাগ করিতে পারা যায় না। আমি যদি আপনাদিগকে শুধু এই বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিতাম যে, ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টিয়াছেন, তাহা হইলে উহা কোনরূপ অর্থ প্রকাশ করিত না। তথাপি এই সমুদায় চিন্তাবাদির পর আমরা সেই প্রাচীন পুরুষের নিকটই পৌছি।

তবে আমরা এক্ষণে কি দেখিলাম ? যে জাগতিক শক্তির এই সকল বিকাশ— তাহাদিগকে যে নামই দাঁও না কেন, ভূত বা চিন্তাশক্তি বা শক্তি বা চৈতন্য তাহারা সেই বিখ্যাতী চৈতন্যের প্রকাশ, অথবা আমরা ভবিষ্যতে তাঁহাকে যে রূপ বলিব—পরম প্রভু। যাহা কিছু দেখ, শোন, বা অনুভব কর, সবই তাঁহার সৃষ্টি, ঠিক বলিতে গেলে— তাঁহারই পরিণাম—আরো ঠিক বলিতে গেলে বলিতে হয়, প্রভু স্বয়ং। তিনিই সূর্য ও তারকারূপে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পাইতেছেন, তিনিই জননী ধরনী, তিনিই স্বয়ং সমুদ্র। তিনিই মূহ বৃষ্টিধারারূপে পড়িতেছেন, তিনিই মূহ বাতাস, যাহা আমরা শ্বাস লই, তিনিই শরীরে শক্তিরূপে কার্য্য করিতেছেন। তিনিই বক্তৃতা, তিনিই বক্তা, তিনিই এই শ্রোতৃমণ্ডলী। তিনিই সেই বেদী, যাহার উপর আমি দাঁড়াইয়া ; তিনিই ঐ আলোক, যাহা স্বর্গা আমি তোমাদের মুখ দেখিতেছি। এ সবই তিনি। তিনি জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ, আর তিনিই ক্রমসঙ্কুচিত হইয়া অণু হন, আবার ক্রমবিকশিত হইয়া ঈশ্বর হন। তিনিই অবনত হইয়া অতি নিম্নতম পরমাণু হন আবার ধীরে ধীরে নিজস্বরূপ প্রকাশিয়া নিজেতে যুক্ত হন। ইহাই জগতের রহস্য। তুমিই পুরুষ, তুমিই স্ত্রী, তুমিই যৌবনগর্ভে ভ্রমণশীল যুব, তুমিই বৃদ্ধ—দণ্ড ধরিয়া ভ্রমিতেছ, তুমিই সকল বস্তুতে—হে প্রভু, তুমিই সকল। জগতের এই একমাত্র ব্যাখ্যা, বাহ্যতে মানবের যুক্তি তৃপ্ত। এক কথায় বলিতে গেলে, আমরা

তাহা হইতেই জন্মাই, তাহাতে বাঢ়িয়া থাকি এবং তাহাতেই ফিরাই যাই :

জগৎ ১

সুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ।

মনুষ্যময় স্বভাবতই বাহিরে যাঁতে চায় । মন গেল শরীরের বাহিরে ইন্দ্রিয়প্রণালী দিয়া উঁকি মারিতে চায় । চক্ষু অবশ্যই দেখিবে, কণ অবশ্যই শুনিবে, ইন্দ্রিয়গণ অবশ্যই বহির্জগৎ প্রত্যক্ষ করিবে । তাই স্বভাবতঃই প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্ব মানুষের দৃষ্টি প্রথমেই আকর্ষণ করে । মানবাত্মা প্রথমেই বহির্জগতের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিয়াছিল । আকাশ, নক্ষত্রপুঞ্জ, অন্তবীক্ষস্থ অত্যাশ্চর্য্য পদার্থনিচয়, পৃথিবী, নদী, পক্ষত, সমুদ্র প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল, আর আমরা সকল প্রাচীন দন্ডেই ইহার কিছু কিছু পরিচয় দেখিতে পাই, প্রথমে মানব মন অন্ধকারে হাতড়াইতে হাতড়াইতে, বাহিরের যাহা কিছু তাহাই, ধরিতে চেষ্টা করিয়াছিল । নদীর একজন দেবতা, আকাশের অধিষ্ঠাত্রী আর একজন, মেঘের অধিষ্ঠাত্রী একজন আবার বৃষ্টির অধিষ্ঠাত্রী আর এক জন । যাহাদিগকেই প্রকৃতির শক্তি বশিয়া জানি, তাহারাই সচেতন পদার্থরূপে পরিণত হইল । কিন্তু এই প্রশ্নের যতই গভীর হইতে গভীরতর অনুসন্ধান হইতে লাগিল, ততই এই বাহ্য দেবতাপ্রাণে মনুষ্যের আর তৃপ্তি হইল না । তখন মনুষ্যের সমুদয় শক্তি অন্তরে প্রদাহিত হইল—মানুষের নিজ আত্মা সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতে লাগিল । বহির্জগৎ হইতে ঐ প্রশ্ন গিয়া অন্তর্জগতে পহঁছিল । বহির্জগৎ বিশ্লেষণ করিয়া শেষে মানুষ অন্তর্জগৎ বিশ্লেষণ করিতে আরম্ভ করে । এই ভিতরের মানুষ সম্বন্ধে প্রশ্ন, ইহা আসে—উচ্চতর সভ্যতা হইতে, প্রকৃতি সম্বন্ধে গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি হইতে, উচ্চতর ভূমিতে উন্নত হইলে ।

এই ভিতরের মানুষই অজ্ঞতার বৈকালের আলোচ্য বিষয় । এই অন্তর্মানবসম্বন্ধে প্রশ্ন মানুষের যতদূর প্রিয় ও তাহার হৃদয়ের বত সন্নিহিত আর কিছুই তত নহে । কত লক্ষ বার, কত কত দেশে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছে । কি অরণ্যবাদী সন্ন্যাসী, কি রাজা, কি দারিদ্র্য কি ধনী, কি সাধু
১লা আষাঢ়, ১৩০৮ ।]

উদ্বোধন ।

২৭৯

কি পাপী, প্রত্যেক নর, প্রত্যেক নারী, সকলেই কোন না কোন সময়ে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিয়াছেন—এই ক্ষণভঙ্গুর মানবজীবনে কি নিত্য কিছু নাই? এই শরীর মরিলেও এমন কিছু কি নাই, যাহা মরে না? যখন এই শরীর পুলিমায়ে পরিণত হয়, তখন কি কিছু জীবিত থাকে না? অগ্নি শরীরকে ভস্মসাৎ করিলে তাহার পর আর কিছু কি অবশিষ্ট থাকে না? যদি থাকে, তবে তাহার নিয়তি কি? উহা যার কোণায়? কোথা হইতেই বা উহা আসিয়াছিল? এই প্রশ্নগুলি পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, আর যতদিন এই সৃষ্টি থাকিবে, ততদিন মানব-মানুষ চিন্তিবে, ততদিনই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিতে হইবে। ইহার উত্তর যে আসে নাই, তাহা নহে, প্রতিবারই উত্তর আসিয়াছিল; আর যত সময় যাইবে, ততই উহা উত্তরোত্তর অধিক বল সংগ্রহ করিবে। সহস্র বর্ষ পূর্বে ঐ প্রশ্নের উত্তর একেবারেই প্রদত্ত হইয়াছিল; আর পরবর্তী সময়ে ঐ উত্তরই পুনঃ কথিত, পুনঃ বিশদীকৃত, হইয়া আমাদের বুদ্ধির নিকট উজ্জলতররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব আমাদের কেবল ঐ উত্তরের পুনঃ-কখন করিতে হইবে মাত্র। আমরা এই সৰ্বগ্রাসী সময়ভাণ্ডালি সম্বন্ধে নূতন আলোক প্রক্ষেপ করিব, এরূপ ভাব করি না। আমাদের আবাক্সা এই যে, সেই প্রাচীন মহান্ সত্য বর্তমান কালের ভাষায় প্রকাশিব, প্রাচীন দিগের চিন্তা আধুনিকদিগের ভাষায় প্রকাশিব, দার্শনিকদিগের চিন্তা লৌকিক ভাষায় বলিব—দেবতাদের চিন্তা মানবের ভাষায় বলিব, ঈশ্বরের চিন্তা দুর্বল মানব-ভাষায় প্রকাশিব, যাহাতে লোকে উহা বুঝিতে পারে, কারণ আমরা পরে দেখিব, যে ঐশী সত্তা হইতে ঐ সকল ভাব প্রসূত, তাহা মানবেও বর্তমান—যে সত্তা ঐ চিন্তাগুলি স্বজিয়াছিলেন, তিনিই মানুষে প্রকাশিত হইয়া নিজে উহা বুঝিবেন।

আমি তোমাদিগকে দেখিতেছি। এই দৃষ্টির জন্ত কতকগুলি জিনিষের আবশ্যক? প্রথমতঃ চক্ষু—চক্ষু, অবশ্যই থাকাই চাই। আমি সর্ব প্রকারে পূর্ণ হইতে পারি, কিন্তু যদি আমার চক্ষু না থাকে তবে আমি তোমাদিগকে দেখিতে পাইব না। অতএব, প্রথমতঃ আমার অবশ্যই চক্ষু থাকা আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ, চক্ষুর পশ্চাতে আর কিছু যাহা বাস্তবিক দর্শনেন্দ্রিয়, তাহা যদি না থাকে, তবে পর্যাপ্ত হইবে না। চক্ষু বাস্তবিক ইন্দ্রিয় নহে। উহা দর্শনের যন্ত্রমাত্র; ইন্দ্রিয় হইতেছে—মস্তিষ্কস্থ স্নায়ুবেদ্র বাস্তবিক তৎপশ্চাতে—যদি ঐ কেন্দ্রটী নষ্ট হয়, তবে

- কোথায় এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ শুনা যায় ? সংযুক্ত বর্ণে যেমন—অ+ই =ঐ, অ+উ=ঔ। সংযুক্ত বর্ণে (ঐঔ তে), বিবৃত্ত্ব উচ্চারণ হেতুই গ্রহণ হইবে না * ।

ঐ ঔ এই সংযুক্ত বর্ণে যে অবর্ণ আছে, তাহা বিবৃত্ত্বত্ব প্রসন্ন বিশিষ্ট অথ অবর্ণ হইতে পৃথক্ হইবে। আর ইহাতে যে ই বর্ণ এবং উ বর্ণ আছে তাহাও বিবৃত্ত্বত্ব প্রসন্ন বিশিষ্ট বলিয়া অন্যত্র বিবৃত্ত্ব প্রসন্ন বিশিষ্ট ‘ই’ ‘উ’বর্ণ হইতে পৃথক্ হইবে। অতএব এই স্থলে যখন বিবৃত্ত্ব এবং বিবৃত্ত্বত্ব ভেদে প্রবৃত্ত্বই ভিন্ন ভিন্নই হইল, তখন ‘ঐ’ ‘ঔ’ প্রভৃতি সংযুক্ত বর্ণে অ ই প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের গ্রহণ ক্রমে হইবে। অতএব বর্ণের একদেশ বর্ণ গ্রহণে কদাপি গৃহীত হইতে পারে না।

ভাষ্যমূল।—অথবা পুনঃ গণ্যস্তে। অগ্রহণং চেন্নুড়িবিধি লাদেশবিনামেসু ঋকারগ্রহণম্ *। অগ্রহণং চেন্নুড়িবিদাদেশ বিনামেসু ঋকার গ্রহণং কত্তব্যম্। তস্মান্নুড়ি বিহলঃ। ঋকারে চেতি বক্তব্যম্। ঈতাপি যথা স্তাৎ আনুধুঃ আনুধুরিতি।

বঙ্গানুবাদ।—অথবা পুনঃ না হন, অবয়বের গ্রহণ নাই করা যাউক ! যদি অবয়বী গ্রহণে, অবয়বের গ্রহণ না করা যায় ; তবে হুট্ বিধান লকার আদেশে এবং বিনামে (গত্ব বিধান) ঋকারের গ্রহণ কৰ্ত্তব্য।*

অবয়বী গ্রহণে অবয়বের গ্রহণ না করিলে, হুট্ বিধানে, ঋ স্থানে ঋ আদেশে, ন স্থানে গত্ব বিধান, ঋকারের গ্রহণ করা কৰ্ত্তব্য। অতথা “তস্মান্নুড়ি বিহলঃ” ৭।৪।৭।১। (হুটী ব্যঞ্জনবর্ণ বিশিষ্ট ধাতুর দীর্ঘীকৃত আকারের পর হুট্ আগম হয় ; যেমন—‘অর্দ’ ধাতুর রেক এবং দ কার মিলিয়া, দুই ব্যঞ্জনবর্ণ বিশিষ্ট ধাতু হওয়াতে এবং সিটের ণে, ঋ কারের বৃদ্ধি আকার হইলে হুট্ আগম হইয়া “আনর্দ” পদ সিদ্ধ হইয়া থাকে) এই সূত্রে, ঋ বর্ণ গ্রহণ করা কৰ্ত্তব্য। অর্থাৎ সূত্রান্তে “ঋকারে চ” (ঋকার পরে থাকিলেও, পূর্বোক্ত সূত্রানুসারে হুট্ আগম হয়) এইরূপ বাস্তবিক করা কৰ্ত্তব্য। যেন ঋধু এই ধাতুর উত্তর পুট্ আগম করিয়া ‘আনুধুঃ আনুধুঃ’ এই স্থলেও প্রয়োগ সিদ্ধ হইতে পারে। নতুবা ‘ঋধু’ ধাতুর ‘ঋ’ কারে, তদবয়ব স্বরূপ ‘রকারের গ্রহণ না করিলে, ঋধু ধাতুতে দুই ব্যঞ্জনবর্ণও সিদ্ধ হইবে না, সূত্রানুসারে হুট্ আগমও সম্ভব হইবে না। হুট্ আগম কালে ঋ কারের গ্রহণ জ্ঞাত বাস্তবিক করিলে, হুট্ আগম সিদ্ধ হইবে এবং ‘আনুধুঃ’ প্রয়োগও নিশ্চয় হইবে। তবে দোষ এই হইবে যে, ১লা আবার, ১৩০৮।] উদোধন। [৪] ২৮১

‘ঋণারেন্চ’ এইরূপ একটা বৃহৎ অবসর বিধিষ্ট বার্তিক প্রয়োগ নিবন্ধন গৌরব হইবে।

ভাষামূল।—যত্র পুনর্গৃহ্যন্তে দ্বিহল ইত্যেব তত্র সিদ্ধম্। যত্রাপি ন গৃহ্যন্তে তসাপোষ ন দোষঃ। দ্বিহলগ্রহণং ন করিষ্যতে। তস্মান্নুড্ ভবতীত্যেব। যদি ন ক্রিয়তে। আটকুঃ, আটুরিতানোপি প্রাপ্নোতি। অশ্লোতিগ্রহণং নিরমার্থং ভবিষ্যতি। অশ্লোতেরেক বর্ণোপধত্র নাভ্রজ্ঞাবর্ণোপধত্রোতি।

বঙ্গানুবাদ।—যাহার মতে অবদবীর গ্রহণে অবদনের গ্রহণ হয় না, তাহার মতেও এইস্থলে দোষ হইবে না। কেননা, ‘তস্মান্নুড্ দ্বিহলঃ’ স্থানে ‘দ্বিহল্’ গ্রহণ করা হইবে না। কেননা নাত্র ‘তস্মান্নুট্’ (দীর্ঘরূত আকারের পর ছুট্ আগম হয়) ‘ভবতি’ এইরূপ সূত্র করিয়া তাহা হইলেই ঋকার বিশিষ্ট ধাতুতে ছুট্ বিধান হইয়া ‘তান্নুপকুঃ’ পদসিদ্ধ হইবে। যদি সূত্রে ‘দ্বিহল্’ (চুই ব্যঞ্জন) গ্রহণ না করা হয়; তবে ‘আটকুঃ’ ‘আটুঃ’ এই সমস্ত একব্যঞ্জন বর্ণ বিশিষ্ট ধাতুর উত্তর ছুট্ আগম হইবে। যথা সঙ্গত প্রয়োগ সিদ্ধি না হইয়া অসঙ্গত আনটকুঃ প্রভৃতি প্রয়োগ হইতে থাকিবে। “অশ্লোতেন্চ” ৭।৪।৭২ (অভ্যাস (১) সংজ্ঞক দীর্ঘ আকারের পর ছুট্ আগম হয়; যথা; আনশে)। যদি সর্বত্রই ছুট্ আগম প্রাপ্ত হইত তাহা হইলে এই সূত্র অনাবশ্যক হইবে। এই সূত্র বর্ণ্য হইয়া এই নিয়ম করিবে যে, ‘অশ্রু’ ধাতুর অ বর্ণ উপধা বিশিষ্টের ঐ ছুট্ আগম হইবে, অত্র অ বর্ণ উপধা বিশিষ্ট ধাতুর ছুট্ আগম হইবে না।

ভাষামূল।—কৃপো রোলঃ, ঋকারস্ত চেতি বক্তব্যম্। লাদেশে চ ঋকার গ্রহণং কর্তব্যম্। ইহাপি যথা স্ত্রাৎক্১প্তঃ ক্২প্তবানিতি। যত্র পুনর্গৃহ্যন্তে র ইত্যেব তত্র সিদ্ধম্। যত্রাপি ন গৃহ্যন্তে তস্তাপোষ ন দোষঃ। ঋকারোপাত্র নির্দিষ্টতে। কথম্। অবিভক্তিনো নির্দেশঃ কৃপ উঃ রঃ লঃ কৃপো রোল ইতি। অথবা উভয়তঃ স্ফোটমাৎ নির্দিষ্টতে। রশ্চতেলশ্রুতি ভবতীতি। বিনামে ঋকার গ্রহণং কর্তব্যম্।

(১) কোনও শব্দের দ্বিহল হইলে তাহার পূর্বে শব্দের অভ্যাস সংজ্ঞার যেমন ভূ বাতুর লিটেতে গল্, আদি প্রত্যয় আদেশ হইলে, তৎ পূর্বেস্থিত বাত্ দ্বিহল হইয়া ভূব্, ভুব্, এইরূপ আদেশ হয়। এই ছুইবার উচ্চারিত ভূব্, এর পূর্বে শব্দ অর্থাৎ ভূব্, এর অভ্যাস সংজ্ঞা হয়। অশ্রু ধাতুরও এই স্থলে লিটের গলে দ্বিহল হইয়া অশ্, অশ্, এইরূপ আদেশ হইয়াছে। ইহার পূর্বে অশ্, ভাগের অভ্যাস সংজ্ঞা হইয়াছে।

রষাভ্যাং নোণঃ সমান পদে ঋকারাচ্চেতি বক্তব্যম্ । ইহাপি যথা স্মৃতি ।
মাতৃগাং পিতৃগামিতি । যত্র পুনর্গৃহ্যন্তে রষাভ্যামিত্যেব তত্র সিদ্ধম্ । ন
সিদ্ধ্যতি । যত্বেকাং পরং ভক্তেঃ তেন ব্যবহিত্ত্বান্ প্রাপ্নোতি । মাতৃদেবমঃ
অট্ বানায়ইত্যেব সিদ্ধম্ ।

বঙ্গালুবাদ । ‘লা দেশে’ (র স্থানে ল আদেশে), ঋকার গ্রহণ করা
কর্তব্য ‘কৃপোরোলঃ’ এই সূত্রে, ঋকারের স্থানে ল কার আদেশ হইলেও সূত্রে,
পুনঃ ঋ কারের গ্রহণ করা কর্তব্য । যেহেতু ‘কৃপোরোলঃ’ এই সূত্রে ঋকারস্থিত-
রেফ্ অংশের স্থানেই যদি ল্ আদেশ হয়; তাহা হইলে, ‘সমগ্র ঋ কার’ এইরূপ
স্বরবর্ণ স্থানে, ‘সমগ্র ৯ কার’, এইরূপ স্বরবর্ণ আদেশ হওয়ার জন্ম; ‘ঋকার
স্থানে ৯ কার হয়’ এইরূপ ও সূত্রের অভিরিক্ত বার্তিক করিতে হইবে ।
যাহাতে রূপ ধাতু হইতে ৯ কার আদেশ হইয়া ‘কৃপ্ত’ কৃপ্তবান্ প্রভৃতি পদ
সিদ্ধি হইতে পারে । আর যাহার মতে অবয়বী গ্রহণে অংশাবয়বেরও গ্রহণ
হইয়া থাকে, তাহার মতে ঋকারের অভ্যন্তরে রকার সিদ্ধি আছে; সুতরাং
ঋকারাংশ রকার স্থানে ল কার হইয়া এবং তাহার সহিত ঋকারের অথ
স্বরংশ যুক্ত হইয়া ৯ কার আদেশ হইবে । অতএব সকল প্রযোগই অনায়াসে
সিদ্ধ হইবে ।

যাহার মতে অবয়বী গ্রহণে অবয়বের গ্রহণ হয় না, তাহার মতেও কোনও
দোষ হইবে না । যেহেতু, ‘কৃপোরোলঃ’ এই সূত্রে ঋকারও নির্দেশ করা
হইবে । তাহা কি রূপে হইবে ?

সুধটী কোনও বিভক্তি বিশেষ দ্বারা নির্দেশ করা হইবে না । “কৃপ
উঃ রঃ লঃ ” এইরূপ পদচ্ছেদ করিয়া কৃপোরোলঃ এইরূপ সূত্র করা হইবে ।
তাহা হইলেই এইরূপ অর্থ হইবে, যে কৃপ ধাতুই ঋকারের স্থানে, ল কার
বিশিষ্ট স্বরবর্ণ অর্থাৎ ৯ কার এবং র কার স্থানে ল কার আদেশ হইবে ।
তাহা হইলেই ঋ স্থানে ৯ হইয়া ‘কৃপ্ত’ কৃপ্তবান্ প্রভৃতি প্রয়োগও সিদ্ধ
হইবে ।

অথবা অবয়বী গ্রহণে অবয়বের গ্রহণ এবং অগ্রহণ, উভয় পক্ষেই ফোন্ট
বর্ণ (ব্যঞ্জনবর্ণ) মাত্র নির্দিষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ যে স্থানে র্ শ্রবণ হইবে, সেই র্
স্থানে আদেশ হইলে, ল শ্রবণ হয় এইরূপ স্পষ্ট বর্ণ আদেশ হইবে । তাহা
হইলে র কার শ্রবণীভূত ঋকার স্থানেও ল কার শ্রবণীভূত ৯কার অবশ্যই
হইবে ।

‘বিনামে’ (ন স্থানে এত বিধানে) ঋকারের গ্রহণ করা কর্তব্য । রষাভ্যাং নোঃ সমানপদে” ৮। ৪। ১ (একবাক্যস্থিত রেফ্ এবং সকারের পর যে ন কার, তাহার স্থানে নকার হয়) এই সূত্রে ঋকারটি । অর্থাৎ ঋকারের পরে নকার হয়, এইরূপ বলা কর্তব্য । যেহেতু রষাভ্যাং সূত্রে—“রকার যকারের পরে ন কার থাকিলে, নকার হয়” । এইরূপই উল্লিখিত আছে ; কিন্তু ঋকারের পরে নকার হইবার কোনও উল্লেখ নাই যদি র কার গ্রহণে, ঋকারের অবয়বস্থিত রকারের গ্রহণ না হয় ; তবে মাতৃগাম্ পিতৃগাম্ এই স্থলেও যাহাতে নকার হইতে পারে, এই জন্ত সূত্রে, ঋকারের পরে ন কারের স্থানেও ন কার হয় এইরূপ বলিতে হইবে ।

বাহার মতে অবয়বী গ্রহণে অবয়বের গ্রহণ হয়, তাহার মতে “রষাভ্যাং অর্থাৎ র কার যকারের পরে ন স্থানে ন হয়” এইরূপ বলিলেই, মাতৃগাম্ প্রভৃতি প্রয়োগ সিদ্ধি হইবে । যেহেতু ‘মাতৃ’ শব্দের ‘ঋ’কারের অভ্যন্তরে যে রকার আছে, তাহাকে নিমিত্ত করিয়া ‘নাম্’ শব্দের ‘ন’কার, ‘ণ’ হইবে । সুতরাং ‘মাতৃগাম্’ প্রয়োগও সিদ্ধি হইবে ।

এই রূপ করিলেও প্রয়োগ সিদ্ধি হইবে না । যেহেতু ঋকারে কেবল রকারই নাই উহার পূর্বাংশ রকার এবং শেষাংশ ইকার সদৃশ কোনও দ্রববর্ণ । অতএব ঋকারের রেফ অংশের শেষ ভাগ, অন্ত স্বরবর্ণ থাকিতে এবং রকারের পরে, সেই স্বরবর্ণ ব্যবধান থাকিতে, ঋকারের পরে, ন কার স্থানে ন কার প্রাপ্তি হইবে না ।

সুতরাং যাহারা অবয়বী গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহাদের মতে ত দোষ ঘটিবেই ।

না, এই স্থলে দোষ ঘটিবে না । ‘রষাভ্যাং’ সূত্রের দ্বারা প্রয়োগ সিদ্ধি হইলেও, তৎপরবর্তী অট্-কুপাঙ-নুন্ম ব্যায়েহপি ৮। ৪। ২ । (অট্-প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ, ক বর্ণ, প বর্ণ, আঙ্-উপসর্গ, নুন্ম অর্থাৎ অজুবার ইহার পৃথক্ পৃথক্ রূপে, অথবা একত্র মিলিত হইয়া, বর্ণা সত্ত্ব বর্ণে ব্যবধান হইলেও র কার বকারের পরস্থিত ন স্থানে ন হয়) এই ইদ্রানুগারে, স্বরবর্ণ মাত্রেরই অট্-প্রত্যাহার মধ্যে অন্তর্ভাব হেতু, ঋকারের অভ্যন্তরস্থিত র কারের পরবর্তী ‘ই’সদৃশ স্বদভাগও অট্-প্রত্যাহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইরাছে । সুতরাং ঐ স্বরাংশ ব্যবধান থাকিলেও, রকারের পরস্থিত ন স্থানে ন হয় বলিয়া, ঋর পরেও ন” হইবেই ।

ভাষামূল।—ন সিদ্ধতি বর্ণৈকদেশা কে বর্ণ গ্রহণেন গৃহ্যন্তে । যে ব্যাপবৃত্তা
অপি বর্ণা ভবন্তি । যচ্চাপি রেফাংপরং ভক্তেঃ ন তৎকৃচিদপি ব্যাপবৃত্তে
দৃশ্যন্তে । এবং ত্ৰি' যোগ বিভাগঃ করিষ্যতে । রযাভ্যাং নোণঃ সমানপদে ।
ততো দ্যাবায়ে । ব্যায়ায়ে চ রযাভ্যাং নোণঃ ভবতীতি । ততোহট্‌কুপাণ্ড্‌হুস্তি
রিতি । উদসিদানীং কিমর্থম্ । নিয়মার্থম্ । এট্‌তরেবাক্ষরসমাস্মায়ি কৈবর্বাবারে
নান্যৈরিতি ।

বঙ্গালুবাদ ।—এইরূপ করিলেও মাতৃণাম্ প্রভৃতি শব্দের ঋকারের পরে
গত্ব হইবে না যদিও ঋকারের মধ্যে, র্‌ কারাংশের শেষাংশ যে স্বর বর্ণ, তাহা
অট্‌ প্রত্যাহার মধ্যে পাঠ্য হেতু, প্রয়োগসিক্তি সম্ভব বলা হইয়াছে,
তাহাও হইবে না । বর্ণের এক অংশ, বর্ণগ্রহণে গৃহীত হয় বটে ; কিন্তু
কোন বর্ণ সকল বর্ণ গ্রহণে গৃহীত হয় । যাহারা ব্যাপবৃত্ত অর্থাৎ পৃথককৃত
হইলেও বর্ণ বলিয়া প্রতীতি হয় । যেমন র কার বা অকার ইহার অন্য
বর্ণের সহিত (র কার ঋকারের সহিত, মিলিত হইয়া থাকিলেও, পুনরায়
স্বতন্ত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে) যথা 'রবি'শব্দে রকার 'অন্ত' শব্দে 'অ'কার পৃথক
ব্যবহৃত হয় । এই স্থলে ঋ বর্ণের একাংশ যে রকার, তাহার অন্তর্ভুক্ত হয়
বলিয়া ঋকার গ্রহণে 'র' গৃহীত হইলেও ঋকারের অপরাংশ যে স্বর বর্ণ,
তাহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া দৃষ্ট হয় না বলিয়া, ঋকার গ্রহণে তাহার গ্রহণ
হইতে পারে না । যেহেতু ঋকারবস্তিত বেকের শেষাংশ কোনও বর্ণ
বলিয়া স্পষ্ট প্রতীতি হয় না, যে, বর্ণাংশে উহার গ্রহণ হইবে । অর্থাৎ যেমন
অকারের সর্গ আকার, ইকারের সর্গ ঈকার বলিয়া, আকার গ্রহণ করিলেই
তাহার সর্গ আকারাদি অষ্টাদশ প্রকার অকারেরই গ্রহণ হইয়া থাকে, এবং
সেই জন্যই অট্‌ প্রত্যাহার মধ্যেও সকল প্রকারের অকারই গৃহীত হয়,
সেইরূপ ঋকারের শেষাংশ কাহার সর্গ যে, অট্‌ প্রত্যাহার মধ্যে
গৃহীত হইবে ; এবং সেই বর্ণাংশ ব্যবধান থাকিলেও রকারের পরস্থিত
নকার স্থানে ণ কার হইবে ? এইরূপে প্রয়োগ সিক্তি না হইলে, স্ত্রে
যোগ বিভাগ করা যাইবে । যেমন "রযাভ্যাং নোণঃ সমানপদে"
একাংশ এইরূপ স্ত্র করিয়া অট্‌কুপাণ্ড্‌ হুস্তি ব্যায়ায়পি" এই স্ত্রের শেষাংশ
'ব্যায়ায়পি' এই টুকু মাত্র গ্রহণ করিয়া এইরূপ স্ত্র করিব যে, 'রযাভ্যাং
নোণঃ সমানপদে ব্যায়ায়পি' এক্ষণে এই স্ত্রের ইহাই মর্থ হইবে যে, এক
পদস্থিত রেফ এবং ঋ কারের পরে, যে কোনও বর্ণই ব্যবধান থাকুক না
১৩১ আষাঢ়, ১৩০৮ ।] উদ্বোধন । ২৮৫

কেন, ন কারের পরে ও কার হইবেই। সুতরাং স্বাকারের অভ্যন্তরস্থিত র কারের পরে যে কোন বর্ণই ব্যবধান হউক তাহার পরেই ন স্থানে ও হইবে। অতএব মাতৃগাম্ শব্দের স্বাকারের পরেও ওকার প্রাপ্তি না হইবে না।

এইরূপ সূত্র করিবার পবে, পর, সূত্রের অপরাংশ যে পূর্ব ভাগে, “অট্ কুপাঙ্‌নুমতিঃ” গ্রহণ করিব। (তাহা হইলে অট্ প্রত্যাহারস্থিত বর্ণ ক বর্ণ, পবর্ণ, আঙ্ উপসর্গ ইহাদের দ্বারা ব্যবধান থাকিলেও র এবং ষ এর পরস্থিত ন স্থানে ও হয়। এইরূপ অর্থ হইবে)। যদি এই রূপই হয় তবে, পূর্ব কল্পিত সূত্রানুসারেই ত রেফ ও ষ কারের পরস্থিত ন স্থানে ও সর্বত্রই প্রাপ্ত হইবে ? তবে পুনরায় “অট্ কুপাঙ্‌নুম্” (অট্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ, কবর্ণ, পবর্ণ, ইহার ব্যবধান থাকিলেও ও হয়) এই সূত্র করিবার প্রয়োজন কি ?

এইরূপ সূত্র নিয়ম বিধানের জন্ত করিবার প্রয়োজন হইবে। সেই নিয়ম এই যে, যদি “অক্ষর সমায়ায়িক” (১) স্থিত কোন বর্ণ ব্যবধান থাকিলে, র ও ষ এর পরস্থিত ন স্থানে ও প্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে অট্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ (স্বরবর্ণ এবং যবরহ), কবর্ণ প বর্ণ, আঙ্ উপসর্গ, ত্তম্ (অনুস্বার) এই সকল বর্ণ দ্বারা ব্যবধান থাকিলেই হইবে। অজ্ঞ বর্ণ দ্বারা ব্যবধান থাকিলে হইবে না।

ভাষ্যমূল।—যত্য়পি গৃহান্তে তত্য়াপ্যেষ ন দোষঃ। আচার্য্য প্রবৃত্তিজ্ঞাপ-
য়তি। ভবতাকারাগোপয়মিতি। যদয়ং ক্ষুভাদিষু নুনগনশব্দং পঠতি। নৈতদন্তি
জ্ঞাপকম্। বুদ্ধার্থমেতৎস্মাৎ। নার্মগনিঃ। যত্য়চি ত্ত্য়প্রোতি শব্দং পঠতি। যত্য়পি
নুনগনশব্দং পঠতি। ননুচোক্তং বুদ্ধার্থমেতৎস্মাৎ। বর্হিরপা বদ্ধিরন্ত বদ্ধং
গচ্চম্। অসিদ্ধং বহিরঙ্গমন্তরঙ্গে।

(১) এইরূপ ইতিহাস প্রসিদ্ধ আছে যে, মহর্ষি পাণিনি ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রণয়ন জন্য দীর্ঘকাল মহাদেবের উপাসনা করিয়াছিলেন। মহাদেব উপাসনার তুষ্ট হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। নৃত্যের শেষে প্রথমতঃ নয়বার এবং পরে পঁচবার উন্নয়-ধ্বনি করিয়াছিলেন, তাহা হইতে এই চতুর্দশটি সূত্র বিনির্গত হইয়াছিল। সেই সূত্র এই,—
অইউণ্‌। ১। ঋক্‌। ২। এঙ্‌। ৩। ঐওচ্‌। ৪। হযবট্‌। ৫। লণ্‌। ৬। এতণম্‌।
৭। ঝড্‌। ৮। ষঢ্‌। ৯। জঘঙদশ্‌। ১০। ঋফছঠথটতল্‌। ১১। কপয। ১২। শযসর
১৩। হল্‌। ১৪। মহাদেবের নিকট হইতে এই অক্ষর সমূহ আগমন করার পবে, এই সকল
অক্ষরের “অক্ষর সমায়ায়িক” নাম হইয়াছে।

বঙ্গভাষাবাদ।—এইরূপ করিলে, বাহার মতে অবয়বী গ্রহণে অবয়বের গ্রহণ হয় না, তাহার মতেও দোষ হইবে না। কেন না ঋকারের পরে যে ‘ন’ কার স্থানে ‘ণ’ কার হয়, তাহা আচার্য্য পাণিনির প্রবৃত্তি অনুসারেই জানা যাইবে। যেহেতু তিনি “ক্ষুভ্রাদি গণ” মধ্যে, “নুনমন” শব্দ পাঠ করিয়াছেন। যদি ঋকারের পরে ‘ন’ স্থানে ‘ণ’ না হইত; তবে স্বভাবতঃ ‘নু’ শব্দের ‘ঋ’কারের পরে, নমন শব্দের ‘ন’কার মুক্তি‘ণ’ হইত না। সুতরাং আচার্য্য পাণিনি ‘ক্ষুভ্রাদি গণ’ মধ্যে, ‘ন’কারের স্থানে ‘ণ’কার না হইবার জন্ত, যখন নুনমন শব্দ পাঠ করিয়াছেন, তখন তাহাতে ইহাই জানা যাইতেছে যে, ঋকারের পরে ‘ন’ কারের স্থানে ‘ণ’বার হয় এই জন্তই শব্দের ঋকারের পরে ‘নমন’ শব্দের ‘ন’কার মুক্তি‘ণ’ হইয়া থাকে। আর তাহা বাহাতে না হইতে পারে, এই জন্তই ক্ষুভ্রাদিগণ মধ্যে নুনমন শব্দ পাঠ করিয়াছেন। সুতরাং পাণিনির অভিপ্রায়ানুসারেই ঋকারের পরস্থিত ন স্থানে ণ হইবে।

ইহা কখনও জাপক হুদতে পারে না। কেন না ক্ষুভ্রাদিগণে যে, ‘নুনমন’ শব্দ পাঠ করা হইয়াছে, তাহা ‘ন’ কার স্থানে ‘ণ’ কার নিষেধ করিবার জন্য নহে। তবে ‘ক্ষুভ্রাদিগণে’ পাঠ করিবার ইহাই প্রয়োজন যে, যেকপ ‘ক্ষুভ্রাদি গণ’ পঠিত শব্দের আত্ম স্বারং বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ ‘নুনমন’ শব্দেরও আদি স্বরের বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। তাহা হইলে, ‘নুনমন’ শব্দের স্থানেও ঋকারের বৃদ্ধি হইয়া, ‘নার্ণমনি’ শব্দ সিদ্ধ হইবে।

যদি ক্ষুভ্রাদি গণে নুনমন শব্দ, ঋকারের বৃদ্ধির জন্তই পাঠ হইয়া থাকে; তবে ‘ত্পোতি’ শব্দ ক্ষুভ্রাদিগণে কেন পাঠ করা হইয়াছে?

যে (বৃদ্ধির) জন্ত ‘নুনমন’ শব্দে ক্ষুভ্রাদিগণে পাঠ করা হইয়াছে, ‘ত্পোতি’ শব্দও সেই জন্যই পাঠ করা হইয়াছে। যদি ইহাই বলা যায় যে, ‘ত্পোতি’ শব্দেরও ঋকারের বৃদ্ধি হওয়ার জন্তই ক্ষুভ্রাদিগণে পাঠ হইয়াছে; তাহা কখনও সঙ্গত হইতে পারে না। যেহেতু, বৃদ্ধি কার্য্য বহিরঙ্গ, গন্ধ বিধান অন্তরঙ্গ (১) অতএব “অন্তরঙ্গ কার্য্য কৰ্ত্তব্য হইলে, বহিরঙ্গ কার্য্য,

(১) যে কার্য্য বহু অপেক্ষা অর্থাৎ বহু নিমিত্ত থাকে, তাহাকে বহিরঙ্গ বলে। যে কার্য্যে অল্প নিমিত্ত থাকে তাহাকে অন্তরঙ্গ বলে। ‘নুনমন’ শব্দে, ‘ক্ষি’ প্রত্যয় করিয়া “তদ্ধিত্তেত্বচামাদেঃ ৭১২।১১৭ (এ ইং ৭ইং প্রত্যয় বিশিষ্ট তদ্ধিত্ত পাবে থাকিলে, শব্দের আদি স্বর বর্ণের বৃদ্ধি হয়) এই শ্রুত্যানুসারে, ঋকারের বৃদ্ধি হইয়া ‘নার্ণমনি’ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, ‘ক্ষি’ প্রত্যয় পরে থাকিলে আর সেই

অসিকই হইবে এই স্বভাসিক নিয়মানুসারেই, ক্ষুভাদিগণে 'মুনমন, ও তৃপ্তোতি শব্দের পাঠ, ম কার স্থানে ণ কার বিধানের জন্তই জানিতে হইবে বুদ্ধির জন্ত কদাপি ইহার উদ্দেশ্য হইতে পারে না ।

ভাষ্যমূলম্ ।—অথবা উপরিষ্টাদোগ বিভাগঃ করিয়াতে । ঋতঃ নো গো ভবতি । ততশ্চন্দ্রশ্র বগ্রহাং । স্মৃত ইত্যেব । প্লুত্বৈচ ইহুতো । এতচ্চ বক্তবাম্ । যত্র পুনর্গৃহ্যন্তে গুরোষ্টোরিতোব প্লুত্যা তত্র মিদ্ধম্ । যস্যাপি ন গৃহ্যন্তে তত্রাপোষ ন দোষঃ । ক্রিয়ত নাস এব । তুল্যরূপে সংযোগে দ্বিব্যজ্ঞন বিধিঃ * । তুল্যরূপে সংযোগে দ্বিব্যজ্ঞনাশ্রয়ো বিধিন্ সিধ্যতি । কুকুটঃ । পিললী । পিত্তমিতি ।

বর্ণানুবাণ ।—পক্ষান্তরে, যেমন পূর্বে ২ সূত্র সকলে, যোগবিভাগ করা হইয়াছে সেই প্রকার “ছন্দস্যবগ্রহাং” চ । ২৬ ।

(ঋকারান্ত অবগ্রহের (১) পরেস্থিত ন কার স্থানে ণ কার হয়, বেদের প্রয়োগে) এই সূত্রেরও যোগ বিভাগ করা যাইবে । সেই যোগ বিভাগ এইরূপ করা হইবে যে সূত্রের একাংশ ‘ঋতঃ’ (ঋকারের পরস্থিত ন কার স্থানে ণ কার হইবে) নো গো ভবতি । তদনন্তর সূত্রের অপরাংশ এইরূপ করা হইবে যে ‘ছন্দস্যবগ্রহাং’ (বেদে, অবগ্রহের পরস্থিত ন কার স্থানে ণ কার হয়) এক্ষণে সম্পূর্ণ সূত্র মিলিত হইয়া এইরূপ অর্থ হইবে যে, বেদের অবগ্রহের পরস্থিত নকার স্থানে যেখানে ণকার হইবে, সেইখানে ঋকারের পরস্থিত নকারেরই হইবে । আর ঐ সূত্রাংশ ‘ঋতঃ’, (যাহা এক্ষণে মূলসূত্র হইতে পৃথক করা হইরাছে) সেই সূত্রের অনুরূপ্তি আসিয়া রবাত্যাং সূত্রে সংযুক্ত হওয়াতে এইরূপ অর্থ হইবে যে, রকার বকার এবং ঋকারের পরস্থিত নকার স্থানে ণকার হয়) একই বাক্যে থাকিলে । সুতরাং ঋকারের এক অংশ রকার ঋকারের মধ্যে গ্রহণ না করিলেও কোনও স্থলেই দোষ ঘটিবে না । ঐতর্য্য বর্ণের একাংশ, বর্ণ গ্রহণে গ্রহণ করিবার কোনও আবশ্যক নাই ।

‘ক্রি’ ১ প্রত্যয় ভুক্তি নিম্নরূপ হইলে, ক্ষুভাদিগণ পাঠি মুনমন শব্দের ঋকারের বুদ্ধি ইষ্টা থাকে । অতএব ইত্যেত ক্রি প্রত্যয় ভুক্তি ইষ্টা হইয়াছে । এই বুদ্ধি কার্য্য বহিরঙ্গ হইরাছে । আব ‘মুনমন’ শব্দের ঋকারের অব্যবহিত পরেই ন কার থাকাতে অন্তরঙ্গ এবং সকল বর্ণের শেষে, ‘ক্রি’ প্রত্যয় হওয়াতে শব্দের সর্বাংশ বর্ণে ঋকারের বুদ্ধি হওয়াতে, ঋকারের বুদ্ধি অনেকবর্ষ ব্যবধান হেতু, বহিরঙ্গ হইল ।

(১) সংযুক্ত বা নিকটস্থ বর্ণ সমূহের, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবস্থানকে অবগ্রহ বলে । যেমন—নিহোতা সং সি বর ভি যি ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথা

শ্রীম——কথিত।]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

[গৃহস্তাশ্রমধর্ম-৫ সংস্ক]

শ্রীরামকৃষ্ণ। (মহিমার প্রতি) তোমরা সংসারী, কামিনী-কাক্ষণ

ও বাথ। সংসারও রাখ, ধর্মও রাখ।

মহিমা। এ কি আর থাকে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি পঞ্চবটীর কাছে গঙ্গাব ধাবে টাকা মাটী, মাটীই টাকা ও টাকাই মাটী, এই বিচার করতে কবতে যখন টাকা গঙ্গাব জলে ফেলে দিলুম, তখন এণ্টু ভব হলো। ভাবলুম, আমি কি লক্ষ্যোচ্ছাদা হলুম। মা লক্ষ্মী যদি খ্যাট বন্ধ করে দেন, তা হলে কি হবে! তখন হাজীর মত পাটোয়ারী করলুম। বলুম, মা! তুমি যেন জদয়ে থেকে। একজন তপস্বী করাতে ভগবতী সন্তুষ্ট হয়ে বলেন, তুমি বর চাও। সে বলে, মা! যদি বর দেবে তবে এই কর, যেন আমি নাতিব সঙ্গে সোনার খালে ভাত খাই। এক ববেতে নাতি, ঐশ্বর্য্য, সোনা খাল সব হল, (সকলের হাস্য)।

[সংসারী ও ত্যাগ, বদ্ধ ও মুক্ত]

“মন থেকে কামিনী-কাক্ষণ ত্যাগ হলে ঈশ্বরের মন যায়, তাঁতে মন গিয়ে লিপ্ত হয়। যিনিই বদ্ধ, তিনিই মুক্ত হতে পাবেন।

ঈশ্বর থেকে বিমুখ হলেই বদ্ধ;—নিকৃতির নীচের কাটা থেকে তফাৎ হয় কখন? যখন নিকৃতির বাটীতে কামিনী-কাক্ষণের ভার পড়ে।

“ছেলে ভূমিষ্ট হয়ে কেন কাঁদে? ‘গর্ভে ছিলাম, বোণে ছিলাম।’ ভূমিষ্ট হয়ে এই বলে কাঁদে—কাঁহাএ কাঁহাএ কাঁহাএ—এ কোথায় এলুম, ঈশ্বরের পাদপদ্ম চিন্তা করছিলাম, এ আবার কোথায় এলুম।

“তোমাদের পক্ষে মনে ত্যাগ—সংসার অনাসক্ত হয়ে কব।

[সংসার ত্যাগ]

মহিমা। তাঁর উপর মন গেলে আর কি সংসার থাকে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে কি? সংসারে থাকবে না ত কোথায় যাবে? আমি দেখছি, যেখানে থাকি, রামের অঘোষণায় আছি। এই জগৎ-সংসার রামের অঘোষণা।

“রামচন্দ্র গুরু কী ছে জান লাভ করিবার পর বলেন, আমি সংসার ত্যাগ করবো। দশবথ তাঁকে বুঝবার জন্য বশিষ্ঠকে পাঠালেন। বশিষ্ঠ দেখলেন, রামের তীব্র বৈরাগ্য। তখন বলেন, ‘রাম! তুমি আগে আমার সঙ্গে বিচার কর, তাৎপর সংসার ত্যাগ কর। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, সংসার কি ঈশ্বর ছাড়া, তা যদি হয়, তা হলে তুমি ত্যাগ কর।’ রাম দেখলেন যে, ঈশ্বরই জীব জগৎ সব হয়েছেন। তাঁর সত্তাতে সনস্ত সত্তাবান। তখন রামচন্দ্র চুপ করে রইলেন। “সংসারে কাম ক্রোধ এই দণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়, নানা বাসনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়, আসক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। যুদ্ধ কেলা থেকে ধোঁই সুবিধা। গৃহে থেকে যুদ্ধই ভাল, খাওয়া মেলে, ধন্যপত্নী অনেক সাহায্য করে। কলিতে অনাগত প্রাণ-সাত জায়গায় অঙ্গের জ্ঞান ঘুরার চেয়ে এক জায়গাই ভাল। এই গৃহে যেন কেলায় ভিতর থেকে যুদ্ধ করা।

“আর সংসারে থাকো, ঝড়ের এঁটোপাতা হসে। ঝড়ের এঁটোপাতাকে কখনও ঘরের ভিতর নিয়ে যায়, কখনও আঁস্তাকুড়ে। হাওয়া যে দিকে যায়, পাতাও সেই দিকে যায়। কখনও ভাল জায়গায়, কখনও মন্দ জায়গায়! তোমাকে এখন সংসারে ফেলেছেন, ভাল; এখন সেই খানেই থাক, আবার যখন সেখান থেকে তুলে ওর চেয়ে ভাল জায়গায় নিয়ে ফেলবেন, তখন যা হয় হবে।

“সংসারে রেখেছেন, তা কি করবে? সংসার ও আত্মসমর্পণ (Resignation) সমস্ত তাঁকে সমর্পণ কর, তাঁকে আত্মসমর্পণ কর—তাহলে আর কোন গোল থাকবে না। তখন দেখবে, এনিই সব করছেন। সবই ‘রামের ইচ্ছা’।

একজন ভক্ত। ‘রামের ইচ্ছা’ গল্পটা কি?

শ্রীহামকৃষ্ণ। কোন এক গ্রামে এতটা তাড়ী থাকে। বড় ধার্মিক, সকলেই তাঁকে বিশ্বাস করে, আর ভালবাসে। তাড়ী হাতে গিয়ে কাপড় দিক্তী করে। খরিদদার দাম জিজ্ঞাসা করলে বলে, ‘রামের ইচ্ছা, সুতার দাম এক টাকা, রামের ইচ্ছা মেহরতের দাম ১০ আনা, রামের ইচ্ছা, মুনফা ১০ আনা, কাপড়ের দাম রামের ইচ্ছা ১০/০। লোকের এতো বিশ্বাস যে, তৎক্ষণাৎ দাম ফেলে দিয়ে কাপড় কিনে নিত। লোকটা ভারি ভক্ত, রাত্রিতে খাওয়া দাওয়ার পর অনেকক্ষণ চণ্ডীমণ্ডপে বসে ঈশ্বর চিন্তা করে, তাঁর নাম গুণ কীর্তন করে। একদিন অনেক রাত হয়েছে, লোকটার ঘুম হচ্ছে না, বসে

আছে, এক একবার তাঁমাঝে থাকে, এমন সময় সেই পথ দিয়ে এক দল ডাকাত ডাকাতি করতে যাচ্ছে। তাদের একজন মুঠের অভাব হওয়াতে ঐ তাঁতীকে এসে বলে, ‘আয় আমাদের সঙ্গে’ এই বলে হাত ধবে টেনে নিয়ে চললো। তারপর অবজন গৃহস্থেব বাড়ী গিয়ে ডাকাতি ক’রলে। কতকগুলো জিনিষ তাঁতীর মাথায় দিলে। এমন সময় পুলিশ এসে পড়ল। ডাকাতিরা পালাল, কেবল তাঁতী মাথায় মোট দর পড়ল। সে বাড়ি তাকে হাজতে রাখা হ’ল। তারপর দিন ম্যাজিষ্টার সাহেবেব কাছে বিচার। কিন্তু গ্রামের লোকে জানতে পেরে সব এসে উপস্থিত। তাঁরা সকলে বলে, হুজুর! এ লোক বখনও ডাকাতি ক’তে পারে না।

সাহেব তখন তাঁতীকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কি গো ভূমি কি ক’রেছে বল?’

‘তাঁতী বলে, হুজুর! রামের ইচ্ছা, আমি রাত্রিতে তাঁত খেলব। তাংবাব রামের ইচ্ছা, আমি চণ্ডিমণ্ডপে বসে আছি, রামেব ইচ্ছা অনেক রাত হ’ল। আমি, রামেব ইচ্ছা, ভগবানের চিন্তা করছিলাম আর তাঁব নাম গান করছিলাম এমন সময় রামের ইচ্ছা, একদল ডাকাত সেই পথ দিয়ে গেল। রামের ইচ্ছা, তারা আশ্রয় ধবে টেনে নিয়ে গেল। রামের ইচ্ছা, তারা এক গৃহস্থেব বাড়ী ডাকাতি করে। রামের ইচ্ছা, আমাব মাথায় মোট দিলে। এমন সময় রামের ইচ্ছা, পুলিশ এসে পড়ল। রামেব ইচ্ছা, আমি দর পড়লুম। তখন রামের ইচ্ছা, পুলিশের লোকেরা আমাব হাজতে দিলে। অ’জ সকালে বাঁমের ইচ্ছা হুজুরেব কাছে এনেচ।

অমন ধার্মিক লোক দেখে সাহেব তাঁতীকে ছেড়ে দেবার ভকুম দিলেন। তাঁতী রাস্তায় বন্ধুদের বলে, রামেব ইচ্ছা, আমায় ছেড়ে দিয়েছে।

‘সংসার করা, সংসার ক’বা স’ই বামে ইচ্ছা।’ তাই তাঁব উপর সব ফেল দিয়ে সংসারে কাজ কর

‘তা না হ’লে আর ক’িইবা ক’বে?’

‘কেরানী একজন জেলে গিছিল। জেল খাটা শেষ হলে, সে জেল থেকে বেরিয়ে এল। এখন জেল থেকে এসে, সে কেবল পেট পেই ক’বে নাচবে না কি? না সে এসে কেরানীগিবিই ক’বে।

‘সংসারী যদি জীবন্ত হয়, সে মনে ক’লে অনায়াসে সংসারে থাকতে পারে। যার জ্ঞানলাভ হয়েছে, তার এখান সেখান নাই। তার সব সমান। যার সেখানে আছে, তার এখানেও আছে।

[কেশব সেন, সংসার ■ জীবশ্রুতি]

যখন কেশব সেনকে বাগানে প্রথম দেখলুম, বলেছিলাম; ‘এরই লাজ খসেছে দেখছি। সভাশুদ্ধ লোক হেসে উঠলো। কেশব বলে, ‘তোমরা হেসো না, এর কিছু মানে আছে, একে জিজ্ঞাসা করি।’ আমি বললাম, যত দিন বেঙাচির লাজ না খসে ততদিন কেবল জলে থাকতে হয়, আড়ায় উঠে ডাঙ্গায় বেড়াতে পারে না। যেই লাজ খসে, অমনি লাফ দিয়ে ডাঙ্গায় পড়ে। তখন জলেও থাকে, আবার ডেঙ্গায়ও থাকে। তেমনি মানুষ যতদিন অবিস্তার লাজ না খসে, ততদিন সংসার, জলে পড়ে থাকে। অবিস্তার লাজ খসলে—জ্ঞান হলে, তবে মুক্ত হয়ে বেড়াতে পারে, আবার ইচ্ছা হলে সংসারেও থাকতে পারে।

ভগবৎকৃপা ও সাধন ।

(স্বামী প্রকাশানন্দ।)

বাং লক্ষ্মী চাপরং লাভং মত্ততে নাধিকং ততঃ ।

যস্মিন্ স্থিতো ন ভঃপেন গুরুণাপি বিচালাতে ॥

যে অবস্থা লাভ করিলে আর কিছু লাভ অধিক বলিয়া মনে হয় না এবং যে অবস্থায় থাকিয়া জীব সংসারের গুরুতর শোক তাপে বিচলিত না, সেই অবস্থা-লাভের জন্ত চেষ্টা করাই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অর্জুনকে পুনঃ পুনঃ এই উপদেশ দিয়াছেন। যিনি সংসার-সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গে আপনার জীবনতরী স্থিরভাবে চালাইতে কৃতকার্য হইয়াছেন, যিনি শোকতাপ যন্ত্রণার ষাট প্রতিঘাতে বায়ুহীন স্থানে নিশ্চল দীপ-শিখার ভ্রাম্য অবিচলিত থাকিতে সমর্থ হইয়াছেন, যাহার নিকট সংসারের বাহ্য চাকচিক্য ■ “ইন্দ্রাদি সম্পদ স্তব্ধ” তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে, যিনি আপনার ভাবে আপনি বিভোর, আত্মতৃপ্ত, আত্মরতি, আত্মারাম সেই জীবই গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়াছেন। ভ্রম্ভ মানব জীবন ধারণ করিয়া সেই চরম অবস্থা লাভের জন্ত একান্ত যত্ন করাই মনুষ্য জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন “মুখে সিদ্ধিসিদ্ধি বলিলে নেশা হইবে না, সিদ্ধি বাজার হইতে কিনিয়া আন, তৎপরে উগা বাটিয়া পান কর, তবে নেশা হইবে ;

ধর্মজগতেও ঐক্য, ধর্মের কেবল উচ্চ উচ্চ কথা মুখে বলিলে জীবনে ধর্মলাভ হয় না, সঙ্গুর অশ্রয়লাভ করতঃ শাস্ত্রানুযায়ী অভ্যাস ও সাধন ব্যতীত ধর্ম-জীবন লাভ অসম্ভব ।” কেবল শাস্ত্র পড়িলে অথবা শিঙিত হইলে কি হইবে ? ছেলেবেলা আমরা ত দ্বিতীয়ভাগে পড়িয়াছি, “মিথ্যা কথা কহিও না,” কিন্তু কায়মনোবাক্যে সত্য পালন করা অতি কঠিন, হয় ত সারা জীবন কাটিয়া গেল, তথাপি কায়মনোবাক্যে সত্যপালন করিতে শিখিলাম না ; আমরা সকলেই ধর্মের কথা অনেক জানি, ধর্মের সুদীর্ঘ বস্তুতা দিতে পারি, কিন্তু স্বাভাবিক জীবনে সেই ধর্মোপদেশগুলি প্রতিফলিত করাই কঠিন । শ্রীশ্রীরাঘবকৃষ্ণদেবের জীবনে এই তত্ত্বের অদ্বুত বিকাশ আমরা শুনিতে পাঠি । তিনি নিরাকর ছিলেন, তিনি শাস্ত্রাদি পড়েন নাই, কিন্তু জ্ঞান ভক্তি যোগের চরম অবস্থা তাঁহার জীবনে অদ্বুতভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল । ইহার মর্মোদ্ঘাটন করিতে যাইলে আমরা দেখিতে পাঠি, কথা ও কায়ে আকাশ পাতাল প্রভেদ । কথা, কায়ে পরিণত করাই, জীবের কর্তব্য । কথা কায়ে পরিণত করার নামই সাধন । সাধন বাতীত সিদ্ধিলাভ অসম্ভব । আমি বাটীতে বসিয়া কাশীর কথা বলিলে ত আর আমার কাশী দেখা হইবে না । আমাকে কষ্ট করিয়া কাশীতে যাইতে হইবে, তবে কাশী দেখার সাক্ষ্য হইবে । বাল্যকাল হইতে সামান্ত বিদ্যাশিক্ষার জন্ত কত পরিশ্রম ও কত ব্যয় করিতে হয়, এক এক পরীক্ষা দিতে অক্টক পরমায়ু ক্ষয় হইয়া যায়, সামান্ত অর্থোপার্জনের জন্ত কত চেষ্টা করিতে হয়, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া জীবনাস্ত করিয়া তবে অর্থোপার্জন করিতে হয়, আর যে বিদ্যা সকলের শ্রেষ্ঠ, সেই পরা বিদ্যা লাভ কি কেবল মুখের কথায় হইবে, না ছোটো শাস্ত্রের শ্লোক মুখস্থ করিলেই হইবে, না ছ একবার জপ বা উপাসনা অথবা একবার ধর্মমন্দিরে যাইলেই হইবে । এই ভগবৎকৃপাভের আশায় পঞ্চমবর্ষীয় শিশু প্রব, হৃৎকেন্দ্র মাতৃস্নেহমমতা দূরে বিসর্জন দিয়া স্বাপদসঙ্কুল বনমধ্যে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, এই ধর্মতত্ত্বলাভের জন্ত রাজপুত্র শাক্যসিংহ রাজ-সিংহাসন ত্যাগ করিয়া কঠোর সাধনে ব্রতী হইয়া বলিয়াছিলেন,—

অত্রাসনে শুযাতু মে শরীরং
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ বাতু
অগ্রাপ্য বোধিং বহুক্লমহুর্ভাং
অত্রাসনাং কায়মতশ্চলিষ্যতে ।

আমি এই আসন করিয়া বসিলাম, আমার শরীর শুষ্ক হইয়া যাইবে, আমার

স্বক্ অশ্রি মাংস চূর্ণীকৃত হইয়া যাউক, সেই বহু বহু কলান্তরেও ছল্লভ যে পরমজ্ঞান লাভ না করিয়া আমার শরীর এই আসন হইতে টলিবে না। কি কঠোর তপস্যা! কি তীব্র সাধন! কি অদ্বুত তাগ!

মহাপুরুষগণ জগতে আদর্শ জীবন লইয়া আবিস্কৃত হন। যে আদর্শ-জীবন লাভ করা জীবের চরম লক্ষ্য, সেই আদর্শ-জীবন আমরা মহাপুরুষদিগের জীবনেই দেখিতে পাই। লোক শিক্ষার জন্মই তাঁহারা ধরনীতলে অবতরণ করেন; যখন জীবগণ ধর্ম্য বিস্মৃত হয়, আদর্শ-জীবনভাভে জীবের ঘোর সন্দেহ ও অবিশ্বাস আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন প্রকৃতির অনৈতিক নিয়ম প্রভাবে, মহাস্রাগণের আবির্ভাব হয়; তাঁহারা নিজ জীবনে সাধনা করিয়া ধর্মের চরম আদর্শ স্বীয় জীবনে প্রাক্ষিপিত করিয়া জীবগণকে সম্মার্গে প্রবর্তন করেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়াই শাস্ত্রে ও ধর্ম্যে বিশ্বাস হয়, হৃদয়ে নিবাসের স্থলে অদম্য উৎসাহ ও বিশ্বাস আসিয়া উপস্থিত হয়। আমরা এইরূপ মহাপুরুষগণের জীবনদে পাঠ করিয়া দেখি, সকলেরই কঠোর সাধক-জীবন, বাক্যের ছটা অন্ন, কেবল বাক্য-সকলকে কার্যে পরিণতির একান্ত চেষ্টা।

একণে প্রশ্ন উঠিতে পারে, নানা পথ, নানা মত; কোন পথ অহুমরগ করিব, কোন সাধন অবলম্বন করিব? কথা এই, লক্ষ্যস্থল সকলেরই এক। শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধভক্তিও একই কথা, ইহাই মহাপুরুষদিগের নিদ্রান্ত বাক্য। চরম স্থল এক, কিন্তু সেই চরমস্থলে যাঁহাদের বিভিন্ন পথ আছে। যেমন মই, বাশ সিঁড়ি বিভিন্ন প্রকার উপায় দ্বারা ছাদে উঠিতে পারা যায়, তদ্রূপ সেই পরমতত্ত্বলাভের বহু পথ আছে। কচিভেদে, জীবের মানসিক অবস্থা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন মতের অবতারণা হইয়াছে। আমি হয়ত নৌকা-যোগে হুগলী যাইতে ভালবাসি, তুমি হয়ত রেলযোগে অথবা অথ কোন উপায়ে তথায় যাইতে আনন্দিত হও, ইহাই পার্থক্য। অপরকে ঘৃণা না করিয়া নিজ পথের উপর নিষ্ঠা করিয়া চলিয়া যাইতে হয়। জ্ঞানী হও, জ্ঞানের ক্ষুধার পথে, ভক্ত হও ভক্তির কোমল পথে, যোগী হও যোগমার্গের সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক পথে, এবং কর্মী হও ত কর্মের কঠোর পথে তোমাকে চলিতে হইবে।

সাধকগণকে সাধারণতঃ চারি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে;—জ্ঞানী ভক্ত, যোগী ও কর্মী। অষ্টধর্মোক্তাচার্য্য শ্রীশঙ্কর বাসস্থত “অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা” ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, সাধনচতুষ্টয় সম্পন্ন হইবার পর

তবে জীবের ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকার জন্মায়, ব্রহ্মজ্ঞান লাভার্থ চেষ্টা করিবার পূর্বে সাধন চতুষ্টয়, অর্থাৎ চারিটী সাধন, করিতে হইবে । প্রথম নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক—এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোন্ বস্তুই বা নিত্য, আর কোন্ বস্তুই বা অনিত্য ইহাই বিচার করা প্রথম সাধন । সমুদায় দৃশ্য অদৃশ্য যাহা কিছু—অনিত্য, নিয়ত পরিবর্তনশীল, হৃদিনের জ্ঞানমরুভূমিতে মরীচিকার ভ্রাম্য মিথ্যা ; আর একমাত্র ব্রহ্ম বা ভগবান্ বা আত্মা—নিত্য, অবিনাশী ও অপরিবর্তনশীল । অনিত্য বস্তুতে আসক্তি করিলেই দুঃখ, শোক ও যন্ত্রণা ; কারণ পরিবর্তনশীল যে বস্তুতেই আসক্ত হওনা কেন, হৃদিন বাদে তাহা তোমার সম্মুখ হইতে সরিয়া যাউবে, হৃদিন পরে তাহার পরিবর্তন হইবে, ফল—তোমার কষ্ট ও যন্ত্রণা । সমসারে আমরা যে হাহাকার শুনিতে পাই, ইহার কাবণ ঐ অনিত্য বস্তুর উপর আসক্তি ; অনিত্য বস্তু হইতে মন গুড়াইয়া লইয়া সেই নিত্য বস্তুর উপর স্থাপন করিতে চেষ্টা কর । দ্বিতীয়—ইহাদুঃখফলভোগবিরাগ । ইহ জগতের যাবতীয় ভোগ্য বস্তুতে এবং পরকালের স্বর্গাদি সুখবিলাসে একান্ত বিরক্তিই দ্বিতীয় সাধন । ইহ জগতের সুখবিলাসের বাহ্য চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া হৃৎথের উৎস খুলিয়া দেওয়ায় ফল কি ? আর এক কথা, আমরা ধর্ম্য করি, ইহ জগতের ভোগ-বিলাস ত্যাগ করি, ভবিষ্যতে মৃত্যুর পর স্বর্গে যাবও অধিক সুখলিপার জন্ম । কি ভোগতৃষ্ণা ! ইহজগতের ভোগ সুখ ছাড়িতে হইবে, এবং পর জগতের ভাবী সুখভোগলাগাও অতলতলে বিসর্জন দিতে হইবে, তবে ব্রহ্মতত্ত্বের আভাস ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হইবে । তৃতীয়—শমদমাদিষট্‌সম্পত্তি দম, শম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও প্রজ্ঞা । বহিঃশ্রিয়গণকে ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে নিগ্রহ করার নাম দম । অন্তঃশ্রিয়গণকে ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে নিগ্রহ করার নাম শম । ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া ধ্যেয়বস্তুতে বিরাম করানর নাম উপরতি । প্রতিকারের চেষ্টা না করিয়া নীতোক্তাদিদ্বন্দ্ব সহকার নাম তিতিক্ষা । চিন্তের একাগ্রতার নাম সমাধান । শুক ও বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাসের নাম প্রজ্ঞা । চতুর্থ—মুমুকুতা ; পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মরণ জনিত শোকা-নলে সন্তপ্ত হইয়া জীবের এই ক্রীড়াপ হইতে মুক্তি হইবার একান্ত ইচ্ছাই চতুর্থ সাধন । এই চারিসাধনে পরিপক্ব হইলে তবে ব্রহ্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসার অধিকারী হয় । জ্ঞানীর পক্ষে মেতি নেতি সাধন আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই, অর্থাৎ ন ইতি, ইহা নয় ; আমরা যাহা দেখিতেছি, শুনিতেছি, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমুদায় পদার্থ

ব্রহ্ম নয় ; শরীর, মন, বুদ্ধি, চিত্ত ■ অহঙ্কার ব্রহ্ম নয় ; এইরূপ বিচার-সাধন করিতে করিতে, এইরূপে স্বরূপের অনুসন্ধান করিতে করিতে জীব দেখে ও প্রত্যক্ষ অনুভব করে যে, সমস্ত জগৎব্রহ্মাণ্ড ইন্দ্রজাল স্বপ্নবৎ, মকুমরীচিকাৎ মিথ্যা, একমাত্র ব্রহ্ম বা পরমাত্মা বা ভগবান্ সত্য এবং আপনার যথার্থ স্বরূপই সেই ব্রহ্ম ; তখনই জ্ঞানী জানেনে বিহ্বল হইয়া বলেন, “শিবকেবলোহং চিদামলকপো শিবোহং শিবোহং”। তখনই তাহার শোকতাপ চলিয়া যায়, ভয় দূরে পলাইয়া যায়, সকল সন্দেহ মিটিয়া যায় ও সকল বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। ইহাই জ্ঞানীর চরম লক্ষ্য। এই প্রত্যক্ষানুভূতি বহুজন্মসাধন-সাপেক্ষ — “বহুনাং জন্মানাং অস্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে”।

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ শরণং পাদসেবনং

অর্চনং বন্দনং দাত্তং সখ্যাম্মনিবেদনং ।

ইহাই ভক্তের সাধন,—ভগবৎগুণ লীলাশ্রবণ, ভগবৎগুণকীর্তন, ভগবৎ-পাদপদ্মে একান্ত শরণাগতি। তাঁহার সেবা, পূজা ও প্রণাম। দাস ও সখা প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবে তাঁহার উপাসনা। আপনাকে তাঁহার পাদপদ্মে একান্তরূপে উৎসর্গীকরণ।

অনন্তকর্মা ও অনন্তচিত্ত হইয়া সেই প্রাণারোহের অনুদিন ধ্যানই ভক্তের একমাত্র কর্তব্য কৰ্ম ও সাধনা। ভগবৎপাদপদ্মের সুধাপান বাতীত ভক্তের অন্ত চিন্তা নাই, অন্ত কার্য্য নাই। ভগবানের নিরন্তর ধ্যান করিতে করিতে, ভক্তের সমস্ত জগৎ ভুল হইয়া যায়, প্রাণাবামের সেই চিদবন মূর্তি দর্শন করিতে করিতে ভক্ত আত্মহারা হইয়া যান, এবং তিনি ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান না। জ্ঞানীর আমি, ও ভক্তের তুমি বা তিনি, একই কথা।

চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ। যিনি চিত্তবৃত্তি সংযম করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারই নাম যোগী। জ্ঞান ও ভক্তের সাধনায় যোগের অঙ্গসকল থাকিলেও এই সাধনার সাধক, বিশেষ যোগী আখ্যা পাইয়াছেন। আমাদের মন অনবরত চতুর্দিকে ধাবিত হইতেছে, একদণ্ডও বিরাম নাই, চিত্তের এই বিভিন্ন মুখী পতি সংযত করিয়া এক ধোয় বস্তুর দিকে সঞ্চালন করাই যোগীর কার্য্য। যেরূপ, বিভিন্নমুখী সূর্য্যকিরণ কেন্দ্রীভূত করিলে এক ভয়ানক তেজ উৎপন্ন হয় সেইরূপ বিভিন্নমুখী মানসিকবৃত্তি একমুখী করিলে অপূর্ণ শক্তির বিকাশ হয়। মনের সেই অবস্থার সহজে তত্ত্বজ্ঞানের বিকাশ হইতে পারে। যোগশাস্ত্রে অষ্টাঙ্গ যোগের কথা লিখিত হইয়াছে। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার

ধ্যান, ধারণা, সমাধি। যে অবস্থায় চিত্তবৃত্তি স্থির হইয়া ধোয় বস্তুতে একাগ্র ভাবে অবস্থান করে, যম নিয়মাদি যোগাঙ্গ সাধন দ্বারা সেই অবস্থা লাভ করাই যোগীর চরম লক্ষ্য। এই যোগসাধনা করিতে করিতে যোগীর কতকগুলি বিভূতি বা সিদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হয়। অনেক সাধক এই সিদ্ধিতে আসক্ত হইয়া চরম লক্ষ্য ভুলিয়া যায়। আমি ঘাইব একস্থানে, যদি পশ্চিম-ধ্য কোন ভাষাসা কিস্বা সৌন্দর্য্যময় স্থানে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া তথায় রহিয়া যাই, তাহা হইলে আমার আর গন্তব্য স্থলে পৌঁছান হইল না। তবে ও সব ঘাইফুটের জাঘ বুঝিতে হইবে। উদ্যমের অপেক্ষ না হইয়া এবং চামড়নের নিকটবর্ত্তী হইয়াছি মনে করিয়া খুব উদ্যমের সহিত সাধনার প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। এই যোগসাধনা বহু কষ্টসাধ্য ও অভ্যাস সাপেক্ষ। এই ছদ্ম বারণহীন মনকে সংযত করা যে কত ধৈর্য্য ও কত দীর্ঘকাল অভ্যাসের প্রয়োজন, তুচ্ছভোগী ভিন্ন কেহই বুঝিতে পারিবেন না।

কর্ম্মা বশেন, তুমি এক দণ্ড কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পার না, তোমাকে কর্ম্ম করিতেই হইবে, অতএব নিকাম ও নিঃস্বার্থ হইয়া কর্ম্ম করিতে অভ্যাস কর, ভগবানের প্রীত্যর্থ কর্ম্ম কর। কর্ম্মফলে আসক্ত হইয়াই আমরা দুঃখ পাই। যাহা কর্তব্য কর্ম্ম, তাহাই করিয়া, কর্ম্মের ফলের জ্ঞান ভাবিও না; ভগবান্ গোতায় বলিয়াছেন, “কর্ম্মেই তোমার অবিকার, কর্ম্মফলে নহে”; কর্ম্মফলে অনাসক্তিই মুক্তির কারণ। অসৎ কর্ম্ম কর, অসৎফল পাইবে, সৎ কর্ম্ম কর, সৎফল পাইবে। আমি কতা নাই, ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব কার্য্য করিতেছে, এই বুদ্ধি আনিবার চেষ্টা কর, আর তোমাকে কর্ম্মে আবদ্ধ করিতে পারিবে না।

সাধনা কালে সঙ্গুর একান্ত আবশ্যিক। বাল্যকালে ক, শিক্ষা হইতে শিক্ষকের প্রয়োজন হয়। আর এই গুরুতর বিষয়ে, জীবন মরণের ব্যাপারে সঙ্গুর ব্যতীত শিক্ষা একেবারে অসম্ভব। “তীর্ণা স্বয়ং ভীষভবার্ণবং জনা-নহেতুনাভ্যাপি ভার্য্যন্তঃ”, সঙ্গুর এই ভীষ সংসার সমুদ্র পার হইয়াছেন, এবং অপর ব্যক্তিদিগকে অহেতু সংসার সাগরের পর পারে লইয়া যান। অনেকে সঙ্গুর অভাবে অসঙ্গুর হাতে পড়িয়া পথভ্রষ্ট হইয়াছেন। তজ্জ্ঞাত্রুতিতে আমরা পুনঃ পুনঃ সঙ্গুর শরণ লইবার ও অসঙ্গুর আশ্রয়ের বিষয় ফল বর্ণনা দেখিতে পাই। “প্রাণ্য বরান্ নিবোধত”, “তত্ত্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাত্তগচ্ছেৎ সমিৎপাদিঃ শ্রেষ্ঠত্বং ব্রহ্মনিষ্ঠং”, শ্রেষ্ঠ গুরুগণের আশ্রয় লাভ করিয়া গেই পরতত্ত্ব

অবগত হও। সেই তব জানিবার কুশ হস্তে করিয়া বেদজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ
গুরুর নিকট যাউবে।

অবিজ্ঞানামৃত্তরে বর্তমানাঃ

স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতশ্রুতমানাঃ ।

জগদ্যমানাঃ পরিত্যজ্য মৃঢ়া

অকেনৈব নীৰ্য্যমানা যথাক্কাঃ ।

অসঙ্গলুপ্তগণ আপনারা অলিচ্ছায় মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে, অগণ আপনাদিগকে
ধীর ও পণ্ডিত মনে করিয়া অহঙ্কারে আত্মহারা হইতেছে। একজন অন্ধ আর
একজন অন্ধকে পথ দেখাছতে যাইয়া যেমন পথ না পাইয়া পথহার্য হইয়া
কেবল ঘুরিতে থাকে, ইহাওও সেইরূপ ধর্ম্মপথের পথিককে বিশেষ লইয়া
গিয়া কেবল ঘুরাইয়া মারে। অতএব সঙ্গলুপ্তাভের জন্ত ভগবানের নিকট
একান্তমনে প্রার্থনা করা কর্তব্য। প্রাণের একান্ত ব্যাকুলতা হইলে সঙ্গলুপ্ত
আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হন। সঙ্গলুপ্তর যেমন আবশ্যক, শিষ্যও
তেমনই সং হওয়া আবশ্যক। সংশিষ্য সঙ্গলুপ্তর আশ্রয়ে সাধনায় অচিরে সিদ্ধি
লাভ করিতে পারে। তবে সঙ্গলুপ্তর আশ্রয়ে অশ্লিষ্টাচারের দোষ সকল সময়েই
গুণরাইয়া যায়।

সাধকের অমুরাগ ব্যাকুলতা একান্ত প্রয়োজন। গুণগুলি বলিয়াছেন,
“তীব্রসংযোগানং আসন্নঃ”, যাহাদের হৃদয়ে তীব্র আবেগ আসিয়া উপস্থিত হই-
য়াছে, তাহাদের সে শুভদিন অতি নিকটাতী। কোন সময়ে একবৃদ্ধ এক
মহাপুরুষকে জিজ্ঞাসা করেন, “প্রভু কবে আমার ভগবান্ লাভ হইবে?”। তত্ক্ষ-
ণেরে তিনি কিছুই বলিলেন না, তাহার হস্ত ধরিয়া নিকটবর্তী সরোবরে লইয়া
গিয়া তাহাকে চুবাইয়া ধরিলেন; যখন তাহার শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল,
তখন তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, “ভগবান্ লাভের জন্ত যখন এইরূপ
প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইবে, তখনই তোমার ভগবান্ লাভ হইবে”।
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, “বিষয়ীর বিষয়ে বেক্রপ টান, সতীর পতিতে বেক্রপ
টান, কৃপণের ধনে বেক্রপ আসক্তি, ভগবানের প্রতি সেইরূপ অমুরক্তি
উপস্থিত হইলে ভগবৎসাত্ত্বের বিলম্ব হইবে না”। তাহার জীবনে
আমরা অদ্ভুত ব্যাকুলতার কথা শুনিতে পাই। দিব্যবাসন হইয়া
সক্কা আগত হইলে রামকৃষ্ণদেব মা মা বলিয়া কাদিতেন ও বলি-
তেন, “মা! রামপ্রসাদকে দেখা দিলি, আমার দেখা দিবি না!”

এই কথা বলিতে বলিতে ছুটিয়া গঙ্গার ধারে যাইয়া জীব টানিয়া বাহির করিতেন। মধ্যে মধ্যে এত কাদিতেন যে লোকে বলিত, বলক একেবারে পাংগল হইয়া গিয়াছে। এইরূপ পাংগল হইতে হইবে, এইরূপ ব্যাকুল ও উন্মত্ত হইতে হইবে, তবে হইবে। ব্যাকুল সাধকের সঙ্গ না করিলে ব্যাকুলতা আসে না, উন্মত্ত সাধুসঙ্গ এবাৎ আশ্রয় ও পরামর্শদাতার বলিয়া শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন, সাধনার আবশ্যিকতা কি, ভগবানের কৃপার কালে সমস্ত হইবে, কিছুই করিবার আবশ্যিকতা নাই। যে ব্যক্তি ভগবানের কৃপার উপর বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া, সংসারের ঘাত প্রতিঘাত অবাধে সহ্য করিয়া সর্বাবস্থায় নিশ্চিন্তভাবে অবস্থান করিতে পারেন, তাঁহার পদধূলি আমি মস্তকে গ্রহণ করি; তিনি গন্তব্যস্থানে পৌছিয়াছেন, তাঁহার অবস্থা স্বতন্ত্র, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যাহারা সংসারের সমস্ত কাণ্ডে চেষ্টা উদ্ভূত প্রকাশ করে, কিছুই অত্যাচার হইলে অশান্তিতে যাহাদের হৃদয় ভরিয়া যায় এবং সেই অত্যাচারের জন্য প্রাণপণ করে, কেবল ধর্মের জন্য কোন চেষ্টা নাই, উদ্ভূত নাই, ভগবানের কৃপায় হইবে বলিয়া বসিয়া থাকে, সে ব্যক্তি কপট, অচিরে বা বিলম্বে সে নিজের গুলদ বৃক্ষিতে পারিবে।

পশ্চাত্তরে যাহারা ভগবানকে নিয়মাত্মীন করিয়া ফেলিতে চান, তাঁহারা বাতুল। অমুক মন্ত্র জপ করিলে ভগবান সাক্ষাৎকার হইবে ইত্যাদি বলিয়া তাঁহাকে গাণ্ডার ভিতর আনিয়া মস্তক-বিকৃতির লক্ষণ ব্যতীত আর কিছুই বোধ হয় না। যিনি মহা স্বাধীন, যিনি নিয়মাত্মী, যাহা হইতে সমস্ত নিয়ম, তাঁহাকে নিয়মের অধীন করা আশ্পর্কীয় কথা ভিন্ন আর কি বলিব। রামকৃষ্ণদেব পুনঃ পুনঃ বলিতেন, “আমার ভাগল যদি আমি লেজের দিকে কাটি”। ভগবানকে নিয়ম দ্বারা বদ্ধ করা যাইতে পারে না। তবে সাধন মন্ত্রাদি জপ, পূজা ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা ও রহস্য কি? যে রূপ আত্মরক্ষা হইতে কখন আশ্রয় পড়িবে, তাহা কেও জানে না, তবে যে বুদ্ধতলে থাকে, সে যে প্রথমে আশ্রয় পাইবে, এ কথা নিশ্চিত—সাধন ভজন, যোগ, সাগ, জ্ঞান, কর্ম, এই সকল দ্বারা সেই ভগবৎরূপ আত্মরক্ষার তলার যাওয়া। তাঁহার কৃপাতেই সমস্ত হয়, একথা অতি সত্য, তবে কবে তাঁহার কৃপা হবে কে জানে। “পাহারাওয়ালার হাতে আধারে থাকে, সে সকলকে দেখিতে পায়, কিন্তু তাহাকে কেহ দেখিতে পায় না, যদি পাহারাওয়ালার

সেই আঁধারে নিজের মুখের দিকে ধরে, তবেই তাহাকে সকলে দেখিতে পায়” । ভগবান্ কৃপা করিয়া নিজ স্বকণ্ঠ প্রকাশিত না করিলে, তাঁহাকে বুঝিবার সাধ্য কাহারও নাহি । শরণাগত হইয়া তাঁহার মুখপানে চাইয়া তাঁহার চরণ তলে পড়িয়া থাক । সময়ে তাঁহার কৃপাগ্রস্ত করিয়া কৃতকৃতার্থ হইবে ।

শ্রীশ্রীরামানুজচরিত ।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ।]

[১২ বর্ষ, ৩২৪ পৃষ্ঠার পর ।

জ্ঞানকাণ্ডের কিন্তু কোনও পরিবর্তন হয় নাই, কারণ যথার্থ জ্ঞান নিতাই একরূপ । ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণগুলি কোটি বৎসর পূর্বে যেমন সত্য ছিল, কোটি বৎসর পরেও সেইরূপ সত্য থাকিবে । সেই অষ্টোত্তরশত উপনিষদ্ পূর্বেও যেমন বর্তমান ছিলেন, এখনও তদ্রূপ বর্তমান আছেন, এবং ভবিষ্যতেও তদ্রূপ থাকিবেন । তাঁহার সকলই একবাক্যে বলিতেছেন, “ভ্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানন্তঃ”, মহাত্মাগণ ভ্যাগদ্বারাই জন্ম মৃত্যু অতিক্রম করিয়া অমবৃত্ত লাভ করিয়াছিলেন । তাগই মনুষ্যের অভাবরূপ ভ্রম দূর করিয়া তাঁহাকে পরমানন্দের অধিকারী করিতে সক্ষম ।

যাহা বলা হইল, তদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাউতেছে যে, জ্ঞানমার্গের পথিক পৃথিবীরাজে অতি বিরল । যাঁহার কর্মবাসনা বলবতী, তিনি উক্ত পথের পথিক হইতে চেষ্টা করিলে তাঁহার অনধিকারচর্চা করা হইবে, এবং তদ্বারা যে তাঁহার ও সমাজের বিশেষ ক্ষতি হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

কর্মকাণ্ডের মূল ধর্ম বা কর্তব্যপালন, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে । সূত্রাং যিনি কর্তব্যপালনপরায়ণ, তাঁহার কর্মে অধিকার নাই । কর্তব্যপরায়ণ মানব যে কর্তব্য অতিপালনে সক্ষম হইবেন, তাহার কারণ, তিনি ইন্দ্রিয়গুলির উপর ক্রিয়ং পরিমাণে আধিপত্য লাভ করিয়াছেন । ইন্দ্রিয়দ্বারা নীরমান ব্যক্তি সতত যথেষ্টাচারী । পূর্বে কোন সময়ে ঋদ্ধিক্ ও যাজ্ঞিককুল ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়া পড়িয়াছিলেন । তাঁহাদের হস্তেই যজ্ঞাদির ভার ব্রহ্ম ছিল । সূত্রাং তাঁহার নীর উদরপূর্তি ও ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার জন্য অতিরিক্ত-মত্তমাংসময় হিংসাসাধ্য যজ্ঞের সৃষ্টি পূর্বক তাহা বেদোক্ত বলিয়া জনসমাজে প্রচার করিলেন । ধর্ম-মূলা ও ধর্মজননী শ্রুতি আপনার ছায়াকে মানবসমাজে স্থাপন পূর্বক লজ্জিতা হইয়া যেন হিমালয়-বন্দরে লুক্কায়িত হইয়া পড়িলেন । এই ছায়া শ্রুতিকে অবলম্বনপূর্বক, ক্রতুক্রত দেবদেবীগণের নাম গ্রহণ করতঃ আয়ত্তুরি যাজ্ঞিককুল

পশুশোণিতে ভাৱভৰ্ষ কলঙ্কিত কৰিতে লাগিলেন। বৰ্ম্ম-জ্ঞান-ময় বেদ সৰ্ব্বত্ৰই অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। ভৱীতি, পশ্চাচাব, হিংসা, দ্বেষ ভাৱতকে যেন বত্ৰপণ্ডব নিবাসভূমি কৰিয়া তুলিল। সাজিক আচাব, দয়া, দাক্ষিণ্য, উদারতাৰ অভাব সৰ্ব্বত্ৰই পৰিলক্ষিত হইল। অতাব হইলেই তাহাৰ পূৰ্ত্তি আছে, ইহা পূৰ্বে দেখাইয়াছি। সেই স্বাভাবিক নিয়মানুসাৰে, সত্ত্বগুণ, দয়া, দাক্ষিণ্য আৰু উদারতাৰ মূৰ্ত্তি পৰিগ্ৰহপূৰ্ণক সৰ্ব্বার্থসিদ্ধ বুদ্ধ নামে হিমালয়প্ৰান্তে উদ্ভিত হইলেন। জন্মমৃত্যুজৰাণ্যাদিহুংখদোষময় জীৱনৰ উপৰ বীতশ্ৰদ্ধ হইয়া যৌবনৰ প্ৰাৱেশই শিনি বাণপ্ৰস্ৰী ও ভিক্ষুক হইলেন এবং পৰিশেষে হুংখলেশপৰিশূন্ত শান্তিদাময় পথ আৱিষ্কাৰপূৰ্ণক ত্ৰিতাপতপ্ত মানবকুলকে তৎপণেৰ পথিক কৰিয়া আচড়াল সকলকেই অমৃত্যেৰ অধিকাৰী কৰিলেন। আৱদ্ধগুণ পৰ্য্যন্ত যাবতীৰ জীবকুল সমভাবে তাঁহাৰ সুবিশাল হৃদয়ৰাজ্য স্থান প্ৰাপ্ত হইয়াছিল। ছায়াশক্তিৰ বিভীষিকাময়ী মূৰ্ত্তি ও যাজিককপোলক্লিত ৰাক্ষস-তুলা জগৎকৰ্ত্তা, এ দুটাই কেবল তাঁহাৰ দৃষ্টিতে ছেয় বলিয়া বোধ হইয়াছিল। যে জগৎকৰ্ত্তা ভৱীতি, পশ্চাচাব, হিংসা, দ্বেষাদিৰ পৃষ্ঠপোষক, সে কি কখন জগৎকৰ্ত্তাৰ আসন গ্ৰহণ কৰিতে পাৰে? স্তববাং তিনি তাৎকালিক শ্ৰুতি ও ঈশ্বৰ উভয়কেই নিৰ্দ্দাসিত কৰিয়া দিয়া সংকল্পেৰ পূজা প্ৰচাব কৰিলেন। শুভাশুভ কৰ্ম্ম শুভাশুভ ফল প্ৰসব কৰে, অতএব হে মানব, শুভকৰ্ম্মেৰ অমুষ্ঠান কৰ, সুখে থাকিবে। অজলোক বুদ্ধকে নাস্তিক বুলে, কাৰণ তিনি ঈশ্বৰ মানেন নাই। তিনি যে ঈশ্বৰকে মানেন নাই, সে ঈশ্বৰকে না মানাই ভাল। একুপ ঈশ্বৰকে মান্ত কৰিয়া আন্তিক হওয়া অপেক্ষা যে নাস্তিক হওয়া সহস্ৰগুণে ভাল, ইহা পাঠকমাত্ৰই স্বীকাৰ কৰিবেন। বস্তুতঃ বুদ্ধদেব কি নাস্তিক ছিলেন? তাঁহাৰ ন্যায় ঈশ্বৰপৰায়ণ আন্তিক জগতে সাতিশয় বিৰল। কাৰণ কৰ্ম্ম কৰ্ত্তা বাতীত কুত্ৰাপি দৃষ্ট হয় না। তিনি শুকৰ্ম্ম মানিয়াছেন, স্তববাং সংকৰ্ত্তাকেও তৎসঙ্গে মানা হইয়াছে। ঈশ্বৰই ছেয়গুণৰহিত, সৰ্ব্ব-কলাণ্ডগুণমণ্ডিত সংকৰ্ত্তা। অতএব বুদ্ধদেবকে নাস্তিক বলিব কি প্ৰকাৰে?

তাঁহাৰ সৰ্ব্বতোমুখী উদার হৃদয় সমভাবে সৰ্ব্বজীবকুলেৰ পৰ মঙ্গলেৰ জন্ত সৰ্ব্বদাই জগজ্জক থাকিত। স্তববাং অধিকাৰীনিৰ্দ্দাচন তাঁহাৰ পক্ষে এক প্ৰকাৰ অসম্ভবপৰ হইয়াছিল। তিনি সাধু অসাধু, বালক বৃদ্ধ, স্ত্ৰী পুৰুষ, ধনী দরিদ্ৰ, পণ্ডিত মূৰ্খ সকলকেই নিৰ্দ্দাশপণেৰ পথিক কৰিলেন। কিন্তু যেখন উদয়ময় ৰোগগ্ৰস্ত প্ৰচুৰব্যত্ৰাসিত পৰিপাক কৰিতে লক্ষ্য হয় না,

সেইকণ অনদিকাবীগণও তৎপ্রদত্ত মহামূল্য উপদেশরাজি ভদ্রয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইল না। সুতরাং তাঁহার পরম পবিত্র আন্তিকধর্ম্য নাস্তিকতায়, ও শূন্যবাদে পরিণত হইল। “সত্য মিথ্যা, ধর্ম্ম অধর্ম্ম সকলই মিথ্যা। জগতের সৃষ্টিকর্তা কেহই নাই, কাহাকে ভয় করিব ?” এইরূপ ধারণা বশতঃ বৌদ্ধগণ যথেষ্টাচারপরায়ণ হইলেন। জগতে পুনরায় সুখশান্তির অভাব হইল। পৃথিবী বৌদ্ধানুরদলের ভায়ে গীড়া পাইতে লাগিলেন। সুতরাং জগতের দুঃখ অপনয়নের জন্য মঙ্গলময় বিধাতা শ্রীশ্রীশঙ্কর নাম গ্রহণ করিয়া লোকগুরু-রূপে অবতীর্ণ হইলেন।

ভগবান শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য যোড়শবর্ষীয় যুবকমাত্র। কিন্তু যেমন তরুণ তপনের সম্মুখে জগতের তমোরাশি কখনও অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ দিব্যপ্রতিভোদ্ভাসিত বদনমণ্ডল, পরম মনোহর সেই তেজস্বী যুবকের সম্মুখে নাস্তিকতা যথেষ্টাচার প্রভৃতি বিছুই অবস্থান করিতে পারিল না। দিব্যগমে তারকাবলির জ্বায়া বৌদ্ধানুরগণ ভারত গগন হইতে চিরদিনের জন্য অপনামিত হইল। নির্মল জ্ঞানালোকে চতুর্দিক্ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আধ্যাত্মিতে পুনরায় শান্তির রাজ্য সংস্থাপিত হইল। ধর্ম্মজ্ঞানজননী ঋতিদেবী হিমাদ্রি-কন্দর হইতে বহির্গতা হইয়া সেই দিব্যশাস্তি, নবীন সন্তাসীর কণ্ঠে বৎসল্য অর্পণ করতঃ তাঁহাকে পতিভে বরণ করিলেন। ঋতিসনাথ শঙ্কর অধিকাংশ নির্বীচন-পুরঃসর পুনরায় বেদমার্গ প্রকটিত করিলেন। সনাতনধর্ম্মের জয়পতাকা হিমাদ্রি হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সর্বত্রই উড্ডীয়মান হইল। দেবপিতৃগণ স্বাধাযধ্যমন্ত্রে পুনরায় তর্পিত হইতে লাগিলেন। চিরসুখ, বিজ্ঞান-বিগ্রহ অধিকূল উপনিষদ্ সমূহের পবিত্র ধ্বনিতে পুনরায় জাগরুক হইয়া উঠিলেন। ভাবত-মাতার আর আনন্দের সীমা রহিল না।

স্বকর্ম্ম সাধন পূর্ব্বক জ্যৈষ্ঠ ১৭ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে শঙ্করমুন্নি শঙ্করদেব স্বকীয় পরমধামে গমন করিলেন। কাল এক দিকে যেমন সুন্দর সুন্দর নূতন বস্তুর আবির্ভাব করাইয়া সকলের চিত্তকে পুলকিত ও আকৃষ্ট করে, অল্প দিকে, আবার সেই চিত্তোৎফুল্লকর নবীন পদার্থকে ছিন্ন ভিন্ন বিশোধ করিয়া হরিত্রেরও হেস করিয়া তুলে। ইহাই কালধর্ম্ম। সেই কালধর্ম্মানুসারে শঙ্কর-কথিত বেদচতুষ্টয়সার মহাবাক্যচতুষ্টয়ের হুরর্থ করিয়া তদ্রূপাবলম্বী অনেক সন্তাসীবিশোধারী ইন্দ্রিয়পরশ মানব, আপনাদের উপর এবং সমাজের উপর বহু অনর্থ আনিয়া ফেলিলেন। “অহং ব্রহ্মস্মি” বাক্যে তাঁহার সার্বভৌমত্ব-

পরিমিত, সপ্তদাতুময়, বিষ্টামুদ্রাহী, জন্মমৃত্যুজরাব্যাদির নিবাসভূমি, সক্ষীর্ণ-দৃষ্টি, অক্ষবনধরজীবন, অতীতানাগত বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, এবং অকৃতবুদ্ধি মধুসাই অনাদি, অনন্ত, সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ, সৰ্বাশ্রয়, পরমানন্দধাম, অচ্যুত ব্রহ্ম একরূপ স্থির করিলেন। পদ্মপত্রের যেকপ জল লগ্ন হইতে পারে না, ব্রহ্ম বস্তুতেও সেইরূপ পুণ্য পাপ, আচার অনাচার, সত্য মিথ্যা প্রভৃতি কিছুই সংশ্লিষ্ট হইতে পারে না। আমিই সেই ব্রহ্ম, —সুতরাং আমি যাহাই করি না কেন, আমাতে কোনও দাগ লাগিতে পারে না। ইহাপেক্ষা পৈশাচিক সিদ্ধান্ত আর কি হইতে পারে? একরূপ ধারণার দশবস্তীগণ যে শীঘ্রই আপনাদের ■ শ্বদেশের সর্বনাশের কারণ হইবে, তাহা কি আর বুঝিতে বিলম্ব হয়? বস্তুতঃই উক্ত স্বকপোলকল্পিতহৃদযর্থকারীগণ শঙ্করকথিত পরমনির্গুণ ধর্ম্য ধারণা করিতে না পারিবা, পুনরায় ভারতবর্ষে, দুর্গীতি, হিংসা, দ্বেষ, অমত্য প্রভৃতির রাজ্য স্থাপন করিল। সুখ, শাস্তি ও সত্যের অভাব সর্বত্রই পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। সেই অভাব দূর করিবার জন্ত যে মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইলেন, হে পাঠক! এস এক্ষণে আমরা সেই বিশিষ্টদৈবতবাদপ্রচারকর্তা ভগবান্ শ্রীশ্রীরামানুজাচার্যের নিখল জীবনচরিত্র আলোচনার জন্ত আগ্রসর হই। এ ভাবরাজ্যে অভাব বস্তু থাকিতে পারে না। সুখ, শাস্তি, সত্য, দাক্ষিণ্য, ধর্ম্য প্রভৃতি ভাব বস্তু এবং হুঃখ, অশাস্তি, মিথ্যা, হিংসা, সক্ষীর্ণতা, ঈর্ষা, দ্বেষ, অধর্ম্য প্রভৃতি অভাব বস্তু। যাহা না থাকিলে মনুষ্যের কষ্ট হয়, তাহাই ভাব পদার্থ। অতএব সুখ শাস্তি প্রভৃতি ভাব বস্তু, এবং তৎসমুদয়ের অভাব, হুঃখ অশাস্তি প্রভৃতি অভাব বস্তু। অভাব হইলেই ভাব আসিয়া তাহার প্রতিবিধান করে, ইহা পূর্বে প্রমাণ করা হইয়াছে। সেই নিয়মানুসারেই ভারতভূমিতে শ্রীমদ্রামানুজাচার্যের অবির্ভাব হইল।

দ্বিতীয় ভাগ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মাদ্রাজ হইতে সার্কি ত্রিযোজন নৈর্ঘ্যেতে ত্রীপেরেরম্ভের নামে একটি বর্জিত গ্রাম আছে। সংস্কৃত ভাষায় ইহার নাম শ্রীমহাভূতপুরী। গ্রামবাসীদের মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক। একটি মণ্ডীর ও বিশাল বিষ্ণু-মন্দির অভ্যন্তরে অর্গস্থিত। তন্মধ্যে কেশব পেরুমল নাম ধারণ পূর্বক ত্রিলোক-ভর্তা বিষ্ণু সন্নিভবদনে, সকলের প্রতি সমভাবে রূপাকটাক বিতরণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন। মন্দির প্রাঙ্গণের অপর পার্শ্বে অস্ত্র একটি দেবগৃহ শোভা পাইতেছে। ইহাতে ষষ্টিরাজ, ভক্তবীর, ভক্তবৎসল, বেদান্তকমলভাস্বর, ভাব্যকার শ্রীমদ্রামানুজাচার্য যুক্তকরে সেবকরাঞ্জের আসন গ্রহণ করিয়া

উপনিষ্ট আছেন। সম্মুখে একটি নিশ্চয়নসলিলা, নিগুরঙ্গা, সুবিশাল দীর্ঘিকা পবিত্রভক্তহৃদয়ের স্থায় সেই বৈকুণ্ঠপ্রতিম সমগ্র দেবায়তনটিকে স্থায় অভ্যন্তরে ধারণ করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত ভক্তত্যা নৈসর্গিক খোভা সবলেরই চিত্তকে আকর্ষণ করে। স্থানটি নানাবিধ বৃক্ষলতামণ্ডিত, বিহগকুলের মধুর কলরবে মুগ্ধরিত, মধ্যে মধ্যে প্রস্ফুটিত কুসুমকুল কর্তৃক উদ্ভাসিত ও দোরভিত, শান্তি-মাধুর্য্য-সৌন্দর্য্য-প্রচুর, এবং অষ্টপুঙ্খনাকীর্ণ। দেবিলে বোধ হয়, যেন বিশ্বের পালন-দায়ী নিরন্তর নিযুক্ত থাকায় মধ্যে মধ্যে পরিশ্রম অল্পভব করিলে স্মীয় প্রিয়তম সেবকের সহিত কমলাপতি তথায় বিশ্রামলাভ করিবার জন্ত আগমন করিয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ)

রামকৃষ্ণ-মিশন।

স্বামীবিবেকানন্দ।— ঢাকা হইতে স্বামীজি ৮ চন্দ্রনাথ ও.

শ্রীশ্রীকামাখ্যা দর্শন করিতে যান। কামাখ্যায় গোহাটী সহরে তিনটি অতি সুন্দর বক্তৃতা করেন। গোহাটীগণসিগণ আশাতীত মন্তোয়লাভ করিয়াছিলেন। শরীর আরও বেশী অসুস্থ হওয়াতে স্বামীজি কয়েক দিবসের জন্ত শীর্ণও আসেন; সংবাদ পাইয়াই তথায় স্বয়ং শ্রীযুক্ত কটন সাহেব স্বামীজিকে যাহার পর নাই খাতির যত্ন ও অত্যাশা করিয়াছিলেন; দেখানও স্বামীজির একটি বক্তৃতা হয়। প্রায় যাবতীয় ইংরাজ কস্মচারী উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা শুনিয়া শ্রীযুক্ত কটন সাহেব অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। সকলকারই নিবট শ্রদ্ধাশ্রদ্ধা করিতেছেন। প্রজারঞ্জক বটন সাহেবের অসামান্য নম্রতা ভদ্রতা এবং গুণগ্রাহিতা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। স্বামীজি এক্ষণে মঠে প্রত্যাগমন করিয়াছেন; শরীর তত সুস্থ নয়।

সিস্টার নিবেদিতা।— ইংলণ্ডে রামকৃষ্ণ-মিশনের প্রচার-

কার্য্য খুবই হইতেছে। ইংলণ্ডের বড় বড় সভায় এবং সম্প্রদায়ে ব্রহ্মচারিণী নিবেদিতা অতি সাদরে ও সাগ্রহে আহূত হইতেছেন। তথায় তিনি ভারতের সমাজচিত্র এবং গার্হস্থ্য পারিবারিক চিত্র আশ্চর্য্য ক্ষমতার সহিত অঙ্কিত করিয়া সকল নর নারীর সমক্ষে দেখাইতেছেন যে, ভাবভেদে গৌরব কত উজ্জল, কত মহিমান্বিত, এবং কত অধুকেরণীয়। ভারতের নিম্নকগণ ব্রহ্মচারিণীর নিকট নির্দোষ হইয়া যাইতেছেন। ক্রমশঃ সকলেই ভারতের গুণ গ্রহণ করিতেছেন। শ্রীযুক্ত রমেশ বাবু একস্থলে আমতা নিবেদিতার সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, তাহার দিগ্ভা বুদ্ধি ও বলিবার-কহিবার ক্ষমতা অলোকসামান্য। একপ ব্যক্তি আর কিছু দিন ইংলণ্ডে থাকিলে ভারতের প্রভূত মঙ্গল সন্দেহ নাই। শুনিলাম, সিস্টার, বর্তমান ভারত সম্বন্ধে এমন একখানি সুন্দর পুস্তক প্রণয়ন করিতেছেন যে, তাহার দ্বারা ইংরাজগণ প্রচুব উপকৃত হইবেন এবং ভারতেরও যথেষ্ট গৌরব বুদ্ধি হইবে। একপ উচ্চধরণের বহি নাকি আর এ পর্য্যন্ত বেহ বাহির করিতে পারেন নাই। প্রার্থনা করি, তিনি শীঘ্রই কৃতকার্য্য হউন।

মাহুষের অতি নিখিল চক্ষুর দ্বারা থাকিতে পারে, কিন্তু সে কিছুই দেখিতে পাইবে না। অতএব, উহা বিশেষ আবশ্যক যে, পুরুত হস্তিযন্ত্রী যেন থাকে। আমাদের প্রত্যেক হস্তিযন্ত্রী সম্বন্ধেও তদ্রূপ। বাহিরের বর্ণ কেবল ভিতরে শব্দ সহসা যাইবার বহনান; উহা মস্তিষ্ককে কেন্দ্রে নাওয়া চাই। তবু উহাই পর্যাপ্ত নহে। কখন কখন একদল হস্তি, ভূমি তোলাব পুস্তকাগারে বসিয়া একাগ্রমনে কোন পুস্তক পড়িতেছে, এমন সময় ঘড়িতে বারটা বাজিল, কিন্তু ভূমি তাহা শুনিতে পাঠিলে না। এখানে কিসেব অভাব? মন উহাতে ছিল না। অতএব আমবা দেখিতেছি, ভূতায়ত্তা, মন অগ্ৰাহী থাকা চাই। প্রথম, বাহ্য যন্ত্র; তার পর এই বাহ্য যন্ত্রটী হস্তিযন্ত্রে নিকট যেন এই বিষয়কে বহন করিয়া লইয়া যায়; তারপর আগার মন ইন্দ্রিয়ে যুক্ত হওয়া চাই। যখন মন ঐ মস্তিষ্ককে কেন্দ্রে যুক্ত না থাকে, তখন বর্ণ যন্ত্রে বর্ণ মস্তিষ্ককে কেন্দ্রে বিষয়ের ছাপ পড়িতে পারে, কিন্তু আমবা উহা বুঝিতে পারিব না। মনও কেবল বাহ্যক মাত্র, উহাকে ঐ বিষয়ের ছাপ আরো ভিতরে বহন করিয়া বুদ্ধিকে প্রদান করিতে হয়। বুদ্ধি উহার সহকে নিশ্চয় করে। তথাপি কিন্তু পর্যাপ্ত হইল না। বুদ্ধিকে আবার জাবো ভিতরে লইয়া গিয়া এই শরীরের রাজা আত্মার নিকট সমর্পণ করিতে হয়। তাহার নিকট পড়িলে, তিনি তবে আদেশ করেন, “কর” অথবা “করিও না।” তখন মেয়ে ক্রমে উহা ভিতরে গিয়াছিল, মেয়ে মেয়ে ক্রমে আবার বহির্গত হইতে, — প্রথমে বুদ্ধিতে, তার পর মনে, তারপর মস্তিষ্ককে কেন্দ্রে, তাবপব বহির্গত, তখনই বিষয়-জ্ঞান সম্পূর্ণ হইল বলা যায়।

যন্ত্রগুলি মাহুষেব সূত্রদেহে অবস্থিত। মন কিন্তু তাহা নহে, বুদ্ধিও নহে। হিন্দুশাস্ত্রে উহাদেব নাম সূক্ষ্ম শরীর, খৃষ্টিয়ান শাস্ত্রে আধ্যাত্মিক শরীর। উহা এই শরীর হইতে অনেক সূক্ষ্ম বটে, কিন্তু উহা আত্মা নহে। আত্মা এই সকলের অতীত। সূক্ষ্মশরীর অল্প দিনেই ধ্বংস হইয়া যায়—খুব সামান্য কারণে উহার ভিতরে গোলযোগ ঘটে ও উহার ধ্বংস হইতে পারে। সূক্ষ্ম শরীর এত সহজে নষ্ট হয় না। কিন্তু উহাও কখন সবল, কখন বা দুর্বল হয়। আমরা দেখিতে পাই, বুদ্ধি লোকেব ভিতর মনের তত বল থাকে না, আবার শরীর সবল থাকিলে মনও সবল থাকে, নানাবিধ ঔষধ মনের উপর কাণ্ড করে, বাহিরের সকল বস্তুই উহার উপর কাণ্ড করে, আবার উহাও বাহ্য জগতের উপর কাণ্ড করিয়া থাকে। যেমন শরীরের উন্নতি অবনতি আছে, তেমনি মনেরও সবলতা দুর্বলতা আছে, অতএব মন কখন আত্মা হইতে পারে না, কারণ আত্মা অবিমিশ্র ও অমরহিত।

১৫ই আগষ্ট, ১৩৮৮।] উদ্বোধন। [৩] ৩০৫

আমরা কিরূপে উহা জানিতে পারি? আমরা কি করিয়া জানিতে পারি যে, মনের পশ্চাতে আরো কিছু আছে। স্বপ্রকাশ জ্ঞান কখন জড়ের ধর্ম হইতে পারে না। এমন কোন জড় বস্তু দেখা যায় নাই, জ্ঞানই যাহার স্বরূপ জড় ভূত কণন আপনাকে প্রকাশ করিতে পাবে না। জ্ঞানই সমুদয় জড়কে প্রকাশ করে। এই যে সমুখের হল hall দেখিতেছি, জ্ঞানই উহার মূল বলিতে হইবে, কারণ কোন না কোন জ্ঞানের সহায়তা ব্যতিরেকে উহার অস্তিত্বই উপলব্ধ হইত না। এই শরীর স্বপ্রকাশ নহে। যদি তাহাই হইত, তবে মৃত ব্যক্তির দেহও স্বপ্রকাশ হইত। মন অথবা আধ্যাত্মিক শরীরও স্বপ্রকাশ হইতে পাবে না। উহা জ্ঞানস্বরূপ নহে। যাহা স্বপ্রকাশ, তাহার কখন ধ্বংস হয় না। যাহা অপরের আলোক লইয়া আলোকিত, তাহার আলোক কখন থাকে, কখন থাকে না। কিন্তু যাহা আলোকস্বরূপ, তাহার আসা যাওয়া, সর্বলতা দুর্বলতা আবার কি? আমরা দেখিতে পাই, চক্ষের ক্ষয় হয়, আবার উহার কণা বৃদ্ধি হইতে থাকে,—তাৎপার্য কারণ, উহা সূর্যের আলোকে আলোকিত। যদি অগ্নিতে লৌহপিণ্ড ফেলিয়া দেওয়া যায়, আর যদি উহাকে গোহিতোত্তপ্ত করা যায়, তবে উহা আলোক বিকিরণ করিতে থাকিবে, কিন্তু ঐ আলোক অপরের বলিয়া উহা চলিয়া যাইবে। অতএব ক্ষয় কেবল সেই আলোকেই সম্ভব, যাহা অপরের নিকট হইতে গৃহীত, যাহা স্বপ্রকাশ আলোক নহে।

একগে আমরা দেখিলাম, এই ব্রহ্মদেহ স্বপ্রকাশ নহে, উহা আপনাকে আপনি জানিতে পারে না। মনও আপনাকে আপনি জানিতে পারে না। কেন? কারণ, মনের শক্তির হ্রাসবৃদ্ধি আছে, কখন উহা সর্বল কখন আবার দুর্বল হয়, কারণ বাহ্য সৰল বস্তুই উহার উপর কার্য করিয়া উহাকে সর্বল ও করিতে পারে, দুর্বলও করিতে পারে। অতএব মনের মধ্য দিয়া যে আলোক আসিতেছে, তাহা উহার নিজের নহে। তবে উহা কাহার? উহা এমন কাহারও আলোক অবশ্য হইবে, যাহার পক্ষে উহা ধার করা আলোক নহে, অথবা অপর আলোকের প্রতিবিম্ব নহে, কিন্তু যাহা আলোকস্বরূপ; অতএব সেই পুরুষের স্বরূপভূত যে জ্ঞান, তাহার কখন নাশ বা ক্ষয় হয় না, উহা কখন প্রাণল কখন বা মূঢ় হইতে পারে না। উহা স্বপ্রকাশ—উহা আলোকস্বরূপ। আত্মা জ্ঞানেন, তাহা নহে, আত্মা জ্ঞানস্বরূপ; আত্মার অস্তিত্ব আছে, তাহা নহে, আত্মা অস্তিত্বস্বরূপ; আত্মা যে স্থা, তাহা নহে, আত্মা স্থাস্বরূপ। যে

স্বামী, তাহার স্বাধীন অপর কাহারও নিকট প্রাপ্ত—উহা আর কাহারও প্রতিবিম্ব ।
যাহার জ্ঞান আছে, সে অপর কাহারও নিকট জ্ঞানলাভ করিয়াছে, উহা
প্রতিবিম্বস্বরূপ । যাহাব অস্তিত্ব আছে, তাহার সেই অস্তিত্ব অপর কাহারও
অস্তিত্বের উপর নির্ভর করিতেছে । যেখানেই গুণ ॥ গুণীর ভেদ আছে,
সেখানেই বৃত্তিতে হইবে, সেই গুণগুলি গুণীর উপর প্রতিবিম্বিত হইয়াছে ।
কিন্তু জ্ঞান, অস্তিত্ব বা আনন্দ এ গুলি আত্মাব ধর্ম্য নহে—উহাবা আত্মার
স্বরূপ ।

পুনরায় প্রশ্ন হইতে পারে, আমরা এ কথা স্বীকার করিয়া লইব কেন ?
কেন আমরা স্বীকার করিব যে, আনন্দ, অস্তিত্ব, স্বপ্রকাশিতা আত্মার স্বরূপ,
আত্মাব ধর্ম্য নহে ? ইহাব উত্তর এইঃ—যেমন আমরা দেখিয়াছি, শবীরের
প্রকাশ মনের প্রকাশে, যতক্ষণ মন থাকে, ততক্ষণ উহার প্রকাশ, মন চলিয়া
গেলে দেহেরও প্রকাশ আর থাকে না । চক্ষু হইতে মন চলিয়া গেলে, আমি
তোমার দিকে চাহিয়া থাকিতে পারি, কিন্তু তোমার দেখিতে পাইব না ; অথবা
শ্রবণেন্দ্রিয় হইতে উহা চলিয়া গেলে, তোমাদের কথা একবিন্দুও শুনিতে পাইব
না । সকল ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেই এইরূপ । সুতরাং আমরা দেখিতে
পাইলাম, শরীরের প্রকাশ—মনের প্রকাশে । আবার মন সম্বন্ধেও তদ্রূপ ।
বহির্জগতের সকল বস্তুই উহার উপর কার্য্য করিতেছে, সামান্য কারণেই উহার
পরিবর্তন ঘটতে পাবে, মস্তিষ্কের মধ্যে একটু সামান্য গোলমাল হইলেই উহার
পরিবর্তন ঘটতে পারে । অতএব মনও স্বপ্রকাশ হইতে পারে না, কারণ
আমরা সমুদয় প্রকৃতিতেই দেখিতেছি, যাহা কোন বস্তুর স্বরূপ, তাহার
পরিবর্তন হইতে পাবে না । কেবল যে গুলি অপর বস্তুর ধর্ম্য, যাহা অপর
বস্তুর প্রতিবিম্বস্বরূপ, তাহারই পরিবর্তন হয় । কিন্তু তর্ক হইতে পারে, আত্মার
প্রকাশ, আত্মার জ্ঞান, আত্মার আনন্দও কেন ঐরূপ অপরের নিকট হইতে গৃহীত
হউক না ? এরূপ দীকারে দোষ এই হইবে যে, ইহার অস্ত্র কিছু পাওয়া
যাইবে না ;—একণ প্রশ্ন উঠিলে, উহা আবার কাহার নিকট হইতে আলোক
প্রাপ্ত হইল ? যদি বল, ‘অপর কোন আত্মা হইতে,’ তবে আবার প্রশ্ন উঠিলে—
উহাই বা কোথা হইতে আলোক পাইল ? অতএব অবশেষে আমরা দিগকে এমন
এক আয়নার খামিতে হইবে, যাহার আলোক অপরের নিকট প্রাপ্ত নহে ।
অতএব ত্রাসদ্রুত সিদ্ধান্ত এই, যেখানে প্রথমেই স্বপ্রকাশিতা দেখিতে পাই,
সেখানেই আমি, আর অধিক অগ্রসর না হওয়া ।

অতএব আমরা দেখিলাম, মানুষেব প্রথমতঃ এই স্থল দেহ, তৎপরে সূক্ষ্ম শরীর—উহার পশ্চাতে মানুষেব প্রকৃত স্বরূপ আত্মা রহিয়াছেন। আমরা দেখিয়াছি, স্থলদেহের সমুদয় শক্তি মন হইতে গৃহীত—মন আবার আত্মার আলোকে আলোকিত।

আত্মার স্বরূপসম্বন্ধে আবার নানা প্রশ্ন উঠিতেছে। আত্মা স্বপ্রকাশ, সচ্চিদানন্দই আত্মার স্বরূপ, এই যুক্তি হইতে যদি আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, তবে স্বভাবতঃই ইহা প্রমাণিত হইতেছে, যে, উহা শূন্য হইতে সৃষ্ট হইতে পারে না। বাহ্য স্বপ্রকাশ, অপরবস্ত-নিরপেক্ষ, তাহা কখন শূন্য হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। আমরা দেখিয়াছি, এই জড়জগতও শূন্য হইতে হয় নাই—আত্মা ত দূরের কথা। অতএব উহার সর্বদাই অস্তিত্ব ছিল। এমন সময় কখন ছিল না, যখন উহার অস্তিত্ব ছিল না, কারণ যদি আত্মার অস্তিত্ব ছিল না, তবে কাল কোথায় ছিল? কাল আত্মার ভিতরে। যখন আত্মার শক্তি মনের উপর প্রভাবিত হয়, আর মন চিন্তা কবে, তখনই কালের উৎপত্তি। যখন আত্মা ছিল না, তখন সূত্রায় চিন্তাও ছিল না, আর চিন্তা না থাকিলে, কালও থাকিতে পারে না। অতএব যখন কাল আত্মাতে রহিয়াছে, তখন আত্মা এক সময়ে বর্তমান ছিলেন, কি করিয়া বলা যাইতে পারে? উহা বজ্রও নাই, যুত্যাও নাই, উহা কেবল বিভিন্ন সোপানের মধ্য দিয়া চলিতেছে মাত্র। উহা ধীরে ধীরে আপনাকে নিম্ন অবস্থা হইতে উচ্চ ভাবে প্রকাশ করিতেছে। উহা মনের ভিতর দিয়া শরীরের উপর কার্য্য করিয়া আপনার মহিমা বিকাশ করিতেছে, আব শরীর দ্বারা বাহ্য জগৎ গ্রহণ করিতেছে ও উহাকে বুঝিতেছে। উহা একটী শরীর গ্রহণ করিয়া উহাকে ব্যবহার করিতেছে, আর যখন সেই শরীর দ্বারা আর কোন কার্য্য হইবার সম্ভাবনা থাকে না, তখন আর এক এক শরীর গ্রহণ করে।

এক্ষণে আবার আত্মার পুনর্জন্মসম্বন্ধে প্রশ্ন আসিল। অনেক সময় লোকে এই পুনর্জন্মের কথা শুনিতেই ভয় পায়, আর লোকের কুসংস্কার এত প্রবল যে, চিন্তাশীল লোকেও বরং বিশ্বাস করিলে যে, আমরা শূন্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, তারপর আবার মহা যুক্তির সহিত সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে চেষ্টা করিলে যে, যদিও আমরা শূন্য হইতে উৎপন্ন, কিন্তু পরে আমরা অনন্তকাল ধরিয়া থাকিব। বাহ্যারা শূন্য হইতে আসিয়াছে, তাহার্য্য অবশ্যই শূন্যে যাইবে। তুমি আমি বা উপস্থিত কেহই শূন্য হইতে আইসে নাই, স্তব্ধতা শূন্যে যাইবেও ৩০৮

না। আমরা অনন্তকাল ধরিয়া রহিয়াছি এবং থাকিব, আর জগৎ স্রষ্টাও এমন কোন শক্তি নাই, যাঁহা তোমার অথবা আমার অস্তিত্ব উড়াইয়া দিতে পাবে। এই পুনর্জন্মবাদে কোন ভয় পাইবার কাৰণ নাই, উহাই মানুষ্যের নৈতিক উন্নতির প্রধান সহায়ক। চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের ইহাই ঞ্চায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত। যদি পরে তোমার অনন্তকাল অস্তিত্ব সম্ভব হয়, তবে ইহাও সম্ভব যে, তুমি অনন্তকাল ধরিয়া ছিলে; আর কোনরূপ হইতে পাবে না। এই মতের বিরুদ্ধে যে কতকগুলি আপত্তি শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার নিরাকরণ করিতে চেষ্টা করিতেছি। যদিও তোমরা অনেকে এই আপত্তিগুলিকে অকিঞ্চিৎকর বোধ করিবে, কিন্তু তথাপি আমাদের কাছে উহাদের উত্তর দিতে হইবে, কারণ, কখন কখন আমরা দেখিতে পাই, খুব চিন্তাশীল লোকেও খুব মুখোঁচিৎ কথা সকল বলিয়া থাকে। লোকে যে বলিয়া থাকে, ‘এমন অসঙ্গত মতই নাই, যাঁহা সমর্থন করিবার জন্য কোন না কোন দার্শনিক উঠেন,’ এ কথা অতি সত্য। প্রথম আপত্তি এই, আমাদের ভূত জন্মের কথা স্মরণ থাকে না কেন? তাহাতে জিজ্ঞাস্য এই, আমরা আমাদের এই জন্মে অতীত ঘটনাই কি সব স্মরণ করিতে পারি? তোমাদের মধ্যে কয়জনের শৈশবকালের কথা স্মরণ হয়? শৈশবকালের কথা তোমাদের কাহারই স্মরণ হয় না; আর যদি স্মৃতিশক্তির উপর অস্তিত্ব নির্ভর কবে, তবে তোমার উহা স্মরণ নাই বলিয়া, ঐ শৈশবাবস্থার তোমার অস্তিত্বও ছিল না বলিতে হইবে। কেহ যদি স্মরণ করিবার থাকে, তবে তাহারই উপর অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে বলা কেবল বৃথা প্রলাপমাত্র। আমাদের ভূত জন্মের কথা স্মরণ থাকিবার প্রয়োজন কি? সেই মস্তিষ্কও নাই, উহা একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, আর নূতন প্রকার মস্তিষ্ক রচিত হইয়াছে। অতীতকালের সংস্কারসমষ্টি আমাদের মস্তিষ্কে আসিয়াছে—উহা লইয়াই মন এই শরীরে বাস করিতে আসিয়াছে।

আমি এক্ষণে যেরূপ, তাহা আমার অনন্ত অতীত কালের কর্মফলস্বরূপ। আর সমূহ অতীত স্মরণ করিবারই বা আমার কি প্রয়োজন? কুসংস্কারের এমনি প্রভাব যে, যাঁহারা এই পুনর্জন্মবাদ অস্বীকার করে, তাঁহারা ইচ্ছাস করে, এক সময়ে আমরা বানর ছিলাম, কিন্তু তাঁহাদের বানরজন্ম কেন স্মরণ হয় না, তাহা জিজ্ঞাসিতে ভয়সা কবে না। যখন কোন প্রাচীন ঋষি বা সাধু সত্য পতাক্ষ করিয়াছেন শুনি, আমরা তাঁহাকে ভ্রান্ত বলিয়া থাকি; কিন্তু হাফসলি ইহা বলিয়াছেন, টিণ্ডাল ইহা বলিয়াছেন, তবে ইহা অবশ্যই সত্য। ১৫ই আষাঢ়, ১৩০৮।]

হইবে -তখন আমরা উহা অমনি গানিয়া লই। প্রাচীন কুসংস্কারের পরিবর্তে আমরা আধুনিক কুসংস্কার আনিয়াছি, ধর্মের প্রাচীন পোপের পরিবর্তে আমরা বিজ্ঞানের আধুনিক পোপ বসাইয়াছি। অতএব আমরা দেখিলাম, এই স্মৃতিসম্বন্ধে যে আপত্তি, তাহা সত্য নহে। আর এই পুনর্জন্মসম্বন্ধে যে সকল অপত্তি হইয়া থাকে, তন্মধ্যে ইহাই একমাত্র আপত্তি, যৎসম্বন্ধে বিদ্র লোকে আলোচনা করিতে পারেন। যদিও পুনর্জন্মবাদ প্রমাণ করিতে হইলে, তাহার সঙ্গে লগ্নে স্মৃতিও থাকিবে, ইহা প্রমাণ করার কোন প্রয়োজন নাই, ইহা আমরা দেখিয়াছি, তথাপি আমরা ইহা দৃঢ়ভাবে বলিতে পারি যে, অনেকের এইরূপ স্মৃতি আসিয়াছে, আর তোমরাও সকলে যে জন্মে মুক্তি লাভ করিবে, সেই জন্মে এই স্মৃতি লাভ করিবে। তখনই কেবল তুমি জানিতে পারিবে যে, জগৎ স্বপ্নমাত্র, তখনই তুমি অহরের অন্তবে বুঝিবে যে, তোমরা এই জগতে নট মাত্র, আর এই জগৎ রঙ্গভূমিমাত্র, তখনই অনাসক্তির ভাব তোমাদের ভিতর বজ্রবেগে আসিবে, তখনই যত ভোগভৃগু, জীবনের উপর এই মহা আশ্রয়—এই সংসার চিরকালের জন্য উঠিয়া যাইবে। তখন তুমি স্পষ্টই দেখিবে, তুমি জগতে কতবার আসিয়াছ, কত লক্ষ লক্ষ বাব তোমরা পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, স্বামী, স্ত্রী, বন্ধু, ঐশ্বর্য্য, শক্তি লইয়া কাটাইয়াছ। এই সকল কতবার আসিয়া কতবার চলিয়া গিয়াছে। কতবার তুমি সংসার তরঙ্গের উচ্চ চূড়ায় উঠিয়াছ, আবার কতবার তুমি নৈরাশ্রের গভীর গহবরে নিমজ্জিত হইয়াছ। যখন স্মৃতি তোমার নিকট এই সকল আনিয়া দিবে, তখনই কেবল তুমি বীরের হ্রায় দাঁড়াইবে, আর জগৎ যখন তোমার দ্রুতঙ্গী করিবে, তখন তুমি হাস্য করিবে। তখনই তুমি বীরের হ্রায় দাঁড়াইয়া বলিতে পারিবে, “মৃত্যু,তোমাকেও আমি গ্রাস করি না,তুমি আমাকে কি ভয় দেখাও ?” যখন তুমি জানিতে পারিবে, মৃত্যুর তোমার উপর কোন শক্তি নাই, তখনই তুমি মৃত্যুকে ভয় করিতে পারিবে। সকলেই এই জ্ঞানলাভ করিবে।

আম্বার যে পুনর্জন্ম হয়, তাহার কি কোন যুক্তিযুক্ত প্রমাণ আছে? এতক্ষণ আমরা কেবল শব্দা নিরাস করিতেছিলাম, দেখাইতেছিলাম যে এই পুনর্জন্মবাদ অপ্রমাণ করিবার যে যুক্তিগুলি, তাহা অক্লিকংকর। এক্ষণে উদ্যম সর্পক্ষে যে যে যুক্তি আছে, তাহা বিবৃত হইতেছে। পুনর্জন্মবাদ স্বাভাবিক জ্ঞান অসম্ভব। মনে কর, আমি রাস্তায় গিয়া একটা কুকুরকে দেখিলাম। উহাকে কুকুর বলিয়া জানিলাম কিরূপে? আমি মনের দিকে তাকাইলাম—

সেখানে আমার সমুদয় পূর্বসংস্কারগুলি যেন গুরে গুরে সজ্জাকৃত রহিয়াছে । নূতন কোন বিষয় আসিলামাত্রই আমি ঐ টাকে সেট প্রাচীন সংস্কারগুলি সহিত মিলাইলাম । যখনই দেখিলাম, মেইকপ জালের আর কতকগুলি নংকার রমিয়াছে, অমনি আমি উহাদিগকে তাহাদের সহিত মিলাইলাম, অমনি আমার তৃপ্তি আসিল । আমি তখন উহাকে কুকুব বলিলাম, জানিতে পারিলাম, কারণ, উহা পূর্বাভিষ্টি কতকগুলি সংস্কারের সহিত মিলিল । যখন আমি উহার তুল্য সংস্কার আমাব ভিতরে না দেখিতে পাই, তখনই আমার অতৃপ্তি আটসে । এইরূপ হইলে উহাকে ‘অজ্ঞান’ বলে । আর তৃপ্তি হইলেই উহাকে ‘জ্ঞান’ বলে । যখন একটা আপেল (apple) পড়িল, তখন মানুষের অতৃপ্তি আসিল । তারপর মানুষ ক্রমশঃ ঐরূপ কতকগুলি ঘটনা—যেন একটী শৃঙ্খল, দেখিতে পাইল । কি সে শৃঙ্খল ? সেই শৃঙ্খল এট যে, সকল আপেলই পড়িয়া থাকে । মানুষ উহার মাধ্যাকর্ষণ সংজ্ঞা দিল । অতএব আমরা দেখিলাম, পূর্বের কতকগুলি অনুভূতি না থাকিলে নূতন অনুভূতি অসম্ভব, কারণ, ঐ নূতন অনুভূতির সহিত মিলাইবার আব কিছু পাওয়া যাইবে না । অতএব, কতকগুলি ইউরোপীয় দার্শনিকের মত, “বালক ভূমিষ্ঠ হইবার সময় সংস্কারশূন্য মন লইয়া আসে” একথা যদি সত্য হয়, তবে তাহাকে সংস্কারশূন্য মন লইয়া যাইতে হইবে । কারণ, তাহার ঐ নূতন অনুভূতি মিলাইবার জন্তে আর কোন সংস্কার রহিল না । অতএব দেখিলাম, এই পূর্বসংস্কৃত জ্ঞানভাণ্ডার ব্যতীত নূতন কোন জ্ঞান হওয়া অসম্ভব । বাস্তবিক কিম্ব আমাদের সকলকেই পূর্বসংস্কৃত জ্ঞানভাণ্ডার সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিতে হইয়াছে । জ্ঞান কেবল ভ্রূয়াদর্শনলব্ধ, জানিবার আর কোন পথ নাই । যদি আমরা এখানে ঐ জ্ঞানলাভ না করিয়া থাকি, আমরা অন্তঃই অপর কোথাও উহা লাভ করিয়া থাকিব । যুক্তায় সন্দেহই দেখিতে পাই কেন ? একটা কপোত এইমাত্র ডিম্ব হইতে বাহির হইয়াছে—একটা শ্বেদ আসিল অমনি সে ভয়ে মায়েব কাছে পলাইয়া গেল । কোথা হইতে ঐ কপোতটী শিখিল যে, কপোত শ্বেদের ভক্ষ্য ; ইহার একটী পুরাতন ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু উহাকে ব্যাখ্যাই বলা যাইতে পাবে না । উহাকে স্বাভাবিক জ্ঞান বলা হইত । যে ক্ষুদ্র কপোতটী এইমাত্র ডিম্ব হইতে বাহির হইয়াছে, তাহার এরূপ মরণভীতি আসে কোথা হইতে ? সদ্য ডিম্ব হইতে বহির্গত হংস জলের নিকট আসিলেই জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে, এবং স্নাত্তার দিতে থাকে কেন ? উহা কখন সম্ভরণ করে নাই, অথবা কাহাকে সম্ভরণ দিতে ১৫ই আষাঢ়, ১৩০৮ ।] উদ্বোধন । ৩১১

দেখে নাই। লোকে বলে উহা স্বাভাবিক জ্ঞান। উহা একটা মন্ত কথা, কিন্তু উহা আমাদের নূতন কিছুই শিখাইল না। এই স্বাভাবিক জ্ঞান কি, তাহা আলোচনা করা যাক। আমাদের নিষেদের ভিতরই শত প্রকারে স্বাভাবিক জ্ঞান রহিয়াছে। প্রথমে কোন ব্যক্তি পিয়ানো বাজাইতে শিখিতে লাগিলেন। প্রথমে তাঁহাকে প্রত্যেক পরদায় দিকে নজর রাখিয়া তবে উহাদের উপর অঙ্গুলি প্রয়োগ করিতে হয়; কিন্তু অনেক মাস, অনেক বৎসর অভ্যাস করিতে করিতে উহা স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়, আপনি আপনি হইতে থাকে। এক সময়ে যাহাতে ইচ্ছার প্রয়োজন হইত, তাহাতে আর জ্ঞানপূর্বক ইচ্ছার প্রয়োজন থাকে না, কিন্তু উহা জ্ঞানপূর্বক ইচ্ছা ব্যতীতই নিষ্পন্ন হইতে পারে, উহাকেই বলে স্বাভাবিক জ্ঞান। প্রথমে উহা ইচ্ছাসহকৃত ছিল, পরিশেষে আর ইচ্ছার উহাতে প্রয়োজন রহিল না। এখনও সম্পূর্ণ প্রমাণ হইল না। অর্ধেক প্রমাণ এখনও বাকি। ঐ অর্ধেক প্রমাণ এই যে, প্রায় সমুদয় কাগাই, যাহা এক্ষণে আমাদের স্বাভাবিক, তাহাদিগকে ইচ্ছার অধীনে আনয়ন করা ঘাইতে পারে। শরীরের প্রত্যেক পেশীই আমাদের অধীনে আনয়ন করা ঘাইতে পারে। এ বিষয়ে সাধারণে উত্তমরূপেই জ্ঞাত আছেন। অতএব অমরী ও ব্যতিরেকী দুই উপায়েই প্রমাণ হইল যে, যাহাকে আমরা স্বাভাবিক জ্ঞান বলি, তাহা ইচ্ছাকৃত কার্যের অবনত ভাব মাত্র। অতএব যদি সমুদয় সৃষ্টিতেই এই এক সাদৃশ্য প্রয়োগ করা যায়, যদি সমুদয় প্রকৃতিই সমপ্রণালীক হয়, তবে গুরুত্ব এবং তির্যগ্ জ্ঞানিতে যাহা স্বাভাবিক জ্ঞান, তাহা ইচ্ছার অবনত ভাব মাত্র।

আমরা বহির্জগতে যে নিয়ম পাঠিয়াছিলাম, অর্থাৎ প্রত্যেক ক্রমবিকাশ প্রক্রিয়ার পূর্বেই একটা ক্রমসঙ্কোচ প্রক্রিয়া বর্তমান? আর ক্রমসঙ্কোচ হইলেই তৎসঙ্গে সঙ্গে ক্রমবিকাশও থাকিবে, এই নিয়ম খানিটয়া আমরা স্বাভাবিক জ্ঞানের কি ব্যাখ্যা পাইতে পারি? স্বাভাবিক জ্ঞান তাহা হইলে বিচারপূর্বক কার্যের ক্রমসঙ্কোচভাব হইয়া দাঁড়াইল। অতএব মানুষ বা পশুতে যাহাকে স্বাভাবিক জ্ঞান বলি, তাহা অবশ্যই পূর্ববর্তী ইচ্ছাকৃত কার্যের ক্রমসঙ্কোচভাব হইবে। আর ইচ্ছাকৃত কার্য বলিলেই পূর্বে আমরা বাস্তবিক কার্য করিয়াছিলাম, স্বীকার করা হইল। পূর্বকৃত কার্য হইতেই ঐ সংস্কার আসিয়াছিল, আর ঐ সংস্কারও রহিয়াছে। এই মৃত্যুভীতি, এই জন্মবিমাত্রা জলে সন্তরণ, আর মনুষ্যের মধ্যে যাহা কিছু অনিচ্ছাকৃত স্বাভাবিক কার্য রহিয়াছে,

মুণ্ডাবাদ ।—হে পাণ্ডব, বাহ্যকেই (প্রাচীন ঋষিগণ) সন্ন্যাস বলিয়াছেন, তাহাকেই তুমি যোগ বলিয়া জানিবে, কারণ যে ব্যক্তি সঙ্কল্পের সন্ন্যাস করে নাই, সে কখনও যোগী হইতে পারে না ॥ ২ ॥

ভাষ্য ।—নহু চ নিরঞ্জেক্রিয়মৌব ক্রতিশ্রুতিযোগশাস্ত্রেষু সন্ন্যাসিত্বং যোগিত্বং চ অসিদ্ধং, কথমিহ সাধেঃ সক্রিয়স্য সন্ন্যাসিত্বং যোগিত্বকপ্রসিদ্ধমুচ্যতে ইতি নৈব দোষঃ কস্মাচ্চিদগুবৃত্তা উভয়স্যাং সংপিপাদয়িত্বাত্ তৎ কথং ? কৰ্ম্মফল-সঙ্কল্পসংজ্ঞাসাং সংজ্ঞাসিত্বং, যোগাস্থত্বেন কৰ্ম্মানুষ্ঠানাত্ কৰ্ম্মফলসঙ্কল্পস্য বা চিত্ত-বিক্ষেপহেতোঃ পরিত্যাগাদযোগিত্বং চেতি গোণমুভয়ং ন পুনৰ্মুখ্যং সংজ্ঞাসিত্বং যোগিত্বং চাভিপ্রেতমিত্যোক্তমর্থং দর্শয়িতুমাং ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—একগে আশঙ্কা এই প্রকার হইতে পারে যে, ক্রতি শ্রুতি এবং যোগশাস্ত্রে নিরঞ্জি এবং অক্রিয় ব্যক্তিরই সন্ন্যাসিত্ব ও যোগিত্ব প্রসিদ্ধ আছে ; এই স্থলে কেন সাধিক ও সক্রিয় ব্যক্তির সন্ন্যাসিত্ব ও যোগিত্ব অপ্রসিদ্ধ হইলেও উক্ত হইতেছে ? । এই প্রকার উক্তিতে (বাস্তবিক) কোন দোষ নাই । কারণ গোণীলক্ষণদ্বারা এই উভয়কে প্রতিপাদন করিবার ইচ্ছাতেই এই প্রকার বলা হইয়াছে ; তাহা কি প্রকার ? কৰ্ম্মফলবিষয়ে সংকল্প পরিত্যাগ করা হয় বলিয়া (তাদৃশ কৰ্ম্মীর) সন্ন্যাসিত্ব (উক্ত হইয়াছে) ; ধ্যানযোগের সাধন বলিয়া কল্পের অনুষ্ঠান করা হয় বলিয়াই হউক, অথবা চিত্তবিক্ষেপের হেতু কৰ্ম্মফলসংকল্পের পরিত্যাগ করা হয় বলিয়া, তাহার যোগিত্ব (শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে) । এই সন্ন্যাসিত্ব ও যোগিত্ব গোণ,মুখ্য সন্ন্যাসিত্ব ও যোগিত্ব এ স্থলের অভিপ্রেত নহে, এই বিষয়টী দেখাইবার জন্ত (ভগবান্) বলিতেছেন (যে) ॥ ২ ॥

ভাষ্য ।—যং সৰ্ব্বকৰ্ম্মফলপরিত্যাগলক্ষণং পরমার্থসন্ন্যাসমিতি প্রোক্তঃ ক্রতি-শ্রুতিবিদঃ যোগঃ কৰ্ম্মানুষ্ঠানলক্ষণং তৎ পরমার্থসংন্যাসং বিদ্ধি জানৌহি হে পাণ্ডব । কৰ্ম্মযোগস্ত প্রবৃত্তিলক্ষণস্ত তদ্বিপরীতেন নিবৃত্তিলক্ষণেন পরমার্থ-সংন্যাসেন কৌদৃশ্যং সামান্ত্রমস্মীকৃত্য তদ্ব্যব উচ্যত ইত্যপেক্ষায়াং ইদমুচ্যতে । অস্তি পরমার্থসন্ন্যাসেন সাদৃশ্যং কর্তৃদ্বারকং কৰ্ম্মযোগস্ত । যোহি পরমার্থসংজ্ঞা-সী স ত্যক্তসৰ্ব্বকৰ্ম্মসাধনতয়া সৰ্ব্বকৰ্ম্মতৎফলবিষয়ং সঙ্কল্পং প্রবৃত্তিহেতুকাম-কারণং সংকল্পতি । অয়মপি কৰ্ম্মযোগী কৰ্ম্মকুরূপএব ফলবিষয়ং সঙ্কল্পং সংকল্পতীত্যোক্তমর্থং দর্শয়িতুমাং নহি বশ্যং অসন্ন্যাস্তসঙ্কল্পোহসন্ন্যাসোহপরিত্যক্তঃ ফলবিষয়ঃ সঙ্কল্পোহভিসন্ধির্ধেনসোহসন্ন্যাস্তসঙ্কল্পঃ কণ্ঠেন কশ্চিদপি কৰ্ম্মী যোগী সমাধানবান্ ন সম্ভবতীত্যর্থঃ । ফলসঙ্কল্পস্ত চিত্তবিক্ষেপহেতুত্বাৎ । তস্মাদ্ যঃ ১৫ই আবার, ১৩০৮ ।] উপোধন । [৪] ৩১৩

কশ্চন কশ্চিদপি কশ্মী সংশ্রুতকশ্মফলসংক্রমোভবেৎ স যোগী সমাধানবান্
অবিন্শ্চিন্তিতোভবেৎ চিত্তবিক্ষেপহেতোঃ ফলসঙ্কল্পস্ত সন্ন্যাসাদিত্যভিপ্রায়ঃ ।
এবং পরমার্থসন্ন্যাসকর্মযোগযোগোঃ কর্তৃদ্বারকং সংশ্রাসসাম্যমপেক্ষা “যং
সংশ্রাসমিতিপ্রাহুর্যোগঃ তং বিদ্ধি পাণ্ডব”, ইতি কর্মযোগস্ত স্তব্যর্থং সং-
ত্য়াসমুত্তম ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—শ্রুতি ও স্মৃতির বেত্তাগণ, যে সর্বকর্মফল পরিত্যাগরূপ
পরমার্থ সন্ন্যাস বলিয়া থাকেন কক্ষাচর্চানলক্ষণ যোগকেও সেই পরমার্থ
সন্ন্যাস বলিয়াই তুমি জানিও, হে পাণ্ডব ! প্রবৃত্তি লক্ষণ কর্মযোগের ও তাহার
বিপরীত নিবৃত্তিলক্ষণ পরমার্থ সন্ন্যাসের কোন সাধর্ম্যকে অবলম্বন করিয়া
উভয়ের একরূপতা কথিত হইতেছে, এই প্রকার প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য এই
বলা হইতেছে, যে পরমার্থ সন্ন্যাসের সচ্ছিত কর্মযোগের কর্তৃদ্বারক সাদৃশ্য
আছে ; (কর্তৃদ্বারক সাদৃশ্য কিপ্রকার তাহা বলা হইতেছে যে যেব্যক্তি পরমার্থ-
সন্ন্যাসী, সে সকল কর্মরূপ সাধন পরিত্যাগ করে, এই জন্য প্রবৃত্তি হেতু কামের
কারণ, সকল প্রকার কর্ম ও তৎফলবিষয়ে সঙ্কল্পেব সন্ন্যাস করিয়া থাকে ;
(পূর্বোক্ত) এই কর্মযোগীও কর্মের অন্তর্ধান কালেই ফলবিষয়ে সঙ্কল্প পরি-
ত্যাগ করিয়া থাকে । এই প্রকার পরস্পর সাদৃশ্য প্রতিপাদন করিবার জন্য
বলা হইতেছে যে, যে কারণ “সন্ন্যাসস্তসঙ্কল্প” (ফলবিষয়ে সঙ্কল্প অর্থাৎ
অভিসন্ধিকে যে ব্যক্তি পরিত্যাগ কবে না,) কোন ব্যক্তি যোগী অর্থাৎ
সমাহিতচেতা হইতে পারে না, কাবণ ফলবিষয়ক সঙ্কল্প, চিত্তের বিক্ষেপের প্রতী
হেতু, সেই কারণে যে কোন কর্মী কর্মফলের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছে, সে
সমাহিতচেতা (অর্থাৎ) অবিন্শ্চিন্তিত হয়, কারণ চিত্তবিক্ষেপের হেতু ফল-
বিষয়ক সঙ্কল্প সে পরিত্যাগ করিয়াছে । ইহাই অভিপ্রায় । এ পরমার্থ
সন্ন্যাস ও কর্মযোগের এই প্রকার কর্তৃদ্বারক সন্ন্যাসরূপ সাধারণ ধর্মকে অপেক্ষা
করিয়া বাহ্যকে সন্ন্যাস বলিয়াছেন, তাহাকেই তুমি যোগ বলিয়া জানিবে, হে
পাণ্ডব !” এই বাক্যের দ্বারা কর্মযোগেরই স্ততির জন্য তাহার সন্ন্যাসত্ব কীর্তিত
হইয়াছে ॥ ২ ॥

আরুক্ষ্যো মূর্নেযোগং কর্ম কারণমুচ্যতে ।

যোগীকৃত্য তত্শ্রেব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

অন্য ।—যোগঃ আকরুক্ষোঃ মুনৈঃ কৰ্ম্ম কারণম্ উচ্যতে তৈশ্চৈব (পুনঃ)
যোগাক্রুতস্য শমঃ কারণম্ উচ্যতে ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদ ।—ধ্যানযোগে আরোহণার্থী মননশীল ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্মই (ধ্যান
যোগ লাভের কারণ (বলিয়া) উক্ত হয় । সেই ব্যক্তিই যোগাক্রুত হইলে তাহার
পক্ষে শম (অর্থাৎ) সর্বকর্ম্মনিবৃত্তিই (টীটনিক্সির) কারণ (বলিয়া) কাক্তিত হইয়া
থাকে ॥ ৩ ॥

ভাষ্য ।—ধ্যানযোগস্য ফলনিরপেক্ষঃ কর্ম্মযোগঃ বহিঃসমাধনমিতি তং
সন্ন্যাসভেদে ন স্তত্ব । অধুনা কর্ম্মযোগস্য ধ্যানযোগসাম্যতাং দর্শয়তি আকরুক্ষো-
রারোহণমুচ্ছিতোহনারুহস্য ধ্যানযোগেহবস্তাত্তমশক্তিশ্চৈব ইত্যর্থঃ কস্তা-
রুক্ষোঃ ? মুনৈঃ কর্ম্মফলসন্ন্যাসিনঃ ইত্যর্থঃ । কিমাকরুক্ষোঃ ? যোগঃ ।
কর্ম্ম কারণং সাধনমুচ্যতে । যোগাক্রুতস্য পুনস্তৈশ্চৈব শমঃ সর্বকর্ম্মভো নিবৃত্তিঃ
কারণং যোগাক্রুতস্য সাধনমুচ্যত ইত্যর্থঃ । যাবদ্যাবৎ কর্ম্মভ্য উপরমতে
তাবৎ তাবৎ নিরাস্যস্য জিতেন্দ্রিয়স্য চিত্তং সমাধীয়তে । তথা সতি সখ্যটিতি
যোগাক্রুতো ভবতি । তথ্যচোক্তং ব্যাসেন

“নৈতাদৃশং ব্রাহ্মণ্যাস্তি বিত্তং যথৈকতা সমতা সত্যতা চ ।

শীলং স্থিতিদৃণিধানমার্জবং ততস্তত্তশোপরমঃ ক্রিয়াভাঃ ॥” ইতি ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—ফলনিরপেক্ষ কর্ম্মযোগ, ধ্যানযোগের বহিরঙ্গ সাধন (ধ্যান
যোগের বিষয় ধোয় বস্তু, কর্ম্মযোগেব বিষয় নহে, অথচ কর্ম্মযোগ চিত্ততত্ত্বি দ্বাৰা
ধ্যানযোগের কারণ হয়, এই জন্ত ধ্যানযোগের বহিরঙ্গ সাধন বলিয়া শাস্ত্রে
কর্ম্মযোগের নির্দেশ হয়), এই কারণ সন্ন্যাসরূপে স্তুতি করিয়া এক্ষণে কর্ম্ম-
যোগ যে ধ্যানযোগেব সাধন, তাহাই দেখাইতেছেন, “আকরুক্ষু” আরোহণ করিতে
অভিলাষী, অনাক্রুত (অর্থাৎ) ধ্যানযোগে অবস্থিতি করিতে অসমর্থ ব্যক্তির
পক্ষে ইহাই অর্থ । আকরুক্ষু কিরূপ ? মুনি, অর্থাৎ “কর্ম্মফল সন্ন্যাসী” কিসে
আরোহণ করিতে অভিলাষী ? যোগে, (এই প্রকার ব্যক্তির) কর্ম্মই কারণ
(অর্থাৎ) সাধন উক্ত হয় । সেই ব্যক্তিই যোগাক্রুত হইলে (তাহার পক্ষে)
“শম” উপশম (অর্থাৎ) সর্ব কর্ম্ম হইতেই নিবৃত্তিই কারণ (অর্থাৎ) যোগা-
ক্রুতত্বের সাধন উক্ত হয় । যেমন যেমন কর্ম্ম হইতে উপরত হয়, সেই প্রকারে
নিরাস্য ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির চিত্ত সমাহিত হয়, এইরূপ হইলে সে শীঘ্র যোগা-
ক্রুত হইয়া থাকে, ব্যাসও এই প্রকারই বলিয়াছেন যে একত্বপ্রত্যয়, সমতা,
১৫ই আষাঢ়, ১৩০৮ ।] উষোদন । ২১৫

সত্যাব্যবহার, শীল, শ্রৈষ্ঠ্য, অহিংসা, সারল্য এবং ক্রমে ক্রমে ক্রিয়ানিচয় হইতে উপরতি, এই কয়টির দ্বারা ব্রাহ্মণের পক্ষে অত্র কোন ধন নাই ॥ ৩ ॥

যদা হি নেজ্জিয়ার্থেষু ন কৰ্ম্মসমুপজ্জতে ।

সৰ্বসংকল্পসম্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৪ ॥

অর্থঃ ।—যদা সৰ্বসংকল্পসম্যাসী ইজ্জিয়ার্থেষু কৰ্ম্মসু ন । অমুপজ্জতে তদা যোগারূঢ় উচ্যতে ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ ।—যে সময় সৰ্বপ্রকার সংকল্পের পরিত্যাগকারী (কৰ্ম্মী) ইজ্জিয়ার্থ কৰ্ম্মসমূহে কৰ্ত্তব্য জ্ঞান করে না, সেই সময় সেই ব্যক্তি যোগারূঢ় বলিয়া কথিত হয় ॥ ৪ ॥

ভাষ্য ।—অখেদানীং কদা যোগাক্রোভবতীত্যুচ্যতে । যদা সমাধীৰ্য়মান-
চিত্তো যোগী হি ইজ্জিয়ার্থেষু ইজ্জিয়ার্থার্থাঃ শব্দাদয়ন্তেষু ইজ্জিয়ার্থেষু কৰ্ম্মসু চ
নিতা নৈমিত্তিককামাশ্রতিষিদ্ধেষু প্রয়োজনাভাববুদ্ধ্যা নাহুপজ্জতে অমুপজ্জ
কৰ্ত্তব্যতাংবুদ্ধিং ন করোতি ইত্যর্থঃ সৰ্বসংকল্পসংগ্রাসী সৰ্বান্ সংকল্পান্ ইহামুত্রার্ধ-
কামহেতুন্ সংশ্রুতিসু শীলমশ্রুতি সৰ্বসংকল্পসম্যাসী যোগারূঢ়ঃ প্রাপ্তযোগ
ত্যতং তদা তস্মিন্ কালে উচ্যতে । সৰ্বসংকল্পসংগ্রাসীতি বচনং সৰ্বাংশ
কামান্ সৰ্বাণি কৰ্ম্মাণি সংশ্রুতিদিত্যর্থঃ । সংকল্পমূলং হি সৰ্বকামাঃ—

সংকল্পমূলঃ কামোবৈ যজ্ঞাঃ সংকল্পসমুৎপাদাঃ ।

কাম জানামি তে মূলং সংকল্পাঙ্ঘ্রি জায়সে ।

ন ত্বাং সংকল্পয়িষ্যামি তে মে ন ভবিষ্যসি ॥

ইত্যাদিশ্রুতেঃ ।

সৰ্বকামপরিত্যাগে চ সৰ্বকৰ্ম্মসংগ্রাসঃ সিদ্ধোভবতি “স যথাকামো ভবতি তৎ
ক্রতুর্ভবতি যত্ ক্রতুর্ভবতি তৎ কৰ্ম্ম কুরুতে ।” ইত্যাদি ঋতিভাঃ ।

যদ্যপি কুরুতে কৰ্ম্ম ততঃ কামসু চেষ্টিতম্ ॥

ইত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চ ।

ত্বেয়াচ্চ নহি সৰ্বসংকল্পসংগ্রাসে কশ্চিং অপদিতুমপি শক্তঃ । তস্মাত্ সৰ্ব-
সংকল্পসম্যাসীতি বচনং সৰ্বান্ কামান্ সৰ্বাণি কৰ্ম্মাণি চ ত্যজয়তি
ভগবান্ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—অনন্তর এইকণে কোন সময়ে যোগারূঢ় হয় তাহাই বলা
হইতেছে—যে সময় সমাধীৰ্য়মানহৃদয় যোগী, ইজ্জিয়ার্থ সমূহে (ইজ্জিয়ার্থ অর্থ

(অর্থাৎ) শব্দাদি বিষয়ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া এই বিবিধ পদার্থটাই ইন্দ্রিয়ার্থ শব্দের দ্বারা এইস্থানে অভিহিত হইতেছে) এবং নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য ও প্রতিষিদ্ধ কর্মসমূহে, নিম্প্রয়োজনত্ব জ্ঞাননিবন্ধন অনুযুক্ত হয় না। অর্থাৎ অনুযুক্ত” কর্তব্যব্যবোধ করে না। (এবং) “সর্বসংকল্পসংগ্রাসী” ঐহিক ও পারত্রিক সকল প্রকার কামের হেতু সংকল্পনিবৃত্তিকে পরিত্যাগ করাই সাহায্য স্বভাব, সেই সর্বসংকল্পসংগ্রাসী (এই প্রকার হইলে) সেই সময়ে (ঐ ব্যক্তি) যোগাবৃত্ত (অর্থাৎ) লক্ষ্যযোগ বলিয়া উক্ত হয়। সর্বসংকল্পসংগ্রাসী এই বিশেষণটী দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে যে, সকল প্রকার সংকল্প ও সকল কর্মের সম্ভ্রাস করিতে হইবে, কারণ সংকল্পই সকল কামের মূল ।

“সকল প্রকার কাম সংকল্প হইতে উৎপন্ন হয়। হে কাম, আমি তোমার মূল কারণকে জানি। তুমি সংকল্প হইতে উৎপন্ন হও। তোমাকে আমি আর সংকল্পের বিষয় করিব না, তাহা হইলেই তুমি আমার (হৃদয়ে) উৎপন্ন হইতে পারিবে না ।”। এই প্রকারের বাক্য, স্মৃতি শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় ।

সর্বকাম পরিত্যাগ করিলে সর্বকর্মের সংগ্রাস সিদ্ধ হয়। “সেই পুরুষ, যে প্রকার কামনা করে, সেইরূপ যোগকে সাধনবুদ্ধিতে গ্রহণ করে, যে প্রকার যোগাদি ক্রিয়াকে সাধন বুদ্ধির বিষয় করে, সে সেই প্রকার যোগাদিকর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে”, এই প্রকার স্মৃতিবাক্য দ্বারাও ইহা প্রমাণ হইতেছে—

“লোক যাহা কিছু কর্ম করে, তাহা সকলই কামেরই বিলাস মাত্র”, এই প্রকার স্মৃতিবাক্যও ইহাতে প্রমাণ হইয়া থাকে। যুক্তিবলেও ইহা সিদ্ধ হইতে পারে, কারণ সর্বপ্রকার সংকল্পের সম্ভ্রাস হইলে জীব স্পন্দিত হইতেও পারে না। সেই কারণে (স্থির করিতে হইবে যে, যোগাকৃত ব্যক্তির পক্ষে) সর্ব-সংকল্প-সংগ্রাসী এই পদটী উল্লেখ দ্বারা ভগবান্ সকল প্রকার কাম ও সকল প্রকার কর্মের পরিত্যাগ করাইতেছেন ॥ ৪ ॥

উক্তরেদান্মনান্মানং নান্মানমবসাদয়েৎ ।

আটৈশ্বব হ্যাত্মনো বজ্জরাতৈশ্বব রিপূরান্মনঃ ॥ ৫ ॥

অর্থঃ ।—আত্মনা আত্মানং উক্তরেৎ । ন আত্মানং অবসাদয়েৎ হি (যতঃ) আত্মা এব আত্মনঃ বজ্জঃ (তথা আত্মাএব) আত্মনঃ রিপুঃ ॥ ৫ ॥

১৫ই আষাঢ়, ১৩০৮ ।]

উদ্বোধন ।

৩১৭

মূলানুবাদ ।—আপনি আপনার উদ্ধার করিবে, আপনাকে অবসন্ন করিবে না, আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার রিপু হয় ॥ ৫ ॥

ভাষ্য ।—যদৈবং যোগাকৃচ্ছদা তেন আত্মা আত্মনা উদ্ধৃতো ভবতি সংসারাদনর্থক্ৰান্তাং অতঃ । উদ্ধবেং সংসারসাগরে নিমগ্নমাত্মনাত্মানং তত উৎ উর্দ্ধং হরেহুঙ্করেৎ । যোগাকৃচ্ছামাপাদয়েদিত্যর্থঃ । ন আত্মানমবসাদয়েন্নাদো নয়েন্নাদোগময়েৎ । আত্মৈব হি যশ্চাৎ আত্মনোবন্ধুঃ । নহাত্মঃ কশ্চিদ্বন্ধুঃ সংগাবমুক্তয়ে ভবতি । বন্দুপপিতাবং মোক্ষং প্রাপ্তি প্রতিকূল এব স্নেহাদি বন্ধনায়তনাত্মাত্মাত্মমবধারণমাত্মৈব হ্যাত্মনোবন্ধুরিতি । আত্মৈব রিপুঃ শত্রুর্যোহাত্মোহপকারী বাহুঃ শত্রুঃ সোহপ্যাত্মপ্রযুক্ত এবৈতি যুক্তমেবাবধারণ-মাত্মৈব রিপুবাশ্মন ইতি ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—যে কালে এই প্রকার যোগারত হইবে, সেই সময় (সাধক) অনর্থানুহপূর্ণ সংসার হইতে আপনা হইতেই উদ্ধৃত হয় । (ইহাই বলি হইতেছে) সংসারনিমগ্ন আত্মাকে আত্মার সাহায্যেই সেই সংসার হইতে উর্দ্ধে উঠাইবে অর্থাৎ ধ্যানযোগে আকৃষ্ট করিবে । আত্মাকে অবসন্ন করিবে না অর্থাৎ অধঃপত্নিত করিবে না, কাবণ আত্মাই আত্মার বন্ধু ; (লোকপ্রসিদ্ধ) বন্ধু প্রকৃত পক্ষে মোক্ষের প্রতিকূলই হয়, কাবণ ঐ বন্ধু স্নেহরূপ সংসারবন্ধনের হেতু । এই ক্রম অবধারণ করা হইয়াছে যে, আত্মাই আত্মার বন্ধু (অপর ব্যক্তি বন্ধু) নহে, আত্মাই আত্মার শত্রু, বাহিরের যদি কেহ অপকারী শত্রু হয়, সে আত্ম-ব্যবহারেই শত্রু হয়, এই কারণে (শুদ্ধলেন্ড) অবধারণ করা হইতেছে যে, আত্মাই আত্মার শত্রু (অপর কেহ নহে) ॥ ৫ ॥

বন্ধুরাত্মানন্তস্ত যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ ।

অনাত্মানন্ত শত্রুস্তে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬ ॥

অবয়ব ।—যেন আত্মনা এব আত্মা জিতঃ তস্ত আত্মা আত্মনঃ বন্ধুঃ অনাত্মনঃ (অজিতেশ্রিয়স্ত) আত্মা এব শত্রুবৎ শত্রুস্তে বর্ত্তেত ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদ ।—যে ব্যক্তি আত্মার বলে দেহাদি জয় করিতে পারিয়াছে, সেই ব্যক্তির আত্মাই আপনার বন্ধু হয়, যে ব্যক্তি অজিতেশ্রিয় তাহার আত্মাই শত্রু-বৎ আত্মার অহিতাচরণ করিয়া থাকে ॥ ৬ ॥

ভাষ্য ।—আত্মৈব বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মন ইত্যুক্তং তত্র কিং লক্ষণ আত্মানো-বন্ধু কিংলক্ষণোবাশ্মনো রিপুরিত্যুচ্যতে । বন্ধুরাত্মানন্তস্ত তস্ত আত্মনঃ স ৩৮ উঃপাদন । [৩য়— ১০ম সংখ্যা ;

আত্মা বন্ধুঃ যেন আত্মনা আত্মৈব জিতঃ আত্মা কার্যাকারণজ্ঞাতঃ যেন বশীকৃতঃ জিতেন্দ্রিয় ইত্যর্থঃ । অনাশ্রয়নস্ত অজিতাশ্রয়নস্ত শত্রুশ্চে শত্রুভাবে বক্তেত আত্মৈব শত্রুবদ্ যথা অনাশ্রা শত্রুরাশ্রনোহপকারী তথা আত্মা আশ্রনোহপকারে বর্তেত ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—আত্মাই আত্মার বন্ধু ও শত্রু ইহা বলা হইয়াছে । কিরূপ আত্মা আত্মার বন্ধু এবং কিরূপে আত্মাইবা আত্মার শত্রু হয়, তাহাও বলা হইতেছে । সেই আত্মাই আত্মার বন্ধু, যে আত্মার দ্বারা আত্মা জিত অর্থাৎ বশীকৃত হইয়াছে, এই স্থলে আত্মা এই শব্দটির অর্থ বেহ ও চন্দ্রিয় সমূহ । জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির আত্মাই আত্মার বন্ধু (ইহাই তাৎপর্য্য) ; অনাশ্রা (অর্থাৎ) অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির আত্মাই শত্রুর দ্বারা শত্রুভাব (অর্থাৎ) অপকার করিতে প্রবৃত্ত হয় । অজিতেন্দ্রিয় আত্মা আপনিই আপনার অপকার করিয়া থাকে ইহাই অর্থ ॥ ৬ ॥

জিতাশ্রয়নঃ প্রশান্ত্য পরমাত্মা সমাহিতঃ ।

শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭ ॥

অর্থঃ ।—জিতাশ্রয়নঃ প্রশান্ত্য (সংশ্রাসিনঃ) শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ পরমাত্মা সমাহিতঃ (সাক্ষাদাত্মভাবেন প্রকাশিতঃ) ভবতি ॥ ৭ ॥

মূলানুবাদ ।—দেহ ■ ইন্দ্রিয় সকলকে যে জয় করিতে পারিয়াছে ও যাহার অন্তঃকরণ প্রশান্ত, সেই সন্ন্যাসীর শীত উষ্ণ ও তজ্জনিত সুখ ও দুঃখ সম্পর্কে এবং মান বা অপमानেও পরমাত্মা সাক্ষাৎ আত্মভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

ভাষা ।—জিতাশ্রয়ন ইতি । জিতাশ্রয়নঃ কার্যাবারাদিসংজ্ঞাত আত্মা জিতো যেন স জিতাত্মা তত্ত্ব জিতাশ্রয়নঃ প্রশান্ত্য প্রসন্নান্তঃকরণস্ত সত্যঃ সংশ্রাসিনঃ পরমাত্মা সমাহিতঃ সাক্ষাদাত্মভাবেন বর্তেত ইত্যর্থঃ । কিংচ শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানে চ অপমানে চ মানাপমানয়োঃ পূজাপরিভবয়োঃ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—জিতাশ্রয়ন ইত্যাদি (শ্লোকের অর্থ) “জিতাত্মা” দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির সমষ্টিরূপ আত্মা জিত হইয়াছে যৎকর্তৃক, সেই জিতাত্মা “প্রশান্ত” প্রসন্নচিত্ত, জিতাত্মা ■ প্রসন্নচিত্ত হইলে সন্ন্যাসীর পরমাত্মা সমাহিত (হয়) অর্থাৎ সাক্ষাৎ আত্মভাবে প্রকাশ পায়, শীত উষ্ণ (ও তজ্জনিত) সুখ দুঃখ সমূহে এবং মানে বা অপमानে (সকল অবস্থাতেই পরমাত্মা সমাহিত হয়); মান ■ অপমান শব্দের অর্থ পূজা ■ পরিভব ॥ ৭ ॥

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তায়া কূটস্থোবিজিতৈশ্রিয়ঃ ।

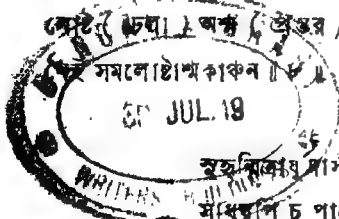
যুক্ত ইত্যাচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্বকাঞ্চনঃ ॥ ৮ ॥

অর্থঃ ।—জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তায়া কূটস্থঃ বিজিতৈশ্রিয়ঃ সমলোষ্টাশ্বকাঞ্চনো-
যোগী যুক্তঃ (সমাহিতঃ) ইতি উচ্যতে ॥ ৮ ॥

মূলানুবাদ ।—জ্ঞান বিজ্ঞানের দ্বারা যাহার আত্মা তৃপ্ত, যে কূটস্থ
(অপ্রকম্পিত) যাহার হস্তিমানচয় বশীকৃত, লোষ্ট্র প্রস্তর ও কাঞ্চনে যাহার
সমতাবুজ্জি হইয়াছে, সেই যোগীই যুক্ত (অর্থাৎ সমাহিত) বলিয়া নির্দিষ্ট
হয় ॥ ৮ ॥

ভাষ্য ।—জ্ঞানেন্দি । জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তায়া জ্ঞানং শাস্ত্রোক্তপদার্থানাং
পরিজ্ঞানং বিজ্ঞানং তু শাস্ত্রতো জ্ঞাতানাং তথৈব স্বানুভবকরণং । তাত্ম্যং
জ্ঞানবিজ্ঞানাভ্যং তৃপ্ত্যঃ সংজাতাং প্রত্যয়ঃ আত্মা অণ্ডঃকরণং যন্ত স জ্ঞান-
বিজ্ঞানতৃপ্তায়া কূটস্থোহপ্রকম্পো ভবতীত্যর্থঃ । বিজিতৈশ্রিয়শ্চ । য ঈদৃশঃ
যুক্তঃ সমাহিত ইতি স উচ্যতে কথ্যতে । স যোগী সমলোষ্টাশ্বকাঞ্চনঃ
লোষ্ট্রাশ্বকাঞ্চনানি সমানি যন্ত সঃ সমলোষ্টাশ্বকাঞ্চনঃ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—জ্ঞান ইত্যাদি (শ্লোকের অর্থ) “জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তায়া”, জ্ঞান
(শব্দের অর্থ) শাস্ত্রীয় বিষয় সমূহের পরিজ্ঞান ; বিজ্ঞান (শব্দের অর্থ) শাস্ত্রের
দ্বারা পরিজ্ঞাত সেই, পদার্থ সমূহের সেই ভাবে নিজের অনুভবের বিষয়ীকরণ,
এই প্রকার জ্ঞান বিজ্ঞানের দ্বারা যাহার আত্মা (অর্থাৎ অণ্ডঃকরণ) তৃপ্ত হই-
য়াছে (অর্থাৎ) অণ্ড সকল বস্তুর প্রতি অপেক্ষণীয়তা নাই, এই প্রকার বুদ্ধি
যুক্ত হইয়াছে, সেই জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তায়া (এই শব্দের দ্বারা অভিহিত হইতেছে) ।
এবং “কূটস্থ” অপ্রকম্প হয় । বিজিতৈশ্রিয়, যে ব্যক্তি ঈদৃশ হয়, সেই যুক্ত
(অর্থাৎ) সমাহিত উক্ত হইয়া থাকে । সেই যোগী “সমলোষ্টাশ্বকাঞ্চন”
সেই যে চন্দ্রাঃ অশ্বঃ প্রস্তর, কাঞ্চন (স্বর্ণ) এই তিনটি বস্তুই যাহার সমান



সুহৃদ্বিত্রাযুদাসীন মধ্যস্থ দ্বেষাবদ্ধুঃ ।

সমুদ্রপি চ পাপেষু সমবুদ্ধিবিশিষ্যতে ॥ ৯ ॥

অর্থঃ ।—সুহৃদ্বিত্রাযুদাসীন মধ্যস্থ দ্বেষাবদ্ধুঃ সাধুযু অপি চ পাপেষু সমবুদ্ধিঃ
(যোগী) বিশিষ্যতে (সর্বোৎকৃষ্টোভবতীত্যর্থঃ) ॥ ৯ ॥

মূলানুবাদ ।—সুহৃৎ, মিত্র, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষা, বদ্ধ, সাধু ও
৩২ • উদ্বোধন । [৩য়—১০ম সংখ্যা ;

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথাস্থত ।

N/724. [শ্রীম—কথিত ।] ৪২ 759

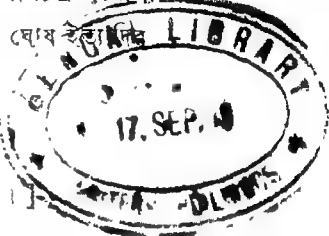
শ্রীশ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণের সহিত শ্রীযুক্ত জৈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ডাক্তার সরকার, শ্রীযুক্ত গিৰিশচন্দ্র ঘোষ ইত্যাদি

বঙ্গোপকণন ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

[গৃহহাশ্রম কথা প্রসঙ্গে ।]



আগ্নিন মাসের শুরু চতুর্দশী হিদি । দপ্তনী, অটমী ও নবমী দিন দিন ধরিয়৷ মহামাসার পূজা মহোৎসব হইয়া গিয়াছে । দশমীতে বিজয়া ও তত্পলক্ষে পরস্পরের প্রেমালিঙ্গন ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছে । ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে কলিকাতার অন্তর্বত্তী শ্যামপুকুর নামক পল্লীতে বাস করিতেছেন । শরীরে কঠিন ব্যাধি, গলায় ক্যান্সার । চিকিৎসার্থ কলিকাতার আগমন করিয়াছেন । বলরামের বাড়ীতে যখন ছিলেন, কবিরাজ গঙ্গাশ্রাদ্দ দেখিতে আসিয়াছিলেন । তাঁহাকে পরমহংসদেব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এ রোগ সাধ্য, না অসাধ্য । কবিরাজ এ প্রশ্নের উত্তর দেন নাই, চুপ করিয়া ছিলেন । ইংরাজী ডাক্তারেরাও রোগটী অসাধ্য, এ কথা ইঙ্গিত করিয়াছিলেন । এক্ষণে ডাক্তার সরকার চিকিৎসা করিতেছেন ।

আজ বৃহস্পতিবার, ২২শে অক্টোবর, ১৮৮৫ সাল । শ্রামপুকুরস্থিত একটি বিতল গৃহমধ্যে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ, একটি দ্বতলাঘরের মধ্যে শয্যা রচনা হইয়াছে, তাহাতে উপবিষ্ট । ডাক্তার সরকার, শ্রীযুক্ত জৈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও ভক্তেরা সম্মুখে এবং চারিদিকে সমাসীন । জৈশান বড় দাতা, পেন্সন লইয়াও দান করেন, ঋণ করিয়া দান করেন, আর সন্তোষই জৈশ্ব চিন্তায় থাকেন । পীড়া শুনিয়া তিনি দেখিতে আসিয়াছেন । ডাক্তার সরকার চিকিৎসা করিতে আসিয়া ৬ । ৭ ঘণ্টা করিয়া থাকেন—ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণকে সাতশয় ভক্তিপ্রজ্ঞা করেন, ও ভক্তদের সহিত পংম আত্মীয়ের গ্রাম বাবহার করেন ।

রাত্রি প্রায় ৭টা । বাহিরে জ্যোৎস্না—পূর্ণাবয়ব নিশানাশ যেন চারিদিকে সূখা ঢালিয়াছেন । ভিতরে দীপালোক । ঘরে অনেক লোক, অনেকে

মহাপুরুষ দর্শন করিতে আসিয়াছেন। সকলেই এক দৃষ্টে তাঁহাব দিকে চাহিয়া বহিষ্কৃত হইয়া গুনিবেন, তিনি কি বলেন। দেখিবেন, তিনি কি করেন।

কৈশিকের দেহখণ্ড পরমহংসদেব বলিতে লাগিলেন,

(निनिष्ठ मन्मथ)

“যে সমারী ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি রেখে সমার করবে, সে ধরা, সে বীরপুরুষ। যেমন লাক্কর মাথায় ছ মল ঘোঁঝা আছে, তাব বর যাচ্ছে, মাথায় ঘোঁঝা, তবও সে দেখছে। যাব শক্তি না থাকলে হয় না।

“যেদন পাঁকাল মাছি পাঁকে থাকে, কিছু গাথে একটুও পাঁক নাই।
পানকোঁচী জলে সন্ধ্যা দুই ঘরে কিছু পাখা এক বা ঝাড়া দিলেই, আর
গাথে জল থাকে না।

(নিম্নলিখিত হ'বার উপায়)

“কিন্তু সংসারে নিশিথুভাবে থাকতে গেলে, কিছু সামান্য করা চাই।
দিন কতক নিরুজ্জনে থাকা দরকাব, তা এক বছর হোক, ছ মাস হোক, তিন মাস
হোক, বা এক মাস হোক। সেই নিরুজ্জনে ঈশ্বর চিন্তা করতে হয়, সর্বদা
ঊঁহাকে ব্যাকুল হয়ে, ভক্তির গুণ প্রার্থনা করতে হয়। আর মনে মনে
বলতে হয়, ‘আমার এ সংসারে কেউ নাই, যাদের আপনার বলি, তারা ছ দিনের
জন্ম, ভগবান আমার একমাত্র আপনার লোক, তিনিই আমার সনাতন, হায়!
কেমন করে তাঁরে পাব।’

“ভক্তিলভের পর সংসার করা যায়। যেমন হাতে তেল মেখে কাঁটাল ভাঙলে, হাতে আর আটা লাগে না।

‘‘সংসার জলের স্বরূপ, আর মানুষের মনটা যেন ছুদ। জলে যদি ছুদ রাখতে যাও, ছুদে জলে এক হয়ে যাবে। তাই নির্জন স্থানে দই পাতে হয়। দই পেতে মাখম তুলতে হয়। মাখম তুলে যদি জলে রাখ, তা’হলে জলে মিশবে না, নিলিপ্ত হয়ে ভাসতে থাকবে।

“হ্রস্বজ্ঞানীরা জামাৎ বলেছিল, মহাশয় আমাদের জনক রাজার মত। তাঁর মতন নিলিপ্তভাবে আমরা সংসার করবো। আমি বলুম, নিলিপ্তভাবে সংসার করা বড় কঠিন, যথেষ্ট জন-বাক্য হওয়া যায় না।

“জনকাজা হেটুগু হরে, উৰ্দ্ধ পদ করে কত তপস্যা করেছিলেন।
ভোগাদের হেটুগু বা উৰ্দ্ধপদ হতে হবে না, কিন্তু সাধন চাই, নিৰ্জনে বাস

চাই। নিরুজ্জনে জ্ঞানলাভ, ভক্তিলাভ করে, তবে গিয়ে সংসার করতে হয়। দই নিরুজ্জনে পাততে হয়। ঠেলাঠেলি নাড়ানাড়ি করলে দই বসে না।

“জনক নির্লিপ্ত বলে তাঁর একটা নাম বিদেহ—কি না দেহে দেহবুদ্ধি নাই। সংসারে থেকেও জীবমুক্ত হয়ে বেড়াতেন। বিস্তৃত দেহবুদ্ধি যাওয়া অনেক দূরের কথা। পুণ সাধন চাই।

“জনক ভারী বীরপুরুষ। দুখানা তলোয়ার লুপ্তেন। একখানা জ্ঞান, একখানা কন্ম।

(সংসার আশ্রমের জ্ঞান ও সন্ন্যাস আশ্রমের জ্ঞান)

“যদি বল, সংসার আশ্রমের জ্ঞানী, আর সন্ন্যাস আশ্রমের জ্ঞানী, এ দুয়ের তফাৎ আছে কি না। তার উত্তর এত যে, দুই-ই এক জিনিষ। এটীও জ্ঞান, উটীও জ্ঞান—এক জিনিষ। তবে সংসারে জ্ঞানীও ভয় আছে। কামিনী কাম্বনের ভিতর থাকতে গেলেই একটু না একটু ভয় আছে। কাজলের ঘরে থাকতে গেলে যত সিয়ানাই হও না কেন, কাল দাগ একটু না একটু গায়ে লাগবে।

“মাখম তুলে যদি নূতন হাড়িতে রাখ, তা হলে মাখম নষ্ট হবার কোনও সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু যদি ঘোলের হাড়িতে রাখ, তা হলে সন্দেহ হয়।

“খই যখন ভাজা হয়, দু চারটে খই খোলা থেকে টপ্ টপ্ করে লাফিয়ে পড়ে। সেগুলি যেন মল্লিকা ফুলের মত, গায়ে একটুও দাগ থাকে না। খোলায় উপর যে সব খই থাকে, সেও বেশ খই, তবে অত ফুলের মত হয় না, একটু গায়ে দাগ থাকে। সংসারভাগী সন্ন্যাসী যদি জ্ঞানলাভ করেন, তবে ঠিক এই মল্লিকে ফুলের মতন দাগশূণ্য হয়। আর জ্ঞানের পর সংসার খোলায় থাকলে, একটু গায়ে লালচে দাগ হতে পারে। জনকরাজাব সত্য এক ভৈরবী এসেছিল। জীলোক দেগে জনকরাজা হেঁটমুখ হয়ে, চোখ নীচু করেছিলেন। ভৈরবী তাই দেখে বলেছিলেন, হে জনক! তোমার এখন জীলোক দেখে ভয়! পূর্ণজ্ঞান হলে পাঁচ বছরের ছেলের স্বভাব হয়—তখন জীপুঁবব বলে ভেদ বুদ্ধি থাকে না।

‘যাই হোক, যদিও সংসারের জ্ঞানীর গায়ে দাগ থাকতে পারে, সে দাগে কোনও ক্ষতি হয় না। চক্ষে কলঙ্ক আছে বটে, কিন্তু আলোর ব্যাঘাত হয় না।

(জ্ঞানের পর কন্ম লোকসংগ্রহার্থ)

“কেউ কেউ জ্ঞানলাভের পর লোকশিক্ষার জন্য বর্ষ করে, যেমন জনক ও

নারদাদি । লোক-শিক্ষার জন্য শক্তি থাকা চাই । ঋষিরা নিজের নিজের জ্ঞানের জন্য ব্যস্ত ছিলেন । নারদাদি আচার্য্য গোকেবর হিতের জন্য বিচরণ করে বেড়াইতেন । তাঁরা বীর পুরুষ ।

“হাবাতে কাঠ যখন ভেসে যায়, একটা পাখী বসলে ডুবে যায় ; কিন্তু বাহাছরি কাঠ যখন ভেসে যায়, তখন গরু, মাল্লু, এমন কি, হাতী পর্য্যন্ত তার উপর যেতে পারে । Steam boat আপনি ও পারে যায়, আবার কত মানুষকে পার করে দেয় ।

“নারদাদি আচার্য্য ওই বাহাছরি কাঠের মত, ওই steam-boatএর মত ।

“কেউ আম খেয়ে গামছা দিয়ে মুখ পুঁচে বসে থাকে, পাছে কেউ টের পায় । আবার কেউ কেউ একটা আম পেলে, কেটে একটু একটু সকলকে দেয়, আর আপনিও খাও ।

“নারদাদি আচার্য্য সকলের মঙ্গলের জন্য জ্ঞানলাভের পরও ভক্তি নিয়ে ছিলেন ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

[ভক্তিযোগ—যুগধর্ম্ম কথা প্রসঙ্গে]

জ্ঞানযোগ ■ ভক্তিযোগ ।

ডাক্তার । জ্ঞানে মানুষ অধিক হয়, চক্ষু বুজে যায়, আর চক্ষে জল আসে । তখন ভক্তির দরকার হয় ।

শ্রীযামকৃষ্ণ । ভক্তি মেখে মানুষ, তাই অন্তঃপুর পর্য্যন্ত যেতে পারে । জ্ঞান বারবাতী পর্য্যন্ত যায় ।

ডাক্তার । কিন্তু অন্তঃপুরে যাকে তাকে ঢুকতে দেওয়া হয় না । বেঞ্চারী ঢুকতে পারে না । জ্ঞান চাই ।

শ্রীযামকৃষ্ণ । ঠিক পথ জানে না, কিন্তু ঈশ্বরে ভক্তি আছে, তাঁকে জানবার ইচ্ছা আছে, এরূপ লোক কেবল ভক্তির জোরে ঈশ্বর লাভ করে । একজন ভারি ভক্ত জগন্নাথ দর্শন করতে বেরিয়েছিল, পুরীর কোন্ পথ সে জানতো না, দক্ষিণ দিকে না গিয়ে পশ্চিম দিকে গিছিল । পথ ভুলেছিল বটে, কিন্তু ব্যাকুল হয়ে লোকদের জিজ্ঞাসা করতো । তারা বলে দিলে, ‘এ পথ নয়, ঐ পথে যাও ’ ভক্তটী শেষে পুরীতে গিয়ে জগন্নাথ দর্শন করলে । না জানলেও কেউ না কেউ বলে দেয় ।

ডাক্তার । সে ভুলে তো গিছিল ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ, তা হয় বটে, কিন্তু শেষে পায় ।

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার ।

(ঈশ্বর সাকার না নিরাকার)

শ্রীরামকৃষ্ণ । তিনি সাকার, আবার নিরাকার । একজন সন্ন্যাসী জগন্নাথ দর্শন করতে গিছিল । জগন্নাথ দর্শন করে সন্দেহ হল, ঈশ্বর সাকার, না নিরাকার । হাতে দণ্ড ছিল, সেই দণ্ড দিয়ে, দেখতে লাগল—জগন্নাথের গায়ে ঠাকো কিনা । একবার এধার থেকে ওধারে দণ্ডটা নিয়ে যাবার সময় দেখলে যে, জগন্নাথের গায়ে ঠেকুলো না—যেন সেখানে ঠাকুরের মূর্তি নাই । পুনর্বার দণ্ড এধার থেকে ওধারে নিয়ে যাবার সময় বিজ্ঞানের গায়ে ঠেকল । তখন সন্ন্যাসী বুঝল, যে ঈশ্বর সাকার, আবার নিরাকার । কিন্তু এটা ধারণা করা বড় শক্ত । ‘যিনি নিরাকার, তিনি আবার সাকার কিরূপে হবেন ?’ এ সন্দেহ মনে উঠে । আবার সাকার যদি হন, তো এত নানারূপ কেন ?

ডাক্তার । যিনি আকার করেছেন, তিনি সাকার । তিনি আবার মন করেচেন, তাই তিনি নিরাকার ; তিনি সবই হতে পারেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । ঈশ্বরকে লাভ না করতে পারলে, এ সব বুঝা যায় না । সাধকের জন্ত তিনি নানাভাবে নানারূপে দেখা দেন ।

“একজনের এক গামলা রঙ ছিল । অনেকে তার কাছে কাপড় রঙ করতে আসতো । সে লোকটা জিজ্ঞাসা করতো, ‘তুমি কি রঙে ছোপাতে চাও ?’ একজন হয়তো বলে, ‘আমি লাল রঙে ছোপাতে চাই ?’ অমনি সেই লোকটা গামলার রঙে সেই কাপড় খানি ছুপিয়ে বলতো, ‘এই নাও তোমার লাল রঙে ছোপান কাপড় ।’ আর একজন হয়তো বলে, ‘আমার হলুদে রঙে ছোপান চাই ।’ অমনি সেই লোকটা সেই গামলার কাপড় খানি ডুবিয়ে বলতো, ‘এই নাও তোমার হলুদে রঙ ।’ নীলরঙে ছোপাতে চাইলে, আবার সেই একই গামলায় ডুবিয়ে সেই কথা, ‘এই নাও তোমার নীলরঙে ছোপান কাপড় ।’ এই রকমে যে, যে রঙে ছোপাতে চাইতো, তার কাপড় সেই রঙে সেই একই গামলা হতে ছোপান হ’ত । একজন লোক এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখছিল । বার গামলা, সে জিজ্ঞাসা করলে, ‘কেমন হে ! তোমার কি রঙে ছোপাতে হবে ?’ তখন সে বললে, ‘তাই ! তুমি যে রঙে রঙেছ, আমার সেই রঙ দাও ।’ (সকলের হাস)

“একজন বাহে গিছিল—দেখলে, গাছের উপর একটা সুন্দর জানোয়ার রয়েছে। সে এসে আর একজনকে বললে, ‘ভাই! অমুখ গাছে আমি একটা লালবড়ের জানোয়ার দেখে এলুম।’ সে লোকটা বললে, ‘আমিও দেখে এসেছি, তা সে লাল রঙ হতে যাবে কেন, সে যে সবুজ রঙ।’ আর একজন বললে, ‘না না, সে সবুজ হতে যাবে কেন, সে যে হলদে।’ এইরূপে আরও কেউ কেউ বললে বেগুনি, নীল, কাল ইত্যাদি। শেষে ঝগড়া। তখন তারা গাছতলায় গিয়ে দেখে, একজন লোক বসে আছে। তাকে জিজ্ঞাসা করায়, সে বললে, ‘আমি এই গাছতলায় থাকি, আমি সে জানোয়ারটাকে বেশ জানি। তোমরা যা যা বলছো, সব সত্য, সে কখন লাল, কখন সবুজ, কখন নীল কখন হলদে, আরও সব কত কি হয়। কখন দেখি, কোন রঙই নাই।’

“যে ব্যক্তি সদাসর্বদা ঈশ্বর চিন্তা করে, সেই জানতে পারে, তাঁর স্বরূপ কি? সে ব্যক্তিই জানে যে, ঈশ্বর মানাক্রমে দেখা দেন। নানানভাবে দেখা দেন। তিনি সগুণ, আবার নিগুণ (The Absolute)। যে গাছতলায় থাকে, সেই জানে যে, বছরপীর নানাংগু, আবার কখন কখন কোন রঙ্গই থাকে না। অথচ লোকে কেবল তর্ক ঝগড়া করে কষ্ট পায়। তিনি সাকার, তিনি নিরাকার। কি রকম জান? যেন সচ্চিদানন্দ সমুদ্র, কুল কিনাবা নাই। ভক্তি হিমে এই সমুদ্রের স্থানে স্থানে জল বরফ হয়ে যায়, যেন জল বরফ আকারে জমাট বাঁধে, অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি ব্যক্তি Personal God হয়ে, কখন কখন সাকার রূপ হয়ে দেখা দেন। আবার জ্ঞানস্বরূপ উঠলে সে বরফ গলে যায়।”

ডাক্তার। স্বরূপ উঠলে বরফ গলে জল হয়, আবার জানেন, জল আবার নিরাকার বাষ্প হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। অর্থাৎ ‘ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা’ এই বিচারের পর সমাধি হলে রূপ টুপ উড়ে যায়। তখন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি (Personal God) বলে বোধ হয় না। কি তিনি, মুখে বলা যায় না। কে বলবে? যিনি বলবেন, তিনিই নাই। তিনি তাঁর আমি আর খুঁজে পান না। তখন ব্রহ্ম নিগুণ (The Absolute)। তখন তিনি কেবল বোধে বোধ হন। মন, বুদ্ধি দ্বারা তাঁকে ধরা যায় না (The unknown and the unknowable)।

“তাই বলে ভক্তি চন্দ্র, জ্ঞান স্বরূপ। শুনেছি, খুব উত্তরে আর দক্ষিণে

সমুদ্র আছে । এত ঠাণ্ডা যে, জল মাঝে মাঝে বরফের চাঁই হয় । জাহাজ চলে না । সেখানে গিয়ে আটকে যায় ।

ডাক্তার । ভক্তিপথে মানুষ আটকে যায় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । হ্যাঁ, তা যায় বটে, কিন্তু তাতে হানি হয় না, কেন না, সেই সচ্চিদানন্দ সাগরের জলই জমে বরফ হয়েছে । যদি আরও বিচার করতে চাও, যদি ‘ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা’ এই বিচার কর, তাতেও ক্ষতি নাই, জ্ঞান-স্বর্গে বরফ গলে যাবে—তবে সেই সচ্চিদানন্দ সাগরই ব্রহ্ম ।

(কাঁচা আমি ও পাকা আমি, ভক্তের আমি)

“জ্ঞানবিচারের শেষে সমাধি হলে, আমি টাম কিছু থাকে না । কিন্তু সমাধি হওয়া বড় কঠিন । ‘আমি’ কোন মতে যেতে চায় না । আর যেতে চায় না বলে, ফিরে ফিরে এই সংসারে আসতে হয় । “গরু হাঙ্গা হাঙ্গা (আমি, আমি) করে, তাই এত দুঃখ । সমস্ত দিন লাঙ্গল দিতে হয়—গ্রীষ্ম নাই, বর্ষা নাই । কিস্বা কসাইয়ে কাটে । তাতেও নিস্তার নাই । চামারে চামড়া করে, জুতো তৈয়ার করে । অবশেষে নাড়ী ভুঁড়ী থেকে তাঁত হয় । ধুরুরির হাতে পড়ে যখন তুঁহুঁ তুঁহুঁ (তুমি তুমি) করে, তখন গরুর নিস্তার হয় ।

‘যখন জীব বলে, ‘নাহং’, ‘নাহং’ ‘আমি কেহ নহ, আমি কণ্ঠা নহ, হে ঈশ্বর ! তুমি কণ্ঠা, আমি দাস, তুমি প্রভু’, তখন নিস্তার, তখনই মুক্তি ।”

ডাক্তার । কিন্তু ধুরুরির হাতে পড়া চাই । (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ । যদি একান্ত ‘আমি’ না যায়, তবে থাক্ শালা ‘দাস আমি’ হয়ে । (সকলের হাস্য)

“সমাধির পর কাহারও কাহারও আমি থাকে,—দাস আমি, ভক্তের আমি । শঙ্করাচার্য্য বিত্তার ‘আমি’ লোক শিক্ষার জন্ত রেখে দিছিলেন ।

“দাস আমি,’ ‘বিত্তার আমি,’ ‘ভক্তের আমি,’ এরই নাম ‘পাকা আমি,’ । ‘কাঁচা আমি’ কি জান ? আমি কণ্ঠা, আমি এত বড় লোকের ছেলে, আমি বিদ্বান্, আমি ধনবান্, আমাকে এমন কথা বলে ? এই সব ভাব । যদি কেউ বাড়ীতে চুর করে, তাকে যদি ধরতে পারে, তাহলে প্রথমে জিনিষ পত্র কেড়ে নেয়, তার পর উত্তম মধ্যম মারে, তারপর পুলিশে দেয় । বলে, ‘কি ! জানে না, কার চুরি করেছে ?’

(বালকের আমি)

“ঈশ্বর লাভ হলে পাঁচ বছরের বালকের স্বভাব হয়, ‘বালকের আমি’ও

‘পাকা আমি।’ বাগক কোন গুণের বশ নয়। ত্রিগুণাতীত। সম্ব. রত্নঃ, তমঃ কোন গুণের বশ নয়। দেখ, ছেলে তমোগুণের বশ নয়। এই মাত্র ঝগড়া মারামারি করলে, আবার তৎক্ষণাৎ তাইই গলা ধরে কত ভাব, কত খেলা। আবার রজোগুণেরও বশ নয়। এই খেলা-স্বর পাংলে, কত বন্দো-বস্ত, আবার কিছুক্ষণ পরেই সাপড়ে রইলো। মার কাছে ছুটেছে। হয়ত একখানি সুন্দর কাপড় পরে বেড়াচ্ছে। খানিকক্ষণ পরে কাপড় খুলে পড়ে গেছে। হয় কাপড়ের কথা একেবারে ভুলে গেল—নয়, বগলদাবায় করে বেড়াচ্ছে। যদি ছেলেটাকে বল, ‘বেশ কাপড় খানি, কার বাপড় রে?’ সে বলে, ‘আমার কাপড়, আমার বাবা দিয়েচে।’ যদি বল, ‘লক্ষ্মী ছেলে, আমার কাপড় খানি দাও না।’ সে বলে, ‘না, আমার কাপড়, আমার বাবা দিয়েছে, না, আমি দোব না।’ তারপর ভুলিয়ে একটি পুতুল, কি একটি বাঁশ যদি হাতে দাও, তা হলে পাঁচ টাকা দামের কাপড় খানি তোমায় দিয়ে চলে যাবে। আবার পাঁচ বছরের ছেলের সম্বগুণেরও আঁট নাই। এই পাড়ার খেলুড়েনের সঙ্গে কত ভালবাসা, একদণ্ড না দেখলে থাকতে পারে না। কিন্তু বাপ মার সঙ্গে যখন অশ্রু জাগায় চলে গেল, তখন নূতন খেলুড়ে হ’ল। তাদের উপর তখন সব ভালবাসা পড়লো। পুরাণো খেলুড়েনের এক রকম একেবারে ভুলে গেল। তারপর জাত অভিমান নাই। মা বলে দিয়েছে, ‘ও তোর দাদা হয়,’ তা সে ষোল খানি জানে যে, এ আমার ঠিক দাদা। তা একজন যদি বামুনের ছেলে হয়, আর একজন যদি কামারের ছেলে হয়, তো একপাতে বসে ভাত খাবে। আর গুচি অশুচি নাই, হেগো পৌদে খাবে। আবার লোক লজ্জা নাই, ছোঁচাবার পর থাকে তাকে পেছন ফিরে বলে, ‘দেখ দেখি, আমার ছোঁচান হয়েছে কিনা?’

“আবার ‘বুড়োর আমি’ আছে (ডাক্তারের হাত)। বুড়োর অনেক গুলি পাশ। জাতি অভিমান, লজ্জা, ঘৃণা, ভয় ইত্যাদি। বিধয় বুজি, পাটোয়ারি, কপটতা। যদি কারুর উপর আকোছ হয়, তো সহজে যায় না, হয়তো যতদিন বাঁচে, ততদিন যায় না। তারপর পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার ; এই সব ‘বুড়োর আমি’ কাঁচা আমি।

(জ্ঞান কাহাদের হয় না)

শ্রীরামকৃষ্ণ। ৪ঃ জনের জ্ঞান হয় না। যার বিদ্যের অহঙ্কার, যার পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, যার ধনের অহঙ্কার, তার জ্ঞান হয় না। এসব লোককে

যদি বলা যায় যে, অমুখ জায়গায় বেশ একটা সাধু আছে, দেখতে যাবে ?
অমনি নানা ওজর করে বলে, যাব না । আর মনে মনে বলে, আমি এত বড়
লোক, আমি যাব ?

(সত্ত্বগুণ ঃ ঈশ্বরলাভ ; ইন্দ্রিয় সংযমের উপায়)

“তমোগুণের স্বভাব অহঙ্কার । অহঙ্কার অজ্ঞান থেকে হয়, তমোগুণ
থেকে হয় ।

“পুরাণে আছে, রাবণেব রজোগুণ, কুল্লকর্ণের তমোগুণ, বিভীষণের সত্ত্বগুণ ।
বিভীষণ রামচন্দ্রকে লাভ করেছিলেন । তমোগুণের আর একটা লক্ষণ—
ক্রোধ । ক্রোধে দিক্ বিদিক্ জ্ঞান থাকে না । হুমান লক্ষা পুড়ালেন, এ জ্ঞান
নাই যে, সীতার কুটীর নষ্ট হবে ।

“আবার তমোগুণের আর একটা লক্ষণ—কাম । পাথুরেঘাটার গিঞ্জ
ঘোষ বলেছিল, কাম ক্রোধাদি রিপু এরাতো যাবেনা, এদের মোড় ফিরিয়ে
দাও । ঈশ্বরের কামনা কর । সচ্চিন্তনেন্দ্রের সহিত রমণ কর । আর ক্রোধ
যদি না যায়, তবে ভক্তির তমঃ আন । কি ! আমি হুর্গানাম করেছি, উদ্ধার
হ'ব না । আমার আবার পাপ কি ? আমার আবার বন্ধন কি ? তারপর
ঈশ্বর লাভ করবার লোভ কর । ঈশ্বরের রূপে মুগ্ধ হও । আমি ঈশ্বরের
দাস, আমি ঈশ্বরের ছেলে, যদি অহঙ্কার করতে হয়, তো এই অহঙ্কার কর ।
এই রকমে ছয় রিপু মোড় ফিরিয়ে দিতে হয় ।

ভাকার । ইন্দ্রিয় সংযম করা বড় শক্ত । ঘোড়ার চক্ষের হৃদিকে হুঁজি
দাও । কোন কোন ঘোড়ার চক্ষু একেবারে বন্ধ করিতে হয় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তাঁর যদি একবার কুপা হয়, ঈশ্বরের যদি একবার দর্শন
লাভ হয়, আশ্রমের যদি একবার সাক্ষাৎকার হয়, তা হলে আর কোন ভয়
নাই—তখন ছয়রিপু আর কিছু করতে পারবে না ।

“নারদ, প্রহ্লাদ এই সব নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষদের অত করে চক্ষের হৃদিকে
হুঁজি দিতে হয় না । যে ছেলে নিজে বাপের হাত ধরে মাঠের আল্পণে
চলছে, সে ছেলে বরং আশ্রয়ান হয়ে বাপের হাত ছেড়ে দিয়ে খানায় পড়তে
পারে । কিন্তু বাপ যে ছেলের হাত ধবে, সে কখনও খানায় পড়ে না ।

ভাকার । কিন্তু বাপ ছেলের হাত ধরা ভাল নয় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তা নয় । মহাপুরুষদের বালকস্বভাব । ঈশ্বরের কাছে

তাহারা সন্দেহাই বালক। তাঁদের অহঙ্কার থাকে না। তাঁদের সবশক্তি ঈশ্বরের শক্তি, বাপের শক্তি, নিজের কিছুই নয়।

(বিচারপথ ও আনন্দপথ ; জ্ঞানযোগ ■ ভক্তিযোগ)

ডাক্তার। আগে ঘোড়ার চক্ষের দুদিকে ঠুলি না দিলে, বোড়া কি এগুতে চায় ? রিপু বণ না-হলে, কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুমি যা বলচো, ওকে বিচার-পথ বলে—জ্ঞানযোগ বলে। ও পথেও ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। জ্ঞানীরা বলে, আগে চিত্তশুদ্ধি হওয়া দরকার। আগে সাধন চাই, তবে জ্ঞান হবে।

“আমার ভক্তিপথেও তাঁহাকে পাওয়া যায়। যদি ঈশ্বরের পাদ-পদ্মে একবার ভক্তি হয়, যদি তাঁর নামগুণ গান করতে ভাল লাগে, তাহলে ইন্দ্রিয় সংযম আর চেষ্টা করে কব্জতে হয় না। রিপু বণ আপনা আপনি হয়ে যায়।

“যদি কাহারও পুত্র শোক হয়, সে দিন সে কি আর লোকের সঙ্গে ঝগড়া করতে পারে, না নিমন্ত্রণে গিয়ে খেতে পারে ? সে কি লোকের সামনে অহঙ্কার করে বেড়াতে পারে, না স্তম্ভ সন্তোষ করতে পারে ? বাহুল্যে পোকা যদি একবার আলো দেখতে পায়, তা হ’লে কি সে আর অন্ধকারে থাকে ?

ডাক্তার। তা পুড়েই যক সেও স্বীকার।

শ্রীরামকৃষ্ণ। নাগো, ভক্ত কিন্তু বাহুল্যে পোকের মত পুড়ে মরে না। ভক্ত যে আলো দেখে ছুটে যায়, সে যে মণির আলো। মণির আলো খুব উজ্জ্বল বটে, কিন্তু সিন্ধু আর গীতল, এ আলোতে গা পুড়ে না, এ আলোতে শান্তি হয়, আনন্দ হয়।

(জ্ঞানযোগ বড় কঠিন)

“বিচারপথে, জ্ঞানযোগের পথে, তাঁহাকে পাওয়া যায়। কিন্তু এ পথ বড় কঠিন। আমি শরীর নই, মন নই, বুদ্ধি নই, আমার রোগ নাই, শোক নাই, অশান্তি নাই, আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ, আমি স্তম্ভহৃৎকের অগীত, আমি ইন্দ্রিয়ের বশ নই, এ সব কথা মুখে বলা খুব সোজা। কাজে করা, দারণা হওয়া, বড় কঠিন। কাঁটাতো হাত কেটে যাচ্ছে, দরদব্ব করে রক্ত পড়ছে, অথচ বলছি, ‘কই, কাঁটায় আমার হাত কাটে নাই, আমি বেশ আছি।’ এ সব কথা বলা সাজে না, আগে ঐ কাঁটাকে জ্ঞানান্নি দিয়া পোড়াতে হবে তো ?

(বই পড়া জ্ঞান বা পাণ্ডিত্য ; শিক্ষাপ্রণালী)

“অনেকে মনে করে, বই না পড়ে বুঝি জ্ঞান হয় না, বিজ্ঞা হয় না। কিন্তু

পড়ার চেয়ে শুনা ভাল, শুনার চেয়ে দেখা ভাল। কাশীর বিষয়ে পড়া, কাশীর বিষয়ে শুনা, আর কাশী দর্শন করা অনেক তফাৎ।

“আবার যারা নিজে সতরঞ্চ খেলে, তারা চাল তত বুঝে না, কিন্তু যারা না খেলে, উপর চাল বলে দেয়, তাদের চাল ওদের চেয়ে অনেকটা ঠিক ঠিক হয়। সংসারী লোক মনে করে, আমরা বড় বুদ্ধিমান। কিন্তু তারা বিষয়া-সক্ত। নিজে খেলেচে। নিজেদের চাল ঠিক বুঝতে পারে না। কিন্তু সংসার-ত্যাগী সাধুলোক বিষয়ে অনাসক্ত। তারা সংসারীদের চেয়ে বুদ্ধিমান। নিজে খেলে না, তাই উপর চাল ঠিক বলে দিতে পারে।

ডাক্তার। (ভক্তদিগের প্রতি) বই পড়লে এ ব্যক্তির (পরমহংসদেবের) এত জ্ঞান হতো না। Faraday communed with nature. প্রকৃতিকে ফেরাড়ে নিজে দর্শন করতো, তাই অতো Scientific truth discover করতে পেরেছিল। বই পড়ে বিভ্রা হলে, অত হত না। Mathematical formulae only throw the brain into confusion. Original inquiry বপথে বড় বিষ এনে দেয়।

(ঈশ্বর প্রদত্ত জ্ঞান ও মানুষের পাণ্ডিত্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি) যখন পঞ্চবটীতে মাগীতে পড়ে পড়ে আমি মাকে ডাকতুম, আমি মাকে বলেছিলাম, মা! আমায় দেখিয়ে দাও, কন্মীর কৰ্ম্ম করে যা পেয়েছে, যোগীরা যোগ কবে যা দেখেছে, জ্ঞানীরা বিচার করে যা জেনেছে, আরও কত কি, তা কি বলবো।

“আহা! কি অবস্থাই গেছে। ঘুম যায়। এই বলিয়া পরমহংসদেব গান-করিয়া বলিতে লাগিলেন;—

ঘুম ভেঙ্গেছে আর কি ঘুমাই,
সোণে যাগে জেগে আছি।
এখন যোগ নিদ্রা তোরে পেয়ে মা,
ঘুমেতে ঘুম পাড়ায়েছি।

“আমি তো বই টাই কিছুই পড়িনি, কিন্তু দেখ, মার নাম করি বলে, আমায় সবাই মানে। শঙ্কু মণিক আমায় বলেছিল, চাল নাই, তরোয়াল নাই, শাস্তি-রাম সিং। (সকলের হাস)

শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষের ‘বুদ্ধদেব চরিত’ অভিনয় বর্ণনা হইতে লক্ষ্যগিল।

তিনি ডাক্তারকে নিমন্ত্রণ করাইয়া ঐ অভিনয় দেখাইয়াছিলেন। ডাক্তার উহা দেখিয়া ধারণা নাই আনন্দিত হইয়াছিলেন।

ডাক্তার। (গিগীশের প্রতি) তুমি বড় বদলোক। আমার কি রোজ থিয়েটার খেতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি বলছো, আমি বুঝতে পারছি না।

মাষ্টার। গুর থিয়েটার বড় ভাল লেগেছে। (ক্রমশঃ।)

শ্রীশ্রীরামানুজচরিত ।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ।]

[৩৩৪ পৃষ্ঠার পর ।

প্রায় সহস্র বৎস পূর্বে আশুনি কেশবাচার্য্য নামে এক ইষ্টনিষ্ঠ সদ্ভাক্ষণ এই গ্রামে বাস করিতেন। সেই সময় শ্রীমদ্ যামুনাচাৰ্য্য বা আল্‌ওয়ান্দার রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া নথির শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্বক শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে অত্যাশ্রমী-ভিক্ষুবশে অবস্থান করিতেছেন। ওরুর বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হইলে, আল্‌ওয়ান্দরই তৎকালিক সমগ্র বৈষ্ণবমণ্ডলীর নেতৃত্বপে পরিগৃহীত হইলেন। তাঁহার অসাধারণ ত্যাগ, বৈরাগ্য, পাণ্ডিত্য, নব্রতা, ইষ্টনিষ্ঠা প্রভৃতি, সকল বৈষ্ণবেরই অমুকরণীয় হইয়া উঠিল। তদ্রূপিত হুমধুর স্তোত্র সকল মজ্জনই সাদরে কণ্ঠস্থ ও হৃদয়স্থ করিয়া আপনাদের কৃতকৃত্য মনে করিলেন। বস্তুতঃই, মহাত্মা যামুনাচাৰ্য্য উক্ত স্তোত্রে এরূপ উৎকট ভক্তি ও প্রীতির সহিত শ্রীমদ্ভগবৎপাদপদ্মে সরলভাবে আত্মনিবেদন করিয়াছেন যে, তাহা পাঠ করিলে পাবণচন্দ্রেরও ভক্তির সঞ্চার হয়। চতুর্দিক্ হঠতে দলে দলে ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ বৈষ্ণবগণ আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্বক আপনাদিগকে পরম ভাগ্যবান্ বলিয়া জ্ঞান করিলেন। তন্মধ্যে দুই, একজন তাঁহার আশ্রিত ভিক্ষু-শ্রম গ্রহণ পূর্বক নিরন্তর তৎসহবাসে ও তৎসেবার কালোতিপাত করিয়া আপনাদের সর্বতোভাবে কৃতার্থ বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন।

পেরিয়া তিরু মলাই নথি বা বুদ্ধ শ্রীশৈলপূর্ণ যামুনাচাৰ্য্যের সর্বপ্রধান শিষ্য ছিলেন। তিনি জীবনের শেষভাগে গার্হস্থ্যধর্ম পরিত্যাগ করিয়া উক্ত মহাপুরুষের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তৎসহবাসে কালোতিপাত করেন। তাঁহার হুইটি ভদ্রী ছিলেন। জ্যেষ্ঠার নাম ভূমি পেরাট্টি, ভূদেবী, বা কান্তিমতী। কনিষ্ঠার নাম পেরিয়া পেরাট্টি বা মহাদেবী।

ত্ৰীপেরেম্বুচুর নিবাসী আহরি কেশবাচার্য্য কাঙ্ক্ষিতীয় পাণিগ্রহণ করেন। কনিষ্ঠা মহাদেবী নিকটস্থ আহরম্ গ্রামনিবাসী কমলনয়ন ভট্টের সহিত উদাহরশ্রুতলে বন্ধা হইলেন। ভগ্নীষেধের উদাহকাৰ্য্য সম্পন্ন হইয়া গেলে ত্ৰীশৈল-পূর্ণ নিশ্চিন্ত মনে ভগবদ্যানপরায়ণ হইলেন এবং পরিশেষে মহাত্মা যামুন-চার্য্যের আশ্রয় সদ্‌ওরুলাভ করিয়া বৃদ্ধাবস্থায় তৎসহবাসে পরমানন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

আহরি কেশবাচার্য্য সাতিশয় বজ্রনিষ্ঠ ছিলেন বলিয়া পণ্ডিতগণ তাঁহার “সৰ্ব্বজ্ঞতু” উপাধি দিয়াছিলেন। স্মৃতবাং তাঁহার পূর্ণনাম, শ্রীমদাহরি সৰ্ব্ব-জ্ঞতু কেশবদীক্ষিত। বিবাহের পর দম্পতি বহু বৎসর ত্ৰীপেরেম্বুচুরে সুখে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদের কোনও সন্তান না হওয়ায় ভক্ত কেশবাচার্য্য কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্নমনঃ হইলেন। পরিশেষে বজ্রদ্বারা ত্ৰীভগবান্কে প্রীত করিয়া তৎকৃতপায় পুত্রসন্তান লাভ করিবার আশা তাঁহার হৃদয়ে জাগরুক হইল।

যজ্ঞ এব পরোধনো ভগবৎপ্রীতিকারকঃ।

অভীষ্টকৰ্ম্মধুগ্ যজ্ঞস্তস্মাৎ যজ্ঞঃ পরাগতিঃ ॥

ইত্যাদি সন্তাপচ্ছেদী শাস্ত্রবাক্য সমূহও সেই আশাকে বলবতী করিয়া তুলিল। তিনি মহোদধিতীরবর্তী-বৃন্দারণ্যানিবাসী শ্রীমৎপার্বসারথির সমীপে গমন পূৰ্ব্বক স্বীয় মনোভাব নিবেদন করিয়া তদুদ্দেশে যজ্ঞ করিতে সন্মত করিলেন। তদনুসারে তিনি সন্নীক বৃন্দারণ্যে উপস্থিত হইলেন ও ত্রীপার্ব-সারথির কুমুদসরোবর বা তিরুইল্লি কেশির (তিরু-ত্ৰী, ইল্লি-কুমুদ, কেশি-সরোবর) তীরে পুত্রকামনায় যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন। অধুনা আমরা যে স্থানকে ট্রিল্লিকেন্ বলি, তাহা ঐ তিরুইল্লি কেশির ঈংরাজি অপভ্রংশ। যাহা পূৰ্বে বৃন্দারণ্য নামেখ্যাত ছিল, তাহা এক্ষণে ঐ সরোবরের নামানুসারে ট্রিল্লিকেন্ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। মাদ্রাজ, মহরা বা মথুরার অপভ্রংশ। ইহা বৃন্দারণ্য বা ট্রিল্লিকেনের উত্তরে।

যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে নিশাকালে কেশবাচার্য্য নিদ্রিতাবস্থায় শ্রীমৎ পার্ব-সারথিকে স্বপ্ন দেখিলেন। স্বপ্নে ভগবান্ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “হে সৰ্ব্বজ্ঞতো, আমি তোমার সঙ্গাচার, নিষ্ঠা, ও ভক্তিতে সাতিশয় পরিতুষ্ট হইয়াছি। তুমি উদ্বিগ্ন হইও না। আমিই তোমার পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিব। মনুষ্যাগণ দুৰ্ঘু দ্বিবশতঃ পূৰ্ব্বাচার্য্যগণের বধার্থ অভিপ্রায় অবগত হইতে

না পারিয়া আপনাদিগকে ঈশ্বর মনে করিতেছে, এবং অহঙ্কারের বশবর্তী হইয়া কুকর্মপরায়ণ ও যগেচ্ছাচারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শুভরাত্রে আচার্য্য ক্রমে আমি অতীর্ণ না হইলে তাহাদের কোনও গতি নাই। তুমি স্ত্রীর সহিত গৃহে প্রতিগমন কর। শীঘ্রই সিদ্ধকাম হইবে।” এরূপ সুস্বপ্ন দেখিয়া দেখিয়া কেশবাচার্য্যের আর উল্লসের মীমা রহিল না। তিনি পত্নীকে সকলই কহিলেন এবং পরদিন প্রভুষে উভয়ে স্বগ্রামাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

এই ঘটনার এক বৎসর পরে ভাগ্যবতী কাস্তিমতী সর্কসুলক্ষণ-সম্পন্ন এক পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন। ৪১১৮ কল্যুকে, ৯৩৯ শকাব্দে, বা ১০১৭ খ্রিষ্টাব্দে আদ্র্শিনক্ষত্রযুক্ত চৈত্র মাসের দ্বাদশ দিবসে, শুক্র পঞ্চমী তিথিতে, কর্কট লগ্নে, বৃহস্পতিবারে, পিঙ্গলা নামক বৎসবে, হারিতগোত্রীয়, ষড়্ভুশাখা-ধারী ভগবান্ শ্রীরামানুজাচার্য্য তরুণ তপনের জ্বায় অজ্ঞান অন্ধকার বিদূরিত করিয়া সর্বলোক সমক্ষে সমুদিত হইলেন। তাঁহার জন্মে দুর্ভুদ্বির নাশ হইয়া সদ্ভুদ্বির বিকাশ হইয়াছিল বলিয়া, পণ্ডিতগণ “ধীলঙ্কা” এই বাক্য দ্বারা তাঁহার জন্মকাল নির্ণয় করিয়াছেন। “অঙ্কু বামা গতিঃ” এই জাম্বাবনীর উক্ত বাক্যে ধ, ল, এবং ধ, এই তিন প্রধান অক্ষর আছে। কাদি নব, টাদি নব, ও যদি নব এই কয় অক্ষর মালা এক হইতে নয় পর্য্যন্ত সংখ্যার জ্ঞাপক। টাদি নবের মধ্যে ধ নবম স্থানীয় বলিয়া নয় সংখ্যা বুঝাইবে। এবং যদি নবের মধ্যে ল তৃতীয় স্থানীয় বলিয়া তিন সংখ্যা বুঝাইবে। অতএব ধ, ল, এবং ধ, এই অক্ষরত্রয় ৯৩৯ শকাব্দ বুঝাইল।

সেই সময় কনিষ্ঠা ভগ্নী মহাদেবীও এক পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন। স্ত্রীকণ গুচ হইতে বহির্গতা হইয়া কিয়দ্বিগম পরে তিনি নবজাত পুত্রের সহিত জোষ্ঠী কাস্তিমতীর পুত্র সন্দর্শন বাসনায় শ্রীপেরুমবুহুরে আগমন করিলেন। ভগ্নীদ্বয় পরস্পরের সমস্তিযুথাবলোকনে যৎপরোনাস্তি আনন্দিতা হইলেন। ইত্যবসরে লোকমুখে বার্তা পাইয়া শ্রীরঙ্গক্ষেত্র হইতে বৃদ্ধ শ্রীশৈলপূর্ণও নবপ্রস্থত ভাগিনেয়দ্বয়কে দর্শন করিবার মানসে তথায় উপনীত হইলেন। বহুকালের পর জ্ঞাতকে পাইয়া কাস্তিমতী ও মহাদেবী উভয়েই পরম নির্মমতা লাভ করিলেন। সর্কসুলক্ষণযুক্ত শিশুদ্বয়কে দেখিয়া বৃদ্ধ সন্ন্যাসীও পরম প্রীত হইলেন। কাস্তিমতীর পুত্রের নানাবিধ দৈবলক্ষণ দর্শন করিয়া তাঁহার নন্দা আলোয়ার কথিত উক্ত সময়ে শ্রীপেরুমবুহুরে আদিশেষাবতারের কথা শ্রবণ হইল। বৃহৎ পদ্মপুরাণের দ্বাত্রিংশ অধ্যায়, নারদ পুরাণ, স্বক পুরাণের

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়, এবং শ্রীমঙ্গলবতের একাদশ স্কন্ধে কলিযুগে যে জনন্ত দেবের কথা বর্ণিত আছে, এই শিশুই যে সেই লক্ষণাবতার, তাহাতে তাঁহার আর কোনও সন্দেহ রহিল না। তদনুসারে তিনি উহার নাম শ্রীরামানুজ রাখিলেন, এবং মহাদেবীর পুত্রকে গোবিন্দ আখ্যা প্রদান করিলেন। মহাদেবা ভাব্যতে আর একটি পুত্র প্রসব করেন, তাঁহার নাম ছোট গোবিন্দ।

আদি কবি মহর্ষি বায়িকী লিখিতেছেন যে,

সার্প্যে জাভৌ তু সোমিত্রী কুলীরেহ ভূয়দিতৈ রবৌ ।

চৈত্র মাসের অশ্লেষা নক্ষত্রে, রবি কর্কট রাশিতে গমন করিলে লক্ষণ ও শক্রর জন্মগ্রহণ করিলেন। শ্রীমদ্রামানুজাচাৰ্য্যেরও জন্মমাস এবং রাশি স্মৃতিজ্ঞানন্দনদ্বয়ের তুল্য।

শিশু ছইট চার মাসের হইলে, তাহাদিগকে অশ্বে লইয়া মাতৃঘর গৃহ হইতে নিষ্ক্রমণ করিলেন, ও আদিত্য দর্শন করাইলেন। পরে যথা সময়ে তাহাদের অন্নপ্রাশন, বর্ণবেশ, চূড়াকবণ, বিছারস্ত্র ও উপনয়ন কাম সম্পন্ন হইল। বাল্যকাল হইতেই রামানুজ অসাধারণ ধীশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। শিক্ষকের মুখ হইতে একবার শুনিলেই, যেরূপ হুকুম পাঠ হউক না কেন, তিনি অন্যায়সে তাহার অর্থবোধ করিতে পারিতেন। এজন্ত সকল শিক্ষকেরই স্নাতশয় প্রিয় ছিলেন।

তাঁহার ধীশক্তি কেবল যে বহিমুখী ছিল তাহা নহে। দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের স্থচীর ভ্রায় ইহা উত্তর দক্ষিণ রূপ ধন্য অর্থ উভয়কেই সমভাগে দেখাইয়া দিত। ধর্মের অক্লেশলন ও ধার্মিকের সহবাস তাঁহার সাতিশয় প্রিয়কর ছিল। সুবিধা পাইলেই তিনি সাধুসঙ্গ করিতে বিলম্ব করিতেন না।

সেই সময় শ্রীকাঞ্চীপূর্ণ নামে এক পরম ভাগবত কাঞ্চি নগরীর প্রধানতম বর বালিয়া সঙ্গজন পরিচিত ছিলেন। উক্ত মহাশয় প্রতিদিন কাঞ্চি হইতে দেব পূজার্থ পুনামেণি নামক গ্রামে গমন করিতেন। শ্রীপেরুম্বুছব, ঐ স্থানদ্বয়ের মধ্যবস্তী। সুতরাং তিনি রামানুজের বাটির পার্শ্ব দিয়া প্রতিদিন গমনাগমন করিতেন। জাতিতে শূদ্র হইলেও তাঁহার প্রগাঢ় ঈশ্বরানুগ দোখিয়া ব্রাহ্মণগণও তাঁহাকে সমুচিত শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। একদা সামং-বাগের রাঁহুজ অধ্যাপক গৃহ হইতে আগমন কালীন এই ভাগবতোক্তের সহিত পথিমধ্যে সহসা মিলিত হইলেন, এবং তদীয় দিব্য মুখজ্যোতিঃ নিরীক্ষণ করিয়া স্বতঃই তাঁহার দিকে সাতিশয় আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। তিনি অতি

বিনীতভাবে তাঁহাকে সেই রজনী তাঁহার আলয়ে ভিক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। ত্রীকাকিপূর্ণ বালকের দিব্যশক্তি ■ ভগবৎকণ দেখিয়া আমন্ত্রণ অস্বীকার করিতে পারিলেন না। পরমভাগবতকে অতিথি পাইয়া রামানুজের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহাকে সূচকরূপে ভিক্ষা করাইয়া, তদীয় পাদসংস্পর্শ করিতে উদ্রুত হইলেন। অতিথি কিন্তু স্বীকৃত হইলেন না। কহিলেন, “আমি নীচ, শূদ্র। আপনি ব্রাহ্মণ ■ পরম বৈষ্ণব। কোণায় আমি আপনার পদসেবা করিব, তাহা না হইয়া আপনি কি না দাসের সেবা করিতে চাহিতেছেন ?” শ্রীরামানুজ তাহাতে দ্বিগুণিত হইয়া কহিলেন, “বুদ্ধিলাম, আমার অদৃষ্ট মন্দ। তজ্জন্মই আপনার ভ্রাতৃ মহাপুরুষের সেবা-ধিকার পাইলাম না। মহাশয়, উপবীত ধারণ করিলেই কি ব্রাহ্মণ হয় ? যিনি হরিত্তিকিণরায়ণ, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। দেখুন তিরুপ্পান আলোয়ার চণ্ডাল হইয়াও ব্রাহ্মণের পূজা হইয়াছেন।”

বালকের ঈদৃশী ভক্তি দেখিয়া ত্রীকাকিপূর্ণ তাঁহাকে মনুষ্যজ্ঞান করিতে পারিলেন না। নানাবিধ সদালাপের পর রজনীতে রামানুজগৃহে বিশ্রামস্থ অল্পভব করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে স্বস্থানে গমন করিলেন। সেই দিবস হইতে উভয়ে উভয়ের প্রেমে চিরদিনের জন্ত বদ্ধ হইয়া পড়িলেন।

পূর্বাচার্য্যগণ রামানুজকে কেন যে লক্ষণাবতার বলিয়াছেন, তাহা তাঁহারা পুরাণপ্রমাণানুসারে দেখাইয়াছেন, ইহা পূর্বে ইঙ্গিত করিয়াছি। সৌমিত্রির স্বভাবের সহিত কেশবনন্দনের স্বভাব তুলনা করিলেও আমরা অনেক সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাই। লক্ষ্মীবর্দ্ধন লক্ষণের কর্তব্যপরায়ণতা, সত্যনিষ্ঠা, রামভক্তি, জিতেন্দ্রিয়তা, ও ধর্মপরায়ণতা জগতীতলে অতুলনীয়। তাঁহার হৃদয়রাজ্যের শ্রীরামচন্দ্রই একমাত্র অধীশ্বর ছিলেন। রামবস ভিন্ন ইতর রসে তাঁহার আস্থা-মাত্রই ছিল না। সুতরাং তিনি যে পার্থিব প্রলোভন হইতে সুদূরে অবস্থান করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি ? ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ, আমরা “বাস্তবিক-গিরিসমুদ্রা, রামসাগরগামিনী”, রামায়ণী গঙ্গায় অবগাহন করিলে প্রাপ্ত হই। যখন মায়ায়ম স্বর্ণমৃগ, রমণীকুলের গৌরবস্বরূপিনী জনকনন্দিনীকে মোহিত করিয়া, সর্বকলাপগুণসমম্বিত ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকেও বিমোহিত করিয়াছিল, সেই সময় শ্রীমান্ লক্ষণ তাঁহার হৃদয়ের একমাত্র অভিষ্টদেবকে এইরূপে সাবধান করিতেছেন।

(ক্রমশঃ)

সবই পূৰ্ণ কাৰ্য্য, পূৰ্ণ অনুভূতির ফল, উহারা একত্রে স্বাভাবিক জ্ঞানরূপে পরিণত হইয়াছে। এতক্ষণ আমরা দেশ আসিলাম, আর এতদূর পর্য্যন্ত আধুনিক বিজ্ঞানও আমাদের সহায় রহিলেন, কিন্তু আব এক গোল আসিতেছে। আধুনিক বিজ্ঞানবিদেরা প্রাচীন ঋষিদের সহিত একমত হইতেছেন এবং তাহাদের যতপািন প্রাচীন ঋষিদের সঙ্গে মিল, ততখানি কোন দোষ নাই। বৈজ্ঞানিকেরা স্বীকার করেন যে, প্রত্যেক মানুষ এবং প্রত্যেক জন্তুই এক এক গুণি অনুভূতি সমষ্টি গঠন করিয়া জন্মগ্রহণ করে। তাহারা ইহাও মানেন যে, মনের এই মনল কাৰ্য্য পূৰ্ণ অনুভূতি-ব ফল; কিন্তু তাহারা বলেন, ঐ অনুভূতিগুলি যে আত্মার, ইহা বলিবার আবশ্যকতা কি? উচা কেবল শরীরেই ধৰ্ম্ম, তাহা বলিলেই হয়। উচা বংশানুক্রমিক সঞ্চার বলিগেই ত হয়। ইহাট শেষ প্রশ্ন: আনি যে মনল সংস্কার লটব, জন্মিয়াছি, তাহা আমাব পূৰ্বপুরুষদের সঞ্চিত সংস্কার, হহাই বন না কেন? ক্ষুদ্র জীবাব হইতে সৰ্বশ্রেষ্ঠ মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলেই কল্পসংস্কার আমার ভিতরে রহিয়াছে, কিন্তু উচা বংশানুক্রমিক সঞ্চারের বশেই আমাতে আসিয়াছে। এক্ষণ হইলে আর কি গোল থাকে? এই প্রশ্নটি অতি সূক্ষ্ম। আমরা এই বংশানুক্রমিক সঞ্চারের কতক অংশ মানিবাও থাকি। কতটুকু মানি? মানি কেবল আত্মার বাসোপযোগী গুণ দান করা পর্য্যন্ত। আমরা আমাদের পূৰ্ব কন্মের দ্বারা কোন বিশেষ শরীর আশ্রয় করিয়া থাকি। আর যাঁহারা আপনাদিগকে সেই আত্মাকে সম্ভাররূপে লাভ করিবার উপযুক্ত কারয়াছেন, তাহাদের নিকট হইতেই তিনি উপযুক্ত উপাদান গ্রহণ করিয়া থাকেন।

বংশানুক্রমিক-জন্মবিকাশবাদ প্রমাণ বাতীতই একটা অদ্ভুত প্রতিজ্ঞা স্বীকার করিয়া থাকেন যে, মনের সংস্কারবাণির ছাপ জড়ে থাকিতে পারে। যখন আমি তোমা দিকে তাকাই, তখন আমার চিত্তহৃদে একটা তরঙ্গ উঠে। ঐ তরঙ্গ চলিয়া যায়, কিন্তু স্মারূপে তরঙ্গাকারে থাকে। আমরা উহা বুঝিতে পারি। ভৌতিক সংস্কার যে শরীরে থাকিতে পারে, তাহা আমরা বুঝি। কিন্তু শরীর ভয় হইলেও যে মানসিক সংস্কার শরীরে বাস করে, তাহার প্রমাণ কি? কিসের দ্বারা ঐ সংস্কার সঞ্চারিত হয়? মনে কর, যেন মনের প্রত্যেক সংস্কার শরীরে বাস করা সম্ভব; মনে কর, আদিম মনুষ্য হইতে আরম্ভ হইয়া বংশানুক্রমে সকল পূৰ্বপুরুষের সংস্কার আমার পিতার শরীরে রহিয়াছে এবং পিতার শরীর হইতে আমাতে আসিতেছে। কি করিয়া? জীবগুণকোষের

(Bio-plasmic cell) দ্বারা । কিন্তু কি করিয়া ইহা সম্ভব হইবে, কারণ, পিতার শরীর সম্পূর্ণ সন্তানে আইসে না । একই পিতামাতার অনেকগুলি সন্তানসমুহিত থাকিতে পারে, তাহা হইলে এই বংশানুক্রমিক সঞ্চারবাদ হইতে ইহা নিঃসংশয়ভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, এখানে সঞ্চারক ও সঞ্চার্য্য এক, অর্থাৎ ভৌতিক বলিয়া পিতামাতা তাঁহাদের নিজ মনোবৃত্তির কিঞ্চিদংশ বোয়াইবেন, আর যদি তাঁহাদের সমুদয় মনোবৃত্তিই আইসে, তবে প্রথম সন্তানের জন্মের পর তাঁহাদের মন শূন্যস্থকপ হইবে ।

আবার যদি জীবাণুকোষে চিরকালের অনন্ত সংস্কারসমষ্টি থাকে, তবে জিজ্ঞাস্য এই, উহা কোথায় ও কিরূপেই বা থাকে ? ইহা একটা অত্যন্ত অসম্ভব প্রতিজ্ঞা, আর যতদিন না এই জড়াদোরা প্রমাণ করিতে পারেন, কি করিয়া ঐ সংস্কার ঐ কোষে থাকিতে পারে, আর কোথায়ই বা থাকিতে পারে, এবং মনোবৃত্তি ভৌতিক কোষে নিদ্রিত থাকে, ইহার অর্থ কি, বুঝাইতে পারেন, ততদিন তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে না । এইটুকু বেশ স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে যে এই সংস্কার মনের মধ্যে, মনই জন্মজন্মা-
 গ্রহণ করিতে আইসে, মনই আপন উপযোগী উপাদান গ্রহণ করে, আর যে মন আপনাকে কোন বিশেষ প্রকার শরীর ধারণ করিবার উপযুক্ত কর্ম করিয়াছে, যতদিন পর্য্যন্ত না উহা সেই উপাদান পাইতেছে, ততদিন উহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে । ইহা আমরা বুঝিতে পারি । অতএব দাঁড়াইল এই টুকু যে, আত্মার দেহগঠনোপযোগী উপাদান প্রস্তুত করা পর্য্যন্তই বংশ-
 অনুক্রমিক সঞ্চারানুসারে পিতামাতার কর্ম । আত্মা কিন্তু দেহের পর দেহ গ্রহণ করেন—শরীরের পব শরীর প্রস্তুত করেন ; আমরা যে কোন কার্য্য করি, তাহাই সূক্ষ্মভাবে রহিয়া যায়, আবার সময় পাইলেই উহাও প্রকাশ পাইতে প্রস্তুত হয় । যখনই আমি তোমার দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখনই আমার মনে একটা তরঙ্গ উঠে । উহা যেন চিত্তহ্রদের ভিতর ডুবিয়া যায়, সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর হইতে থাকে, কিন্তু উহা একেবারে নাশ হইয়া যায় না । উহা আবার তরঙ্গাকারে উঠিতে প্রস্তুত হইয়া থাকে—উহার নাম স্মৃতি । দেখা গেল, সমুদয় সংস্কার-
 সমষ্টি আমার মনে বহিয়াছে, মূঢ় হইলে এই সমুদয় সংস্কারের সমবেত সমষ্টি আমার উপর থাকে । একটা বল রহিয়াছে, আর আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই হাতে একটা ছড়ি লইয়া সব দিক্ হঠাতে উহাকে মারিতে আরম্ভ করিলাম ; বলটা ঘরের এক ধার হইতে আর এক ধারে যাইতে আরম্ভ হয়, দরজার
 ৩৩৮

কাছে পৌঁছিয়েই উহা পলাইয়া যায়। উহা কোন্ শক্তিতে বাহিরে চলিয়া যায় ? যতগুলি ছড়ি মারা হইতেছিল, তাহাদের সমবেত শক্তিতে। উহার দিক্ ও ঐ সকলের সমবেত ফলে নির্ণীত হইবে। এইরূপ, শরীরের পতন হইলে আত্মাকে চালায় কে ? উহা—যে সকল কার্যা করিয়াছে, যে সকল চিন্তা করিয়াছে, উহা ঐ সকল শক্তি লইয়া চলিবে। যদি সমবেত কর্ম্মসমষ্টি এরূপ হয় যে, পুনর্বার ভোগের জন্য উহাকে নূতন শরীর গড়িতে হয়, তবে উহা সেই সকল পিতামাতার নিকট ঘাইবে, বাহাদের নিকট হইতে সেই শরীর গঠনের উপযোগী উপাদান পাওর হইবে—তখনই উহা একটা নূতন শরীর গ্রহণ করে। এইরূপে উহা দেহ হইতে দেহান্তরে যায়, স্বর্গে বা, আবার পৃথিবীতে আইসে, মাহুষ হয়, অথবা উচ্চের বা নিম্নতর শরীর গ্রহণ করে। এইরূপেই উহা চলিতে থাকে, যতদিন না উহার ভোগ শেষ হইয়া আবার বুরিয়া পূর্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্ত হয়। উহা তখন নিজের স্বরূপ জানিতে পারে, নিজেকে কি তাহা জানিতে পারে, অজ্ঞান চলিয়া যায়, উহার শক্তি সমূহ প্রকাশিত হয়, উহা তখন সিদ্ধ হইয়া যায়, আর উহার পক্ষে স্থূল শরীরের কোন আবশ্যকতা থাকে না—স্থূল শরীরেবও আবশ্যকতা থাকে না। উহা নিজ আলোকে নিজেকে প্রকাশিত হয়, মুক্ত হইয়া যায়, উহার আর জন্ম বা মৃত্যুর আবশ্যকতা থাকে না।

আমরা এ সম্বন্ধে এক্ষণে আর বিশেষ আলোচনা করিব না। কিন্তু এই পুনর্জন্মবাদ সম্বন্ধে আর একটা কথা বলিয়াই নিবৃত্ত হইব। এই মতই কেবল জীবাশ্মের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া থাকেন। উহা আমাদের সমুদয় দুর্বলতার কারণ অপর কাহাবও ঘাড়ে চাপায় না—যাহা একটা সাধারণ মানবীয় দুর্বলতা। আমরা আমাদের নিজেদের দোষ দেখিতে পাই না। চক্ষু কখন আপনাকে দেখিতে পায় না। উহারা আর সকলের চক্ষু দেখিতে পায়। আমরা আমাদের দুর্বলতা স্বীকার করিতে বড় নারাজ, আমরা অপবের ঘাড়ে দোষ চাপাইতে পারি। সাধারণ মানব অপর লোকের উপর সমুদয় দোষ চাপাইয়া থাকে ; তাহা যদি না পারে, তবে ঈশ্বরের ঘাড়ে দোষ চাপায় ; তাহা না হইলে অদৃষ্ট নামক একটা ভূতের সৃষ্টি করে। অদৃষ্ট আবার কি ? উহা কোথায় ? আমরা যাহা বপন করি, আমরা তাহাই পাইয়া থাকি।

আমরাই আমাদের অদৃষ্টের সৃষ্টিকর্ত্তা। আমাদের অদৃষ্ট মন্দ হইলেও কাহাকেও দোষ দিবার নাই, আগর ভাল হইলেও কাহাকেও প্রশংসা করিবার নহে। [প্রাণ. ১৩০৮।]

উদ্বোধন :

৩৩৯

নাই। বাতাস সমদাই চলিতেছে। যে সকল জাহাজের পাল খাটানো থাকে, সেই জাহাজেই বাতাস লাগে—তাহারাই পাল ভরে এগিয়ে যায়। যাহাদের পাল গুটানো থাকে, তাহাদিগের বাতাস লাগে না—তবে কি ইহা বায়ুর দোষ হইল? আমরা যে, কেহ শ্রমী, কেহ বা দুঃখী, ইহা কি সেই কবণাময় পিতার দোষ, যাহার কৃপা পবন দ্বিবারাত্রি অবিরত বহিতেছে—যাহার দয়ায় কোন ক্ষয় নাই? আমরাই আমাদের অদৃষ্টের রচয়িতা। তাহার সূৰ্য্য চন্দ্রল বসন্ত সফল জন্ম উদ্ভিত। তাহার বায়ু মাধু পানী সকলের জন্মই সমান বহিতেছে। তিনি সকলের প্রভু, সকলের পিতা, দয়াময়, সমদর্শী। তোমরা কি মনে কর, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু আমরা যে দৃষ্টিতে দেখি, তিনিও সেই দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন? ভগবৎ-সম্বন্ধে ইহা কি ক্ষুদ্র ধারণা। আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুতুল এখানে নানা বিষয়ের জ্ঞান অতি আগ্রহের সহিত প্রাপণপণে চেষ্টা করিতেছি, আর নির্যাদেব মত মনে করিতেছি, ভগবানও ই বিষয়গুলি ঠিক সেইরূপ সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিবেন। তিনি জ্ঞান, এ পুতুল খেলার অর্থ কি! তাহার প্রতি সব দোষ চাপান, তাঁহাকে দণ্ড পুরস্কারের কড়া বলা, কেবল নির্যাদের কথা মাত্র। তিনি কাহাবও দণ্ড বিধানও করেন না, কাহাকেও পুরস্কারও দেন না। সব দেশে, সকাল, সন্ধ্যা অবস্থায় তাহার অনন্ত দয়া পাঠাব সকলেই অধিকারী। উহার ব্যবহার করণ করিব, তাহা আমাদের উপর নির্ভর করিতেছে। মানুষ ঈশ্বর বা আর কাহারও দোষ দিও না। যখন নিজ কর পাপ, তখন আপনাকেই নিন্দা কর, এবং যাহাতে আপনার মঙ্গল, তাহারই চেষ্টা কর।

পূর্বোক্ত সমস্তার ইহাই মীমাংসা। যাহারা নিজেদের কষ্টের জ্ঞান অপরের নিন্দা করবে (দুঃখের বিষয়, একরূপ লোকের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে), তাহারা সাধারণতঃ হতভাগা চন্দ্রল মস্তিষ্ক; ইহারা নিজের কৰ্ম্মদোষে এ অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছে, এক্ষণে তাহারা অপরের নিন্দা করিতেছে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় না, উহাতে তাহাদের কিছুমাত্র উপকার হয় না। বরং অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাইবার এই চেষ্টাতে তাহাদিগকে আরও চন্দ্রল করিয়া ফেলে। অতএব কাহাকেও তোমার নিজের দোষের জ্ঞান নিন্দা করিও না, নিজের পাথে নিজ দাড়াও, সমুদয় দক্ষিণ তোমার নিজের ঘাড়ে লও। বল, আমি যে কষ্ট ভোগ করিতেছি, তাহা আমারই কৃতকর্ম্মের ফল—তাঁহা হইতেই প্রমাণিত হইতেছে, উহা আমারই

দ্বারা নাশও হইতে পারে। যাহা আমি সৃষ্টি করিয়াছি, তাহা আমি ধ্বংস করিতে পারি, যাহা অপর কেহ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা আমি কখন নাশ করিতে সমর্থ হইব না। অতএব উঠ, সাহসী হও, বীর্যবান হও। সমুদয় দায়িত্ব আপনার ঘাড়ে লও—জানিয়া রাখ, তুমিই তোমার অদৃষ্টের স্বজনকর্তা। তুমি যে কিছু বল বা সহায়তা চাও, তাহা তোমার ভিতরেই রহিয়াছে। অতএব তুমি এক্ষণে জানিয়া নিজেই ভবিষ্যৎ গঠন করিতে থাক। ‘গংস্তা শোচনা নাস্তি’—এক্ষণে সমুদায় অনন্ত ভবিষ্যৎ তোমার সম্মুখে। সর্কদাঁই ইহা মনে রাখিবে, তোমার প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক কার্যই সফল থাকিবে। মনে মনে এই আশা রাখিবে, যেমন অসং চিন্তা, অসং কাণ্ড সমুদয় তোমার উপর ব্যারের দ্বারা লাকাইয়া পড়িতে উদ্ভূত, সেইরূপ সংচিন্তা, সংকার্যগুলি সহস্র দেবতার বলসম্পন্ন হইয়া তোমাকে সদা রক্ষা করিতে উদ্ভূত থাকিবে।

অন্নতত্ত্ব ।

কোন প্রশ্ন মাত্র এতবার জিজ্ঞাসা করিয়াছে, কোন তত্ত্বের রহস্য উদ্ঘাটন করিতে মানব সমুদায় জগৎ খুঁজিয়াছে, কোন প্রশ্ন মানব-হৃদয়ের এক অন্তঃকর ও প্রবর্তক, কোন প্রশ্ন আমাদের অস্তিত্বের সহিত এক অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত যত এই মানবদ্বার অমরত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন? কবিদিগের হস্তা নরনারায়ণ হইয়াছে, সাধু মহাত্মা স্তানী সকলেরই ইহা মূখ্য চিন্তার বিষয় হইয়াছে। সিংহাসনোপবিস্তি রাজগণ ইহার বিচার করিয়াছেন, পণ্ডিতগণ অর্থাৎ দার্শনিক এই অমরত্বের স্বপ্ন দেখিয়াছে। শ্রেষ্ঠ মানবগণ এই প্রশ্নের উত্তর প্রায় স্পর্শ করিয়াছেন—অতি হীন মানবগণও ইহার আশা করিয়াছে। এটি বিষয়ে লোকের আগ্রহ এখনও নষ্ট হয় নাই, এবং যতদিন মানব প্রকৃতি বিজ্ঞান থাকিবে, ততদিন নষ্ট হইবেও না। জগতে এই সম্বন্ধে অনেক অনেক উত্তর দিয়াছেন। আবাব ঐতিহাসিক প্রতি যুগেই দেখা যায় যে, সহস্র সহস্র ব্যক্তি এই প্রশ্ন একেবারে অনাবশ্যক বলিয়া পবিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি উহা সেইরূপই নূতন রহিয়াছে। অনেক সময় জীবন সংগ্রামে ব্যস্ত থাকিয়া এই প্রশ্ন যেন ভুলিয়া যাইতে হয়। হঠাৎ কেহ কালগ্রামে পতিত হইল—এমন কেহ, যাহাকে আমি দ্ব্যতক খণ্ড ভাল বাসিতাম, আমার অন্তরের অন্তরতম কেহ হঠাৎ যম আমাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইলেন, তখন যেন মুহূর্ত্তের জন্য শ্রাবণ, ১৩০৮।] উদ্বোধন। ৩১১

জন্ত এই সংসারের কোলাহল, সব গোলামাল খামিয়া গেল, সব যেন নিস্তর হইল, আর আত্মার গভীরতম প্রবেশ হইতে সেই প্রাচীন প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতে লাগিল—ইহার পর আর কি আছে? আত্মার কি গতি হয়? ঠেকিয়াই মানুষ সমুদয় শিক্ষা করে। আমাদের বিচারও এই কতকগুলি সাধারণ অশ্রুতির উপর নির্ভর করে। আমাদের চতুর্দিকে নয়ন বিস্তারিত করিয়া আমরা কি দেখিতে পাই? ক্রমাগত পরিবর্তন! বীজ বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন হয়—আবার বৃক্ষ হইতে বীজ হয়। বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বৃক্ষ হয়—আবার ঘুবিয়া বীজরূপে পবিণত হয়। কোন জীব উৎপন্ন হইল—কিছুদিন রহিল—আবার ফিরিয়া মরিয়া গেল—এই রূপে একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ হইল। মানুষের সম্বন্ধেও তক্রম। পর্বত সকল ধীরে অথচ নিশ্চিত রূপে গড়াইয়া যাইতেছে, নদী সকল ধীরে অথচ নিশ্চিত শুকাইয়া যাইতেছে। সমুদ্র হইতে বৃষ্টি আসিতেছে, আবার উহা সমুদ্রে যাইতেছে। সর্বত্রই একটা একটা বৃত্ত—জন্ম, বৃদ্ধি ও মার্শ যেন গণিতেব জায় সঠিকভাবে একটের পর আর একটা আসিতেছে। ইহাই আমাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা। এই সকলেরই অভ্যন্তর-দেশে ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া অনন্ত প্রকারের অনন্ত আকৃতিযুক্ত উচ্চতম সিদ্ধপুংষ পর্য্যন্ত মহান্ বস্তুরাশির পশ্চাতে আমরা একটা একটু দেখিতে পাই। প্রতিদিনই আমরা দেখিতে পাই, যে হুর্ভেদ্য প্রাচীর এক পদার্থ হইতে আর এক পদার্থকে পৃথক করিতেছে, লোকে ভাবিত, তাহা ভঙ্গ হইয়া যাইতেছে—আর আধুনিক বিজ্ঞান সমুদয় ভূতকেই এক পদার্থ বলিয়া বুঝিতেছে—কেবল যেন সেই এক প্রাণশক্তিই নানারূপে ও নানা আকারে প্রকাশ পাঠিতেছে—উহা যেন সমুদয়ের মধ্যে এক শৃঙ্খলরূপে বিদ্যমান—এই সকল বিভিন্নরূপ যেন তাহার এক একটা অংশ—জনস্বরূপে বিস্তৃত, অথচ সেই এক শৃঙ্খলেরই অংশ। ইহাকেই ক্রমোন্নতিবাদ বলে। এই ধারণা অতি প্রাচীন—মহুযাসমাজ যত প্রাচীন, এই ধারণাও তত প্রাচীন। কেবল মানুষের জ্ঞান যত বর্দ্ধিত হইতেছে, ততই উহা যেন আমাদের চক্ষে আরও উজ্জ্বলতররূপে প্রতিভাত হইতেছে। প্রাচীনেরা আর একটা বিষয় বিশেষরূপ বুঝিতেন—ক্রমসঙ্কোচ। কিন্তু আধুনিকেরা এই তত্ত্বটা তত ভালরূপ বুঝেন না। বীজই বৃক্ষ হয়, এক বিন্দু বালুরূপা কখন বৃক্ষ হয় না। পিতাই পুত্র হয়, মুক্তিকাও কখন সম্ভানরূপে জন্মায় না। কোথা হইতে এই ক্রমবিকাশ হয়, ইহাই প্রশ্ন। বীজ পূর্বে কি ছিল? উহা সেই বৃক্ষরূপ ছিল। ঐ বীজে

ভবিষ্যৎ একটী বৃক্ষের সম্ভবনীয়তা রহিয়াছে । ক্ষুদ্র শিশুতে ভবিষ্যৎ মানুষ্যের সমুদয় শক্তি অন্তর্নিহিত রহিয়াছে । সর্বপ্রকার ভবিষ্যৎ জীবনই অব্যক্তভাবে উহাদের বাজে রহিয়াছে । ইহার তাৎপর্য্য কি ? ভারতের প্রাচীন দার্শনিকেরা ইহাকে ‘ক্রমসঙ্কোচ’ বলিতেন । অতএব আমরা দেখিতে পাঠিতেছি, প্রত্যেক ক্রমবিকাশের আদিতেই একটী ‘ক্রমসঙ্কোচ’ প্রক্রিয়া রহিয়াছে । যাহা পূর্ক হইতেই বর্তমান নহে, তাহার কখন ক্রমবিকাশ হইতে পারে না । এখানেও আধুনিক বিজ্ঞান আমাদেরকে সাহায্য করিয়া থাকেন । গণিতের যুক্তি দ্বারা সঠিকভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, জগতে যত শক্তির বিকাশ দেখা যায়, তাহাদের সমষ্টি সৰ্বদাই সমান । তুমি এক বিন্দু জড় বা এক বিন্দু শক্তি বাড়াইতে বা কমাইতে পার না । অতএব শূন্য হইতে কখনই ক্রমবিকাশ হইবে না । তবে কোথা হইতে হইল ? অবশ্য ইহার পূর্বে ক্রমসঙ্কোচ প্রক্রিয়া হইয়া থাকিবে । পূর্ববয়স্ক মানুষের ক্রম সঙ্কোচে শিশুর উৎপত্তি, আবার শিশু হইতে ক্রমবিকাশ প্রক্রিয়ায় মানুষের উৎপত্তি । সর্বপ্রকার জীবনের উৎপত্তির সম্ভবনীয়তা তাহাদের বাজে রহিয়াছে । এখন এই সমস্তা যেন কিছু সরল হইয়া আসিতেছে । ইহার সহিত পূর্বোক্ত সমুদয় জীবনের একত্বের ভাব ধর । ক্ষুদ্রতম জীবাণু হইতে পূর্ণতম মানব পর্য্যন্ত বস্তুাবক এক সত্তা, এক জীবনই বর্তমান । যেমন এক জীবনেই আমরা শৈশব, যৌবন, বার্দ্ধক্য প্রভৃতি বিবিধ অবস্থা দেখিতে পাই, —হ তত্ত্বটিকেই আর একটু অগ্রসর হইয়া আর একটু বিস্তারিত করিয়া দেখ,—ঐ শৈশব অবস্থার পশ্চাতে—তাহার পশ্চাতে—তাহার পশ্চাতে—কি আছে দেখ, যতক্ষণ না তুমি জীবাণুতে উপনীত হও । এইরূপে ঐ জীবাণু হইতে পূর্ণতম মানব পর্য্যন্ত যেন এক জীবন-স্রোত বিরাজমান । ইহাকেই ক্রমবিকাশ বলে এবং আমরা দেখিয়াছি, প্রত্যেক ক্রমবিকাশের পূর্বেই একটী ক্রমসঙ্কোচ রহিয়াছে । যে জীবনীশক্তি এই ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে পূর্ণতম মানব অথবা এই জগতস্থ জৈবের বতীর রূপে ক্রমবিকশিত হয়,—এই সমুদয় গুলিই অবশ্যই জীবাণুতে সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করিতেছিল । সমুদয় শক্তি—এমন কি, স্বয়ং জৈবের উহার মধ্যে অন্তর্নিহিত ছিল—ধীরে ধীরে অতঃ ধীরে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে থাকে । সর্বোচ্চ প্রকাশও অবশ্যই বীজভাবে সূক্ষ্মভাবে উহার ভিতরে ছিল—তাহা হইলে উহা তাহার ক্রমসঙ্কোচ হইল ? সেই সর্বব্যাপী জগন্ময় জীবনীশক্তির ক্রমসঙ্কোচ । এই এক চৈতন্যরাশি যাহা জীবাণু হইতে পূর্ণতম মানব পর্য্যন্ত

১লা শ্রাবণ, ১৩০৮ ।] উদ্বোধন । ৩৪৩

বিভ্রমান, তাহা দীরে দীরে প্রকাশিত হইতেছে। উহা—কি? উহা সেই
মন্দব্যাপী জগন্ময় চৈতন্যের অংশ—উহা ঐ জীবাত্মতে ক্রমসঙ্কুচিত হইয়া
বর্তমান ছিল। উহা সমুদয়ই পূর্ণভাবে বর্তমান ছিল। উহা য জগৎ, তাহা
নাহে। জগন্মানের তাই সমুদয় মন ইন্দ্রে সরাইয়া দেয়। জগন্মানো বা
বুদ্ধির সঙ্গে এই ভাবের যোগ আছে, যেন কিছু বাঁধিবে হইতে আসিতেছে।
ইহা মানিলে পূর্বোক্ত গণিতসঙ্গত ৭ মান অর্থাৎ ভগতে শক্তি মন্দাই মন্দাই
সমনান থাকে, ইহা সিদ্ধ হয় না। উহা ভিতরেই থাকে, কেবল উহা আপনাকে
প্রকাশ করে মাত্র। বিনাশের অর্থ কি? এই একটা ঘ্রাস বাহিয়াছে।
আমি উহা ভূমিতে ফেলিয়া দিলাম, উহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। উহা কি
হইল? উহা স্ফূরণে পরিণত হইল মাত্র। তবে নিশা কি হইল?
সূলেব স্ফূর্তাবে পরিণতি। উহার উপাদান পরমাণুগুলি একত্র হইয়া ঘ্রাস
নামক এই কার্যে পরিণত হইয়াছিল। উহার আবার উহাদের কারণে চালনা
যায়, আর নাশ ইহারই নাম—কারণে লয়। কার্য কি? না, কারণেব
বাল্তাণ। কার্য ও কারণে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই। আবার ঐ ঘ্রাসের
কথাই ধর। উহার উপাদানগুলি এবং উহার নিস্রাতার ইচ্ছা সহযোগে
উহা উৎপন্ন। এই দুইটাই উহার কারণ এবং উহাতে বর্তমান। নিস্রাতার
ইচ্ছাশক্তি এক্ষণে উহাতে কি ভাবে বর্তমান? সাংহতিশক্তিরূপে। ঐ শক্তি
না থাকিলে উহার প্রত্যেক পরমাণু পৃথক্ পৃথক্ হইয়া যাউত। তবে এক্ষণে
কার্যটা কি হইল? না, উহার কারণের সহিত অভেদ, কেবল উহা অপর এক
রূপ ধারণাছে মাত্র। যখন কারণে কিছু কালের জন্ত পরিণাম প্রাপ্ত হয়,
অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট স্থানের ভিতর সঙ্কুচিত আকারে অবস্থান করে, তখন ঐ
কারণটিকেই কার্য বলে। আমাদের ইহা মনে করিয়া রাখা উচিত। এই
তত্ত্বটিকে আমাদের জীবনের ধারণা সম্বন্ধে প্রযুক্ত করিয়া দেখিতে পাই যে,
জীবাত্ম হইতে সম্পূর্ণতম মানব পর্য্যন্ত সমুদয় শ্রেণীই অশ্রু সেই বিশ্বব্যাপী
প্রাণশক্তির সহিত অভেদ। কিছু অমৃতত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন এখানেও মিটিল না।
আমরা কি পাইলাম? আমরা পূর্বোক্ত বিচার হইতে এতটুকু মাত্র পাইলাম
যে, জগতের কিছুই ধ্বংস হয় না। নূতন কিছুই নাই—কিছু হইবেও না।
সেই একই প্রকারের বস্তুরাশি চক্রের ত্রায় পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হইতেছে।
জগতে যত গতি আছে, সবই তরঙ্গাকারে একবার উঠিতেছে, একবার
পড়িতেছে। কোটা কোট ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ণতর রূপ হইতে প্রসৃত হইতেছে—